বাঙলা প্রবন্ধ ও ভাষা-শিল্প

॥ সম্পাদনা ॥

অধ্যাপক সুশীল জানা

॥ লেখকবর্গ ॥

ডক্টর অজিতকুমার ঘোষ, প্রবীণ অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরাশংকর সেনশাস্ত্রী, কবি-অধ্যাপক শুদ্ধসত্ত্ব বসু, ডক্টর সাধনকুমার ভট্টাচার্য, প্রবীণ অধ্যাপিকা বিন্দুবাসিনী দেব, অধ্যাপক কৃষ্ণবন্ধু দাশ, অধ্যাপক অনিলকুমার বসাক, অধ্যাপিকা মঞ্জুশ্রী কর এবং অধ্যাপক সুশীল জানা ॥



বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড

৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড : কলিকাতা ৯

॥ প্রথম প্রকাশ ॥
জানুয়ারী ১৯৬১

॥ প্রচ্ছদ ॥
সুধীন ভট্টাচার্য

মূল্য : ছয় টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষ হইতে শ্রীমনোমোহন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত এবং শ্রীঅমৃতলাল কুণ্ডু কর্তৃক জ্ঞানোদয় প্রেস (১৭ হায়াৎ খাঁ লেন : কলিকাতা ৯) হইতে মুদ্রিত ॥

ভূমিকা

একান্তভাবে কতকগুলো বাস্তব প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখেই ছাত্রছাত্রীদের জন্যে এই গ্রন্থখানি সংকলিত হলো। প্রবন্ধগুলি রচনা করেছেন যাঁরা—তাঁরা সকলেই খ্যাতিমান লেখক এবং অভিজ্ঞ অধ্যাপক। তাঁদের সহযোগিতায় এই গ্রন্থে একদিকে শিল্পগত প্রসাদগুণ এবং অন্যদিকে মননের ঐশ্বর্য একত্রে সমাহৃত হয়েছে। আশা রাখি ছাত্রছাত্রীরা এর দ্বারা উপকৃত হবে।

শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখেই সাধারণ রচনাগুলিকে অত্যধিক তথ্যভারাক্রান্ত করে তোলা হয় নি—কারণ পাঠ্যপুস্তকের মত রচনার তথ্য আয়ত্ত কবার সময় ও সুযোগ ছাত্রছাত্রীরা অল্পই পেয়ে থাকে। সে তথ্য ও বিশ্লেষণ সাম্মানিক ও ঐচ্ছিক বাঙলার গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাগুলিতে করা হয়েছে। প্রবন্ধ আলোচনার এই অংশটিকে বিশেষ বিশেষ বিষয়ের বিশিষ্ট প্রবীণ অধ্যাপক অধ্যাপিকাগণ সুসমৃদ্ধ করেছেন।

গ্রন্থবিজ্ঞাপন প্রচারিত হওয়ার পর প্রকাশনে বিশেষ বিলম্ব ঘটেছে। শ্রদ্ধেয় বহু অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা এবং উৎসুক ছাত্রছাত্রী বই সম্পর্কে অনুসন্ধান করেছেন। তাঁদের অসংখ্য চিঠিপত্রের জবাব ব্যক্তিগতভাবে দিয়ে উঠতে পারি নি। যাই হোক, বিলম্বে হলেও গ্রন্থখানিকে শেষ পর্যন্ত তাঁদের সামনে উপস্থিত করলাম। বইখানি তাঁদের খুশি করতে পারলেই পরিশ্রম সার্থক মনে করবো।

বিনীত

সম্পাদক

সূচীপত্র

বাঙলা ও বাঙালী

ভারতবর্ষ ও জাতীয় সমস্যা

শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ছাত্রসমাজ

আন্তর্জাতিক ও চিন্তামূলক

বিবিধ

বাঙলা সাহিত্য ॥ সাধারণ আলোচনা

বাঙলা সাহিত্য ॥ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা

অলংকার ও ছন্দ

দ্বিতীয় ভাগ

বাঙলা ও বাঙালী

প্রাচীন বাঙলার গৌরব

।। পৌরাণিক প্রমাণ ।। ঐতিহাসিক প্রমাণ ।। বিদ্যার ক্ষেত্রে প্রাধান্য ।।
।। শিল্পের ক্ষেত্রে প্রাধান্য ।। নৌ-বাণিজ্য কীর্তি ।। রাজা শশাঙ্ক ।।
।। মধ্যযুগের কীর্তি ।। কাব্যে-পাণ্ডিত্যে-বীর্যে ।। শিল্পে—চিকিৎসা শাস্ত্রে ।।

"বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ !"—

উত্তরে তোমার শৈলচূড়ার শিখরে চিরশুভ্র রজত ধবল তুষার মুকুট, দক্ষিণে তোমার নীলসিন্ধু জলে বিধৌত চরণযুগল। পূর্বে ও পশ্চিমে—দুই হাত ভরিয়া মা উজাড় করিয়া দিয়াছেন নদীভরা জল, মাঠভরা ফসল; সন্তানের পরিতৃপ্ত কলকণ্ঠে মায়ের মাঠ-ঘাট-বাট মুখরিত।—বঙ্গজননীর ধনধান্যে ভরা এ রূপের গান বহু কবির কাব্যে কীর্তিত হইয়া আছে। আজিকার ছন্নছাড়া, দুঃখে ভরা রূপের সঙ্গে তাহার মিল হইবে না সত্য, কিন্তু একদিন তাহার ছিল—ছিল তাহার রাজ্যপাট, রাজা-সওদাগর, কবি ভাস্কর মনীষী—নানা কীর্তি।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিয়াছেন—বাঙালী সৈন্যবাহিনী অমিতবিক্রমে 'দশাননজয়ী রামচন্দ্রের প্রপিতামহের সঙ্গে' যুদ্ধ করিয়াছিল। মহাভারতের বর্ণনা হইতেও পাওয়া যায়—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে বঙ্গরাজ কুরু পক্ষে যোগ দিয়াছিলেন। এসব অবশ্য পৌরাণিক কাহিনী; ঐতিহাসিক প্রমাণ এসব কাহিনীকে অভিনন্দিত করে নাই। বাঙালীর ছেলে বিজয়সিংহের সিংহল-বিজয়ের কথাও ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সমর্থন করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন—বিজয় সিংহ বাংলার নয়, গুজরাট অঞ্চলেরই মানুষ।

তাই বলিয়া বাঙলার ঐতিহ্য বড় কম প্রাচীন নয়। বাঙালী সুপ্রাচীন জাতি। তাহার গৌরব গরিমার বিচিত্র কাহিনী ইতিহাস-কীর্তিত। বিক্রম-শিলা মহাবিহার ও নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে দুই অমরকীর্তি বাঙালী জ্ঞান-তপস্বীর নাম অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত হইয়া আছে। তাঁহারা হইলেন অতীশ দীপঙ্কর ও পণ্ডিত শীলভদ্র। অতীশ দীপঙ্কর শেষ বয়সে তিব্বত যাত্রা করিয়াছিলেন বৌদ্ধধর্ম শিক্ষাদান করার উদ্দেশ্যে। তিব্বতের ধর্মজিজ্ঞাসুরাই সগৌরবে তাঁহাকে লইয়া গিয়াছিলেন। আর চীনের লোকপ্রসিদ্ধ পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ

নালন্দায় দীর্ঘকাল বাস করিয়া আচার্য শীলভদ্রের কাছে নানা শাস্ত্র শিক্ষা করেন। ইতিহাসের এ বিবরণ প্রমাণ করিয়া দেয়—পাণ্ডিত্যের ক্ষেত্রে বাঙালীর সুপ্রাচীন অধিনায়কত্ব।

শিল্পের ক্ষেত্রেও তাহার মর্যাদা ছিল সুপ্রতিষ্ঠিত। অজন্তা গুহাতে আছে বাঙালী শিল্পীদের চারু হস্তের চিত্র স্বাক্ষর—পণ্ডিতেরা এইরূপ অনুমান করেন। তাছাড়া ভাস্কর্যে বীতপাল ও ধীমান এই দুই বাঙালী শিল্পী অমর হইয়া আছেন। কম্বোডিয়াতে যে ভারতীয় স্থাপত্য কীর্তি দেখা যায়, সেখানেও বাঙালী স্থপতির নির্মাণকৌশলের নিদর্শন লক্ষ্যণীয়।

বাঙালী সাহসেও দুর্বার, প্রাচীন যুগের ইতিহাসে তাহার পর্যাপ্ত প্রমাণ ছড়ান রহিয়াছে। বৌদ্ধযুগে বাঙালী সওদাগর দুস্তর সাগর পার হইয়া নানা দেশে বাণিজ্য করিতে যাইতেন একথা ঐতিহাসিক সত্য। দীর্ঘকাল ধরিয়া তাম্রলিপ্ত (আধুনিক কালে মেদিনীপুর জেলার তমলুক) ছিল সামুদ্রিক বাণিজ্যের এক বিখ্যাত বন্দর। অতি প্রাচীনকাল হইতেই বাঙলার পণ্যসম্ভার সাগরপারের নানা দেশে ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে। রোমের সম্রাটরা বাঙলার মসলিন কাপড় ব্যবহার করিতে ভালোবাসিতেন। অবশ্য বাঙালী সওদাগরেরা সেকালের অর্ণবপোতের সাহায্যে অতদূর যাত্রা যে করিতেন না সে কথা সত্য। আরবীয় বণিকদের মারফতেই এদেশের শিল্প-সামগ্রীসমূহ ইওরোপের হাটে বিক্রীত হইত। মসলিন ছাড়াও এদেশের শিল্পীদের হাতীর দাঁতের কাজ, শাঁখের কাজ বা সোনারূপার তারের কাজও বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। নৌ-শিল্পেও বাঙলার কারিগরদের ছিল অসামান্য প্রসিদ্ধি। এই খ্যাতি সমানে বহু শতাব্দীকাল ধরিয়াই অব্যাহত ছিল।

স্বাধীন বাঙলার ইতিহাস শুরু হয় খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী হইতে। তাহার পূর্বে দীর্ঘ আটশত বৎসর ধরিয়া বাঙলা দেশ নানা রাজবংশের অধীন থাকিয়া মগধের সঙ্গে যুক্ত ছিল। সপ্তম শতাব্দীতে গৌড়েশ্বর শশাঙ্ক বাঙলা দেশকে উত্তর ভারতের রাহুগ্রাস হইতে মুক্ত করেন। বাঙালী রাজা শশাঙ্ক উত্তর ভারতেও তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তার করেন।

শশাঙ্কের পর দীর্ঘ চারিশত বৎসর ধরিয়া পাল রাজবংশ বাঙলা দেশ শাসন করেন। পাল বংশের কুলগৌরব রাজা ধর্মপালের রাজত্বকালে বাঙলার রাজ্যসীমা চতুর্দিকে প্রসারিত হইয়া কাশী, কলিঙ্গ, কামরূপ ও মিথিলা পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। পাল রাজবংশের পর বাঙলা শাসন করেন সেন রাজবংশ—মুসলমান আক্রমণের কাল পর্যন্ত। পাল ও সেন রাজাদের নানা কীর্তি বাঙলার নানা

স্থানে বিকীর্ণ হইয়া আছে। কত বিশালায়তন দীঘি, কত মঠ মন্দির প্রাসাদ অট্টালিকা যে এই দুই পুণ্যকীর্তি রাজবংশের গৌরবময় নিদর্শন বহন করিয়া চলিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। নানা স্থান খননের ফলে পুরাতত্ত্ববিদদের গবেষণার নানা উপকরণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেই সব নিদর্শন বাঙলা দেশের অতি গৌরবময় অতীতের নিশ্চিত স্বাক্ষর বহন করিতেছে।

তুর্কীশাসনের আমলেও বাঙলা দেশ নানা দিক দিয়া গৌরবের অধিকারী হইয়াছিল। সাহিত্য, শিল্প ও স্থাপত্য যে কি পরিমাণ পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল তাহার নানা প্রমাণ আমরা পাইয়াছি। সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাঙলা রামায়ণ, মহাভারত, নানা মঙ্গলকাব্য এবং বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য এই যুগেরই অনন্য-সাধারণ কীর্তি। অবশ্য বাঙলা দেশে সাহিত্যের যুগ তাহার অনেক পূর্বেই শুরু হইয়া গিয়াছে। দশম শতাব্দীতে রচিত বৌদ্ধ গান ও দোঁহা প্রাচীনতম বাঙলা কাব্যের নিদর্শন। দ্বাদশ শতাব্দীর বাঙালী কবি জয়দেব সংস্কৃতে গীতগোবিন্দ রচনা করিয়া এক অমরকীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

কবির ভাষায়:

বাঙলার রবি জয়দেব কবি
কান্ত কোমল পদে,
সুরভি ক'রেছে সংস্কৃতের
কাঞ্চন কোকনদে।

প্রাচীন বাঙলার সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ ভগবান শ্রীচৈতন্যদেব। ঐ একটি নামকে কেন্দ্র করিয়া সারা ভারতবর্ষে যে আলোড়ন জাগিয়াছিল তাহার পরিচয় কত গ্রন্থেই না লিপিবদ্ধ হইয়া আছে! বাঙালী শ্রীচৈতন্য শুধু এক ধর্মগুরু—এ অতি নগণ্য পরিচয়। তিনি এক নূতন জাতির এবং নূতন যুগের স্রষ্টা। তাঁহার দুর্বার প্রভাব আজও অন্তঃসলিলা হইয়া সারা ভারতবর্ষের মানবধারার চিন্তার খাতে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে।

বাঙালী পণ্ডিত রূপ সনাতন, শ্রীজীব প্রভৃতির রচিত মূল্যবান সংস্কৃত গ্রন্থরাজি প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের শৈল-চূড়া।

মোগলযুগের বাঙলার ইতিহাস এক দীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামের দুঃসাহসিক কাহিনী। বার ভুঁইয়ার নাম ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জল অধ্যায় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। প্রতাপাদিত্য, চাঁদ রায়, কেদার রায়, সীতারাম, ঈশা খাঁ প্রভৃতি অসীম বিক্রমে বিপুল মোগলবাহিনীর সঙ্গে দীর্ঘকাল যুদ্ধ করিয়াছেন কিন্তু নতি স্বীকার করেন নাই।

পাঠান আমলে গৌড়শাহী সুলতানদের নির্দেশে বাঙালী স্থপতিরা এমন কতকগুলি মসজিদ ও প্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছিল যেগুলির গঠন-সৌন্দর্য ভগ্নাবশেষের মধ্যে আজও অম্লান হইয়া আছে। আবার এই যুগেই নবদ্বীপ বিদ্যাচর্চার কেন্দ্ররূপে সারা ভারতবর্ষে বিশেষ স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল। নব্য-ন্যায় শিক্ষার এত বড় কেন্দ্র তখন আর কোথাও ছিল না। ন্যায় ও অলঙ্কার শাস্ত্রে বাঙালী পণ্ডিতদের রচনাই আজও প্রামাণ্য হইয়া আছে।

আসল কথা এই যে, বাঙালীর অনন্যসাধারণ প্রতিভা কোনও যুগেই রাজনীতির ঝড়-ঝাপটার আবর্তে পড়িয়া স্তিমিত হইয়া যায় নাই। সকল প্রতিকূলতাকেই অতিক্রম করিয়া বাঙালী মনীষীরা নানা শাস্ত্রের ও নানা বিদ্যার চর্চা করিয়া গিয়াছেন।

সুকুমার শিল্পের ক্ষেত্রেও বাঙালী পিছাইয়া থাকে নাই। ঔরঙ্গজেবের পুত্র মহম্মদ তাঁহার পিতার কাছে উচ্ছ্বসিত ভাষায় বাঙলার কুসুমশিল্পের পরিচয় দিয়াছেন। বাঙলার মসলিনের ত' কথাই ছিল না। ইংরেজ এই শিল্পের মূলোচ্ছেদ না করা পর্যন্ত অপ্রতিহত গতিতে এই অপূর্ব শিল্পটি বহু শতাব্দীর প্রাচীন হইয়াও সগৌরবে বাঁচিয়া ছিল। বাঙালী কারিগরদের প্রস্তুত পিতল ও কাঁসার নানা শিল্পদ্রব্য প্রাচীন যুগেও সবিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। আর ছিল বাঙলার কামানশালায় তৈয়ারী কামান। দলমাদল, কালে খাঁ প্রভৃতির শবদেহ আজও অবিকৃত অবস্থায় তাহাদের প্রাচীন গৌরবের কাহিনী ঘোষণা করিতেছে।

প্রাচীন বাঙলার গৌরব রবি সত্যিই অস্তমিত হইয়াছিল পলাশীর যুদ্ধদিনের কলঙ্কিত সন্ধ্যায়। তাহার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত প্রাচীন বাঙলার সব ছিল। পাঠান বা মোগল আমলে নানা বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও তাহার প্রাণবন্যার উচ্ছ্বাস রুদ্ধ হয় নাই। বাঙালীর গঠনমূলক প্রতিভা লোককল্যাণের নানা পথ সৃজন করিয়া গিয়াছে।

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রেও যে প্রাচীন বাঙলার কত খ্যাতি ছিল গবেষকদের দ্বারা তাহাও সপ্রমাণিত হইয়াছে। বাঙালী চিকিৎসকেরা সেই অন্ধযুগেও বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে শল্য চিকিৎসা করিতেন।

প্রাচীন বাঙলায় অরাজকতা ছিল, ছিল দস্যু-তস্করের ভয়। ভাল পথঘাটও ছিল না। কিন্তু বাঙালীর ছিল সাহস, ছিল দেহে শক্তি। বাঙালী রমণীরাও ছিলেন বীরবালা। তাঁহারা শুধু ডাকাতের সঙ্গে নয়—প্রয়োজন হইলে শত্রুসৈন্যের সঙ্গেও মুক্ত তরবারি হস্তে যুদ্ধ করিতেন। 'রায় বাঘিনী' নামে সুপরিচিত রানী ভবশঙ্করী তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

একদা সর্বক্ষেত্রেই প্রাচীন বাঙলার জয় ধ্বনিত হইত। বাঙালী একদিকে যেমন কীর্তন, বাউল, ভাটিয়াল গান গাহিয়া মানুষের মন ভুলাইত আর একদিকে রণহুঙ্কারে গগন বিদীর্ণ করিত, পৌরুষের দ্বারা নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করিত।

কি ধর্মে, কি সাহিত্যে, কি আচার-বিচার, শিক্ষা-দীক্ষায় সর্বত্র সর্বক্ষেত্রে প্রাচীন বাঙলা ছিল ভারতবর্ষের মুকুটমণি—একথা অসার কল্পনামাত্র নয়, ইতিহাসে ও নানা গ্রন্থে স্বর্ণাক্ষরে তাহার সমর্থন লিপিবদ্ধ হইয়া আছে।

বাঙলার জীবনে ও শিল্পে প্রকৃতির প্রভাব

॥ ষড়ঋতুর প্রাকৃতিক রূপ ॥ কোমল ও কঠোর ॥ বাঙালীর ধর্মজীবনে শক্তির প্রাধান্য ॥ প্রাচীন ভাবজীবনে প্রকৃতির প্রভাব ॥ পুষ্পশিল্পে ভাস্কর্যে প্রভাব ॥ আধুনিক কাব্য জীবনে প্রভাব—রবীন্দ্রনাথ ॥

প্রকৃতি মায়ের আদরের দুলালী এই বাঙলা। ঐশ্বর্য আর সৌন্দর্য ভাণ্ডারের যাহা কিছু আছে, সবই উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিয়া সন্তানকে ভরিয়া দিয়াছেন মা। বাঙলার মাটির কোলে তাইতো অফুরন্ত সোনার ধানে ঢেউএর খেলা, ষড়ঋতুর আবর্তনে ষড়ৈশ্বর্যের পালা। নদ-নদী খালে আর বিলে অনন্ত স্নেহের ধারা, দোয়েল-শ্যামা-পাপিয়া আর কোকিলের কণ্ঠে অজস্র সঙ্গীতের তান। প্রকৃতির এই স্নেহকরস্পর্শে, অমৃত ছোঁয়ায় বাঙালী মানুষ হইয়াছে। বাঙালীর অন্তরে বাহিরে তাই অবিচ্ছিন্নভাবে জড়াইয়া আছে তাহার প্রকৃতির প্রভাব।

বাঙলাকে পটভূমিকা করিয়া ষড়ঋতুর আবর্তনের পালাগান চলিয়াছে বৎসরের পর বৎসর। রুদ্রভালের তৃতীয় নয়নের বহ্নিই প্রথম দেখা দেয় গ্রীষ্মের রূপে। বসন্তসখা মদনকে সে ভস্ম করিতে চায়—তাই দীপ্ত নয়নের বহ্নি আছাড় খাইয়া আসিয়া পড়ে বাঙলার বুকে। দাবদাহ সমস্ত বাঙলাকে জ্বালাইয়া পুড়াইয়া দেয়, বাঙলার বুক হাহাকার করিয়া উঠে। শুকাইয়া যায় তার মাঠ-ঘাট-বাট—নগর জনপদ পল্লী জুড়িয়া জলাভাব। এই কাতর আহ্বানে বোধকরি নটরাজ নয়নবহ্নি সংবরণ করেন, জলস্ফীত জটাজাল বিস্তার করিয়া দেন সমস্ত আকাশের গায়। ঘন কৃষ্ণ জটার সম্ভারে বাঙলার আকাশ বাতাস কোন প্রলয়ের আশঙ্কায় স্তব্ধ গম্ভীর হইয়া আসে। কিন্তু আশঙ্কা নয়, অভয় দিয়াই কলস্বনা ভাগীরথী সহস্র ধারায় নামিয়া আসেন মাটির বুকে। তৃষিত অন্তরের জ্বালা তিনি জুড়াইয়া দেন।

ভাগীরথীর সঙ্গেই হাত ধরিয়া দেখা দেন ভগবতী। মাটির বুকে, প্রকৃতির সভায় উৎসবের আয়োজন আরম্ভ হয়। দোয়েল শ্যামার কণ্ঠে কণ্ঠে বাজে আগমনীর গান। কুন্দ মল্লিকা যুথী অপরাজিতা অর্ঘ্য রচনা করে জননীর। কামিনী শেফালি দুয়ারে দুয়ারে দেয় আলিম্পনা, শ্বেত আলোর মশাল জ্বালে কাশের গুচ্ছ।

শরতের বিদায়ের পালা আসে। মা বিদায় নেন। কিন্তু যাবার বেলায় সোনার ধানে মেয়ের আঁচলটিকে ভরিয়া দিয়া যান। 'নবান্ন' উৎসবের সাড়া পড়ে ঘরে ঘরে।

কুয়াশার শ্বেত উত্তরীয় বাঙলাকে রূপ দেয় নূতন করিয়া। প্রকৃতি নিঃস্ব হয় —আবার এই শূন্যতার ভিতর দিয়াই দেখা দেয় রূপসজ্জা, আবির্ভাব হয় আগুনজ্বালা বসন্তের। কিন্তু এ সজ্জা, এ উন্মাদনা ক্ষণিকের। ফলের সম্ভাবনার সঙ্গেই তাহার সমাপ্তি। তারপর ধীরে ধীরে আসে পত্রঝরা চৈত্র—পুরাতন বৎসরের যত নিষ্ফল সঞ্চয়কে অঞ্চলের আবর্ত-আঘাতে উড়াইয়া লইয়া যায়। নূতনকে অভিনন্দন জানাইয়া পুরাতন বিদায় নেয়।

বাঙলার ঐশ্বর্যশালিনী এই প্রকৃতি। তাহার রূপের অন্ত নাই, তাহার মহিমার তুলনা কোথায়! এই প্রকৃতির কোলেই বাঙালী মানুষ হইয়াছে, তারই স্তন্যপানে হইয়াছে পুষ্ট। ঘর হইতে তাই মায়ের কোলের জন্যই বুঝি তাহার লোভ বেশি। তাই ত পাই বাঙলার কৃষাণকে—কৃষিকেই করিয়া নিল তাহার প্রধান উপজীবিকা। নদীমাতৃক বাঙলা ভূমি। মেঘনা, পদ্মা, ভাগীরথী, ব্রহ্মপুত্র, অজয় আর যমুনা, দামোদর আর রূপনারায়ণ সজলতায় স্নিগ্ধ করিয়াছে দেশকে, উর্বর করিয়া রাখিয়াছে দেশের ভূমিকে। জীবিকার জন্য তাই ত আমাদের পরিশ্রম নাই, ভাবনা নাই, মায়ের কাছে মাঠে গিয়া হাত পাতিলেই মা আমাদের ভাণ্ডার ভরিয়া দেন। এই অজস্র দানে পরিপুষ্ট হইয়াই বাঙালী বোধকরি এত শ্রমকাতর, অলস; উপার্জনের পথ আর আজ সে খুঁজিয়া লইতে পারে না। বাঙলার আজ আর সেই রাজ্যপাট নাই, কিন্তু বাঙালী তার স্বভাবের শিথিলতা, আর লক্ষ্যহীন জীবনের কল্পনা-প্রবণতা হইতে তাই মুক্তি লাভ করিতে পারিল না। বাঙলার জলধারা শুধু স্নেহস্নিগ্ধা নয়। কালভৈরবীর রূপও ঐ কীর্তিনাশার মধ্যে আছে। কত রাজার, কত রাজত্বের কীর্তিকে সে বিনাশ করিয়া আপন বিরাট কুক্ষিতলে টানিয়া নিয়াছে—তাহার দৃষ্টিপাতে কত আমীর যে আজ ফকির—সে সাক্ষী বহন করিতেছে ইতিহাস। এই কালভৈরবীর মধ্যে বাঙালী দেখিয়াছে শক্তিকে; মা চণ্ডীকে। এই শক্তির পায়ে মাথা নত

করিয়াছে বাঙালী—তাই তার এই শক্তির উপাসনা। বাঙলার প্রকৃতি শুধু ভৈরবী নন, তিনি বহুরূপা। কখনও তিনি অন্নপূর্ণা, দাক্ষিণ্যের তাঁর সীমা নাই, অকৃপণ হাতে ধনসম্পদ বিতরণ করিয়াও অতৃপ্ত তিনি। মায়ের বুকে স্নেহের আর প্রেমের অন্ত নাই। আবার কখনও নিরাসক্ত উদাসীন, কখনও বসনে ভূষণে রঙ্গময়ী উৎফুল্লা। মায়ের রূপ বাঙালী দুই চক্ষু ভরিয়া নিরীক্ষণ করিতেছে, উপলব্ধি করিতেছে তার সমস্ত জীবন ভরিয়া, সমস্ত অন্তর-শক্তি দিয়া। তার এই বিচিত্র উপলব্ধি তাকে প্রেরণা দিয়াছে বিচিত্র ধর্মপথে। শাক্ত বাঙালী, বৈষ্ণব বাঙালী, উদাসীন বাউল আর শিবভক্ত বাঙালী তাহার মায়ের মন্ত্রেই দীক্ষিত হইয়াছে। ব্যবহারিক জীবনের শিক্ষা বাঙালী যেমন পাইয়াছে তাহার প্রকৃতির হাত হইতে, ধর্মজীবনের দীক্ষাও লইয়াছে সেই মায়ের কোলে শুইয়া মায়ের রূপে মুগ্ধ হইয়া।

শুধু এই ধর্ম আর ব্যবহারিক জীবনেই নয়, বাঙালীর ভাবজীবনকেও সম্পদশালী করিয়াছে বাঙলার প্রকৃতি। কল্পনাপ্রবণ বাঙালী জীবন ও সত্যকে জানিতে চাহিয়াছে—তাহার কল্পনা আর দার্শনিকতা রূপ লইয়াছে তাহার সাহিত্যে, শিল্পে, সঙ্গীতে, ভাস্কর্যে আর চিত্রাঙ্কনের নিপুণতায়। গানে গানে ভরা বাঙালীর মন; বাঙলার সাহিত্যও তাই গীতি কবিতার সাহিত্য। নদীর কলতানই বুঝি মনকে মুখর করে, তাই পূর্ববঙ্গের আর উত্তরবঙ্গের জলস্রোতের ধারে ধারেই গীতি কবিতার জন্ম। জলের স্রোতে জেলে ডিঙ্গী ভাসাইয়া দিয়া ভাটিয়ালী গানের স্রোতে মাঝি ভাসিয়া যায়। সে গান তাহাকে যে কোন স্বপ্নপুরী, কোন মায়া রাজ্যে লইয়া যায়, তাহা হয়ত সে নিজেও জানে না। ভাটিয়ালী বাঙলারই নিজস্ব সম্পদ। শিশির ধোওয়া মাঠে মাঠে সোনালী রোদের আসন পাতিয়া প্রকৃতি যখন শারদার অর্ঘ্য রচনা করে তখন সেই আনন্দের সাড়ায় দোলা দেয় আমাদের মন। "শরতের রঙ্ যে আমাদেরই প্রাণের রঙ্।" শরৎপ্রকৃতির সঙ্গে তান মিলাইয়াই আমরা আগমনীর গান ধরি। মাকে এমন করিয়া ভালবাসা—এ যে আমরা শিখিয়াছি বাঙলারই আকাশ হইতে, বাতাস হইতে। বাঙালীর মনের বেদনা-ভরা ভালবাসা হইতেই জন্ম লইয়াছে আগমনী গান—গীতের এক অপূর্ব অধ্যায়।

বাঙলার শিল্পের উপরেও প্রভাব পড়িয়াছে বাঙলার জলহাওয়ার। ঢাকার যে মসলিন এককালে সমস্ত পৃথিবীর বিস্ময়ের বস্তু ছিল—তাহার বয়নের একমাত্র উপযুক্ত ক্ষেত্র ছিল এই বাঙলা। বাঙলার যুঁথী, মালতী, কেয়া, কদম্ব, পলাশ কাঞ্চন, চাঁপা আর মাধবী, বকুল আর শেফালির—বিচিত্র রঙের বিপুল সম্ভারই পুষ্পশিল্পের চেতনা জাগাইয়াছিল আমাদের মনে। বাঙলা দেশের মতো সমস্ত

বৎসর ভরা পুষ্পসম্পদ আর কোথায় আছে? এ দান তো অবহেলার নয়। ফুলের মধ্যে তাই বাঙালীর সাধনা চলিল, গড়িয়া উঠিল মনভুলানো পুষ্পের শিল্প। বাঙালীর প্রাণ হইতেই হইয়াছে ভাস্কর্যের 'ছত্রমুখের' প্রাণ প্রতিষ্ঠা।

প্রকৃতির পূজারী কবি। প্রকৃতির রাজ্যে প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে বাঙলার সাহিত্যও। তার বোধ করি চূড়ান্ত উদাহরণ আমাদের বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ। ষড়ঋতুর গানের আসরে বার বার ডাক পড়িয়াছে রবীন্দ্রনাথের। শরতের অতিথি যখন তাঁহার প্রাণের দুয়ারে আসিয়া দাঁড়ায়, তখন আকাশের সাদা মেঘের ভেলার মধ্যে তিনি ছুটির খুঁজিলেন অবকাশ, ধানভরা মাঠের মধ্যে, জলভরা নদ-নদীর প্রবাহে, দোয়েল আর কোয়েলের কণ্ঠে কবি তাঁহার সঙ্গীতকে ছড়াইয়া দিলেন। দুয়ারের কাঙালিনী মেয়েও তাঁহার আশীর্বাদ হইতে বঞ্চিত হয় নাই। হিমের রাতে কুয়াশায় ঢাকা তারার দিকে যখন কবির দৃষ্টি পড়ে, বিষাদকালো যামিনীর দিকে তাকাইয়াই আমাদের ডাক দেন—বলেন, "জ্বালাও আলো, জ্বালাও আলো, সাজাও আলোয় ধরিত্রীরে।" তারপর আসে পৌষ—আসে তার পাকা ফসলের ভরা ডালা নিয়ে। পৌষের হিমেল হাওয়ায় যখন দিগ্বধূরা ধানের ক্ষেতে নেশায় মাতিয়া উঠে, রোদের সোনা মাটির আঁচলে লুটাইয়া ছড়াইয়া পড়ে, মাঠের বাঁশী শুনিয়া শুনিয়া আকাশ খুশী হইয়া উঠে, সেই খুশীর আঘাতে কবির ঘরের দুয়ার খুলিয়া যায়। তিনি, ডাক দেন আরও সকলকে—"আয়রে চলে, আয়, আয়, আয়।" তারপরেই বঙ্গজননীর রূপ কেমন পরিবর্তিত হইয়া যায়। প্রকৃতির এই দীন বেশ কবির ভাল লাগে না। "শীতের বনে কোন সে কঠিন আসবে বলে" শিউলির সঙ্গে সঙ্গে কবির মনও যেন কেমন স্তিমিত হইয়া আসে। দুই দিন পরেই আসে বসন্ত। বসন্তের বাহারে কবিমন জাগিয়া উঠে। অশোকে, পলাশে, কাঞ্চন শিমূলে তাঁহার কাব্যকুঞ্জ আবার হাসিয়া উঠে। তাঁহার সঙ্গীতের শঙ্খধ্বনি করিয়া তৃষাহরা কলস্বিনীকে লইয়া আসেন 'দারুণ অগ্নিবাণে'র দাহকে শান্তি করার জন্য। বাঙলার কবি রবীন্দ্রনাথ প্রতি ঋতুর কবি। প্রকৃতি তার সমস্ত রূপ লইয়াই কবির উপরে মায়া বিস্তার করিযাছে। কিন্তু তবুও রবীন্দ্রনাথ প্রধানত বর্ষারই কবি। বর্ষার কোমলকান্ত আর ভৈরবী রূপ দুইই তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। একদিকে যেমন "সজল মেঘের কোমল কালোয় অরুণ আলো" মিশিয়া কবির রক্তকে পুলকিত করিয়াছে, বনের সহিত, ঝড়ের সহিত মন মাতাইয়া তিনি আকুল হইয়া জাগিয়া উঠিয়াছেন—অন্য দিকে আবার দেখিয়াছেন—"বজ্র মাণিক দিয়ে" আষাঢ়ের আকাশে প্রকৃতির রুদ্ররূপকে। "ঝঞ্ঝার মঞ্জরী বাঁধি উন্মাদিনী কালবৈশাখী" যখন পৃথিবীর বুকে

নামিয়া আসিয়াছে, তখন তাহারই অন্তরালে নির্দয়, নতুন, নিষ্ঠুর নতুনকেই তিনি তাঁহার প্রণাম নিবেদন করিয়াছেন। বাঙলার কবি রবীন্দ্রনাথের কাব্য প্রকৃতির কাব্য। তাঁহার 'ছিন্নপত্রে'র মধ্যে প্রকৃতিই বিচ্ছিন্নভাবে ছড়াইয়া আছে। আর সেখান হইতেই জন্ম লইয়াছে—চিত্রা, চৈতালী আর গীতিকবিতা সদৃশ গল্পের রূপ—ছোট গল্প।

বাঙলার প্রকৃতি বাঙালীর জীবনের উৎস, তাহার পালয়িত্রী, ধাত্রী। তাহার অন্ন আর বস্ত্রের সংস্থান করিয়াছে প্রকৃতি, ধর্মে সে দিয়াছে দীক্ষা, কর্মের পথে দিযাছে শিক্ষা। আর সঙ্গীত, শিল্প, সাহিত্যকে পরিচালনা করিয়াছে আপন সুরেরই প্রভাব দিয়া।

পল্লীবাঙলার লোকশিল্প ও সংস্কৃতি

॥ অতীত বিবরণ ॥ মধ্যযুগের ধর্মে লোকজীবনের প্রভাব ॥ মন্দিরশিল্প ॥ লোকসঙ্গীত ॥ পল্লীর চারু ও কারুশিল্প ॥ বস্ত্রশিল্প ও মসলিন ॥ কাঁসার বাসন ॥ মৃৎশিল্প ॥ গৃহশিল্প ॥ বেতশিল্প ॥ শোলার কাজ ॥ লোকশিল্পে পল্লীরমণীর কৃতিত্ব ॥ আধুনিক যান্ত্রিক রুচি ও পল্লীর মৃতপ্রায় শিল্প ॥

বাঙলার বৈশিষ্ট্য বাঙলার প্রকৃতির দান। বাঙলার দুকূলপ্লাবী নদনদী, বাঙলার সোনার খেত, ঘন অরণ্যানী আর জলবায়ু বাঙলাকে তার সাহিত্যে, সঙ্গীতে, কারু ও চারুশিল্পে আর ধর্মসাধনায় এক অপূর্ব বিশিষ্টতা দান করিয়াছে।

গ্রামে গাঁথা আমাদের বাঙলা দেশ। প্রাচীন বাঙলায় যখন শহরের চোখ-ধাঁধানো ঐশ্বর্য ছিল না, যন্ত্রশিল্পের আবিষ্কারে কলের ধোঁয়ায় যখন আকাশের নীলিমা ঢাকা পড়ে নাই, তখন এই পল্লীই ছিল সকল সভ্যতা ও সংস্কৃতির জন্মভূমি। পল্লীর চণ্ডীমণ্ডপ, বিষ্ণুমণ্ডপ বলিতে আমাদের রাজদরবার; এই মণ্ডপের ধর্মালোচনা হইতেই জন্ম নিত নূতন ধর্ম ও ধর্মপদ্ধতির; পর্ণকুটিরের নিভৃত নিরালায় কত বিচিত্র শিল্পই না জাগিয়া উঠিত বাঙলার এই পল্লীর বুকে।

বাঙলার পল্লীবাসী আর্যধর্মকেই একমাত্র ধর্ম বলিয়া মানিয়া লইতে পারে নাই। স্বজন-পরিজন লইয়া তাহার বাস। সূর্যের অর্ঘ্য রচনা করিলেও আঙিনার পুকুরকে তাহার ভয়, বিষধর সর্পকে লইয়া সে বাস করে, সুন্দরবনের হিংস্র অধিবাসীও তাহার প্রতিবেশী—ভীতির সঞ্চার করে তাহার মনে। তাই

কল্যাণময়ী গৃহলক্ষ্মী করেন পুণ্যপুকুর ব্রত—জন্ম নেয় মনসা-মঙ্গল আর রায়-মঙ্গল কাব্য। এই ধর্মকে আশ্রয় করিয়াই মধ্যযুগের সাহিত্য নূতন এক রূপ পাইল। শাক্ত ও শৈবের সাধনা আর বৈষ্ণবের প্রেমধর্ম পল্লীতে পল্লীতে যে আলোড়নের সৃষ্টি করিল, তাহা হইতেই আমরা পাইলাম কৃত্তিবাসের রামায়ণ, নান্নুরের চণ্ডীদাসের পদাবলীর অমিয় ধারা, কেন্দুবিল্বের 'গীতগোবিন্দের এই গীতময় উচ্ছ্বাস'। 'পূর্ববঙ্গগীতিকা' শুধু পূর্ববঙ্গের নয়, সমস্ত বাঙলা এবং সমস্ত বাঙলা সাহিত্যেরই গৌরবের বস্তু। বাঙলার পল্লী ময়নাপুর আর ময়নাগড়েরই কাহিনী 'শূন্য পুরাণ'। বর্তমানে আমরা অসাম্প্রদায়িক ধর্মসমন্বয়ের যে আওয়াজ তুলি তা একান্তই আধুনিক কালের নয়—প্রাচীন বাঙলার পল্লী অঞ্চলেই এর সূত্রপাত হয় প্রথম। 'সত্য নারায়ণের সিন্নিই' সেই সত্যের প্রমাণ বহন করিয়া আসিতেছে।

এই ধর্মকেই অবলম্বন করিয়া ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিল মন্দির, প্রতিষ্ঠিত হইল দেবদেবীর বিগ্রহমূর্তি। পল্লীবাসীর শিল্প ও সুরুচিবোধের বহু নিদর্শন এই দেব ও দেবালয়ের মধ্যে আজও দেখিতে পাওয়া যায়। বিষ্ণুপুরের দেবালয়গুলি অপূর্ব সৌন্দর্যের নিদান। জোড়া বাঙলা ও পঞ্চরত্ন মন্দিরের চিত্রাবলী দর্শকের বিস্ময় উৎপাদন করে। বাঁকুড়ার এক্তেশ্বরের মন্দির একটি দর্শনীয় বস্তু। দ্বারকেশ্বর নদের তীরে একটি বিশাল স্তম্ভের মতো মন্দিরটি যেন আকাশ ভেদ করিয়া উঠিয়া গিয়াছে। এ মন্দির তুলনাহীন।

ধর্মপ্রবণ পল্লীবাঙলার সুমধুর কণ্ঠেই আমরা শুনিতে পাইলাম আগমনী আর বিজয়ার গান—শুনিলাম বাউলের উদাস-ভরা অভিমান-ভরা কীর্তন। বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতসাধনা আধুনিককালের নয়—বহু প্রাচীন। এবং সম্ভবত রাজসভায় মর্যাদা পাইবার অনেক আগেই এ সঙ্গীত জনগণসভাতেই আদর ও সম্মানে ভূষিত হইয়াছিল। বাঙলার যাত্রা, পাঁচালী, কবিগান বাঙলার সংস্কৃতিকে যে কতখানি পুষ্টিদান করিয়াছে, বর্তমান থিয়েটার ও চলচ্চিত্রই তাহার জাজ্বল্য প্রমাণ। ভাটিয়ালী গানের সঙ্গে ধর্মের যোগ নাই বটে—কিন্তু উহা আমাদের পল্লীর বুকের নদীর গান, পল্লীবাসীর গীতিভরা বুকের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ। সঙ্গীতের আসরে ভাটিয়ালীর যে একটি বিশেষ স্থান আছে তা স্বীকার করিয়া লইতেই হয়।

চারু আর কারুশিল্পও পল্লীসন্তানের শিল্পবোধের পরিচয় বহন করে। মেদিনীপুর, কৃষ্ণনগরের পল্লীরমণীরা যে কাঁথা সেলাই করিতেন, কাঁথার উপরে ফল, ফুল, পাতার যে নকশা আঁকিতেন, আজিকার দিনে তাহা দুর্লভ। সামাজিক অনুষ্ঠানকে উপলক্ষ্য করিয়া এই রমণীদের হাতেই সামান্য মাটির সরা, হাঁড়ি,

কলসী, প্রদীপ আর পিলসুজ, বেতের কুলা, ডালা আর কাঠের পিঁড়ি তুলির টানে অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত হইয়া উঠিত। মাটির আঙিনায় আর ঘরের দাওয়ায় যে আলিম্পন আঁকা হইত তাহাতে সুনিপুণ শিল্প-চাতুর্যই প্রকাশ পাইত।

পল্লীবাঙলার বস্ত্রশিল্প শুধু সৌন্দর্যই সৃষ্টি করে নাই—বাঙলার বাণিজ্যক্ষেত্রেও সে লক্ষ্মীর আসন পাতিয়াছিল। শান্তিপুর, ধনেখালি, শ্রীরামপুর, বাগেরহাট ছিল বস্ত্রশিল্পের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। মিহি সুতার সুকুমার বুনোট, পাড়ের বিচিত্র নকশা রমণীকুলের লোভের বস্তু। ঢাকার মসলিন একসময়ে দিল্লীর রাজদরবারকেও হতবাক করিয়া দিয়াছিল। আর মনে রাখিতে হইবে এই মসলিনের সুতা কাটা হইত চরকায়। বাঙলার গৃহলক্ষ্মীরাই চরকা কাটিতেন। প্রাচীন ছড়ায় তাঁহাদের অমর স্মৃতিটুকু মাত্র আজ খুঁজিয়া পাওয়া যায়—

চরকা আমার সোয়ামী পুত
চরকা আমার নাতি।
চরকার দৌলতে আমার
দুয়ারে বাঁধা হাতি ॥

কিন্তু সেদিন আর নাই। আমরা বর্তমানে সভ্যতায় অনেক দূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছি। দেশী জিনিসে আর মন উঠে না আমাদের। যন্ত্রশিল্পের উৎপাদন তাই আমাদের এখন যোগানদার হইয়াছে—আর এই যন্ত্রশিল্পের আবির্ভাবেই তাঁতের ঘরের ভাত উঠিয়াছে। তবু এখনও ঢাকাই শাড়ি, শান্তিপুর আর ধনেখালীর শাড়ি শিল্পচাতুর্যের যথেষ্ট দাবি রাখে।

পিতল কাঁসার থালা-বাসন আমাদেরই পল্লী অঞ্চলের কুটিরশিল্প। ইসলামপুরী থালায়, বহরমপুরের খাগড়াই বাসনে শিল্পকলার স্বাক্ষর দেখা যায়। এ শিল্পও বর্তমানে অনেকখানি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এখন চিনামাটির বাসন টেবিলের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে—আর চিনামাটির বাসন যাহাদের ঘরে দুর্লভ, তাহাদের লইতে হইয়াছে এলুমিনিয়াম আর কলাইকরা বাসন।

শিল্পকে আশ্রয় করিয়াই এককালে দেশে আমাদের বর্ণভেদের সৃষ্টি হইয়াছিল। এমনি করিয়া সৃষ্টি হইল আরও একটি সম্প্রদায়ের—কুমোর, মৃৎশিল্পী সে। পিতল কাঁসার বাসনের অনেক আগেই মৃৎশিল্পের জন্ম। কলসি, হাঁড়ি, কুঁজা এমন কি থালাও তৈয়ারি করিত তাহারা, আর সেগুলির উপরে শিল্পচাতুরীরও অভাব থাকিত না। সেই মৃৎশিল্পকেও আমরা ভুলিতে বসিয়াছি। কিন্তু সেই মাটি এখন অন্যরূপ লইতে আরম্ভ করিয়াছে। কৃষ্ণনগরের মাটির মূর্তি শুধু শিশুদের

মনোরঞ্জন করে না—সমস্ত রামায়ণ ও মহাভারতকে বিবৃত করিয়া শিক্ষিত ব্যক্তিদেরও বিস্ময় উৎপাদন করে।

আধুনিক সভ্যতার নিদর্শন দালান কোঠা প্রাচীন বাঙলায় ছিল না। আটচালা, দোচালা, চারচালা খড়ের ঘর আর টিনের ঘরই ছিল পল্লীবাসীর সম্পদ। ঘরের বেড়াটি বাঁশের, জানালা দরজাটিও তৈয়ারি করিত তাহারা বাঁশ দিয়া। সামান্য বাঁশ ও খড় বলিয়া তাহা কিন্তু অবহেলা পাইত না। তারই মধ্যে ঘরামি আপন হাতের শিল্পের নিদর্শন রাখিয়া যাইত। আর এই ঘরের দেয়ালের উপরে সীমন্তিনীদের হাতের লতা পাতার আলপনা যখন ফুটিয়া উঠিত তখন তাহা দর্শনের বস্তুই হইয়া উঠিত।

বেতশিল্প পল্লীবাঙলার পরমসম্পদ। বেতের বড় বড় কৌচ, চেয়ার আর টেবিল আমাদের 'মডার্ন ফার্নিচারকে'ও হার মানায়। কুমিল্লা আর সিলেটের শীতলপাটি যাহারা ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহারাই শুধু জানেন তাহার স্নিগ্ধতা আর শিল্প-চতুরতার মহিমা। কিন্তু দেশের আর্থনীতিক পরিস্থিতিতে এখন পল্লীর সে সম্পদও লুপ্ত হইতে বসিয়াছে। তবে বাঁশের চাটাই আর নলো পাটি এখনও ঘরে ঘরে আদৃত হয়। বেতের ঝাঁপি, পেটরা, সুটকেশও দেখা যায় মাঝে মাঝে।

শোলার কাজে দেশের লোক আজও কিছু কিছু উপার্জন করিতেছে। শোলার ফুল, পুতুল, শোলার গয়নার আজও আমরা আদর না করিয়া পারি না। বিশেষ করিয়া শোলার মুকুট আমাদের সামাজিক বিশেষ অনুষ্ঠানে অবশ্য প্রয়োজনীয় জিনিস। মুকুটের কারুকার্যই বোধ হয় বিবাহসভায় বরবধূকে অতখানি মাধুর্যমণ্ডিত করে।

পল্লীর জেলেপাড়ায় গেলে আর এক রকমের শিল্পের নিদর্শন পাওয়া যায়। অপূর্ব শিল্প-কৌশলে তাহারা নৌকা তৈয়ারি করে—জাল বোনে। জাল কি এক রকমের! বিষেশ বিশেষ জাতির মাছ ধরিবার জন্য বিভিন্ন রকম জাল। কৈ-জাল কৈ মাছের জন্য ; রুই-কাতলার জন্য দড়াজাল, ইলিশের জন্য বেড়াজাল। এমনি ঝাঁপজাল, ঘেরা জাল, ধর্মজাল প্রভৃতি কত রকম জালই না জেলেরা নিপুণহস্তে তৈয়ারি করে। আবার এই জাল মেরামতি করিবার সময়ও তাহারা যে নৈপুণ্যের প্রকাশ করে আধুনিকা শিক্ষিতাদের তাহা লজ্জা দিতে পারে। পোলো, ওছা প্রভৃতি কত রকম বাঁশের ফাঁদই না তাহারা তৈয়ারি করে। টোকা আর মাথাল—এও আমাদের চাষীদেরই হাতের তৈয়ারী

পল্লীরমণীদের আর একটি শিল্পের উল্লেখ না করিয়া পারা যায় না। এ শিল্পটি 'বড়ি'—সৌন্দর্যে স্বাদে অতুলনীয়। বড়ি বলিলে আমাদের মনে তাহার যে

আকৃতি জাগে—এ সে জাতীয় বড়ি নয়। এ বড়ি নকশা-করা—ফুল, পাতা, হাতি, ঘোড়া, পাখি, কত বিচিত্র রকমের নকশা-করা বড়ি। একটু হাওয়া লাগিলেই হাওয়ায় সে পাখা মেলে। মেদিনীপুরের পল্লী অঞ্চলেই এ শিল্পের প্রাধান্য দেখা যায়।

কিন্তু সে পল্লী আর নাই। তাহার শোভা গিয়াছে, শিল্প লুপ্ত হইতে চলিয়াছে। ধর্ম সাধনায় নতুন প্রাণের স্পর্শ আর পল্লীবাঙলায় পাওয়া যায় না। সাহিত্য তাহার স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। কণ্ঠে কণ্ঠে আর তেমন করিয়া যেন সুরের সাধনাও চলে না। বিদেশী সভ্যতার আমদানি হইয়াছে। বিদেশী পণ্যদ্রব্যে ছাইয়া গিয়াছে শহর। দামে ও বৈচিত্র্যে তাহার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না কুটিরশিল্প। একদিকে উপজীবিকার অভাব অন্যদিকে শহরের মোহ ও উপার্জনের আকর্ষণ—পল্লী ছাড়িয়া দলে দলে সব ভীড় করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল শহরে। আরম্ভ হইল চাকুরি করা। সময়ের অভাবেই হোক আর মর্যাদার খাতিরেই হোক, হাতের কাজ ঘরের শিল্প আমরা বন্ধ করিয়া দিলাম। নিজের হাতের সৃষ্টির মধ্যে যে আত্মপ্রসাদ, আত্মগৌরব আছে, সেকথা এখন আর ভাবিয়া দেখি না। এমনি করিয়া পল্লীর বহু শিল্পকে আমরা একেবারেই হারাইয়াছি এবং বাকি যা আছে তাহাও হারাইতে বসিয়াছি। আর বিদেশী সভ্যতার আওতায় আমরা এমনি এক অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছি যে এখনও বাঙলার গ্রামে গ্রামে প্রাচীন সংস্কৃতির ধ্বংসাবশিষ্টের যে কত সম্পদ আছে তাহাকে চিনিবার প্রবৃত্তিও আমাদের নাই।

কিন্তু এ শিল্প আবার গড়িয়া তোলার প্রয়োজন আছে। অর্থাগম চাকুরিতে সম্ভব হয় না—হয় শিল্পে—আর সেই শিল্প কুটিরশিল্প, পল্লীশিল্প। পল্লীকে বাদ দিয়া শুধু শহর লইয়া দেশ চলে না। দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতি করিতে হইলে সর্বাগ্রে পল্লীকে উন্নত করিতেই হইবে। তাই পল্লীপ্রাণ কুটিরশিল্পগুলিকেই সর্বপ্রযত্নে আমাদের আবার নূতন করিয়া জাগাইয়া তুলিতে হইবে।

বাঙলার উৎসব—অতীত ও বর্তমান

॥ দেবপূজার মর্মকথা ॥ দেবতার সহিত আত্মীয়তার সম্পর্ক ॥ শারদীয়া পূজা ও তাহার মানবীয় দিক ॥ কালিপূজা ও শক্তিপ্রার্থনা ॥ সরস্বতীপূজা ও বিদ্যানুরাগের অবস্থা ॥ হোলী-খেলা—কোজাগরীর মিলন উৎসব ও বর্তমান অধঃপতন ॥ অন্যান্য পূজা ॥ বর্তমানে মানবীয়তা ও শুচিতার অভাব ॥

ধর্মপ্রাণ বাঙালী—বারো মাসে তাহার তের পার্বণ। বাঙালী ধর্মভীরু। ছেলে মেয়ে স্বজন বহুজন লইয়া আমাদের সংসার। আমাদের সংসারের কল্যাণ অকল্যাণ নির্ভর করে দেবতার আশীর্বাদ বা অভিশাপের উপরে—এই ছিল বাঙালী সমাজের একদিনকার সংস্কার। সেদিন হয়ত নাই—তবু আজও চন্দ্রধরের জীবনব্যাপী দুর্ভোগের কথা আমরা ভুলিতে পারি না। নল-দময়ন্তী, হরিশ্চন্দ্র-শৈব্যার জীবন-কাহিনী আমাদের মনে আতঙ্ক আনে। ভীরু বাঙালী তাই আশীর্বাদ ভিক্ষা করিয়া সকল দেবতার পায়েই অঞ্জলি নিবেদন করে। স্বর্গবাসিনী লক্ষ্মী, ভগবতী, চণ্ডী, মনসা হইতে আরম্ভ করিয়া আমরা আমাদের আঙিনার জলদেবতা পুকুর ঘাটকেও পূজা দেই।

কিন্তু এই পূজার ভিতর দিয়া বাঙালী শুধু আপন সন্তান-সন্ততিরই মঙ্গল কামনা করে নাই। প্রাচীন বাঙলার এই পূজা শুধু আপনাপন ঘরের উৎসব ছিল না—এ উৎসব ছিল সমস্ত গ্রামকে লইয়া—সমাজকে লইয়া। আমাদের সমস্ত উৎসবের মধ্যে দুর্গোৎসবই সর্বপ্রধান। বৎসরান্তে মা একবার আসেন আমাদের ঘরে—সঙ্গে তাঁহার শিশু সন্তান দুইটি—কার্তিক, গণেশ। সখীরাও সঙ্গে আসেন। তিনটি দিনের জন্য আসা—তারপরই ত আবার ভোলা মহেশ্বরের ঘরে তাঁহাকে ফিরিয়া যাইতে হইবে। সমস্ত দেবতার তেজসম্ভূতা ভগবতী—সমস্ত তেজ, সকল শক্তিকে ধারণ করিয়া আছেন তিনি। কিন্তু সেই শক্তি দেখিয়া বাঙালী বিভ্রান্ত হয় নাই। তাঁর সঙ্গে বাঙালীর জননী-সন্তান সম্পর্ক। তিনি শুধু বাঙালীর মা—বাঙালীর কন্যা। ভক্তি ও বাৎসল্য রসে বাঙালী মাকে পূজা করে। স্নেহকাতর মায়ের মন লইয়া বাঙালী সমস্ত বৎসরটি এই দিনের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকে। এই উৎসব বাঙালীর কাছে শুধু ভক্তি-পূজার উৎসব নয়। এ আনন্দের উৎসব—বিচ্ছেদ-কাতরা সন্তানের সঙ্গে মায়ের মিলনোৎসব। তাইতো শেফালি-কুন্দ-কমলে প্রকৃতি তাঁর পূজার অর্ঘ্য রচনা করেন। কণ্ঠে কণ্ঠে আগমনী গানে বাঙলার বাতাস মুখর হয়।

শারদীয়া পূজা—আড়ম্বরের পূজা। প্রাচীন বাঙলায় সমস্ত গ্রামে পূজা হয়ত ছিল একখানা—জমিদার বাড়িতে, বিত্তশালীর ঘরে। গ্রামবাসী সেই পূজাকেই আপন ঘরের পূজা বলিয়া মনে করিত। তাঁতী, জেলে, কৃষাণ আপন আপন শক্তিতে সকলেই মায়ের পূজার উপহার রচনা করিত। দিবার যাহার কিছুই নাই—সে শুধু ভক্তি দিয়া শ্রম দিয়া উৎসবের অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করিত। আহুত, রবাহুত, অনাহুত সকলেরই পংক্তি পড়িত পূজামণ্ডপের আঙিনায়। পূজার তিন দিন অভুক্ত থাকিত না কেউ। ম্লান মুখে বাহির দুয়ার হইতে কাঙালিনীকেও তখন শুধু হাতে ফিরিতে হইত না।

তারপর বিজয়ার উৎসব। মাকে যাত্রা করাইয়া গ্রামবাসী কোলাকুলি, প্রণাম ও আশীর্বাদের ভিতর দিয়া পরস্পরকে আরও নিবিড় প্রেম ও মৈত্রীর বন্ধনে বাঁধিয়া লইত। পরস্পরকে কাছে টানিয়া লইয়া যেন তাহারা মায়ের দুঃখ ভুলিতে চেষ্টা করিত। ধর্মভীরু বাঙালী একদা এমনি করিয়াই তাহার পূজাপার্বণকে অবলম্বন করিয়া হৃদয়বৃত্তির সাধনা করিত।

আজকাল আর সেই বাঙলা নাই—পূজার আনন্দ উৎসবও সেই সঙ্গে অতীতের স্বপ্ন হইয়া গিয়াছে। একটি পূজায় আজ আমরা আর সন্তুষ্ট হইতে পারি না। সর্বজনীন পূজার তাই প্রচলন হইয়াছে। অলিতে, গলিতে, পার্কে, ময়দানে সর্বত্রই ভগবতীর পূজার মণ্ডপ রচনা করা হয়। কিন্তু ভক্তি দিয়া আর তাহা রচনা করা হয় না। এ শুধু উৎসবের আয়োজন—আমোদ-প্রমোদের একটি উপলক্ষ মাত্র। পার্শ্ববর্তী পূজামণ্ডপের সঙ্গে প্রতিযোগিতা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া মণ্ডপের সাজসজ্জা করি। লাউডস্পীকারে সিনেমার গানই হয় উৎসবের প্রধান অঙ্গ। উৎসব-কর্তাদের নিজেদের মধ্যে প্রসাদের ভাগ বাঁটোয়ারা করিয়া আর দীন-দুঃখীদের দিবার মতো কিছু অবশিষ্ট থাকে না। দেবীকে দর্শন করিয়া শুধু হাতেই তাহাদের ফিরিতে হয়। প্রতিমা নিরঞ্জনের আড়ম্বর ও প্রতিযোগিতায় টাকার অঙ্কের একটা মোটা হিসাব ঠিক করিয়া রাখি। নতুবা পূজা আমাদের অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। বিজয়া উপলক্ষে কোলাকুলি প্রণামের কথাটা আর তেমন মনে থাকে না। মৈত্রীর বন্ধনকে প্রাচীন সংস্কার বলিয়াই একরকম ধরিয়া লইয়াছি।

শক্তির পূজা—কালীর পূজা। মা কালীকে পূজা করিয়াই শাক্ত বাঙালী আপন অন্তরের সর্বশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু শক্তির উদ্বোধন আজ আর আমরা চাই না। আমরা চাই শক্তির প্রকাশ—রাস্তাঘাটে বাজি পোড়াইয়া আর লোকের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করিয়া শক্তির প্রকাশ করি। যাহার ফলে হাসপাতালের গাড়িকেও এই উৎসবে আসিয়া যোগ দিতে হয়।

মা সরস্বতীর পূজা ঘরে ঘরে। শারদীয়া পূজার মতো এ পূজায় আড়ম্বর তেমন নাই। তাই দীন-দুঃখীর ঘরেও মা আসন পাতেন। অবিদ্যা দূর করেন মা। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে ছোট বড় সকলেই মায়ের পায়ে অঞ্জলি দেয়—জ্ঞানের জন্য হাত পাতে তাঁর পায়ে। কিন্তু ঘরে ঘরে পূজা পাইয়াও বীণাপাণি আজকাল আর সন্তুষ্ট থাকিতে পারিতেছেন না। তিনিও আসিয়া পথে দাঁড়াইয়াছেন। বারোয়ারি পূজা তাঁহার চাই। লাউডস্পীকারের গান আর নাচের আসর না জমিলে তাঁহার হাতের বীণার মর্যাদা আর থাকে না। আবাল-বৃদ্ধ সকলের পূজা হইলেও আজকাল পথে ঘাটে সরস্বতী পূজার অনুষ্ঠান করে শুধু ছাত্রছাত্রীরাই। কিন্তু তাহাদের এই পূজা বিদ্যার পূজা নয়—এ পূজা শুধুমাত্র আমোদ-প্রমোদেরই নামান্তর। সমস্ত বৎসর যেখানে স্কুল আর কলেজের শিক্ষাকে যাহারা ফাঁকি দিল, শিক্ষক আর পিতামাতার উপদেশ আর আদেশ গ্রহণ করিল না, মা সরস্বতী তাহাদের কাছ হইতে একদিনে আর কী বেশি আশা করিতে পারেন।

দোল হোলি-খেলারই উৎসব। ব্রজধামের শ্রীরাধা-কৃষ্ণের পবিত্র লীলাকে স্মরণ করাইয়া প্রাচীন উত্তর ভারত এই উৎসবের অনুষ্ঠান করিত। আজকাল সেই পবিত্র-হোলি খেলা অপবিত্র কুৎসিৎ খেলার রূপ লইয়াছে। দোল খেলার এই বীভৎস রূপ দেখিয়া সরকার বাহাদুর সেদিনের জন্য রাস্তার যানবাহনের চলাচলও বন্ধ করিয়া রাখিতে বাধ্য হইয়াছেন। উৎসবের নামে এমনি মনুষ্যত্বও আমরা নষ্ট করিতেছি।

কোজাগরী রাত্রির সেই মধুর মিলনও আজকাল আর দেখা যায় না। সারাদিনের উপবাসের পর পূজার প্রসাদ নেওয়া। তারপর পাড়া প্রতিবেশী সকলে মিলিয়া জ্যোৎস্নালোকে রাত্রি জাগরণ। মা, ঠাকুমা, পিসীমার মুখে পুরাণকথা শুনিতে শুনিতে রাত ভোর হইয়াছে। সেই জাগরণে ক্লান্তি আসে নাই। আনন্দে শক্তিই পাইয়াছি। আজকাল আর কোজাগরী পূর্ণিমার সেই শোভা নাই। বিনিদ্র রজনী কোনও ঘরে আর দেখা যায় না। লক্ষ্মী পূর্ণিমায়, শিবরাত্রিতে যদিও বা কেউ জাগে, তাহাদের জন্য ব্যবস্থা থাকে সিনেমা হলে।

শুধু এই সব পূজায় নয়—আমাদের গৃহলক্ষ্মীদের চণ্ডীমঙ্গল ব্রত, পুণ্যপুকুর, মাঘমণ্ডল ব্রতের মাঝেও পরিবর্তন আসিয়াছে অনেক। একটি ঘরে ব্রতের আয়োজন হইলেই অতীতে প্রতিবেশিনী সকলেই সেখানে আসিয়া যোগ দিয়াছেন। পূজার আয়োজন রচনা করিয়াছেন সকলে মিলিয়া—হাতে দুর্বা আর ফুল লইয়া নিষ্ঠার সঙ্গে ব্রতকথা শুনিয়াছেন সকলে একসঙ্গে বসিয়া। পূজান্তে সকলেই সেখানে প্রসাদ পাইয়াছেন। আজকাল আমাদের আঙিনায় পুণ্যপুকুর

কাটা হয় না ; মাঘ মাসে আল্পনার রেখা পড়ে না গোময়লিপ্ত উঠানের মাঝে। চণ্ডীমঙ্গল এবং আরও দুই-একটি ব্রত যদিও কোনও ঘরে হয়, তা পাড়ার আর কেউ জানিতেও পারে না। সে শুধু নিয়ম রক্ষা হয়, উৎসব হয় না।

ধর্মের অনুষ্ঠানের মতো সামাজিক উৎসবের অঙ্গচ্ছেদও আজকাল অনেক হইয়াছে। তাহার রূপের পরিবর্তন হইয়াছে নানাদিক দিয়াই। তাহার কারণ হয়ত অর্থনৈতিক—কিন্তু মনের উদারতার অভাব, এবং প্রীতির অসদ্ভাবও যে তাহার একটি কারণ একথাও সম্পূর্ণ অস্বীকার করা চলে না।

ধর্মের উৎসবে ভক্তি ও নিষ্ঠা তাহার প্রধান অঙ্গ হইলেও তাহাও আমাদের অনুষ্ঠানের উপলক্ষ্যই হয়। প্রধান লক্ষ্যই আমাদের প্রীতি-সম্মিলন। সামাজিক অনুষ্ঠানের ত এই সম্মিলনই প্রধান অঙ্গ। এই মিলনেই আমাদের আনন্দের প্রকাশ—আত্মার বিকাশ হয়। দীন আর ধনী, বড় আর ছোট এখানে দূরে থাকে না। উৎসবের যজ্ঞে এই আদর্শটিই যেন আমাদের মন্ত্র হয়। উৎসবে এই আদর্শচ্যুতি যদি ঘটে, প্রীতি আর মৈত্রী, নিষ্ঠা আর শ্রদ্ধা উৎসবকে পরিচালনা না করে, শুচি আর পবিত্রতার কথা যদি ভুলিয়া যাই, তবে বৃথাই হইবে আমাদের উৎসবের আয়োজন—সহকারশাখা শুধু শোভাই বর্ধন করিবে—মঙ্গলকলস হইতে আর আমাদের জন্য শান্তির জল বর্ষিত হইবে না।

বঙ্গভঙ্গের পরিণতি ও পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যত

।। অতীত কীর্তি—জাতীয়তা জাগরণ ।। সাম্রাজ্যবাদী দলননীতি ।। স্বাধীনতা লাভের কালে বাঙলার অঙ্গচ্ছেদ ।। পশ্চিমবঙ্গের আয়তন, লোকসংখ্যা, কৃষি ও শিল্পের পরিচয় ।। দেশ বিভাগের হঠকারিতা ও পরিণাম ।। নবজীবনের উদ্যম ।।

সুদূর অতীতের কোন সন্ধিক্ষণে গৌড়, সমতট ও বঙ্গের অধিবাসীরা নিজেদের মধ্যে ঐক্যের একটি নিবিড় বন্ধন অনুভব করিয়া এক জাতিতে পরিণত হইয়াছিল, বাঙালী বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছিল—ইতিহাস তাহার সাক্ষী-প্রমাণ রাখে নাই। কিন্তু ভারত-ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলি বাঙালীর কীর্তি-কাহিনীর, দূর অতীতের এক গৌরবময় শৌর্য, বীর্য, সম্পদ ও সুষমামণ্ডিত বাঙলা ও বাঙালীর কথায় মুখর দেখা যায়।

এদেশের জলবায়ু ও প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য, এদেশের সু-রসাল মৃত্তিকা আর

নদীনালা বহু বিচিত্র মানবগোষ্ঠীর সমন্বয়ে, এমন একটি জাতির সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে বহুশত বন্ধনে সুদৃঢ় এমন একটি গভীর আত্মীয়তা রচনা করিয়াছিল যাহা শত শত কালবিপর্যয়েও বিনষ্ট হয় নাই। হিন্দুযুগের বিভিন্ন ধর্ম ও রাষ্ট্রবিপ্লব অতিক্রম করিয়া মধ্যযুগে ধীরে ধীরে বাঙলা ভাষার উদ্ভবের মধ্য দিয়া নিজস্ব ভাষার বন্ধনে বাঙালী তাহার জাতীয়তাকে আরও সুদৃঢ় করিয়া তুলিয়াছিল। তারপর, মুসলমান যুগে হিন্দু ও মুসলমান বাঙালী একযোগে সাহিত্যচর্চায়, আত্মরক্ষায়, দেশপ্রেমে বার বার নিজেদের একাত্মতা প্রমাণ করিয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংরেজশাসনের প্রতিষ্ঠা যে দিন হইতে স্বাধীন বাঙলা ও স্বাধীন বাঙালী জাতিকে লুপ্ত করিয়া ললাটে দাসত্বের কলঙ্ক কালিমা লেপন করিয়াছিল, সেদিন হইতে আরম্ভ হইয়াছিল বাঙালী জাতির স্বাধীনতার অতন্দ্র, অক্লান্ত সাধনা। এই যজ্ঞে হিন্দু ও মুসলমান বাঙালী একযোগে প্রাণ বলি দিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে। ইংরেজ শাসনের সম-দাসত্ব, স্বাধীনতার সাধনায় ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা এবং অপরদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও দর্শন ও নূতন অর্থনৈতিক পরিবর্তনের প্রভাব বাঙালীর জাতীয়তাবোধকে একটি অভূতপূর্ব বলিষ্ঠতা প্রদান করিয়াছিল। বার বার বিদেশী শাসকগোষ্ঠীকে এই বলিষ্ঠ নবজাগ্রত শক্তির সঙ্গে অসম সংগ্রামে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছিল, ইহা ত সেদিনের ঘটনামাত্র।

স্বভাবতই ইংরেজ সেদিন বাঙালীর এই প্রতিবাদকে তাহার দূরদর্শী দৃষ্টিতে বিপজ্জনক মনে করিয়া বাঙালীর জাতীয়তাকে ধ্বংস করিয়া ভারতের স্বাধীনতার সাধনাকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করিবার জন্য প্রথম আঘাত হানিয়াছিল—১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ করিয়া দুইটি বাঙলা সৃষ্টির মাধ্যমে। কিন্তু লর্ড কার্জনের এই ব্যবস্থাকে বিপুল আন্দোলনের মুখে ব্যর্থ করিয়া দিয়া বাঙালীর জাতীয়তাবোধ বহির্বিশ্বকে চমকিত করিয়াছিল।

কিন্তু পরাধীনতার প্রথম দিন হইতে যে বাঙালী জাতি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রগামী সৈনিক হিসাবে জাতীয় বিদ্রোহের পতাকা তুলিয়া ধরিয়াছিল, যে বাঙালীর প্রাণবহ্নি বলিষ্ঠ জাতীয়তাকে বার বার শাসক শক্তির সহিত সংঘর্ষে উদ্ভাসিত করিয়াছিল, হিন্দু ও মুসলমানের ঐক্য যাহার জাতীয়তাকে বিশিষ্টতা প্রদান করিয়াছিল, স্বাধীনতার যুগসন্ধিক্ষণে একদিকে পরাজিত শাসকের শেষতম ও জঘন্যতম চক্রান্তে এবং অপরদিকে সর্বভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের দুর্বলতায়, চরমমূল্য দিতে হইল তাহাকেই। স্বাধীনতার জন্য বঙ্গবিভাগ স্বীকার করিয়া লইতে হইল। স্বাধীনতার আনন্দ ভ্রাতৃবিচ্ছেদের বেদনায় বিধুর হইয়া উঠিল।

এক বঙ্গদেশ দ্বিখণ্ডিত হইয়া দুইটি, পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গে পরিণত হইল—রূপ লইল দুইটি ভিন্ন রাষ্ট্র। বাঙালী জাতি দ্বিধা বিভক্ত হইল।

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট মধ্যরাত্রে ক্ষমতা হস্তান্তরের সঙ্গে সঙ্গে জন্ম হইল ভারতের ক্ষুদ্রতম রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের। দেশ বিভাগের মূল্যে স্বাধীনতা অর্জিত হইল বটে, কিন্তু দেখা দিল অভাবিত নূতন বহু সমস্যা। জাতীয়তাবাদ আধুনিককালের একটি সর্বজনস্বীকৃত তত্ত্ব। একটি জনসমষ্টি কোনও একটি বা একাধিক কারণে নিজেদের মধ্যে নিবিড় ঐক্য ও অপর সকলের সহিত নিজেদের সুস্পষ্ট পার্থক্য অনুভব করিয়া যদি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র স্থাপন করিতে চায় তবে তাহাতে বর্তমান কালের রাষ্ট্রনৈতিক তত্ত্ব সমর্থনই জ্ঞাপন করে, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে উহার অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়ার দিকটিও বিবেচ্য। শুধুমাত্র রাজনৈতিক বিবেচনাই যদি প্রাধান্য লাভ করে ও যদি অর্থনৈতিক দিকটিকে অবহেলা করে, তবে তাহার অবশ্যম্ভাবী কুফল অনিবার্য। বঙ্গবিভাগ এ বিষয়ে আধুনিকতম উদাহরণ।

মাত্র ২৮,২১৫ বর্গমাইল, অর্থাৎ অখণ্ড বঙ্গের ৩৬'৪ শতাংশ ভূমিভাগ ও ২ কোটি ১১ লক্ষ ৯৬ হাজার লোকসংখ্যা অর্থাৎ অখণ্ড বঙ্গের মোট জনসংখ্যার ৩৫'১ শতাংশ লইয়া পশ্চিমবঙ্গ গঠিত হয়। পরে অবশ্য কোচবিহার, চন্দননগর ও বিহারের পুরুলিয়া ও পূর্ণিয়ার কিছু অঞ্চলের সংযুক্তির পরে ইহার আয়তন ও জনসংখ্যা কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে।

অবিভক্ত বঙ্গের উৎকৃষ্ট শস্য উৎপাদনকারী অঞ্চলের অধিকাংশই পূর্ববঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গ ঘাটতি রাজ্যে পরিণত হইল। ধান, পাট, সুপারী, মৎস্য উৎপাদনকারী প্রধান প্রধান জেলাগুলিই চলিয়া গেল পূর্ববঙ্গে। অপর দিকে শিল্পাঞ্চলগুলি, খনিগুলি পড়িল পশ্চিমবঙ্গে। কলিকাতার পাটকলগুলি নির্ভরশীল হইয়া পড়িল পূর্ববঙ্গের উপর, আর পূর্ববঙ্গ নির্ভরশীল হইয়া পড়িল পশ্চিমবঙ্গের উপর কয়লার, কাপড়ের, কাগজের ও তৈলের জন্য। দেশবিভাগ যেন অবুঝ রাজনীতিকদের চোখে আঙুল দিয়া বঙ্গ বিভাগের অবাস্তবতা দেখাইয়া দিল। গভীর অর্থনৈতিক বন্ধন রাজনৈতিক বিচ্ছেদকে উপহাস করিতে লাগিল। হাজার রকমের দরকারী জিনিসের জন্য এক অংশের বাঙালী অপর অংশের বাঙালীর উপর নির্ভর করিতে লাগিল। এক বঙ্গের অর্থনীতি যে কতটা পরিমাণে আরেক বঙ্গের উপর নির্ভরশীল তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। কিন্তু এই জাজ্জ্বল্য সত্যকে অস্বীকার করিবার চেষ্টায় চলিতে লাগিল ইহার উপর স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক আঘাত। পূর্ববঙ্গের বহু মুসলমান পশ্চিমবঙ্গের

কলকারখানায়, রেলজাহাজে কাজ করিয়া রুজি-রোজগার করে, অপরপক্ষে কলিকাতা ও পশ্চিমবঙ্গে কর্মরত বহু হিন্দুর পূর্ববঙ্গে বাড়িঘর, জমিজমা বর্তমান। দেশ বিভাগ ইহাদের উভয়ের পক্ষে বিপর্যয় সৃষ্টি করিল। বিভাগোত্তর যুগে ভারতব্যাপী নূতন করিয়া উন্মত্ত ভ্রাতৃঘাতী যে আগুন জ্বলিয়া উঠিল তাহা সৃষ্টি করিল শরণার্থীর মিছিল। পূর্বপুরুষের বাস্তুভিটা, জমিজমা, বাড়িঘর, ক্ষেত-খামার ফেলিয়া দলে দলে সহায়সম্বলহীন নরনারী অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে সীমান্তপারে ছুটিয়া চলিল। পশ্চিমবঙ্গ হইতে পূর্ববঙ্গগামী শরণার্থীদের তুলনায় বিপুল পরিমাণে পূর্ববঙ্গাগত শরণার্থীরা পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা দ্রুত বাড়াইয়া তুলিল। ইহাদের উপযুক্ত আশ্রয়, বাসস্থান ও কর্মসংস্থানের সমস্যা জটিল আকার ধারণ করিল। একদিকে পশ্চিমবঙ্গের সল্লায়তন অপেক্ষাকৃত অনুর্বর জমির আধিক্য, অধিক জনসংখ্যা, খাদ্য ঘাটতি, কাঁচামালের অভাব, বেকার সমস্যা ও অপরদিকে শরণার্থীর সমস্যা অচিরেই ইহাকে "সমস্যা জর্জরিত" রাজ্যে পরিণত করিল।

শরণার্থী সমস্যায় বিপর্যস্ত, খণ্ডিত, ক্ষুদ্র পশ্চিমবঙ্গ বুঝি আর তাহার সমস্যার সঙ্গে সংগ্রামে সক্ষম হইবে না, ছিন্নমূল হইয়া বাঙালী বুঝি এবার মহাকালের রুদ্ররোষে বিলুপ্ত হইবে,—এই আশঙ্কা অনেকের মনেই জাগিয়াছিল। কিন্তু হোক ক্ষুদ্র, দরিদ্র ও রিক্ত, বাঙালী আর একবার প্রমাণিত করিল যে, বাঙালীর প্রাণপ্রাচুর্য, তাহার জীবনীশক্তি আজও নিঃশেষিত হয় নাই। এখনও তাহারা মৃত্যুর মুখোমুখী সংগ্রামে জয়লাভের শক্তি রাখে। শত ত্রুটি সত্ত্বেও শরণার্থীদের জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় নাই। ভারত সরকারের সহায়তায় পশ্চিমবঙ্গের সরকার ও জনসাধারণ শরণার্থী পুনর্বাসনে যথেষ্ট সাফল্য লাভ করিয়াছে। পুনঃপ্রতিষ্ঠিত শরণার্থীরা পশ্চিমবঙ্গের কর্মপ্রচেষ্টায়, শিল্পকর্মে ও কৃষিক্ষেত্রে তাহাদের যথাযোগ্য স্থান গ্রহণে সক্ষম হইয়াছে। পর পর দুটি পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় নূতন নূতন শিল্প ও শিল্পাঞ্চল স্থাপনের দ্বারা কর্মসংস্থানের সুযোগ ও সম্ভাবনা বৃদ্ধি করিয়াছে। কঠোর শ্রমসাধ্য কর্ম ও বৃত্তি গ্রহণ করিয়া বাঙালী যুবক, কর্মে বিমুখ বাঙালীর দুর্ণাম দূর করিয়াছে। জমিদারী ব্যবস্থার বিলোপে কৃষিক্ষেত্রে নূতন সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত হইয়াছে। ছোট, বড় ও মাঝারি বিভিন্ন প্রকারের সেচ পরিকল্পনায় নূতন জমিতে জলসেচের প্রবর্তনে কৃষির ফলন বৃদ্ধির সুযোগ ঘটিয়াছে। নবাগত শরণার্থীরা তাহাদের উদ্যমের দ্বারা দেশে প্রাণস্পন্দন সৃষ্টি করিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পাইয়াছে স্কুল, কলেজ প্রভৃতি শিক্ষার ব্যবস্থা। অতএব বলা যায়, যে আশা ভঙ্গের নিবিড় কুয়াশায়

পশ্চিমবঙ্গের জন্ম, যে অন্ধকার নিশীথে তাহার শৈশব অতিবাহিত হইয়াছে, তাহা অতিক্রম করিয়া আজ সে কৈশোরের নবীন সম্ভাবনার প্রভাতের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত। তাহার ভবিষ্যত আজ আর অনিশ্চিত, অনুজ্জ্বল, অনুত্তম নয়—একথা সুনিশ্চিত।

স্বাধীন ভারতে বাঙালীর স্থান

॥ অতীত ঐশ্বর্যময় ইতিহাস ॥ ইংরেজ আমলে বাঙালীর প্রাধান্য ॥ জাতীয় আন্দোলনে অগ্রণী ॥ বর্তমান হতাশা ॥ বাঙালীর জীবনীশক্তি ও ভবিষ্যৎ আশা ॥

বহুবিচিত্র জাতি-অধ্যুষিত এই ভারতমহাদেশে বাঙালী জাতি বহুকালাবধিই একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। বাঙলার পালরাজবংশ স্বীয় শৌর্যে বীর্যে সুদূর হিন্দুযুগে ভারতের বুকে একদিন সুবিস্তৃত সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল। এই বাঙলার বুকেই পলাশীর আম্রকাননে বাঙলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলা ও দুইজন বীর বাঙালী সেনাপতি ইংরেজের সঙ্গে প্রথম সংগ্রামে আত্মবিসর্জন করে। বঙ্গের সিংহাসন করায়ত্ত করায় সেদিন সমগ্র ভারতে ভবিষ্যৎ ইংরেজ শাসনের সূচনা ঘটে। শুধু শৌর্য-বীর্যই নয়, অতীতকালে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রেও বাঙলার সন্তান তাহার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছে। এই বঙ্গজননীই একদা অতীশদীপঙ্করকে সুদূর তিব্বতে জ্ঞানবর্তিকা প্রজ্বলিত করিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছিল। উর্বরা বঙ্গভূমি প্রাচ্যের জ্ঞানকেন্দ্র নালন্দাকে একাধিক আচার্য উপহার দিয়াছে। ধর্মজগতে, বঙ্গসন্তান মীননাথ বিখ্যাত নাথ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, আর বঙ্গদুলাল শ্রীগৌরাঙ্গ একদা ধর্মজগতে প্রেমধর্মের দ্বারা বিপ্লব আনয়ন করিয়াছিলেন। কর্মক্ষেত্রে, শিল্পনৈপুণ্যেও বাঙালী পশ্চাদ্‌পদ ছিল না। বাঙলার নিপুণ শিল্পীর হস্তে প্রস্তুত মসলিন বিলাসী মিশর ও রোমান সম্রাটের আভরণ যোগাইত। বস্তুতপক্ষে বাঙালী চিরদিনই তাহার দুঃসাহসের জন্য বুদ্ধিবৃত্তির জন্য, অনুসন্ধিৎসার জন্য, উদার দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য, জ্ঞানে, শৌর্যে, বীর্যে, শিল্পে, ধর্মে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল।

ইংরেজশাসনের সূত্রপাতে বাঙালীর জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হইল। কতিপয় বাঙালীর বিশ্বাসঘাতকতায় যেমন ইংরেজের ক্ষমতালাভের পথ সুগম হইয়াছিল, তেমনি সেই ঘোর দুর্দিনেই, ইংরেজশাসনের প্রারম্ভেই শহীদ

নন্দকুমারের কণ্ঠেই ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে প্রথম ধিক্কার উচ্চারিত হইয়াছিল। তাহার পর ধীরে ধীরে, উনবিংশ শতাব্দীতে যখন পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন বাঙালীই প্রথম ইওরোপীয় শিক্ষা আত্মস্থ করিয়া পাশ্চাত্য গণতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাধীনতার মহামন্ত্র শুনাইয়াছিল সমগ্র ভারতকে। জন স্টুয়ার্ট মিলের বহু পূর্বে রাজা রামমোহনের কণ্ঠে স্বায়ত্তশাসনের বাণী উচ্চারিত হইয়াছিল; বঙ্গের সুসন্তান বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীতেই এদেশে সাম্যের বাণী প্রথম প্রচারিত হয়। সেদিনের বাঙালী প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ব্যবসায় ও বাণিজ্যে ইওরোপীয় বণিককুলের সমকক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন।

তারপর যেদিন ভারতের বুকে আমাদের জাতীয় চেতনা একটা প্রবল আন্দোলনরূপে আত্মপ্রকাশ করিল সেদিন হইতে বাঙালীই স্বাধীনতার সংগ্রামে দীর্ঘকাল নেতৃত্ব দিয়াছে। জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম ভারতীয় সভাপতি ছিলেন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। বাঙলার সে যুগের সংবাদপত্র সারা ভারতের পরাধীনতার বেদনাকে ভাষায় মূর্ত করিত। স্বদেশী আন্দোলনে, অগ্নিযুগে, এই বাঙালীই সারা ভারতকে পথ দেখাইয়াছে সশস্ত্র সংগ্রামের—দিয়াছে নেতৃত্ব। বাঙালীর সেই অসমসাহসে, দুঃসাহসী চিন্তায় বিস্মিত ভারতের অকুণ্ঠ প্রশংসা মহামতি গোখলের কণ্ঠে এইরূপে ধ্বনিত হইয়াছিল—"বাঙলা দেশ আজ যাহা চিন্তা করে, সমগ্র ভারত আগামীকাল তাহা চিন্তা করে।" সত্যই বাঙালী চিন্তা ও কর্মে শুধু প্রাচীন অতীতেই নয়, নিকট অতীতেও সারা ভারতের পথিকৃৎ হিসাবে পরিচয় ও স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্তিমপর্বেও সুভাষচন্দ্র প্রমাণিত করিলেন—পরাধীন, দুর্বল ভারতবাসীও বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে সুসজ্জিত সশস্ত্রবাহিনী গঠন করিয়া যে কোনও যুদ্ধনিপুণ জাতির মতই সংগ্রামে সক্ষম। আর একবার বাঙালীর প্রতিভায় সমগ্র ভারত চমকিত হইল।

কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস এই যে, যে বাঙালী এতদিন ধরিয়া নানাক্ষেত্রে স্বীয় প্রতিভার স্পর্শে—নব নব পথের সন্ধান দিয়াছে, স্বাধীনতা লাভের উত্তরকালে সেই বাঙালী ও বাঙলা দেশ এক মহাসঙ্কটের আবর্তে পড়িয়া জীবনমরণের সন্ধিক্ষণে উপস্থিত। দেশবিভাগের ফলে লক্ষ লক্ষ বাঙালী সহায়সম্বলহীন উদ্বাস্তুতে আজ পরিণত। খণ্ডিত বঙ্গ আজ তাহার জমি ও শিল্পে প্রয়োজনীয় জীবিকা সংস্থানে অক্ষম। সহস্র সহস্র শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালী যুবকের চক্ষে বেকার সমস্যার বিভীষিকা হতাশার ঘোর অন্ধকার সৃষ্টি করিয়াছে। ব্যবসায় ও শিল্পে বাঙালীর অংশগ্রহণ অতি সামান্যই। যে স্বাধীনতার একাগ্র আরাধনায়

বাঙালী নিজেকে নিমগ্ন করিয়াছিল, সর্বস্ব বিসর্জন দিয়া আজ সে তাহা লাভ করিয়াছে বটে, কিন্তু এ কী তাহার করাল মূর্তি? জমিহীন, বাস্তহীন, কর্মসংস্থান-হীন, সহায়সম্বল শূন্য, জরাজীর্ণ, দীন বাঙালীর এ কী মূর্তি? সরকারী কর্তৃপক্ষের মতে অতিরিক্ত উদ্বাস্তুর পুনর্বাসনের উপযুক্ত ঠাঁই পশ্চিমবঙ্গে অভাব। শিক্ষিত বাঙালীর চাকুরিও নাই। বালক ও বালিকাদের শিক্ষার সুলভ ব্যবস্থা সর্বত্র সহজলভ্য নয়। শিল্পে, বিজ্ঞানে আজ বাঙালী পুরোবর্তী কই? আজ হতাশার কুয়াশায় বাঙালীর দৃষ্টি আচ্ছন্ন, আত্মপ্রত্যয়ের পরিবর্তে তাহার মধ্যে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে অসহায়তা। ভারতের অন্যান্য রাজ্যে আজ অগ্রগতির পদধ্বনি শোনা যায় বটে, অথচ বাঙালী আজ কোথায়?

সত্যই আজ বাঙালীর জীবনে মূল সমস্যাই এই যে, আজিকার নূতন পরিপ্রেক্ষিতে, ভবিষ্যতের সুবিপুল সম্ভাবনার সম্মুখীন হইয়া তাহার সকল ত্রুটি, দুর্বলতা, অবসাদ, হতাশা দূর করিয়া বাঙালী যদি নিজেকে নূতন করিয়া সৃষ্টি করিতে না পারে, নব যুগের সঙ্গে নিজের সামঞ্জস্য সাধনে সক্ষম না হয়, তবে ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে তাহাকে অবলুপ্ত হইতে হইবে। অপ্রিয় হইলেও একথা নিষ্ঠুর সত্য।

এই পরীক্ষা কঠিন হইলেও, বাঙালী ইহা উত্তরণে সক্ষম, একথা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। বাঙালীর প্রতিভা, সাহস, নৈপুণ্য অসাধারণ। অভাব তাহার ধৈর্যের, কষ্টসহিষ্ণুতার, ঐক্যের। একথা আমরা প্রায়ই শুনিতে পাই উচ্চতর মহলের ভাষায় না কি বাঙলা দেশ, 'সমস্যার দেশ', 'বাঙালী শ্রমবিমুখ'। বাঙলা দেশ যদি সমস্যার দেশই হয়, তবে তাহার দায়িত্ব শুধু বাঙালীর নয়। 'বাঙালী শ্রমবিমুখ'—একথা যে কত মিথ্যা, পূর্ববঙ্গাগত শরণার্থীরা উষর প্রান্তরে নবশস্য-ভার সৃষ্টি করিয়া, নূতন নূতন পরিশ্রমসাধ্য কার্যে যোগ দিয়া প্রমাণ করিয়াছে। দণ্ডকারণ্যের গহন অরণ্যে, উড়িষ্যার কণ্টকাকীর্ণ ভূমিতে, বিহারের উষর প্রান্তরে, দুর্গাপুরের নবপ্রতিষ্ঠিত শিল্প-প্রচেষ্টায়, উদ্বাস্তু শিবিরের জীর্ণ কুটিরে, কলিকাতার শিল্প প্রতিষ্ঠানে নবীন বাঙালীর শক্তি আজ এক নূতন বাঙলা সৃষ্টির তপস্যায় নিরত। জমিদারী প্রথার অবসানে, বাঙলার মধ্যবিত্ত শ্রেণী আজ ক্রমেই অধিকতর পরিমাণে শ্রমশীল কর্মে, স্বাধীন ব্যবসায়ে আগ্রহ দেখাইতেছে। এই নব প্রচেষ্টায় তাহার আন্তরিকতার অভাব নাই। এই কঠোর সাধনায় আধুনিক বাঙালী নিজেকে অতীতের বাঙালীর যোগ্য বংশধররূপেই প্রমাণিত করিবে, আর একবার বাঙালীর প্রতিভার স্ফুরণে নবীন ভারত আলোকিত হইবে, নবযুগের নূতন প্রভাতে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীদের সহিত একই শোভাযাত্রায় বাঙালী নিজ স্থান গ্রহণ করিবে, ইহা শুধু আশার স্বপ্ন মাত্র নয়, ইহা বাঙালীর দৃঢ় বিশ্বাস।

আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতিতে বাঙালীর অবদান

।। জাতীয় সঙ্গীত ।। গৃহসজ্জা ও শান্তিনিকেতন ।। সাহিত্য ও শিশু-সাহিত্য ।। সঙ্গীতে নূতনত্ব ।। চলচ্চিত্র ।। মঞ্চাভিনয় ।। লোকশিল্প ও সংস্কৃতি ।। ক্রীড়াজগত ।।

আজ আমাদের সংস্কৃতি এক সর্বভারতীয় একাত্মক রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। এই রূপ এক মহাসাগরের; বহু নদনদীর বিপুল সলিল ধারায় নিত্য সেবিত সার্বভৌম এক চৈতন্য রূপ। স্বর্গ ও মর্ত্যের তিল তিল রূপ সংগ্রহ করিয়া যেমন তিলোত্তমা মূর্তির সৃষ্টি হইয়াছিল, ইহাও ঠিক তেমনি বিভিন্ন প্রাদেশিক, বিভিন্ন জাতীয় ও উপজাতীয় সংস্কৃতি মানসের এক ঘনীভূত প্রকৃতিময় রূপ।

এই সংস্কৃতি যজ্ঞে কে কোন্ উপচার আনিয়া দিয়াছে তাহা লইয়া মাঝে মাঝে কোলাহল হইয়া থাকে। নিজ নিজ অবদানের মূল্যায়ন লইয়া অনেক গর্বের স্তূপ জমিয়া উঠিয়াছে। অহঙ্কার প্রয়োজন নাই,—বাঙালী শুধু তাহার খতিয়ান খুলিয়া হিসাবটা দেখিয়া রাখুক।

ভারতীয় সংস্কৃতির অতলান্তিকে বাঙালীর অবদান দক্ষিণ আমেরিকার—তথা পৃথিবীর বৃহত্তম নদী আমাজনের বিপুল স্রোতধারার সহিত উপমেয়।

বাঙালীর সংস্কৃতিগত অবদানের সুদীর্ঘ তালিকার শিরোদেশে আছে বাঙালী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমন অধিনায়ক জয় হে'—স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের জাতীয় মহাসঙ্গীত আর বাঙালী সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' ভারতের রাষ্ট্রচেতনার দীপবর্তিকা—অধুনা কংগ্রেসদলের সভা-উদ্বোধনী সঙ্গীত।

একক রবীন্দ্রনাথ তথা তাঁহার আদর্শসৃষ্টি শান্তিনিকেতনের প্রভাবই সর্বাপেক্ষা গভীর ও সুদূর প্রসারিত। শান্তিনিকেতন শৈলীর শিল্প ও কারুকলা ধারায় আজ সমগ্র ভারতবর্ষের শিল্প ও সৌন্দর্যচেতনা শুধু প্রভাবিত নয়, আপ্লুত—নিমজ্জিত। আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার মূল স্রোতটির উৎস শান্তিনিকেতন। তারপর সজ্জা-শিল্প বা Decorative Art, সেখানেও শান্তিনিকেতন। কংগ্রেস বা রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে যেখানে যত মণ্ডপ-সজ্জার প্রয়োজন, সবই যেন স্বাভাবিক প্রেরণায় শান্তিনিকেতনী শিল্প-পদ্ধতিতে গড়িয়া উঠে। শাড়ীর পাড়ের নকশায়, কাঠের কাজে, নরম চামড়ার তৈয়ারী নানা বিলাস ও উপকরণের অঙ্গে সেই একটি বিশেষ ভঙ্গীর ছাপ পড়ে,—কবিগুরুর কল্পলোক হইতে যাহা একদিন নামিয়া আসিয়া সারা ভারতের শিল্পচেতনাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল।

আমাদের আহার-বিহার, সাজসজ্জায়, দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রতি পদক্ষেপে যে স্নিগ্ধরুচি ধূপের ধোঁয়ার মতো মৃদু সঞ্চারে সর্বভারতীয় রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহার প্রাণকেন্দ্র ঐ শান্তিনিকেতন।

তারপর সাহিত্যের কথা। সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যে বাঙলা সাহিত্যের দুর্নিবার প্রভাব অতি গভীর। বাঙলা উপন্যাসের অনুবাদ প্রতিটি প্রধান ভারতীয় ভাষাকে ঐশ্বর্যময় করিয়াছে। অবাঙালী বহু কবির কণ্ঠেই কবিগুরুর কাব্যকথার প্রতিধ্বনি। বাঙলা সাহিত্যের বিভিন্নমুখী রচনা নানা প্রাদেশিক ভাষার শিল্পীকে বহুতর বিচিত্র আঙ্গিকের সন্ধান দিয়াছে। শিশু-সাহিত্য সম্বন্ধেও এই একই কথা। স্বাধীন শিশু-সাহিত্য রচনার প্রেরণা অন্যান্য প্রদেশ যে আমাদের বাঙলা সাহিত্য হইতে পাইয়াছে একথা অনস্বীকার্য। শিশু-সাহিত্য রচনার পথ বাঙালী ইওরোপ হইতে পাইয়াছে ঠিকই কিন্তু সে তাহার মৌলিকতার সাহায্যে নিজস্ব শিশু-সাহিত্য গড়িয়া তুলিতে বিলম্ব করে নাই। অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্য এ বিষয়ে বাঙালীর অনুসরণ করিয়াছে।

শিল্প ও সাহিত্যের পরে আসে সঙ্গীতের কথা। বিশুদ্ধ রাগ-রাগিণীর অনুশীলন বাঙলার বাহিরে বেশী হইয়া থাকে সন্দেহ নেই। আজও রাগ-সঙ্গীতের আকাশে যাঁহারা চন্দ্র-সূর্য তাঁহারা কেহই বাঙালী নহেন একথাও ঠিক। তবে বাঙলার বিষ্ণুপুর একদা ভারতীয় সঙ্গীতকে শ্রীমণ্ডিত করিয়া তুলিতে যে কত রত্নাভরণ দান করিয়াছিল, প্রকৃত রসিকজন তাহার হিসাব রাখেন। কিন্তু নানা রাগ-রাগিণীর ও দেশী-বিলাতী নানা সুরের বিচিত্র সমন্বয়ে যে 'আধুনিক' সুরের উদ্ভব হইয়াছে তাহার বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল এই বাঙলা দেশেই। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ির জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই মিশ্রণের দুরূহ প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন। অবশ্য তাহারও একটা মৌলিকতা ছিল। এই শ্রেণীর মৌলিকতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বাঙলার বহু আধুনিক সঙ্গীতেই খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। এরই একটা ব্যর্থ প্রচেষ্টা ও সস্তা রূপ আমরা দেখিতে পাই বোম্বাইয়ের সিনেমা সঙ্গীতগুলির মধ্যে—যেগুলি কোনক্রমেই অবশ্য উচ্চস্তরের অথবা রুচিশীলতার পরিচয় বহন করিতেছে না।

আজিকার এই যুগকে অনেকে ব্যঙ্গচ্ছলে সিনেমা-সংস্কৃতির যুগ বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। কথাটা অবশ্য মিথ্যাও নয়। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একথাও স্মরণীয় যে সিনেমা-সংস্কৃতির মধ্যে সত্যকারের সংস্কৃতিগত কোনও প্রচেষ্টা যদি হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা একমাত্র বাঙলা দেশেই হইয়াছে। সুরুচিপূর্ণ ভাল ছবি বলিতে একমাত্র বাঙলা ছবিকেই বুঝায়। নামকরা উপন্যাসের চিত্ররূপ দিবার প্রচেষ্টা বাঙালীর তৈয়ারী ছবিতেই প্রথম দেখা যায়। নামকরা

প্রযোজকরা জানেন, ভাল ছবি শুধু যশস্বী শিল্পীদের উপরই নির্ভর করে না, সেই ছবির পশ্চাতে বলিষ্ঠ কাহিনী চাই এবং সে কাহিনী পাওয়া যাইবে শক্তিমান কথাশিল্পীদের সৃষ্টির মধ্য হইতে। এক্ষেত্রেও বোম্বাই বাঙলা দেশকে অনুকরণ করিয়া লাভবান হইয়াছে। ওখানকার সিনেমা-শিল্পপতিরা বলিষ্ঠ আদর্শমূলক কাহিনীর জন্য বা সুরুচিপূর্ণ গল্পাংশের জন্য বাঙালী সাহিত্যিকেরই শরণাপন্ন হইয়া থাকেন। এইখানেও তাই বাঙলারই জয়।

কিন্তু ইহারও আগের কথা মঞ্চাভিনয় প্রসঙ্গ। এক্ষেত্রে বাঙালী শুধু অগ্রণীই নয়, আজও শীর্ষস্থানের অধিকারী। আমাদের অভিনয়ের ঐতিহ্য শুধু যে শতাব্দী প্রাচীন, এই শেষ কথা নয়। এই শিল্পটি নিরবচ্ছিন্ন গতিতে ক্রমপরিপুষ্টি লাভ করিতে করিতে এখন এক শক্তিশালী সংস্কৃতি আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অন্য কোনও প্রদেশ অবশ্য আজও পেশাদার মঞ্চ প্রতিষ্ঠা করিতে সাহস না করিলেও সৌখীন নাট্য-আন্দোলন প্রায় সব প্রদেশেই সক্রিয়ভাবে গতিশীল। কেন্দ্রীয় সরকারও সংস্কৃতির এই শাখাটির পরিপূর্ণতম বিকাশের জন্য উদ্যোগী হইয়া সরকারী পরিচালনাধীন কর্মকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। প্রতি বৎসরই নানা প্রদেশের নানা অভিনয় সংস্থা রাজধানীতে গিয়া থাকেন নিজ নিজ উৎকর্ষের পরিচয় দিতে। তবে বাঙালী আজও এখানে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। বাঙালীর নিকট হইতেই প্রেরণা লাভ করিয়া আজ সারা ভারতবর্ষ মঞ্চাভিনয়ের প্রতি এত উৎসাহী হইয়া উঠিয়াছে; শুধু তাহাই নয় নাটক, রচনা-রীতি এবং অভিনয় কৌশলে তাহারা সকলেই ঘনিষ্ঠভাবে বাঙালীকে অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে।

লোকসংস্কৃতির প্রতি আজ যে সারা ভারতে একটা জাগ্রত চেতনা দেখা দিয়াছে, সেখানেও রহিয়া গিয়াছে বাঙলা তথা বাঙালীর অসামান্য প্রভাব। লোক-সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের প্রতি বাঙালীই সর্বপ্রথম দৃষ্টি দিয়াছিল; প্রেরণা আসিয়াছিল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে। লোকশিল্প ও লোক-সংস্কৃতিকে বাঁচাইয়া রাখার প্রয়োজনের কথা তিনি প্রথম চিন্তা করেন, তারপর বাঙালী সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন সেই দিকে। তাঁহার শ্রীনিকেতনের মাধ্যমে তিনি এই খাতে অনেকখানি গঠনমূলক কাজও করিয়া গিয়াছেন।

ভারতীয় ক্রীড়াজগতেও বাঙালীর অবদান বড় সামান্য নয়। ফুটবলের জন্য বাঙালী যে ত্যাগ ও অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়াছে তাহা অবিস্মরণীয়। ক্রিকেট, টেনিস, ব্যাডমিণ্টন, হকি প্রভৃতির জন্য বাঙালী ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়ারসিকরা বহু পরিশ্রম করিয়াছেন। ফুটবলের প্রাণকেন্দ্র তাই আজও এই বাঙলা দেশ। আর অন্যান্য ক্রীড়ার ক্ষেত্রেও একথা বলা চলে যে, এক বোম্বাই ছাড়া উৎসাহ

উদ্দীপনা ও অনুরাগ যা কলিকাতার মানুষের মধ্যে দেখা যাইতেছে—তাহা আর অন্য কোথাও নয়।

জীবন-যুদ্ধে বাঙালী আজ ক্ষতবিক্ষত। তাহার জয় গান আজ কাহারও মুখে ধ্বনিত হয় না। তাহার চরিত্র সমালোচনা করিয়া কেহ বা মনে মনে আর কেহ বা প্রকাশ্যে বহু বাহবা পাইয়াছে। কিন্তু সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই পতনোন্মুখ পরাস্ত বাঙালীই আজও অপ্রতিহত প্রভাবে রাজত্ব করিতেছে।

ভারতবর্ষ ও জাতীয় সমস্যা

ভারতের গ্রাম—অতীত ও বর্তমান উন্নয়ন পরিকল্পনা

॥ সভ্যতার সূতিকাগার গ্রাম ॥ অতীতের ভারতীয় গ্রাম ॥ ইংরেজ আমলে গ্রামের সংকট ॥ গ্রামের সমস্যা ও উন্নয়ন ব্যবস্থা ॥ উন্নয়ন পরিকল্পনার গুরুত্ব ॥ বর্তমান উন্নয়ন সাফল্য ॥

মানব-সভ্যতার উষাকালে যেদিন মানুষ ভূমিকর্ষণ করিয়া ক্ষুধার অন্ন সংগ্রহের কৌশল আয়ত্ত করিতে শিখিল, সেদিন হইতে সভ্যতার ইতিহাসে ঘটিয়াছিল যুগান্তকারী পরিবর্তন। সেদিন হইতে অরণ্যচারী যাযাবর মানবগোষ্ঠী তাহার যাযাবর বৃত্তি পরিত্যাগ করিল। উর্বরাক্ষেত্রকে কেন্দ্র করিয়া সেদিন হইতে গড়িয়া উঠিল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মানববসতি—গ্রাম। গোষ্ঠীবদ্ধ আদিম সাম্যবাদী সমাজ-জীবন ভাঙিয়া গড়িয়া উঠিল পরিবার ব্যবস্থা, শুরু হইল ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রথার। ধীরে ধীরে নানান অভাব সম্বন্ধে সভ্য মানব সচেতন হইয়া উঠিল। গ্রামের বিভিন্ন পরিবার বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনের দায়িত্ব গ্রহণ করিল। সৃষ্টি হইল স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম্য অর্থনীতির। এইরূপে আধুনিক মানব-সভ্যতা গ্রামের সূতিকাগারেই ভূমিষ্ঠ হইল। অতিপ্রাচীন কাল হইতে আজ পর্যন্ত বহু সভ্যতার উত্থান-পতন ঘটিয়াছে কিন্তু যে সভ্যতা যত বেশী গ্রামজীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিল সে সভ্যতা ততবেশী স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছে। এই জন্যই ভারত ও চীনের সভ্যতা আজ পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন ধারার কালাতিক্রমণে সমর্থ হইয়াছে। আর ইহারই অভাবে মিশর, গ্রীক ও রোমান সভ্যতার অপমৃত্যু ঘটিয়াছে।

যুগযুগান্তর ধরিয়া ভারতীয় সভ্যতার প্রাণ তাহার লক্ষ লক্ষ গ্রামে স্পন্দিত হইয়াছে, কোটি কোটি গ্রামবাসীর সবলবাহুর কর্মচাঞ্চল্যে তাহার ধমনীতে প্রাণ-প্রবাহ সঞ্চারিত করিয়াছে। এই গ্রাম ও তাহার অধিবাসীরাই ছিল ভারত-সভ্যতার ধারক ও বাহক। এই স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতিবিশিষ্ট গ্রামগুলিতেই অব্যাহতভাবে, ভারতবাসী তাহার দিনাতিক্রমণ করিয়াছে, শস্য ও পণ্যসামগ্রী উৎপাদন করিয়াছে, রাজার দাবি মিটাইয়াছে। গ্রাম পঞ্চায়েৎ তাহার জীবন-ধারাকে নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে। তাই বাহিরের আক্রমণে তাহার রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে সাময়িক আলোড়ন দেখা দিলেও, সাময়িকভাবে তাহার জীবনধারা ব্যাহত হইলেও, তাহার অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে কোনও পরিবর্তন দেখা দেয় নাই। সুদূর ঐতিহাসিক কাল হইতে শুরু করিয়া, হিন্দু ও মুসলমান শাসনকাল অতিক্রম করিয়া, একই জীবনযাত্রা পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া গ্রাম-কেন্দ্রিক ভারত-সভ্যতা ইংরেজ শাসনের প্রাক্কালে উপনীত হইয়াছিল। এই জীবনযাত্রা পদ্ধতির

পরিবর্তনের কোনও প্রয়োজনীয়তা ভারতবাসী অনুভব করে নাই, কারণ ইহা তাহাকে দিয়াছিল সমৃদ্ধি, সুখ, শান্তি, স্বায়ত্তশাসন ও স্থৈর্য। গ্রামবাসীরা সারা দেশকে যোগাইত ক্ষুধার অন্ন, পরিধানের বস্ত্র; দৈনন্দিন প্রয়োজনের, উৎসব অনুষ্ঠানের, বিলাসের সামগ্রী। গ্রাম ছিল কৃষি ও শিল্প, উভয়েরই কেন্দ্র। ছিল না আজিকার মতো বেকার সমস্যা, খাদ্যাভাব, অভাব অনটন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংরেজ শাসনের প্রতিষ্ঠা এই সামন্ততান্ত্রিক, আত্মসমাহিত, স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামজীবনের উপর কঠোর রূঢ় আঘাত করিয়া বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করিল। সে দিনের সদ্য-শিল্পবিপ্লবোত্তর ইংলণ্ডের প্রয়োজন ছিল শিল্পের কাঁচামাল, আর পণ্যের বাজার। ইংরেজ ভারতে ঔপনিবেশিক শাসন-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করিয়া ভারতকে পরিণত করিল ইংলণ্ডের প্রয়োজনীয় কাঁচামালের উৎপাদনকারী দেশে। আর যে ভারতীয় শিল্প শুধু সমগ্র দেশ নহে, মিশর হইতে আরম্ভ করিয়া চীন পর্যন্ত সমস্ত সভ্য জগতের প্রয়োজন মিটাইত, তাহাকে সুপরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করিয়া এদেশে ইংলণ্ডের শিল্পজাত পণ্যের বাজার সৃষ্টি করিল। ভারতীয় গ্রাম্য অর্থনীতি বিধ্বস্ত হইয়া গেল। গ্রাম্য কারিগরেরা অনন্যোপায় হইয়া কৃষিকার্যের আশ্রয় লইল। রেলপথের বিস্তারে দূরদূরান্তের গ্রাম্যশিল্পগুলি ধ্বংস হইয়া দেশের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিদেশী পণ্যের বাজার বিস্তৃত হইল। ভারত তাহার নিজস্ব শিল্প-ব্যবস্থা হারাইয়া একমাত্র কৃষিকার্যের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িল। কিন্তু কৃষি সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশবাসীর জীবিকা সংস্থানের উপায়ে পরিণত হইলেও ইংরেজের নূতন ভূমি-ব্যবস্থায় নূতন জমিদারশ্রেণীর শোষণে চাষী হৃতসর্বস্ব হইয়া পড়িল। নূতন নূতন শহরে, ইংরেজ শাসকগণের সান্নিধ্যে, বিলাসে ব্যসনে জমিদারশ্রেণী গ্রামের শোষণের অর্থ অপচয় করিতে লাগিল। গ্রামের জীবনীশক্তি হরণ করিয়া নূতন শহরগুলি পরিপুষ্ট হইয়া উঠিল। শহরের জৌলুস, শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা, নানা প্রকারের জীবিকার সংস্থান গ্রাম্য মধ্যবিত্ত ও উচ্চতর শ্রেণীগুলিকেও আকৃষ্ট করিল। আরম্ভ হইল গ্রামের ভাঙন, প্রাচীন গ্রাম্য অর্থনীতির অবসান। ইংরেজ শাসনের ইতিহাস ভারতের এই গ্রাম্য জীবনযাত্রা ধ্বংসের ইতিহাস, গ্রাম্য অর্থনীতির বিপর্যয়ের ইতিহাস; কৃষিকার্যের অবনতির ইতিহাস। আধুনিক সভ্যতার বৈদ্যুতিক আলোয়, বিলাসের উপকরণে শহরের শোভা বাড়িয়াছে আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পাইয়াছে গ্রামেরও দুর্দশা। পৌনে দুইশত বৎসরের শাসনের পর ইংরেজ যখন এদেশ হইতে বিদায় লইল তখন রাখিয়া গেল ভারতব্যাপী এক মহাশ্মশান—সমৃদ্ধ গ্রাম্য অর্থনীতির পরিবর্তে ভগ্ন ধ্বংসাবশেষ

জরাজীর্ণ গ্রাম্য অর্থনীতি, সমৃদ্ধিশালী জাতির পরিবর্তে বিশ্বের অন্যতম সর্বাধিক দরিদ্র জাতি।

ইংরেজ নিজ স্বার্থেই একদিকে যেমন কৃষিকে তাহার প্রয়োজনীয় কাঁচামালের উৎপাদনের উপায়ে পরিণত করিয়াছে, তেমনি যন্ত্রশিল্পকেও উন্নত হইতে বাধা দিয়াছে। ফলে ভারত সম্পূর্ণ কৃষিপ্রধান দেশে পরিণত হইয়াছে।

বর্তমানে স্বাধীন ভারতের প্রধান সমস্যা উন্নয়নের, অগ্রগতির। এই সমস্যা বিচারে মনে রাখিতে হইবে, আজ পর্যন্ত সর্বাধিক জাতীয় উৎপাদন কৃষিকার্য দ্বারাই উৎপন্ন হয়। আমাদের সর্বাধিক সংখ্যক দেশবাসী (৬৯·৯ শতাংশ) কৃষক এবং দেশের অধিকাংশ অধিবাসীই গ্রামে বাস করে (৮২·৭%)। এই গ্রাম্য কুটির শিল্পগুলিই আজও কোটি কোটি মানুষের জীবিকার উৎস। সুতরাং ভারতের গ্রামগুলি আজও ভারতীয় অর্থনীতির, সমাজ-ব্যবস্থার ভিত্তি। অতএব এই ভিত্তিকে দৃঢ় না করিতে পারিলে কোনও উন্নয়ন পরিকল্পনাই কাম্য ফল প্রদানে সক্ষম হইবে না। কৃষি-ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটিলে, কৃষির ফলন বৃদ্ধি পাইলে, দেশের খাদ্যাভাব ও শিল্পের কাঁচামালের অভাব দূর হইবে। কৃষকের ক্রয়-ক্ষমতার বৃদ্ধি ঘটিলে শহরের শিল্পজাত পণ্যের বাজার বিস্তৃত হইবে। ব্যাপক শিল্পোন্নয়ন ও উহার ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি বজায় রাখা সম্ভব হইবে। গ্রাম্য কুটিরশিল্পগুলির উন্নতি ঘটিলে ওগুলি বিকেন্দ্রীত বলিয়া দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক শক্তির ব্যাপক বণ্টন সম্ভব হইবে। পথঘাট উন্নত ও প্রসারিত হইলে, যোগাযোগ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ঘটিলে, শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি পাইলে, গ্রামে গ্রামে আধুনিক ব্যাঙ্ক প্রভৃতি সঞ্চয় ও লেনদেনের সুবিধা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা হইলে, বহুমুখী পরিকল্পনাগুলির উৎপন্ন সুলভ বৈদ্যুতিক শক্তি গ্রামে গ্রামে বিস্তারের ব্যবস্থা ঘটিলে, আধুনিক সভ্যতার যাবতীয় সুযোগ সুবিধাই গ্রামে লভ্য হইবে। ইহাতে গ্রাম হইতে শহরাভিমুখে মানুষের অভিযান বন্ধ হইবে। গ্রাম্য সম্পদ ও প্রতিভার যথাযথ ব্যবহারে গ্রাম্য জীবনে আসিবে সুখ ও সমৃদ্ধি। ভারতের ৭ লক্ষ গ্রামের এই পুনরুজ্জীবনের মধ্যেই ভবিষ্যৎ ভারতের উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতি নিহিত রহিয়াছে। গ্রামের পুনর্গঠন এবং গ্রাম ও শহরের মধ্যে পার্থক্যের অবসান করিয়াই একমাত্র নবীন ভারত গঠন করা সম্ভব। গ্রামজীবনের তথা কৃষি ও গ্রাম্য শিল্পের পুনর্গঠনের দ্বারাই নূতন বৈপ্লবিক শক্তির সৃষ্টি সম্ভব, জাতির প্রাণশক্তির পুনঃ প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

এই মহাসত্য উপলব্ধি করিয়াই ভারত সরকার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সঙ্গে সমাজোন্নয়ন ও জাতীয় সম্প্রসারণ পরিকল্পনার কার্যক্রম সন্নিবিষ্ট করিয়াছে।

ইহাদের উদ্দেশ্য হইল গ্রামজীবনের সর্বতোমুখী উন্নতি ও মঙ্গল সাধন করা। পরিকল্পনা কমিশন চারিভাগে এই উদ্দেশ্যগুলিকে বিভক্ত করিয়াছেন :

ক. গ্রামবাসীগণের মধ্যে প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী প্রসারিত করা ;

খ. তাহাদের সমবায়মূলক কর্মে উৎসাহিত ও অভ্যস্ত করা ;

গ. কৃষি ও গ্রাম্য শিল্পগুলির উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা ; এবং ঘ. উৎপাদন বৃদ্ধি করা।

সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনাগুলি দুই জাতের—[১] মূল পরিকল্পনা ও [২] মিশ্র পরিকল্পনা।

মূল পরিকল্পনাতে প্রতি ৩০০টি গ্রাম, উহা ২ লক্ষ অধিবাসী ও ৫০০ বর্গমাইল এলাকা এবং ১৫০ লক্ষ একর কৃষিক্ষেত্র লইয়া একটি করিয়া উন্নয়ন অঞ্চল গঠিত। ১০০টি করিয়া গ্রাম লইয়া ৩টি উন্নয়ন ব্লকে বিভক্ত। এই পরিকল্পনায় প্রধানত কৃষির ফলন বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে। ইহার সহিত জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পথঘাট বিস্তারের কার্যক্রম সংযুক্ত।

মিশ্র পরিকল্পনায় কৃষি ছাড়া স্থানীয় ক্ষুদ্র এবং কুটিরশিল্পের উন্নতির উপর জোর দেওয়া হয়। একটি নূতন প্রতিষ্ঠিত শহরকে এই পরিকল্পনার কেন্দ্র করিয়া কার্যক্রম পরিচালিত হয়। শহরগুলিতে শিল্প-সংস্থাগুলি কেন্দ্রীভূত করা হয় ও চতুর্দিকের গ্রামগুলির উৎপাদিত পণ্যের বাজার ঐ শহরগুলিতে স্থাপিত হয়। গ্রামের কৃষক ও শহরের শিল্পীদের, পরস্পরের পণ্যের বিনিময়ে উভয়ের অভাব দূর করাই ইহার উদ্দেশ্য। সঙ্গে সঙ্গে গ্রামবাসীদের বাসগৃহের সংস্কার, উন্নতি ও নূতন গৃহনির্মাণ কার্য, বয়স্কশিক্ষা, হাসপাতাল স্থাপনা প্রভৃতি সমাজ কল্যাণমূলক কার্য চলিতে থাকে।

জাতীয় সম্প্রসারণ কার্যে গ্রামাঞ্চলে প্রতি তালুকে একটি উন্নয়ন ব্লক স্থাপন করিয়া কৃষি, পশু-প্রজনন ও পশু-সংরক্ষণ, সমবায়, পঞ্চায়েৎ, পূর্ত প্রভৃতি বিভিন্ন দিকে কৃষককে আধুনিক জ্ঞান ও পদ্ধতি শিক্ষা দিয়া উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাহায্য করিবার জন্য বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ থাকেন। ইহা ছাড়া প্রতি পাঁচ হইতে দশটি গ্রামের জন্য থাকেন একজন করিয়া গ্রামসেবক বা গ্রামসেবিকা।

এইরূপে সুপরিকল্পিত কার্যক্রমের মাধ্যমে, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া আজ ভারত এক নতুন গ্রামসমাজ, গ্রামজীবন ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার সাধনায় আত্ম-নিয়োগ করিয়াছে। ইতিমধ্যেই প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষে এই ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি ঘটিয়াছে, অতীত অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার ভিত্তিতে তাহা আরও

পরিবর্ধিত হইবে, এই আশা অসঙ্গত নহে। এই পরিকল্পনার কার্যক্রম যেদিন সমগ্র দেশে বিস্তৃত হইয়া সুসম্পন্ন হইবে, সেদিনের নবভারতের নবজন্মের উৎসব যাপনের জন্য ভারতবাসী তাহার বর্তমান কর্মচাঞ্চল্যের মধ্যেও উদগ্র প্রতীক্ষায় রত।

ভারতের কৃষিসমস্যা ও খাদ্যাবস্থা

॥ কৃষির প্রাচীন ও বর্তমান অবস্থা ॥ কৃষির সমস্যা ও জাতির সংকট ॥ সমাধানের পথ ॥ সার-বীজ-জলসেচ-আধুনিক প্রথায় চাষ ॥ সমবায় সমিতি ॥ কৃষিশিক্ষা ব্যবস্থা—অধিক ফলনের ব্যবস্থা ॥

প্রাচীন ভারতকে যে কৃষি সম্পদশালী করিয়াছিল, যে কৃষি ভারতের সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে জন্ম দিয়াছে, সেই কৃষির সম্পদই যুগ যুগান্তর ধরিয়া বিশাল ভারতের সমস্ত অধিবাসীর অন্ন ও বস্ত্রের সংস্থান করিয়াছে। ভারতবাসীর কোনদিন কোনও অভাব ছিল না, জীবিকার জন্য তাহাকে কখনও ভাবিতে হয় নাই, পরের দুয়ারে সে হাত পাতে নাই কোনদিন। কিন্তু এ সুখ এ সম্পদ ভারতের বুকে চিরদিনের জন্য স্থায়ী হইল না।

আর্য যুগের অবসান হইল। হিন্দু, পাঠান, মোগল একে একে ভারতের বুকের উপরে অধিকার স্থাপন করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল। ভারতের কৃষির সম্পদই তাহাদের সকলের রাজকোষ পূর্ণ রাখিয়াছে। তারপর বিদেশের বণিক ভারতের বুকে যন্ত্রের আমদানি করিল, কুটিরশিল্প উঠিয়া গেল। জনসংখ্যার এক বৃহৎ অংশ পিতৃপুরুষের ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া মাঠে নামিতে বাধ্য হইল। কৃষি সমস্যার এই প্রথম সূত্রপাত হইল। উপার্জনের পথ না থাকিলেও জনসংখ্যার বৃদ্ধি চলিতে লাগিল। এই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার প্রবল চাপ যখন কৃষিভূমির উপরে আসিয়া পড়িতে লাগিল, তখন ঐ খণ্ড খণ্ড জমির স্বল্প উৎপাদন ভারতবাসীর গোলাঘরকে আর পূর্ণ করিতে পারিল না। দেশে দেখা দিল দারিদ্র্য।

ভারতের জলবায়ুই ভারতের কৃষিকে উন্নত ও সম্পদশ্রী পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু খেয়ালী প্রকৃতির হাতে পড়িয়া সেই জলবায়ুরও বহু বিচিত্র পরিবর্তন হইয়াছে এবং হইতেছে। সমস্ত বর্ষা কাটিয়া যায়, কৃষক সতৃষ্ণ নয়নে আকাশের দিকে চাহিয়া থাকে। এক ফোঁটা জলও সেখান হইতে পড়ে না। ভাগ্যের উপর

নির্ভর করিয়া তাহাদের বসিয়া থাকিতে হয়। ভাগ্য অনেক সময়ই মুখ তুলিয়া তাকায় না। অজন্মায় দেশে হাহাকার উঠে। আবার ক্ষেতভরা সোনার ধান যখন ঘরে উঠি উঠি করিতেছে, এমন সময় প্রবল বন্যা লোকের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া যায়। প্রকৃতির এই খেয়ালের উপরে ভারতবাসী হাত দিতে পারে নাই, আর তাহার বিরুদ্ধেও কোনও অভিযোগ তাহারা জানায় নাই।

আমাদের দেশে জমির বণ্টন ব্যবস্থার মধ্যেও ত্রুটি আছে। অধিকসংখ্যক লোকের মধ্যে জমি বিলি হওয়ার জন্য জমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া পড়ে। ইহাতে জমির অপচয় যেমন হয়, তেমনি জমির উৎপাদনও পরিশ্রমানুযায়ী হইতে পারে না। খণ্ডিত ছোট জমির উপর যন্ত্র চালনা সম্ভবপর নয় বলিয়া আমাদের পূর্বপুরুষের সেই হাল দিয়াই আজও চাষ হইতেছে। হালের চাষে শ্রমিকের শক্তিই ব্যয়িত হয়, উৎপাদিকা শক্তি বাড়ে না। জমির উৎপাদিকা শক্তির যে একটি সীমা থাকিতে পারে একথা আমরা কখনও ভাবিয়া দেখি নাই। প্রতি বৎসরই শস্য মাটির সমস্ত রস শোষণ করিয়া লইতেছে। এ অবস্থায় ভাল শস্য পাইতে হইলে মাটিতে যে রসের যোগান দিতে হইবে তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। এই অজ্ঞতার মূলে আছে আমাদের অশিক্ষা। আমাদের দেশে শতকরা পঁচাত্তর জন লোকই জীবিকার জন্য কৃষির উপরে নির্ভর করিয়া থাকে। এই বৃহৎ জনসংখ্যার সকলেই নিরক্ষর। দেবতার কৃপার উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া এবং হালের বদলে কল চালাইয়া যে কৃষিশিল্পের উন্নতি হইতে পারে, এ কথা আমাদের দেশের কৃষকের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। ইহার উপরে তাহাদের স্বাস্থ্য নাই আর তাছাড়া আছে অর্থের অভাব। মূলধনের অভাবে অনেক সময়ে বীজের ধান কিনিবারও সামর্থ্য তাহাদের থাকে না। ভারতের বর্তমান কৃষি-ব্যবস্থাই কৃষি-শিল্পের সর্বনাশকে ডাকিয়া আনিয়াছে। কৃষির এই দুরবস্থা দেখিয়া কলের বাঁশীর ডাকে অনেকেই গ্রাম ছাড়িয়া শহরে আসিয়া ভীড় করিতেছে। ফলে, গ্রাম এবং শহর দুইই সমস্যার জালে জড়িত হইয়া পড়িতেছে।

ভারতের বর্তমান এই আর্থনীতিক দুরবস্থার গোড়ার কথা আমাদের কৃষি-শিল্পের অবনতি। কৃষির উন্নতিতেই ভারতের উন্নতি। গান্ধী-পরিকল্পনার মতে ভারতের কৃষিই ভারতের একমাত্র সম্পদ ও উন্নতির পথের একমাত্র সহায়ক। বর্তমান পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেও কৃষির উন্নতির আলোচনা রহিয়াছে। ভারতের অধিকাংশ লোকের জীবিকা এবং সমস্ত ভারতের খাদ্যাবস্থা ও আর্থনীতিক উন্নতি যেখানে কৃষির উপর নির্ভর করিতেছে. সে কৃষি-ব্যবস্থার আশু প্রতিকার অবশ্য প্রয়োজন।

পতিত জমির পরিমাণ আমাদের দেশে নিতান্ত কম নয়। কৃষির উন্নতি করিতে হইলে এই সব পতিত অনাবাদী ভূমিকে উর্বর করিয়া চাষীর চাষের জমির অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতে হইবে। চাষের জমির উৎপাদিকা শক্তির দিকে চাষীর দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ক্রমাগত শস্য উৎপাদনের ফলে জমির শক্তি যখন কমিয়া আসে, তখন বিবিধ শস্য এবং মাটির উপযুক্ত সারের প্রয়োজন হয়। সার উৎপাদনের জন্য সরকার এখন দৃষ্টি দিয়াছেন, কিন্তু জমির দিকে তাহাদের সযত্ন দৃষ্টি এখনও পড়ে নাই। এই সারের সঙ্গে সঙ্গে ভাল বীজের কথাও আমাদের মনে রাখা দরকার। বীজ ভাল না হইলে উপযুক্ত উর্বরা জমিতেও ফসল ভাল হইতে পারে না। শুধু নিজের ফসলের বীজ সঞ্চয় না করিয়া আরও ভাল বীজের সন্ধান ও সংগ্রহ করা উচিত।

সকল জমিতে সব রকম শস্যের চাষ হয় না ভাবিয়া আমরা বৎসরের কিছুটা সময় অনেক জমিকে পতিত ফেলিয়া রাখি। সমস্ত জমিতে এবং প্রতিকূল জলবায়ুর মধ্যেও যে বিচিত্র শস্য উৎপাদন করা চলে তাহা সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ও চীন গণতন্ত্র আমাদের দেখাইয়া দিয়াছে। জমি যাহাতে পড়িয়া না থাকে, এবং যাহাতে কোন-না-কোনও প্রকার শস্য তাহাতে উৎপন্ন করা যায় সেজন্যও বৈজ্ঞানিক প্রণালীর সাহায্য লইতে হইবে।

কৃষির জন্য মেঘের উপরেই আমরা নির্ভর করিয়া থাকি। অনাবৃষ্টি এবং অতিবৃষ্টির প্লাবন দুইই আমাদের ফসলের জীবনকে বিনষ্ট করে। জলসেচের ব্যবস্থা না হইলে কৃষির উন্নতি সম্ভবপর হইবে না। জলসেচের কাজ পঞ্জাবে অনেকখানি উন্নতি লাভ করিয়াছে। অন্যান্য প্রদেশকেও এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া তৎপর হইতে হইবে। অতিবৃষ্টির প্লাবন হইতে কৃষিকে বাঁচাইবার জন্য বাঁধের কাজ কিছু কিছু হইয়াছে বটে, কিন্তু ভারতের বিস্তৃত কৃষিক্ষেত্রের পক্ষে তাহা নিতান্তই সামান্য। পঙ্গপাল কৃষির অতিবড় শত্রু। বৈজ্ঞানিক উপায় ছাড়া এই শত্রুকে বিনষ্ট করার পথ আর কিছু নাই। অনেক ক্ষেত্রেই আজকাল আকাশযানের সাহায্যে ঔষধ ছড়াইয়া কীট, পতঙ্গ ও পঙ্গপালের গ্রাস হইতে কৃষিকে রক্ষা করা হইতেছে। এই প্রয়োজনে কৃষিবিদ ও সরকারকেই আগাইয়া আসিতে হইবে।

কৃষিপণ্যের উন্নতি করিতে হইলে আমাদের সনাতন প্রথার লাঙলকে বাদ দিতে হইবে। খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন জমিকে একত্র করিয়া যন্ত্রের সাহায্যে জমি চাষ করিতে হইবে। এইরূপ সংযুক্ত প্রশস্ত জমির উপরে বীজ বপনের জন্যও আকাশযানের সাহায্যের প্রয়োজন হইতে পারে। কিন্তু কৃষির এই ব্যবস্থার

আগেই কৃষকদের মধ্যে যৌথ কৃষিব্যবস্থার প্রচলন করিতে হইবে। যৌথ কৃষি-ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গেই সমবায় প্রথার প্রবর্তন আবশ্যক। সমবায় সমিতিকেই আপনাপন কৃষিক্ষেত্রের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। অর্থের অভাব চাষের উন্নতির অন্তরায়। সরকার হইতে অর্থ সাহায্য না আসিলে চাষীর অভাব দূর ও চাষের উন্নতি সম্ভবপর হইবে না। সমবায় সমিতিই সরকার হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া প্রয়োজনমত অর্থের উপযুক্ত ব্যবহার করিবে। জীবনান্ত করিয়া কৃষক ফসল ফলায়, কিন্তু উচিত মূল্যে বাজারে সেই ফসল বিক্রয় করিবার সুযোগ তাহারা পায় না। শস্য বিক্রয় করিবার ভারও এই সমিতিকেই নিজের হাতে লইতে হইবে।

কৃষির উন্নতির এই গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইলে কৃষককে আর নিরক্ষর থাকিলে চলিবে না। চাষীরা যদি কৃষিশিল্পের সর্বাঙ্গীন শিক্ষা উপযুক্তভাবে না পায়, কৃষির উন্নতি তবে কিছুতেই সম্ভব হইবে না। কৃষিশিল্প সম্বন্ধে শিক্ষা দিবার জন্য কৃষিবিদ্যালয় এবং কৃষিশিল্পের ক্রমোন্নতির জন্য সেই সঙ্গে গবেষণাগারেরও প্রতিষ্ঠা অবশ্য প্রয়োজন। সব রকম সাহায্য পাইলেও নিরক্ষর অজ্ঞ কৃষকের কাছে কৃষির উন্নতির আশা করা চলে না। কৃষককে শিক্ষিত হইতেই হইবে এবং এই শিক্ষাদানের সম্পূর্ণ ভার রাজ্য সরকারকেই আপাতত গ্রহণ করিতে হইবে।

ভারতের আর্থনীতিক অবনতিই দেশের কৃষিশিল্প ও খাদ্যব্যবস্থার অবনতির প্রধান কারণ। অন্ন সমস্যা, উদ্বাস্তু সমস্যা, শিল্পসমস্যা সব কিছুই আর্থনীতিক পরিস্থিতির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থাকে। কৃষিশিল্প ও ভারতের খাদ্য সমস্যার উন্নতি করিতে হইলে ভারতের আর্থনীতিক উন্নতির দিকেই সর্বাগ্রে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভারতের নানাবিধ সমস্যার সমাধানের জন্য এবং অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য যন্ত্রশিল্পের প্রসারের কথাই অধিক চিন্তা করা হইয়াছে। যন্ত্রশিল্পের প্রসার ও ক্রমোন্নতির ভিতর দিয়া ভারতের আর্থনীতিক উন্নতি ও বিচিত্র সমস্যার সমাধান অনেকটা নিশ্চয়ই হইবে, কিন্তু কৃষিকে বাদ দিয়া যন্ত্রশিল্প কিংবা ভারতের উন্নতি কিছুতেই সম্ভব হইবে না। কৃষির উপরেই প্রধানত সমস্ত ভারতের খাদ্য-ব্যবস্থা নির্ভর করিতেছে। ভারতের তিন চতুর্থাংশ লোক কৃষির উপর নির্ভর করিয়াই জীবিকা অর্জনের চেষ্টা করে। জনসংখ্যার এই বহুলাংশকে অবহেলা করিলে এবং কৃষিজাত পণ্যের উন্নতির জন্য সর্বান্তঃকরণে অগ্রসর না হইলে শুধু যন্ত্রশিল্পের উৎপাদন দিয়া দেশের শক্তিকে বৃদ্ধি করা একেবারেই সম্ভব হইবে না; দেশের স্বাধীনতাও ক্ষুণ্ণ হইবে। শুধু খাদ্যশস্যের রসদই কৃষি আমাদের দেয় না।

যন্ত্রশিল্পের উন্নতি ও প্রসারের জন্যও কৃষিশিল্পের একান্ত প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক জগতের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য এবং যন্ত্রশিল্পের কাঁচামাল সংগ্রহ করিবার জন্য কৃষিজাত দ্রব্যের প্রয়োজন।

প্রাচীন ভারতের এই কৃষিই ছিল তাহার প্রাণ। এই কৃষিকে অবলম্বন করিয়াই ভারত এক সময়ে সভ্যতা, সংস্কৃতি, দর্শন ও বিজ্ঞানে জগতের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। বর্তমান ভারত আন্তর্জাতিক যোগাযোগের জন্য এই কৃষিকেই আশ্রয় করিয়াছে। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভারতের উন্নতির জন্য যে কোনও দিক দিয়াই আমরা অগ্রসর হই না কেন, এই কৃষিকে আশ্রয় করিয়াই আমাদের চলিতে হইবে। তাই ভারতের কৃষির উন্নতিরই অবশ্য প্রয়োজন। কৃষিশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া এবং জমির উন্নতির দিকে সর্বপ্রযত্ন দৃষ্টি রাখিয়া সরকার ও জনসাধারণ সকলকেই কৃষিশিল্পের ক্ষেত্রে নামিয়া আসিতে হইবে। আমাদের সকলের যুক্ত চেষ্টায় ভারতের লুপ্ত গৌরব কৃষির উন্নতি অবশ্যই হইবে, এবং অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য ও কৃষকজীবনের স্বচ্ছলতার ভিতর দিয়া ভারত তাহার হৃতশ্রী যে নিশ্চয়ই ফিরিয়া পাইবে তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

ভারতের কুটিরশিল্প

॥ অতীতে শিল্পের সমৃদ্ধি ॥ ইংরেজ আমলে সংকটের আবির্ভাব ॥
যন্ত্রশিল্পের প্রবর্তন ॥ সমস্যা : শিল্পে অবনতি ও বেকারসংখ্যা বৃদ্ধি ॥
বর্তমান সমাধান ॥ ভবিষ্যতে শিল্পের স্থান ॥

ভারতের প্রাচীন সভ্যতার বিকাশ তাহার ঘরের শিল্পের ভিতর দিয়া। উত্তরের উত্তুঙ্গ হিমগিরি আর দক্ষিণের মহাসাগরকে অতিক্রম করিয়া বাহিরের কোনও সভ্যতা আর সংস্কৃতি যখন ভারতের বুকে আসিয়া পৌছায় নাই, তখন আপন ঘরের শিল্প দিয়াই ভারতবাসীকে সে বস্ত্র দিয়াছে, আহারের সংস্থান করিয়াছে, তাহার সংসার বাঁধার অনাড়ম্বর সামগ্রী সবই সে যোগান দিয়াছে। তাঁতীরা কাপড়ের যোগান দিয়া মৃৎশিল্পীর নিকট হইতে লইয়া আসিত তাহার প্রয়োজনের তৈজসপত্র, কৃষকেরা আপন ক্ষেতের ধান আর শস্য দিয়া আনিত তাহাদের পরিধানের বস্ত্র। ভারতবাসী কোনদিনও তাহার প্রয়োজনের জিনিসের অভাব বোধ করে নাই। কিন্তু মানুষের মন শুধু প্রয়োজনের মধ্যেই তৃপ্তি পায় না—প্রয়োজনের পরেও অপ্রয়োজনের আনন্দের আকাঙ্ক্ষা তাহার মনে

জাগে। এই আনন্দের আবেগেই কামার, কুমারের মনে দেখা দিয়াছে শিল্পের স্বপ্ন, তাঁতীর তাঁতের মাঝে ফুটিয়া উঠিয়াছে রং-বেরঙের সৌন্দর্য, তাহার কাপড়ের পাড়ের বুনোটে ধরা পড়িয়াছে কত কৌশল, সীমন্তিনীদের হাতের শাঁখায় দেখা গেল লতা, পাতা আর ফুলের সমাবেশ। এমনি করিয়াই শিল্পের মধ্যে আসিয়া রসের যোগান দিল ললিতকলার সৌন্দর্যবোধ। অপ্রয়োজনের আনন্দে ভারতের কুটিরশিল্প সভ্যতার এক নতুন দিক উন্মুক্ত করিয়া দিল।

তখন ভারতবর্ষে এত শহর নগরের আবির্ভাব হয় নাই। গ্রামে গ্রামে গাঁথা ছিল সমস্ত ভারত। সেই গ্রামের কুটিরে কুটিরে বংশানুক্রমে শিল্পের সাধনা করিয়া ভারতবাসী যে দক্ষতা অর্জন করিল, শিল্পের মধ্যে যে সূক্ষ্ম নৈপুণ্যের প্রকাশ পাইল, তাহার খ্যাতি ভারত শুধু তাহার বুকের মধ্যে আর ধরিয়া রাখিতে পারিল না—তাহার সাধনার সিদ্ধি দেশে বিদেশে ছড়াইয়া পড়িল। ঢাকার সূক্ষ্ম মসলিন জগতের শুধু বিস্ময় জাগাইল না—হইল ঈর্ষার বস্তু। তাহার অপূর্বত্ব, সৌন্দর্যই তাহার সর্বনাশ ডাকিয়া আনিল। পূর্ববঙ্গের শ্রীহট্টের মসৃণ চিক্কণ শীতলপাটি এই যন্ত্রের যুগেও জগতের বিস্ময় উদ্রেক করে। হাল-ফ্যাসনের আসবাব পত্রও তাহার বেতশিল্পের কাছে পরাজয় স্বীকার করে। সৌন্দর্যবোধ যাহাদের আছে মোরাদাবাদ আর জয়পুরের বাসন তাহাদেরই ঘরের শোভা বর্ধন করে। সৌখিন গৃহিণীদের আদরের জিনিস ছিল বহরমপুর আর ইসলামপুরের কাঁসার বাসন। ত্রিবাঙ্কুরের হস্তিদন্তশিল্পে আর আগ্রার শ্বেত-পাথরের কারুকার্যের মধ্যে যে দক্ষতা প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহার তুলনাও জগতে বিরল। রেশম শিল্প ভারতের প্রখ্যাত শিল্প। মুর্শিদাবাদ আর বারানসী, মহীশূর ও মাদুরার রেশমী বস্ত্র ভারতের শিল্প-সাধনার সিদ্ধি, জগতের গৌরব। কাশ্মীরের শীতবস্ত্র শুধু আমাদের শীতই নিবারণ করে না, আমাদের শিল্পকলা-বোধের তৃপ্তিসাধন করে। পূর্ব হইতে পশ্চিম, উত্তর হইতে দক্ষিণ—সমস্ত ভারতই আপন শিল্প-সাধনার অপূর্ব দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছে। নৈপুণ্য ও লালিত্যে, সৌন্দর্য ও স্থায়িত্বে ভারতের শিল্প ছিল অতুলনীয়।

এই শিল্পের জগতে ভারতের নারীর অবদানও অগ্রাহ্য করা যায় না। গৃহস্থালীর সমস্ত কাজকর্মের পরে জীর্ণ ছিন্ন কাপড় দিয়া তাহারা যে কাঁথা তৈয়ারি করিতেন, পাড়ের সূতা দিয়া যে জালের শিকা বুনিতেন, গৃহকর্মের প্রয়োজন মিটাইয়াও তাঁহারা আপন কারুকার্যে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেন। আসাম ও ত্রিপুরার তাঁত এখনও মেয়েদের হাতেই চালু আছে। জয়পুর আর আজমীরের গ্রন্থিবন্ধনের শাড়ী নারীর অঙ্গুলি সঞ্চালনের নৈপুণ্যেরই পরিচয় বহন করে।

কিন্তু সেই ভারত কই? ভারতের সেই শিল্পসাধনার গৌরব আজ কোথায়? ভারতের সমৃদ্ধির দিকে যখন বিদেশীর দৃষ্টি পড়িল, তখন দলে দলে বণিকের দল আসিয়া ভীড় করিয়া দাঁড়াইল ভারতের বন্দরে বন্দরে। ওলন্দাজ আসিল, পর্তুগীজ আসিল—ইংরেজ বণিকরা তাহাদের দেশের দ্রব্যসম্ভারের উপহার লইয়া ভারতের দ্বারে হাত পাতিয়া দাঁড়াইল। নিজের ধনকে অবজ্ঞা করিয়া ভারতবাসী বিদেশী দ্রব্যের মোহে আকৃষ্ট হইল। বণিক ইংরেজ ভারতের শাসনভারই শুধু গ্রহণ করিল না—যন্ত্রশিল্পের পত্তন করিয়া ভারতে তাহার বাণিজ্যের দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করিল। ভারতের শিল্প-সাধনার সর্বনাশ শুরু হইল।

কলের জিনিসের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় কুটিরশিল্প দাঁড়াইতে পারিল না, পারা সম্ভবও নয়। অল্প সময়ে অধিক দ্রব্য সরবরাহ করার সামর্থ্য সে রাখে—দাম তাই পড়ে কুটিরশিল্পের তুলনায় অনেক কম। মানুষের আকর্ষণ সেইখানেই। বিদেশীর যন্ত্র ও যন্ত্রশিল্পেরই জয় হইল—তাঁতীর হাতে মাকুর তড়িৎগতি শ্লথ হইয়া আসিল, কাঁসারীর হাতের ঠকঠক শব্দে পাড়ার হাওয়া তেমন করিয়া আর মুখর হইল না; ঘরে ঘরে দেখা দিল কর্মহীন, বেকার জীবন—সমৃদ্ধ ভারতের, গৌরবের ভারতের অবসান হইল।

কুটিরশিল্পের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতে দেখা দিল দুইটি সমস্যা—একটি তাহার শিল্পকলার অবলুপ্তি, আর অন্যটি বেকার সমস্যা। তাঁত প্রায় বন্ধ হইল—তাঁতীদের জীবিকার্জনের আর পথ রহিল না; জাপানের সস্তা সুন্দর পুতুল আর খেলনাকে দেখিয়া কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল ছেলেমেয়েদের হাতে হাতে ঘুরিয়া বেড়াইবার আর দাবি রাখিল না, কারিগরের জীবনসংস্থান অচল হইয়া উঠিল; চিনামাটি আর বিলাতী বাসনের পাশে দেশের বাসনশিল্প আর তেমন আদর পাইল না। বেকার জীবন দেশে একটা মস্ত বড় সমস্যা হইয়া দেখা দিল। বেকার সমস্যার ফলে আর্থনীতিক দুর্দশা ভারতের কৃষকজীবনকেও সুস্থ থাকিতে দিল না। শহরের কারখানার বাঁশী বেকারজীবনকে ডাক দিল। শহরের ভীড় বাড়িল। গ্রামের লোক একে একে গ্রাম ছাড়িল; ক্ষেতের মাঝে লাঙলের চাষ আর তেমন করিয়া জমিয়া উঠিল না; পল্লী হতশ্রী হইল। প্রাচীন ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র, শিল্প ও সৌন্দর্যের জন্মভূমি এই গ্রাম চিরদিনের জন্য অন্তরালে ঢাকা পড়িল।

বর্তমান ভারতের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা মিটাইবার জন্য যন্ত্রের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করার আর কোনও উপায় নাই। এই অগণিত জনসংখ্যার জীবনযাত্রার মালমসলা যোগাইবার সামর্থ্য যন্ত্রের হাতেই আছে,

মানুষের হাতে নাই, একথা সত্য। কিন্তু মানুষের হাতের শিল্পকেও জীবন হইতে বাদ দিলে ত চলিবে না। শুধু প্রয়োজনের জিনিসে মানুষ বাঁচে, মানুষের জীবন বাঁচে না। মানুষের যে জীবনে সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষা আছে, ললিতকলা যে জীবনে ক্ষুধার তৃপ্তিসাধন করে, কুটিরশিল্পের প্রয়োজন ও সার্থকতা সেখানে অবশ্যই আছে। রসের জীবনই মানুষের জীবন। এই জীবনটাকে বাঁচাইয়া রাখার জন্যই কুটিরশিল্পের প্রয়োজন সমধিক। যন্ত্রশিল্পের আওতায় পড়িয়া কুটিরশিল্প যে একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে তাহা নয়। স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে ও প্রতিভার গুণে আজও সে বাঁচিয়া আছে। কিন্তু শুধু বাঁচা নয়, গৌরবের সঙ্গেই তাহাকে বাঁচিতে হইবে—তার লুপ্ত-প্রখ্যাতিকে আবার জাগাইয়া তুলিতে হইবে।

সৌখিন যাহারা, শিল্পবোধ যাহাদের ভিতরে আছে কুটিরশিল্পের আদর এখনও তাহারা করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। এই শিল্পবোধই দেশের জনগণমনের মধ্যে জাগাইয়া দিতে হইবে। তাহা হইলেই এই শিল্পের চাহিদা বাড়িবে—ঘরে ঘরে আবার হস্তশিল্পের সাধনা জাগিয়া উঠিবে। আবার শুধু শিল্পবোধ জাগিলেই লোকে সাধনার পথে অগ্রসর হইতে পারিবে না। এই শিল্পসাধনার জন্য চাই উপযুক্ত কাঁচামাল, চাই অর্থ। দেশের শিল্পসৃষ্টিকে তাই আবার নূতন করিয়া জাগাইয়া তুলিতে হইলে রাজকোষের সাহায্যের দরকার। আজকাল অবশ্য রাজ্য সরকার দেশীয় শিল্পদ্রব্যের প্রসারের জন্য যায়গায় যায়গায় দোকান খুলিয়া ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু এই ব্যবস্থাও ঠিক উপযুক্ত বলিয়া মনে হয় না। কাজের উৎকর্ষ সাধনের জন্য শিল্পীদের অর্থ ও উৎসাহ দুই-ই তাহাদের দিতে হইবে; উপযুক্ত শিক্ষা ও শিক্ষাকেন্দ্রেরও ব্যবস্থার অবশ্য প্রয়োজন। জনগণের চাহিদা যদি আবার দেখা দেয়, শিল্পীরা যদি শিক্ষা আর উৎসাহ পায়, তবে ভারতশিল্পের লুপ্ত সমৃদ্ধি আবার নিশ্চয়ই জাগিয়া উঠিবে—বেকারজীবনের দুর্ভোগ হইতেও মানুষ অব্যাহতি লাভ করিবে।

আজকাল যন্ত্রের যুগ। ভারতের বহুস্থানে আজকাল নানারকম 'প্রজেক্ট' ও 'দামে'র প্রতিষ্ঠা হইতেছে। শিল্পের উন্নতি ও বেকার সমস্যার সমাধান দুই-ই এই সব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য। শিল্পের উন্নতি হয়ত হইবে। বেকার সমস্যারও একটা আংশিক সমাধানও হয়ত হইতে পারে—কিন্তু সম্পূর্ণ সমাধান ইহাতে হইতে পারে না। কুটিরশিল্পের পুনর্জাগরণ না হইলে দেশের অন্ন সমস্যা, বস্ত্র সমস্যার সমাধান হইবে না—বেকার জীবনের দুর্ভোগ শেষ হইবে না। গ্রামের কুটিরশিল্প, গ্রামের লক্ষ্মীই; লুপ্ত ভারতশ্রীকে আবার ফিরাইয়া আনিবে, ভারতের বহু সমস্যার মীমাংসা করিয়া দিবে—শুধু যন্ত্রশিল্পে ভারতের সমস্যার সমাধান হইবে না, হইতে পারে না।

স্বাধীন ভারতে শিল্পোন্নয়ন

॥ শিল্পোন্নতির অর্থ কি ॥ প্রয়োজনীয়তা ॥ সমস্যা ও সমাধানের পথ ॥ বর্তমান অবস্থা ॥ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ॥ ভবিষ্যৎ ॥

অতীতে এমন একটা সময় ছিল, যখন ভারতের জীবনদর্শন মানুষকে তাহার বৈষয়িক লাভক্ষতিকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া পারমার্থিক উন্নতিকেই শ্রেয়ঃ ও প্রেয় বলিয়া শিক্ষা দিত। সেদিন শ্রেষ্ঠীর অট্টালিকা ও সম্রাটের প্রাসাদ অপেক্ষা ঋষির পর্ণকুটিরের মূল্য অনেক বেশী ছিল। সেদিনের উন্নতির মাপকাঠি ছিল বৈভব নহে, বিদ্যা, পরাবিদ্যা। আত্মিক উন্নতিই ছিল শ্রেষ্ঠ, মোক্ষই ছিল লক্ষ্য। সেদিনের কথা আজ কাহিনী। আজিকার পৃথিবী তাহার পর আরও অনেক দূর অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে। আজিকার দিনের মানুষের জীবনদর্শন তাহার আত্মিক বিকাশকে অবহেলা না করিয়াও বৈষয়িক উন্নতিকে গুরুত্ব দেয়। ঐহিক মঙ্গলকে আত্মিক মঙ্গলের সোপান মনে করে। মনে করে—"খালিপেটে ভগবান উপাসনা অসম্ভব"। তাই মধ্যযুগের অবসানের পর পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত শুরু হইয়াছে বৈষয়িক উন্নতির প্রচেষ্টা। ভারতে ইংরেজ এই বার্তাই বহন করিয়া আনিয়াছিল। উনবিংশ শতকে তাই এই পথে আমরা ভারতের কুণ্ঠিত পদক্ষেপের সূচনা লক্ষ্য করি। বৈষয়িক উন্নতির চাবিকাঠি হইল শিল্প, যন্ত্রের সহায়তায় মানুষের উৎপাদন ক্ষমতার বিকাশ। এই শিল্প শুধু কুটিরশিল্প নয়, নিজ গৃহে বসিয়া সামান্য কয়েকটি যন্ত্রযোগে অল্প পরিমাণ সামগ্রী প্রস্তুত শুধু নয়। আধুনিক মানবের পরিভাষায় শিল্প বলিতে বুঝায় শক্তি-চালিত যন্ত্রের দ্বারা বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থা। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যার সাহায্যে প্রাকৃতিক শক্তি করায়ত্ত করিয়া যন্ত্রের দ্বারা প্রভূত পরিমাণে সম্পদ উৎপন্ন করিয়া সমস্ত অভাব মিটাইবার এই প্রচেষ্টাই আধুনিক শিল্পপ্রধান সভ্যতার বৈশিষ্ট্য—বৈষয়িক উন্নতির পথ। বর্তমান সভ্যতার মূলমন্ত্র "সর্বাধিক মানবের সর্বাধিক মঙ্গল"। ইহার জন্য চাই আপামর জনসাধারণের জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম নহে, কাম্যতম পরিমাণ আহার, আশ্রয়, পরিধেয় ও শিক্ষার ব্যবস্থা। ইহার জন্য চাই জাতির উৎপাদন ক্ষমতার বিকাশ, জাতীয় আয়ের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি। বৃহদায়তন শিল্প সংগঠন—জাতীয় শিল্পায়ন এই কারণেই অপরিহার্য। ভারতের কোটি কোটি নিরন্ন, দীন, দরিদ্র অধিবাসীকে বুভুক্ষার অজ্ঞতার, দারিদ্র্যের অতলগহ্বর হইতে প্রাচুর্যের শিখরে উত্তোলনের জন্য তাই প্রয়োজন আধুনিক শিল্প-ব্যবস্থার প্রসারের। এই অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ছাড়া রাজনৈতিক মুক্তি হইবে অর্থহীন।

অর্থশাস্ত্রবিদদের ভাষায় ভারত 'অনুন্নত' দেশগুলির অন্যতম। তাঁহাদের মতে অনুন্নত দেশ বলিতে সেই দেশগুলিকেই বুঝায় যাঁহাদের জাতীয় আয় ও জীবন-যাত্রার মান অত্যন্ত নিম্ন পর্যায়ের। ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক মুদ্রা ও আর্থিক সমস্যাবলী সম্পর্কে জাতীয় পরামর্শদাতা পরিষদের এক বিবরণীতে ১৯৩৯ সালের পৃথিবীর শতকরা ৮৫ ভাগ জনসংখ্যা সংবলিত ৫৩টি জাতির মাথাপিছু জাতীয় আয়ের উপর ভিত্তি করিয়া তিনটি শ্রেণী বিভাগ করা হয়। প্রথম শ্রেণীতে আছে মাথাপিছু ২ শত ডলার বা ১০০০ টাকা আয়ের ঊর্ধ্বের দেশগুলি, যথা—আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী, ইংলণ্ড, ফ্রান্স ইত্যাদি। দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে মাথাপিছু ২ শত ডলার বা ১০০০ টাকা পর্যন্ত আয়ের দেশগুলি, যেমন—ফিনল্যাণ্ড, অস্ট্রিয়া, ইটালী ইত্যাদি। তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িয়াছে ১০০ শত ডলার বা ৫০০ টাকা পর্যন্ত আয়ের দেশগুলি, যেমন—ভারত, চীন, ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্রগুলি। এই তৃতীয় শ্রেণীর রাষ্ট্রগুলিই বিশ্বের 'অনুন্নত' এলাকা। ইহাদের স্বল্পজাতীয় আয়ের কারণ হইল, ইহাদের উৎপাদন ক্ষমতা স্বল্প। স্বল্প উৎপাদন ক্ষমতার মূল কারণ হইল পুঁজিদ্রব্যের স্বল্পতার দরুন ইহাদের নিজস্ব সম্পদগুলির যথাযথ ব্যবহার করার অক্ষমতা। এই সকল দেশগুলিতে উৎপাদন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত মাথাপিছু পুঁজিদ্রব্যের অর্থাৎ যন্ত্রপাতির পরিমাণ অতি অল্প, কারণ, পুঁজিগঠন নির্ভর করে সঞ্চয়ের উপর আর সঞ্চয় নির্ভর করে আয়ের উপর। আয় অল্প বলিয়া, দরিদ্র বলিয়া ইহাদের সঞ্চয় ও পুঁজি কম, আর পুঁজি কম বলিয়া ইহাদের উৎপাদন এবং আয়ও কম। সুতরাং দারিদ্র্যের পাপচক্রই ইহাদের মূল ব্যাধি। আর ইহার সমাধান হইল পুঁজিগঠন, শিল্পায়ন।

এতদিন ভারতের শিল্পোন্নতির, পুঁজিগঠনের বাধা ছিল তিনটি। প্রথমত, রাজনৈতিক বাধা—বিদেশী শাসকের শিল্পবিরোধী নীতি। দ্বিতীয়ত, সামাজিক বাধা—জাতিভেদ ও একান্নবর্তী পরিবার প্রথার দরুন ভারতে শ্রমের সচলতার অভাব; এবং ক্রমবর্ধমান লোকসংখ্যা—ইহাই বর্তমানে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ সমস্যা। তৃতীয়ত, অর্থনৈতিক বাধা—অতিরিক্ত জনসংখ্যার শ্রমের তুলনায় জমি, পুঁজি ও উদ্যোগের অভাব। স্বাধীনতা লাভের ফলে রাজনৈতিক বাধা অপসারিত হইয়াছে। অর্থনৈতিক পরিবর্তনের দরুন একান্নবর্তী পরিবার ধ্বংস প্রায়। আর জাতিভেদ প্রথা আজ আইনত নিষিদ্ধ। সুতরাং, শিল্পায়নের সুযোগ বৃদ্ধি পাইয়াছে সন্দেহ নাই। বর্তমানে ইহার সাফল্য নির্ভর করে কতটা পরিমাণে বাকি বাধাগুলি দূর করা যাইবে তাহার উপর।

অতীতে, পশ্চিমের বিভিন্ন দেশগুলিতে ব্যক্তিগত সঞ্চয় ও ব্যক্তিগত উদ্যমের উপর নির্ভর করিয়া ব্যক্তিগত মালিকানার অধীনে শিল্পায়ন ঘটিয়াছে। কিন্তু এ ব্যাপার বহু সময় সাপেক্ষ এবং ইহার ফলে যে শ্রেণী-বৈষম্যমূলক সমাজ সৃষ্ট হয় তাহাও আমাদের অনভিপ্রেত। ভারতের সমস্যা হইল অতিদ্রুত শিল্পায়ন। ইংলণ্ড, আমেরিকা ২০০ শত, বা ১০০ শত বৎসরে যে পথ অতিক্রম করিয়াছে, ভারতকে তাহা ২৫ বৎসরে অতিক্রম করিতে হইবে, যাহা বর্তমান যুগে সম্ভব। সুতরাং আমাদের পদ্ধতি স্বতঃই পৃথক।

প্রথমেই, শিল্পায়নের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করিতে হইবে। অবশ্য প্রয়োজনীয় সাধারণ ও কারিগরী শিক্ষার বিস্তারের দ্বারা শিল্পোন্নতির গুরুত্ব বুঝাইতে হইবে, পুরাতন সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী বর্জন করিয়া নূতন প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন এবং জাতীয় অগ্রগতির কার্যে সর্বস্ব পণ করিতে প্রস্তুত এমন জাতীয় মনোভাব সৃষ্টি করিতে হইবে।

দ্বিতীয়ত, কৃষিব্যবস্থার পুনর্গঠন। ইহার উদ্দেশ্য হইবে একদিকে খাদ্যাভাব দূর করা ও সম্প্রসারণশীল শিল্পের জন্য ক্রমবর্ধমান পরিমাণে কাঁচামালের উৎপাদনের ব্যবস্থা করা এবং অপরদিকে কৃষকের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া বর্ধিত শিল্পোৎ-পাদনের জন্য আভ্যন্তরীণ বাজার সৃষ্টি করা। উন্নতিশীল কৃষিব্যবস্থাই একমাত্র শিল্পোন্নতির ভিত্তি দৃঢ় করিতে পারে।

তৃতীয়ত, সেচব্যবস্থা ও শক্তি উৎপাদন, যোগাযোগ ও পরিবহণ এবং জনস্বাস্থ্যের উন্নতিমূলক ব্যবস্থা অর্থাৎ এক কথায় 'সামাজিক মূলধন' বা 'Social Capital' সৃষ্টি করা।

ইহাদের প্রত্যেকটিই একমাত্র সরকারী উদ্যোগ ও প্রচেষ্টাতেই সুসম্পন্ন হইতে পারে। এইজন্য ভারতের শিল্পোন্নতির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকেই নেতৃত্ব দিতে হইবে। অনুন্নত দেশগুলিতে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকা এই জন্যই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।

শিল্পোন্নতির এই সোপান ও ভিত্তিগুলি প্রতিষ্ঠার পর প্রধান আরব্ধ কার্য হইবে ভারি ও মূল শিল্পগুলি—যেমন, লৌহ, ইস্পাত, ভারি রসায়ন, ভারি যন্ত্রপাতি নির্মাণ প্রভৃতি শিল্প ও উহাদের আনুষঙ্গিক শিল্পসংস্থার প্রতিষ্ঠা। এগুলি একে অপরের কাঁচামাল যোগাইবে ও একে অন্যের উৎপন্ন ব্যবহার করিয়া উত্তরোত্তর সম্প্রসারিত হইবে। মূল ও ভারি শিল্পই হইল শিল্পোন্নতির চাবিকাঠি। একমাত্র ইহার দ্বারাই একটি দেশ তাহার যাবতীয় অন্যান্য শিল্প সম্প্রসারণের পথ উন্মুক্ত করিতে পারে, ব্যাপক শিল্পোন্নতির সূচনা ও শিল্পায়নের অগ্রগতি অব্যাহত

রাখিতে পারে। মূল ও ভারি শিল্পের প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করিয়া যে শিল্পায়ন আরম্ভ হইবে তাহার সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখিবার জন্য ভোগ্যপণ্য শিল্প, ছোট ও মাঝারি কুটিরশিল্পের সম্প্রসারণের জন্যও ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। বিশেষ করিয়া মূল শিল্পে প্রচুর পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করিতে হয় বলিয়া ও উহাতে উৎপাদন আরম্ভ হইতে বিলম্ব হয় বলিয়া এবং কর্মসংস্থানের আশু সুযোগও কম থাকে বলিয়া একটা অসুবিধার সৃষ্টি হয়। তাই ছোট ছোট কুটির-শিল্পে অল্প বিনিয়োগে অধিক কর্মসংস্থান এবং শীঘ্র ভোগ্যপণ্য উৎপাদন ঘটে বলিয়া, শিল্পায়নকালে ভোগ্যপণ্যের অভাব দূর, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা ও মূল্যস্তর বৃদ্ধি বন্ধ করিবার জন্য উহাদের সম্প্রসারণের ব্যবস্থা প্রয়োজনীয় হইতে পারে।

শিল্পায়নের পর্যায়গুলিকে কৃষি পুনর্গঠনের কার্যক্রমের সঙ্গে এমনভাবে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ করিতে হইবে যেন কৃষিসংস্কারের ফলে যে সকল কৃষক জমিচ্যুত ও অতিরিক্ত হইয়া পড়িবে, তাহারা সঙ্গে সঙ্গে শিল্পে নিযুক্ত হইতে পারে। ফলে ভূমির উপর অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপ ও বেকার সমস্যা হ্রাস পাইবে।

সর্বোপরি এই সমগ্র বিষয়টিকে কার্যে রূপায়িত করিবার জন্য চাই একটি সুচিন্তিত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা—যাহার উদ্দেশ্য শুধু গতি নির্দেশই নয়, যাহাতে থাকিবে ক্রমবর্ধমান পরিমাণে এই শিল্পায়নের জন্য সরকারী বিনিয়োগের ব্যবস্থা। কারণ এক যোগে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্রুত বিনিয়োগ ছাড়া অনুন্নত দেশের দারিদ্র্যের পাপচক্র ভেদ করা যায় না। আর ইহাতে সরকারী বিনিয়োগই একমাত্র পথ।

সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও উহার শিল্পায়ন—এই পথ সম্পর্কে ভারতের জাতীয় নেতৃত্বের দৃষ্টি বহুদিন পূর্বেই আকৃষ্ট হইয়াছিল। ১৯৩৮ খৃঃ নেতাজী সুভাষচন্দ্রের উদ্যোগে জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে কংগ্রেস একটি জাতীয় পরিকল্পনা সমিতি নিয়োগ করিয়াছিল। স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকার একটি পরিকল্পনা কমিশন স্থাপন করেন ও অর্থনৈতিক উন্নতি ও শিল্পোন্নয়নের সুচিন্তিত পরিকল্পনা রচনার দায়িত্ব ইহার উপর অর্পণ করেন। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে যে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা চালু হয় তাহাতে ভবিষ্যৎ শিল্পোন্নতির ভিত্তি স্থাপনের জন্য যোগাযোগ ও পরিবহণ এবং কৃষিব্যবস্থার উন্নতির জন্য প্রধানত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। প্রথম পরিকল্পনায় কৃষির উন্নতির জন্য ৩৫৪ কোটি টাকা ব্যয় হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কৃষি ও সমাজোন্নয়নের জন্য ৫৬৮ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ভারি ও মূল শিল্পকে কেন্দ্র করিয়া ব্যাপক ও দ্রুত শিল্পোন্নতির প্রচেষ্টাকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হইয়াছে। ইহার জন্য ৬৯০

কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। ইহার সঙ্গে বরাদ্দ করা হইয়াছে আরও ২০০ কোটি টাকা ছোট যন্ত্রশিল্প ও কুটিরশিল্পের সম্প্রসারণের জন্য। উদ্দেশ্য, শিল্পোন্নয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে ইহাদের দ্বারা ভোগ্যপণ্য উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করিয়া মুদ্রাস্ফীতির চাপ ও বেকার সমস্যার তীব্রতা হ্রাস করা।

ভারতের দীর্ঘ অবরুদ্ধ নিস্তর, নিথর, স্থাণু অর্থনৈতিক জীবনে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা হাজার বৎসরের জড়তা কাটাইয়া যে বেগ সঞ্চারে সক্ষম হইয়াছে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তাহাকে গভীরতা, ব্যাপকতা ও তীব্রতা প্রদান করিয়াছে। বিহারের ঊষর মৃত্তিকায়, পঞ্জাবের শৈলশিখরে, দাক্ষিণাত্যের বেলাভূমিতে, মধ্যপ্রদেশের গহন অরণ্যে নবপ্রতিষ্ঠিত কলকারখানায় প্রাচীন ভারত আজ নবজীবনের এক অপূর্ব যন্ত্রসঙ্গীত রচনায় ব্যস্ত।

স্বাধীন ভারতের অর্থনৈতিক পুনর্বাসন সমস্যা

।। অতীত সমৃদ্ধি ও মর্যাদা।। ইংরেজ আমলের সংকট।। স্বাধীনতার পরবর্তী সমস্যা—সমাধানের পথ।।

খুব বেশী দিনের কথা নহে, মাত্র দুই শতাব্দী পূর্বেও ভারতের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, ভারতীয় কারিগরের সুদক্ষ কারুশিল্প ভারতের শিল্পকলা এবং প্রাচুর্য সহজেই বিদেশীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। ইহাদের খ্যাতি ইওরোপের একাধিক রাজদরবারে অতি পরিচিত বিষয় হিসাবে আলোচনায় স্থান লাভ করিত। রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে ভারত তখন ঐক্যলাভ করে নাই বটে কিন্তু রাষ্ট্রনৈতিক বিভাগ তাহার সমৃদ্ধির পথ রুদ্ধ করে নাই। দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সুকর্ষিত মৃত্তিকা তাহার সন্তানকে অকৃপণ হস্তে সম্পদ ফিরাইয়া দিত। কৃষকের গোলায় সংবৎসর ধানের অভাব হইত না। অভাব ছিল না অন্যান্য প্রয়োজনীয় শস্যের। নিজের শস্যক্ষেত্রে খুশীমনে সারাদিন ভারতের কৃষক তাহার প্রাণঢালা পরিশ্রমের উপযুক্ত প্রতিদানে ছিল সমৃদ্ধ, সুখী। অভাব কাহাকে বলে তাহা সেদিনের কৃষকসমাজ বড় একটা অনুভব করে নাই। কৃষকের সমৃদ্ধি গ্রামীণ সমাজের অন্যান্য অংশকেও সমৃদ্ধ করিয়াছিল। একদিকে মাঠে মাঠে কৃষকের গানে যেমন আকাশ বাতাস মুখরিত হইত, তেমনি কুটিরে কুটিরে গ্রাম্য শিল্পীর হস্তস্পর্শে, চরকায়, তাঁতে, আরও হাজার রকমের ছোট বড় কুটিরশিল্পে মানুষের মেহনত রচনা করিত এক সুমধুর সঙ্গীত। এই সব গ্রামীণ শিল্পগুলিতে অংশত যেমন কৃষক ও কৃষকরমণীরা তাহাদের অবসর সময়ে আত্ম-

নিয়োগ করিত, তেমনি আবার গ্রাম্য জনসাধারণের একটি অংশ স্থায়িভাবে ইহার দ্বারাই জীবিকা নির্বাহ করিত। সমগ্র ভারতের হাজার হাজার গ্রাম এই শিল্পীদের ও তাহাদের যন্ত্রের গুঞ্জরণে মুখরিত হইয়া উঠিত। দেশ যেমন কৃষি-প্রধান ছিল, তেমনি শিল্পপ্রধানও ছিল। সেদিনের ভারতীয় শিল্প শুধু দেশবাসীর প্রয়োজনই নহে, দূরদূরান্তের বিদেশীদেরও নানান প্রয়োজনীয় এবং বিলাসসামগ্রীর চাহিদা মিটাইত। সেদিনের কর্মব্যস্ত, কর্মকোলাহল মুখরিত, সতত শ্রমশীল এক সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্যপূর্ণ ভারতবর্ষের জীবন্ত ছবি বহু বিদেশী পর্যটকের ভ্রমণ-কাহিনীতে অঙ্কিত আছে। ইংলণ্ডের মাঞ্চেস্টার বার্মিংহাম তখন জন্মায় নাই। দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সুবিস্তৃত অসংখ্য নদীনালাই ছিল সেদিনের যোগাযোগ ও পরিবহণের রাজপথ। নানান আকারের ও আয়তনের বহুবিচিত্র জলযানে সাহসী ও অভিজ্ঞ নাবিকদের উপর নিশ্চিন্তে নির্ভর করিয়া যাত্রীরা পণ্যসম্ভারসহ যাতায়াত করিত। এমন কি বিভিন্ন বন্দরে সমুদ্রোপযোগী বহু বৃহৎ জলযানও কুশলী ভারতীয় কারিগরগণ সহজেই নির্মাণ করিত। ঐ সকল ভারতীয় তরী ভারতীয় নাবিকগণের দ্বারা পরিচালিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে বিচরণ করিত। এমনি একটি সুখী সমৃদ্ধশালী দেশে দুইশত বৎসর পূর্বে ইংরেজ সাম্রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল।

ভারতে ইংরেজ শাসনের ইতিহাস শুধু কলঙ্কময় নয়, পরন্তু পরমবেদনাময় এক জাতীয় ক্রমাবনতির, ক্রমবর্ধমান দুর্দশার, সামগ্রিক জাতীয় জীবনের অভিশাপ ও ধ্বংসের ইতিহাস। ক্ষমতা করায়ত্ত করিবার পর নিজেদের প্রসাদপুষ্ট এক ভূস্বামীশ্রেণী সৃষ্টি করিতে গিয়া কৃষকস্বার্থকে বলি দেওয়া হইল। নূতন ভূমি-ব্যবস্থায় ভারতের কৃষক, আবহমানকাল হইতে প্রচলিত তাহার ভূমিস্বত্ব হইতে চিরতরে বঞ্চিত হইল। কৃষকের সর্বনাশের, কৃষির অবনতির সূচনা হইল। দেখা দিল ভূমিহীন ক্ষেতমজুর নামে জমিচ্যুত এক নতুন শ্রেণীর কৃষক। ইহার কারণ রাজকোষ পূর্ণ করিবার তাড়নায় কৃষকের উপর আরোপিত করের গুরুভার। অপর দিকে নূতন ভূস্বামীবর্গ গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া শহরের বিলাস-ব্যসনে নিমজ্জিত হইল। বিদেশী সরকার ও জমিদারদের অবহেলায় পুরাতন সেচ-ব্যবস্থাগুলি ধীরে ধীরে বিনষ্ট হইয়া গেল। কৃষির ফলন হ্রাস পাইতে শুরু করিল। ইংলণ্ডের নবীন শিল্পগুলির প্রয়োজনীয় কাঁচামাল যোগান দিবার জন্য সরকার হইতে কাঁচামাল উৎপাদনের জন্য নানাভাবে কৃষকের উপর চাপ সৃষ্টি শুরু হইল। কৃষির বৈচিত্র্য বিনষ্ট হইল। কৃষির উৎপাদন একমুখী হইয়া ইংলণ্ডের শিল্পগুলির চাহিদার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল হইয়া পড়িল।

কৃষকের সমৃদ্ধি দূর হইয়া তাহার দারিদ্র্য, অভাব, অনটন, হাহাকার হইল নিত্যনৈমিত্তিক। অপরদিকে রেলপথ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার বিস্তারে অবাধে ইংলণ্ডের শিল্পজাত সস্তা পণ্য ভারতের বাজার হইতে দেশীয় পণ্যসম্ভারকে বিতাড়িত করিল। পুরাতন দেশীয় রাজন্যবর্গ ও পৃষ্ঠপোষক প্রাচীন অভিজাত শ্রেণীর অন্তর্ধানে, নূতন বিদেশী পণ্যের প্রতিযোগিতায় ও নব্য শিক্ষিত শ্রেণীর যাহা কিছু দেশী তাহার প্রতি বিমুখতায় প্রাচীন গ্রামীণ কুটিরশিল্প ও শিল্পীরা উৎসন্ন হইল। গ্রাম্য অর্থনৈতিক জীবন তাহার চিরন্তন পথ হইতে, কর্মধারা হইতে বিচ্যুত হইল, উৎসাদিত হইল। কৃষক হারাইল জমি, শিল্পী হারাইল তাহার জীবিকা। গ্রামভারত ইংরেজশাসনের কৃপায় পরিণত হইল 'উদ্বাস্তু'তে। প্রাচীনকাল হইতে গ্রাম্য টোলে যে শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তাহাও পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে হইল বিনষ্ট। শহরে, নগরে ইংরেজ প্রভুদের সেবার জন্য কেরানী সৃষ্টির শিক্ষালয় স্থাপিত হইল। প্রাচীন, দেশোপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংস হইল কিন্তু নূতন উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা গড়িয়া উঠিল না। অর্থনৈতিক ভিত্তি ও শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবার সঙ্গে সাংস্কৃতিক জীবনেও বিকৃতির অভিশাপ নামিয়া আসিল। সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীতে সারা ভারত জুড়িয়া আমরা দিকে দিকে শুধু ভাঙনের পরিচয়ই পাই। বিংশ শতকের ইংরেজ শাসনকালের ইতিহাস ইহার সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম কিছু নয়। গত শতকে ইংরেজ যেমন নিজ অর্থনৈতিক স্বার্থে কৃষিব্যবস্থাকে বিধ্বস্ত করিয়াছে, কুটিরশিল্পকে ধ্বংস করিয়াছে, তেমনি সেই একই স্বার্থের দ্বারা পরিচালিত হইয়া বিংশ শতকের চতুর্দশপাদ অবধি ভারতের শিল্পায়নে সে দিয়াছে বাধা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানের পর ইংরেজশক্তি যেদিন ভারত পরিত্যাগ করিল সেই মুহূর্ত হইতেই বিধ্বস্ত ভারতীয় অর্থনীতির পুনর্বাসন সমস্যা আমাদের জাতীয় জীবনের সর্বপ্রধান সমস্যায় পরিণত হইয়াছে। ভারতের কৃষি ও কৃষক, শিল্পী ও কুটিরশিল্প, শ্রমিক ও আধুনিক শিল্পব্যবস্থাকে, তাহার শিক্ষাব্যবস্থাকে, যথাযোগ্য স্থানে, সক্ষেত্রে পুনঃপ্রতিষ্ঠা ব্যতীত দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির আশা করা যায় না। সুতরাং আমাদের পুনর্বাসন সমস্যা শুধু পাকিস্তানাগত মানুষের পুনর্বাসনের সমস্যা মাত্র নহে। আমাদের সমস্যা হইল সামগ্রিক ভারতীয় অর্থনীতির পুনর্বাসন সমস্যা।

ইহার জন্য প্রথমেই চাই কৃষির ও কৃষকের পুনর্বাসন। এই উদ্দেশ্যে ভূমিব্যবস্থার আমূল সংস্কার দ্বারা কৃষকের হস্তে জমির প্রত্যর্পণ প্রয়োজন। আর প্রয়োজন কৃষির উৎপাদনের বৈচিত্র্যকরণের ও ফলনবৃদ্ধির। ইহার জন্য চাই

সেচের প্রসার, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তন ও উন্নতি। চাই কৃষিকার্যে আধুনিক বিজ্ঞানের ও যন্ত্রপাতির প্রয়োগ। আর চাই সমবায় প্রচেষ্টার ব্যাপক প্রচলন। চাই জমি হইতে প্রয়োজনাতিরিক্ত কৃষকের অপসারণ।

কৃষির পুনর্বাসনের পাশাপাশি চাই গ্রামীণ কুটিরশিল্পগুলির পুনরুজ্জীবন ও সম্প্রসারণ। অল্প পুঁজিতে এই সকল শিল্পে কৃষি হইতে অপসারিত কৃষকের কর্ম-সংস্থান ঘটিবে। আধুনিক পদ্ধতি ও যন্ত্রপাতির সাহায্যে, বৈদ্যুতিক শক্তির সহযোগিতায় কুটিরশিল্পের সম্প্রসারণ ও উৎপাদন ঘটিলে গ্রাম্য জীবনে ফিরিয়া আসিবে সমৃদ্ধি।

ইহার জন্য চাই সুলভে কৃষক ও গ্রাম্য শিল্পীদের জন্য পর্যাপ্ত ঋণ-প্রদান ব্যবস্থা। রাস্তাঘাট ও যোগাযোগ ব্যবস্থার আরও উন্নতি। চাই সাধারণ ও কারিগরী শিক্ষার বিস্তার।

কৃষির উন্নতিতে খাদ্য-ঘাটতি দূর হইবে, সম্প্রসারণশীল শিল্পগুলির কাঁচামালের যোগান বৃদ্ধি পাইবে। আর সমৃদ্ধিশালী কৃষক ও শিল্পীগোষ্ঠী শহরের যন্ত্রশিল্প-গুলির পণ্যের বাজার সুপ্রসারিত করিবে। এই অবস্থায় ছোট, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্পগুলির প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণ সহজ ও সম্ভব হইবে। ভারি ও মূল শিল্পের প্রতিষ্ঠা দেশে অনির্দিষ্টকালের জন্য শিল্পোন্নতিকে সুনিশ্চিত করিবে। পরে ভোগ্যপণ্য উৎপাদনকারী শিল্পগুলির উন্নতিতে সাহায্য করিবে। শিল্পের উন্নতির ক্ষেত্রে দৃষ্টি রাখিতে হইবে যেন, সকল প্রকার শিল্পের সম্প্রসারণের মধ্যে সুসঙ্গত ভারসাম্য বজায় থাকে। যেন শিল্পগুলি ক্রমেই মুষ্টিমেয় কয়েকটি শিল্পকেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত না হয়। তাহাতে বিভিন্ন অঞ্চলের শিল্পোন্নতিতে ভারসাম্য থাকিবে না। সুতরাং একই সঙ্গে চাই শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ। কুটিরশিল্পের উন্নতি ও শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ নীতির ফলে, দেশের অর্থনৈতিক ক্ষমতা মুষ্টিমেয়র মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া গরিষ্ঠসংখ্যক লোকের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িলে, ধন ও আয় বণ্টনে বর্তমান বৈষম্য হ্রাস পাইয়া দারিদ্র্য দূর হইবে। এইরূপে সমগ্র জাতীয় অর্থনৈতিক জীবন প্রকৃত পুনর্বাসন লাভ করিবে।

ভারতের পঞ্চবার্ষিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা এই উদ্দেশ্যের কথা মনে রাখিয়াই রচিত হইয়াছে এবং রূপায়িত হইতেছে।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা—উদ্দেশ্য ও ভবিষ্যৎ

॥ পরিকল্পনাহীন বিশৃঙ্খলা ॥ পরিকল্পনা কাহাকে বলে ॥ পরিকল্পনার প্রয়োজন, উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি ॥ অন্যদেশের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা ॥

ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় জমি, পুঁজি, কলকারখানা প্রভৃতি সম্পদ উৎপাদনের যাবতীয় উপায়গুলি ব্যক্তিগত মালিকানায় রহিয়াছে। এই সমাজে মুনাফা শিকারই উৎপাদকের, মিল-কলকারখানা-খনি মালিকদের একমাত্র উদ্দেশ্য। মানুষের সমাজের প্রয়োজন নহে, নিজেদের মুনাফার প্রয়োজনই মালিকের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া, যে সকল শিল্পে মুনাফা বেশী তাহাই দ্রুত প্রসারিত হয়, অন্যান্য সকল শিল্প অবহেলিত থাকে, ফলে দেশে বিভিন্ন প্রকার শিল্পের সুষম ও যথাযথ উন্নতি হয় না। দেশের শিল্পোন্নতি ভারসাম্য হারায়। অপরদিকে, মুনাফা বৃদ্ধির জন্য মালিকরা শ্রমিক ও কাঁচামালের যোগানদার কৃষকশ্রেণীকে ক্রমাগত শোষণ করিয়া তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিয়া উৎপাদন খরচ কমাইতে চেষ্টা করে। এইরূপে উৎপাদন বৃদ্ধি ও শিল্পের উন্নতি, সমাজের সকলের শ্রীবৃদ্ধি না ঘটাইয়া বহুকে বঞ্চিত করিয়া মুষ্টিমেয়র প্রাচুর্য বাড়ায়। আর ব্যক্তিগত সঞ্চয় ও উদ্যোগের উপর নির্ভর করে বলিয়া দেশের শিল্পোন্নতি অত্যন্ত ধীর গতিতে অগ্রসর হয়। মালিকশ্রেণীর ব্যক্তিগত স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য সামাজিক স্বার্থের অবহেলা, ভারসাম্যবিহীন অসম শিল্পোন্নতি, শোষণ ও অর্থনৈতিক বৈষম্য, এবং শিল্পোন্নতির ধীরগতি ও দেশের সম্পদগুলির অপচয় ও অযথা ব্যবহার—ইহাই হইল ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য।

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর এই পুরাতন ও বিশৃঙ্খল পথে বিংশ শতাব্দীর সভ্যতা আর চলিতে ইচ্ছুক নহে। আধুনিক মানব তাহার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথ খুঁজিয়া লইয়াছে। উহা হইল সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী অর্থনৈতিক উন্নতির, সমাজগঠনের পথ। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার দুইটি দিক আছে—একটি তাহার উদ্দেশ্য ও অপরটি তাহার পদ্ধতি। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বলিতে একটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য, সমাজের সকল সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের জন্য একটি সচেতন প্রচেষ্টা ও সুচিন্তিত কার্যক্রম বুঝায়। এই সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হইল এক বা একাধিক কতকগুলি দীর্ঘ-মেয়াদী সামাজিক লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের উদ্যোগে ও নেতৃত্বে, সমাজের যাবতীয় সম্পদের হিসাব ও সমাজের সামগ্রিক মঙ্গলের জন্য সর্বাধিক দক্ষতার

সহিত উহাদের যথাযথ ব্যবহারের চেষ্টা করা হয়। ইহার জন্য কোন্ জাতীয় কার্যক্রম গৃহীত হইবে, পরিকল্পনার পর্যায়গুলি কোন্ ধরনের হইবে, পদ্ধতি কি হইবে, নির্ভর করে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর, অর্থনৈতিক উন্নতির কোন্ স্তরে ইহা রহিয়াছে, তাহার সামাজিক অবস্থা ও বৈশিষ্ট্য কি এবং শাসন-যন্ত্র ও পদ্ধতি কোন্ ধরনের, তাহাদের উপর। এই অবস্থাগুলি অনুযায়ী বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বিভিন্ন ধরনের হইতে বাধ্য। সোভিয়েট বিপ্লবের পর রুশ দেশে সর্বপ্রথম অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গৃহীত হয়। তথায় পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল সমাজতন্ত্র গঠন। পরে ধীরে ধীরে ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতেও পরিকল্পনামূলক অর্থনীতির ধারণা গৃহীত হইতে থাকে, তবে ভিন্ন উদ্দেশ্য—বাণিজ্যচক্রের তীব্রতা হ্রাস করিয়া অর্থনৈতিক স্থিরতা ও পূর্ণ কর্মসংস্থান প্রতিষ্ঠার জন্য। অধুনা অনুন্নত দেশগুলিতেও পরিকল্পনার সাহায্যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা চলিতেছে।

সদ্যমুক্ত ভারতের অসংখ্য অর্থনৈতিক সমস্যা রহিয়াছে। কোটি জনসাধারণ দীর্ঘকাল ধরিয়া এক সুখী, অভাবমুক্ত, প্রাচুর্যের জীবনযাপনের অপেক্ষায় সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছে। কৃষকের ঋণের সমস্যা, জমির সমস্যা, অর্ধ-বেকারীর সমস্যা, শিক্ষিতের বেকার সমস্যা, শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির সমস্যা, শ্রমিকের জীবনযাত্রার মানের উন্নতির সমস্যা, নিরক্ষরতার সমস্যা, খাদ্যের সমস্যা, পুঁজির অভাবের সমস্যা, কাঁচামালের সমস্যা, জনসাধারণের প্রচণ্ড দারিদ্র্যের সমস্যা প্রভৃতি হাজার রকমের সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের উপর আসিয়াছে এবং ইহাদের সবগুলি অতিশীঘ্রই সমাধান করিতে হইবে। অথচ পৃথকভাবে ইহাদের কোনও একটি সমস্যা সমাধানের চেষ্টা ব্যর্থ হইতে বাধ্য। ইহারা প্রত্যেকে একে অপরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। ইহাদের সকলের সঙ্গে একটি মূল সমস্যার যোগ আছে উহা হইল অর্থনৈতিক উন্নতির সমস্যা। সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নতির দ্বারা, উৎপাদন ক্ষমতার বৃদ্ধির দ্বারা, ভারতীয় শ্রমিক ও কৃষকের উৎপাদনে দক্ষতা বৃদ্ধির দ্বারা, সামাজিক যাবতীয় সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের দ্বারাই একযোগে এগুলির দ্রুত সমাধান সম্ভব। সুতরাং ভারতের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য একটি সুচিন্তিত, সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক পরিকল্পনাই আমাদের একমাত্র অর্থনৈতিক মুক্তির পথ। এই কারণেই স্বাধীন ভারত পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নতির পথ বাছিয়া লইয়াছে।

এই পরিকল্পনার দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য ভারতে একটি জনকল্যাণকর সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠন। এমন একটি সমাজ-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা হইবে—যেখানে

অর্থনৈতিক উন্নতি থাকিবে অব্যাহত, উৎপাদিকা শক্তি থাকিবে মুক্ত, সামাজিক ন্যায়বিচার হইবে যাহার ভিত্তি, মানুষে মানুষে ভেদ যেখানে হইবে লুপ্ত। ইহার জন্য প্রয়োজন কৃষির পুনর্গঠন, শিল্পোন্নতি, সুষম শিল্পবিস্তার, অর্থনৈতিক শক্তির বিকেন্দ্রীকরণ, মানুষে মানুষে আয়ের ও সম্পদের বণ্টনে বৈষম্য হ্রাস।

আমাদের পরিকল্পনার উদ্দেশ্য শুধু উন্নয়নমূলক নয়, শুধু শিল্পোন্নতি নয়, কল্যাণও বটে। আমাদের পরিকল্পনায় উন্নয়ন ও কল্যাণ এই উভয় উদ্দেশ্যের সামঞ্জস্য সাধিত হইয়াছে। অপরিহার্যরূপেই ইহার জন্য প্রয়োজন ছিল রাষ্ট্রের উদ্যোগ ও দায়িত্বে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য, জনসাধারণের কল্যাণ বৃদ্ধির জন্য, জীবনধারণের মান বৃদ্ধির জন্য, সকল সম্পদের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবহারের জন্য একটি কেন্দ্রীয়, সুসংবদ্ধ পরিকল্পনার। অপর পক্ষে, আমাদের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় আমরা শক্তি প্রয়োগের পরিবর্তে স্বেচ্ছামূলক সহযোগিতায় বিশ্বাস করি বলিয়া, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা স্বীকার করি বলিয়া, ব্যক্তিগত উদ্যোগকেও ইহার বাহিরে রাখা হয় নাই। ভারতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় যেমন রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টাকে অগ্রাসন ও নেতৃত্ব দিয়াছে, তাহার সহিত ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও প্রচেষ্টাকেও যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করিতে দেওয়া হইয়াছে। উভয়ের ক্ষেত্র সুনির্দিষ্ট অথচ উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য ও সংযোগ রক্ষা করা হইয়াছে। একদিকে উন্নয়ন ও কল্যাণ এবং অপর দিকে রাষ্ট্রীয় এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগ উভয়ের সহযোগিতা, ইহাই আমাদের পরিকল্পনার পদ্ধতি। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনা ইহার চমৎকার উদাহরণ। প্রথম পরিকল্পনায় কৃষির পুনর্গঠনের সূচনা দ্বারা, খাদ্য ও কাঁচামালের উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা অবলম্বনের দ্বারা ভবিষ্যৎ ভারি ও মূল শিল্প এবং কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নতির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ভারি ও মূল শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণ ভবিষ্যৎ শিল্পবিস্তারের জন্য প্রয়োজনীয় কলকবজা, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি পুঁজিদ্রব্য সরবরাহ করিবে, আর কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের সম্প্রসারণ এই সময়ে দেশের জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য সরবরাহ করিবে। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার সঙ্গে স্বাধীন বাজার ও মূল্য ব্যবস্থাকে বজায় রাখা হইয়াছে। পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত উদ্যোগ এই উন্নয়ন কার্যে পরস্পরের সহায়তা করিতেছে। অর্থাৎ মিশ্র অর্থনীতিই আমাদের পরিকল্পনার ভিত্তি। ইহাই আমাদের পদ্ধতি।

নির্জলা ধনতন্ত্র এবং খাঁটি সমাজতন্ত্র, আধুনিক কালের পশ্চিম ও পূর্বের এই পরস্পর বিপরীত দুইটি ব্যবস্থার মধ্যে ভারত এক অপূর্ব সমন্বয়ের কঠিন সাধনায় নিমগ্ন। পাশ্চাত্য দেশগুলি পরিকল্পনা গ্রহণ করে পূর্ণ কর্মসংস্থানের জন্য, জাতীয়

আয়ের উচ্চমান বজায় রাখিবার জন্য, তবে তাহাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কেন্দ্র হইল ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা। আর পূর্বের দেশগুলি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায়, এই পরিকল্পনা ব্যবহার করিতেছে। তাহাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তি হইল যৌথ উদ্যোগ, রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টা। ভারত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে, ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও প্রচেষ্টাকে সে নির্বাসন দিতে চায় না। অপর পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিলে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা যে বিশৃঙ্খলা আনয়ন করিতে পারে তাহাও সে জানে। আবার পুরাপুরি যৌথ উদ্যোগ প্রতিষ্ঠায় যে শক্তি প্রয়োগ করা দরকার তাহাতেও সে অনিচ্ছুক। তাই একদিকে ব্যক্তিগত ও অন্যদিকে যৌথ উদ্যোগের সাহায্যে, মিশ্র অর্থনীতির উপর ভিত্তি করিয়া সে রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বে, কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার সাহায্যে যতটা সম্ভব অল্প পরিমাণে বল প্রয়োগের দ্বারা অর্থনৈতিক উন্নতির পথ বাছিয়া লইয়াছে। ইহাতে অনিবার্যভাবেই অগ্রগতি শ্লথ হইতে বাধ্য। প্রশ্ন হইল, আমাদের জনসংখ্যা যে বিপুলবেগে বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে এই ধীর গতিতে সমস্যার চড়াই আমরা উত্তরণে সমর্থ হইব কি না? এ কথা সত্য যে, প্রথম পরিকল্পনাতে আমাদের জাতীয় উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতিও আমরা লাভ করিয়াছি। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কর্মপরিসর আরও ব্যাপকতা লাভ করিয়াছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও নূতন করিয়া খাদ্য সমস্যা দেখা দিয়াছে এবং বিদেশী মুদ্রা সংকটের ফলে পরিকল্পনার কিছুটা আমরা বর্জন করিতে বাধ্য হইয়াছি। তবে, বিপদ সত্ত্বেও, ভারত নিজের উপর আস্থা হারায় নাই। যে বিপদ ও সংকটই আসুক না কেন, পরিকল্পনার পথ ধরিয়া অর্থনৈতিক উন্নতির সংগ্রামে ভারতবাসী একনিষ্ঠ থাকিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। অটুট সংকল্প ও অবিচলিত নিষ্ঠাই তাহাকে এই সংগ্রামে জয়ী করিবে সন্দেহ নাই।

ভারতের নদী পরিকল্পনা

॥ অতীত ও ইংরেজ আমল ॥ প্রয়োজনীয়তা ॥ সামগ্রিক পরিকল্পনা প্রথম ॥ পঞ্চবার্ষিক ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ॥ অগ্রগতি ॥ ভবিষ্যৎ ॥

জলের আর এক নাম প্রাণ। ইহা শুধু তৃষ্ণার্তের পিপাসা দূর করিয়া প্রাণ-ই বাঁচায়, তাই নয়; ইহা প্রাণশক্তির আধারও বটে। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, জলেই প্রাণশক্তির প্রথম স্ফুরণ ঘটিয়াছিল। সে দিন জলে যে 'অ্যামিবা' জন্মিয়াছিল, তাহা হইতেই প্রাণ-বিকাশের ক্রমোন্নতির পর্যায়ে ধীরে ধীরে মানুষ ও অন্যান্য

প্রাণী উদ্ভূত হইয়াছে। যে গ্রহে জল নাই, যে অঞ্চলে জলের লেশমাত্র নাই সেখানে কোনও প্রাণের লক্ষণও নাই।

তাই মানুষের কাছে জলের আর জলের অফুরন্ত প্রবাহ নদীর এত মূল্য। মানব-সভ্যতাই নদীমাতৃক। ভারতবাসীর কাছে নদী—মাতা, দেবী। ভারত-সভ্যতা গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধু, কৃষ্ণা, কাবেরী, গোদাবরী নদীকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। নদী যোগাইয়াছে তাহার তৃষ্ণার জল, তাহার শস্যক্ষেত্রকে করিয়াছে সুজলা, সুফলা, তাহাকে দিয়াছে নৌ-শক্তি আর বাণিজ্য; তাহার জীবনে আনিয়াছে সুখ আর সমৃদ্ধি। দেশে সৃষ্টি করিয়াছে প্রাণপ্রাচুর্য। ভারতের অতীত কৃষিভিত্তিক সভ্যতা শুধু নদীবাহিত প্রাণপ্রবাহে অবগাহন করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, ভারতের মেধা ও পূর্ত-প্রতিভা প্রকৃতি প্রদত্ত বিশাল জলধারাকে সুপরিকল্পিত মনুষ্যখনিত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ধারায় ও খাতে প্রবাহিত করিয়া, পর্বতের দুর্গম অঞ্চলে উপলরুদ্ধ জলধারাকে মুক্ত করিয়া, নিম্নভূমির বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চলে জলধারা নির্মাণ করিয়া শুষ্ক প্রান্তরকে শ্যামশোভা দান করিয়াছিল। অতীত হিন্দু ও মুসলমান শাসনকালের সেই গৌরবময় কীর্তিগুলি যখন ইংরেজ আগমনের পর বিদেশী শাসকের অবহেলায় একের পর এক লুপ্ত হইল তখন হইতেই শুরু হইল কৃষির ও কৃষকের ঘোর দুর্দিন।

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সদ্যমুক্ত ভারত আজ পরিবর্তনের মুখে জীবনের আর এক যুগসন্ধিক্ষণে উপনীত। আজ ভারতের সমৃদ্ধির পুনঃপ্রতিষ্ঠার চাবিকাঠি দুইটি—কৃষির পুনর্গঠন ও উন্নয়ন এবং শিল্পোন্নয়ন। এই দুইয়ের জন্যই ভারতবাসী আজ আবার তাহার নদী-জননীর দিকে মুখ ফিরাইয়াছে। নদীর অফুরন্ত প্রাণশক্তিই আজ আর এক নূতন ভারতের জন্মদানে সক্ষম। ইদানীংকালে ভারতবাসী এই অবহেলিত নদীসমূহের প্রাণ-বিধ্বংসী প্রলয়ঙ্করী শক্তির রূপ দেখিতেই অভ্যস্ত হইয়াছে। কিন্তু কঠোর পরিশ্রমে ও অক্লান্ত চেষ্টায়, এই শক্তির যে মঙ্গলকরী দিক দুইটি আছে তাহার আশীর্বাদে দেশ সহজেই অভিষিক্ত হইতে পারে, সেদিকে অল্পকাল হইল আমাদের দৃষ্টি ও প্রচেষ্টা নিবদ্ধ হইয়াছে।

বিভক্ত ভারতের ২২ কোটি একর কৃষিক্ষেত্রের মাত্র ৫ কোটি একর বা ২৫ শতাংশে মাত্র জলসেচন ব্যবস্থা হইয়াছে। এই বিরাট দেশের সর্বত্র যথাসময়ে সুষম ও পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃষ্টিপাত ঘটে না বলিয়া অধিকাংশ অঞ্চলই বুভুক্ষু কৃষকের আর্তনাদে মুখরিত। অনুপযুক্ত ও অসম বৃষ্টিপাতে যেমন কোথাও বন্যায় কৃষকের সর্বনাশ ডাকিয়া আনে তেমনি দেশের খাদ্য ও কাঁচামালের ঘাটতিও সৃষ্টি

করে। একদিকে অতিবৃষ্টি অঞ্চলে বন্যারোধ ও অন্যদিকে অনাবৃষ্টি অঞ্চলগুলিতে পর্যাপ্ত শস্যের ফলন সুনিশ্চিত করা সম্ভব সেচব্যবস্থার সম্প্রসারণ দ্বারা। আর ইহা করিতে হইলে দরকার নদীশক্তির নিয়ন্ত্রণ। এই ভাবে নদী পরিকল্পনাগুলি কৃষিক্ষেত্রে নূতন প্রাণশক্তির স্পন্দন সৃষ্টি করিতে পারে, খাদ্যঘাটতি ও সম্প্রসারণশীল শিল্পের কাঁচামালের অভাব দূর করিতে পারে। অপর দিকে নদীস্রোতের সাহায্যে জলবিদ্যুৎ শক্তির উৎপাদন সম্ভব। আধুনিক মানব-শক্তি উৎপাদনের যে চারিটি উৎস লাভ করিয়াছে তাহা হইল—কয়লা, খনিজ তৈল, জলশক্তি ও আণবিক শক্তি। তন্মধ্যে প্রথমটির বণ্টন ভারতে সর্বত্র সমান নহে বলিয়া সকল অঞ্চলে ঐ সুবিধা বর্তমান নাই। দ্বিতীয়টির আবিষ্কৃত পরিমাণ এখনও অল্প এবং বণ্টনও সর্বত্র ঘটে না। অপরপক্ষে ভারতের সর্বত্র, প্রকৃতি ও অসংখ্য নদীনালার বিস্তার অফুরন্ত জলপ্রবাহের সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে। বৈজ্ঞানিকদের হিসাবে ভারতে খরস্রোতা নদীসমূহ হইতে বাৎসরিক ৩ হইতে ৪ কোটি কিলোওয়াট বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করা সম্ভব, অথচ বর্তমানে উহার সাহায্যে মাত্র সম্ভাব্য শক্তির ১·৫ শতাংশ শক্তি উৎপন্ন হইতেছে। সুতরাং ভারতের জলশক্তির উন্নয়ন ও প্রসার শিল্পসম্ভাবনার এক নূতন দিগন্ত খুলিয়া দিতে সক্ষম। তাহা ছাড়া ইহার উৎপাদন খরচ অতি অল্প ও ইহার বণ্টন অতিব্যাপক এবং ইহাকে দূরদূরান্তে চালিত করা যায় বলিয়া শহর ও গ্রাম, নিকট ও দূরবর্তী সকল অঞ্চলই; ক্ষুদ্র, বৃহৎ, ও কুটির প্রভৃতি সকল শিল্পই, উপকৃত হইবে। সুলভ শক্তির সরবরাহে পুরাতন কুটির ও গ্রাম্য শিল্পসমূহ পুনরুজ্জীবিত এবং দেশে নূতন শিল্পসমূহের প্রতিষ্ঠা সহজ হইবে। পরিবহণ উন্নত ও প্রসারিত হইবে। নূতন নূতন কর্মসংস্থানে মানুষের শ্রমশক্তির উপযুক্ত ব্যবহার সম্ভব হইয়া উঠিবে। জাতীয় আয়, জীবনধারণের মান বৃদ্ধিতে সূচিত হইবে নব ভারতের সুখ, সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্যের মহোৎসব। নূতন জলপথের স্থাপনা বাণিজ্য ও গমনাগমনের পরিধিও বিস্তৃত করিতে পারে।

ভারতের নদীশক্তির এই সুবিপুল সম্ভাবনার দিকে প্রথম অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়াছিল ১৯৩৮ সালে কংগ্রেস কর্তৃক নিযুক্ত 'জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন'। এই কমিশন সঠিকভাবেই বলিয়াছিল যে, ভারতের বৃহৎ নদীগুলি নিয়ন্ত্রণের দ্বারা জলসেচন, নৌপরিবহণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন এই বহুরকম উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে। এক কথায় এইটাই বহুমুখী নদী পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। কিন্তু এই স্বপ্ন সার্থক করিতে ভারতকে অপেক্ষা করিতে হইল আরও একযুগ।

১৯৫০ সালে পরিকল্পনা কমিশন মোট ২৫৫টি বহুমুখী, বৃহৎ সেচ ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। ইহাদের মোট ব্যয় পড়িবে ১৯০০ কোটি টাকা ও সম্পূর্ণ করিতে লাগিবে ১৫ বৎসর। ইহারা সম্পূর্ণ হইলে ৪ কোটি ১৫ লক্ষ ৯৪ হাজার ৭ শত একর জমিতে জলসেচন কার্য প্রবর্তিত হইবে এবং ৭১ লক্ষ ৬১ হাজার ১৫০ কিলোয়াট জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন হইবে। ইহাদের মধ্যে বহুমুখী নদী পরিকল্পনার সংখ্যা ২৮টি ও উহাদের আনুমানিক মোট ব্যয় ১৩৬৪ কোটি ৭ লক্ষ টাকা। ইহারা মোট ৩ কোটি ১৩ লক্ষ ৮২ হাজার একর জমিতে জলসেচনের কার্য ও ৬২ লক্ষ ১৫ হাজার ১০০ শত কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎ-শক্তির উৎপাদন ঘটিবে।

এই সামগ্রিক পরিকল্পনাকে সম্মুখে রাখিয়া ধাপে ধাপে ইহাকে কার্যকরী করিবার কার্যক্রম স্থির করা হয়। এইজন্য প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ৫৫৮ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়। এই সকল বহুমুখী পরিকল্পনার মধ্যে বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা, পঞ্জাবের ভাক্‌রা-নাঙ্গাল পরিকল্পনা, উড়িষ্যার মহানদী উপত্যকা পরিকল্পনা, দাক্ষিণাত্যের তুঙ্গভদ্রা উপত্যকা পরিকল্পনা, পশ্চিমবঙ্গের ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা, বিহারের কুশী পরিকল্পনা ও বোম্বাইয়ের কাক্‌রাপার পরিকল্পনা প্রধান। এগুলির লক্ষ্য ছিল ৮৫ লক্ষ একরে জলসেচ প্রবর্তন ও ১০ লক্ষ কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন। প্রথম পরিকল্পনার শেষে জলসেচ লক্ষ্য অতিক্রান্ত হইয়াছে এবং জলবিদ্যুৎ উৎপাদন লক্ষ্য প্রায় সম্পূর্ণ।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে জলসেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য মোট ৯১৩ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। ইহাতে প্রথম পরিকল্পনার যে সকল বহুমুখী নদী-উপত্যকা পরিকল্পনায় কাজ অবশিষ্ট আছে তাহা সম্পূর্ণ করা হইবে এবং আরও অনেক নূতন কার্যক্রমে হাত দেওয়া হইবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে জলসেচ-ক্ষেত্রের মোট আয়তন ১০ কোটি ৯০ লক্ষ একরে পরিণত হইবে। আর বহুমুখী পরিকল্পনাগুলির উৎপাদিত জলবিদ্যুতের পরিমাণ দাঁড়াইবে ১৭ লক্ষ কিলোওয়াট ও সর্বমোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার পরিমাণ দাঁড়াইবে ৬৯ লক্ষ কিলোওয়াট।

ভারতের বিশাল নদীগুলির যে বিপুল জলশক্তি এতদিন ধরিয়া অপচিত হইতেছিল, স্বাধীন ভারতবাসী আজ তাহার বৈজ্ঞানিক ব্যবহারের মধ্যে, সুপরিকল্পিত নিয়ন্ত্রণের মধ্যে নবজীবনের সন্ধান লাভ করিয়াছে। নদীর উৎস-মুখে বাঁধ দিয়া জলাধার নির্মাণ করিয়া তাহাতে জলরাশি সঞ্চিত করিয়া তাহা হইতে কৃত্রিম প্রণালীপথে স্রোত প্রবাহিত করিয়া যন্ত্রসহযোগে বিদ্যুৎ উৎপাদন

করিতেছে। এই সুলভ শক্তি অন্ধকারাচ্ছন্ন দূর-দুরান্তের গ্রামে নবদীপমালা রচনা করিয়া নবীন ভারতের দীপাবলী উৎসব ঘোষণা করিতেছে। গ্রামের শিল্পগুলিকে নবসঙ্গীতে উদ্বুদ্ধ করিতেছে। আর অবরুদ্ধ জলাধার নির্গত জলরাশিকে কৃত্রিম খাতে শস্যক্ষেত্রে প্রবাহিত করিয়া ভারত আজ নব নব শস্যভাণ্ডার উন্মোচন করিতে ব্যস্ত। সেচখাত প্রবাহিত জলরাশি তাহার কৃষিসম্পদ, খাদ্য ও কাঁচামালের উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া এক নূতন, কর্মব্যস্ত, সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ কৃষকশ্রেণীর সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছে। মহাভারতে কথিত আছে, মহর্ষি কপিলের শাপে ভস্মীভূত সগর রাজার ষাট হাজার পুত্রকে ভগীরথ গঙ্গাকে মর্ত্যে আনয়ন করিয়া তাঁহার জলধারায় পুনরুজ্জীবিত করিয়াছিলেন। জানি না, ইহা শুধুমাত্র কাহিনী কিনা তবে বহুমুখী নদী পরিকল্পনায় মুমূর্ষু ভারত যে নূতন জীবনের সন্ধান লাভ করিয়াছে একথা আজ আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ সত্য।

ভারতে জনসংখ্যার সমস্যা

।। অতীত কথা ।। ম্যালথাস-এর তত্ত্ব ।। কাম্য-তত্ত্ব ।। ভারতের সমস্যা ।। জাতীয় আয় বৃদ্ধি ।। জাতীয় আয়ও উৎপাদনের সঙ্গে সুষম বণ্টন ।। সমাধান ।।

একদিন ছিল যখন বৃহৎ সংসার, অধিকসংখ্যক পরিবার পরিজন ছিল গৃহ-কর্তার গৌরব, মর্যাদা ও গর্বের বস্তু। সেদিন আজ অতীতের কথা—বর্তমানের নানা অভাব আজ আমাদের নিত্য অতিথি। বহু পুত্র-কন্যা, বহু পরিজন পরিবৃত সংসার আজ আমাদের রাষ্ট্রের পক্ষে বিভীষিকার বস্তু হইয়া উঠিয়াছে।

অধিবাসীর সংখ্যা অনুযায়ী পৃথিবীতে চীন দেশের পরেই ভারতের স্থান। অবিভক্ত ভারতে ১৯৪১ সালের লোকগণনার হিসাবে জনসংখ্যা ছিল ৪০ কোটি। বর্তমান ভারত গণতন্ত্রে ১৯৫১ সালের লোকগণনা অনুযায়ী জনসংখ্যা হইতেছে ৩৫ কোটির অধিক। এই বিপুল লোকসমষ্টি দেশের পক্ষে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিনা, দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির প্রধান অন্তরায় কিনা, অর্থাৎ ভারতে অতিরিক্ত জনসংখ্যার সমস্যা বর্তমান কিনা, সে সম্পর্কে নানা বাদবিতণ্ডার অন্ত নাই।

একদল দেশী ও বিদেশী পণ্ডিতের মতে, ভারতে অতিরিক্ত জনসংখ্যার সমস্যা বর্তমান। ইঁহারা ইংলণ্ডের অষ্টাদশ শতাব্দীর ধর্মযাজক অর্থনীতিবিদ

ম্যালথাস-এর জনসংখ্যার তত্ত্বের সমর্থক। ইঁহাদের মতে অতিরিক্ত জনসংখ্যাই হইতেছে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতির প্রধান অন্তরায়। ম্যালথাস-এর মতে দেশে যদি খাদ্যোৎপাদনের তুলনায় জনসংখ্যা দ্রুততর হারে বৃদ্ধি পায় তবে শীঘ্রই জনসংখ্যা খাদ্যোৎপাদনকে অতিক্রম করে ও ইহার ফলে দারিদ্র্য, অনাহার দুর্ভিক্ষ, মহামারী ইত্যাদি দেখা দেয়। ঐগুলি অতিরিক্ত জনসংখ্যার লক্ষণ ও ফল। ম্যালথাস-তত্ত্বের অনুগামীরা বলেন যে, ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৫০ খৃষ্টাব্দ বৎসরে ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে প্রায় তিনগুণ, অথচ খাদ্যোৎপাদন ঐ অনুপাতে বাড়ে নাই। বর্তমান শতাব্দীতে ও ১৯২১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৫১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ৩০ বৎসরে জনসংখ্যা ৪৪ শতাংশ বাড়িয়াছে অথচ খাদ্যশস্যের অধীনে জমির পরিমাণ বাড়িয়াছে মাত্র ৫ শতাংশ। ১৯১৩-১৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৩৫-৩৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রতি বৎসর জনসংখ্যা ১ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে অথচ খাদ্যোৎপাদন বাড়িয়াছে প্রতি বৎসর ০·৬৫ শতাংশ হারে। ইহার ফলে দেখা দিয়াছে খাদ্যঘাটতি। বর্তমানে প্রতি বৎসর ৬০ হইতে ৭০ লক্ষ টন খাদ্য-ঘাটতি হইতেছে ও বাহির হইতে খাদ্যশস্য আমদানি করিয়া তাহা দূর করা হইতেছে। ইহার আর একটি ফল হইতেছে ভারতবাসীর তীব্র দারিদ্র্য ও জীবনধারণের অত্যন্ত নীচু মান। জমির উপর প্রায় ৭০ শতাংশ ভারতবাসী নির্ভর করিতেছে। প্রতি বৎসর ১ শতাংশেরও বেশী হারে জনসংখ্যা বাড়িতেছে বলিয়া জমির উপরও জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধি পাইতেছে ও কৃষকের জীবনযাত্রার মান ক্রমাগত নিম্নগামী হইয়া পড়িতেছে। এই অবস্থার আর একটি ফল গ্রাম-বাসীদের সাময়িক বেকারী। সারা বৎসর কৃষক ও অন্যান্য গ্রামবাসীর কর্মের সংস্থান থাকে না বলিয়া তাহারা বৎসরের মধ্যে ৩ হইতে ৬ মাস বেকার থাকে এবং যে কাজ অল্প লোকের দ্বারা সম্পন্ন হয় তাহা অধিক সংখ্যক লোকে নিষ্পন্ন করে। ইহাতে মাথাপিছু আয়ও অত্যন্ত অল্প হইতেছে। সুতরাং খাদ্যশস্যের ফলন বৃদ্ধির হার অপেক্ষা লোকসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চতর হার, মোট খাদ্য উৎপাদনে বিপুল ঘাটতি, জনসাধারণের দারিদ্র্য, নিম্নগামী জীবনযাত্রার মান প্রভৃতি ম্যালথাস বর্ণিত জনাধিক্যের সকল লক্ষণগুলিই ভারতে বর্তমান বলিয়া এদেশে অতিরিক্ত জনসংখ্যার সমস্যা বর্তমান—এটাই ম্যালথাস-তত্ত্বে বিশ্বাসী সিদ্ধান্ত।

অপরপক্ষে 'কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব' নামে ম্যালথাস-তত্ত্বের বিপরীত যে তত্ত্ব প্রচলিত আছে সেই মত অনুসারে বলা হয়, চূড়ান্তভাবে নিছক জনাধিক্য বলিয়া কিছু নাই এবং জনসংখ্যাকে শুধুমাত্র খাদ্যোৎপাদনের সঙ্গে তুলনা করা উচিত নয়। জনসংখ্যাকে বিচার করিতে হইবে দেশের মোট ধনসম্পদের উৎপাদনের

পরিপ্রেক্ষিতে। এই তত্ত্বের অনুগামীদের মতে দেশের সম্পদ সমষ্টি, উৎপাদন ব্যবস্থা, কারিগরি জ্ঞান প্রভৃতি অনুযায়ী যে পরিমাণ জনসংখ্যা থাকিলে সর্বাধিক পরিমাণ জাতীয় আয় ঘটিবে তাহাই কাম্য জনসংখ্যা। জনসংখ্যা বৃদ্ধি অকারণে ভীতিজনক নহে। যতক্ষণ পর্যন্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায় ততক্ষণ পর্যন্ত দেশে অতিরিক্ত জনসংখ্যার সমস্যা দেখা দিয়াছে বলা যায় না। শুধুমাত্র যখন দেখা যাইবে যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় আয় বৃদ্ধি না পাইয়া হ্রাস পাইতেছে তখনই বুঝিতে হইবে জনাধিক্য ঘটিয়াছে। আবার সেই অবস্থাতেও নূতন সম্পদের আবিষ্কারে, উৎপাদন ব্যবস্থা ও পদ্ধতির পরিবর্তনে জাতীয় আয়ের পুনর্বৃদ্ধি ঘটিতে পারে এবং অতিরিক্ত জনসংখ্যা বলিয়া যাহা মনে হইতেছিল, তাহা সল্প বলিয়া মনে হইতে পারে, কারণ ঐ নূতন অবস্থায় জাতীয় আয় আরও বাড়াইতে হইলে আরও বেশী শ্রমশক্তির প্রয়োজন হইবে। এই ভাবে অর্থনীতি যদি গতিশীল, উন্নয়নধর্মী হয় তবে "অতিরিক্ত জনসংখ্যা"র ভয় মিথ্যায় পরিণত হইতে পারে। দৃষ্টান্ত হিসাবে এই তত্ত্বের সমর্থকগণ বলেন যে, ঊনবিংশ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় আয়ও বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৮৬৭-৭০ সালে দাদাভাই নৌরজীর হিসাবে মাথাপিছু আয় ছিল বাৎসরিক ২০৲ টাকা মাত্র। ১৯৩১-৩২ সালে ডাঃ ভি. কে. আর. ভি. রাওয়ের হিসাবে উহা দাঁড়ায় ৬৫৲ টাকায় ও ১৯৪৮-৪৯ খৃষ্টাব্দে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রারম্ভে উহা পরিণত হয় ২৪৬৲ টাকায়। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে ১৯৫৫-৫৬ সালে উহা ২৭৩৲ টাকায় পরিণত হয়। সুতরাং 'ম্যালথাস-তত্ত্ব' অনুযায়ী ভারতে জনাধিক্য ঘটিয়াছে বলিলেও, 'কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বানুযায়ী', ভারতে জনসংখ্যা অতিরিক্ত হইয়াছে বলা চলে না।

একটু গভীরভাবে অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই ভারতের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের সংগঠিত শিল্পগুলির ক্ষুদ্রাংশে নিযুক্ত জনসমষ্টির উৎপাদন ও আয় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে অথচ বাকি বৃহদংশে, কৃষির উপর নির্ভরশীল অংশে উত্তরোত্তর আয় হ্রাস পাইতেছে। অতএব এই অংশে জনসংখ্যা ও উৎপাদনের মধ্যে ভারসাম্যের অভাব ঘটিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে আমাদের কৃষিকার্যে কোনরূপ পরিবর্তন ও উন্নতিমূলক কার্যকলাপের অভাবেই, আজ উদ্বৃত্ত জনসমষ্টির উদ্ভব ঘটিয়াছে। কৃষির উন্নতির অভাবেই খাদ্য ও কাঁচামালের ঘাটতি সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং মূল সমস্যা জনাধিক্য নয়—সমস্যা কৃষিব্যবস্থায় ও কৃষি-পদ্ধতির বৈপ্লবিক সংস্কারে। চীন দেশে এই সংস্কারের ফলেই প্রতি একরে যেখানে ৩৫০০ মণ শস্য উৎপন্ন হইতেছে, ভারতে সেখানে উৎপন্ন হয় ৩০ মণ। সুতরাং ভারতে

জনাধিক্যের দরুন উৎপাদন আয় কমে নাই, দারিদ্র্য দেখা দেয় নাই, বরং কৃষির উপর নির্ভরশীল ভারতীয় অর্থনীতিতে এতদিন যে অচলায়তন বর্তমান ছিল, জনাধিক্য ও দারিদ্র্য তাহারই ফল মাত্র। পরিকল্পিত অর্থনীতি গ্রহণ করিয়া, প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রূপায়িত করিয়া ভারত প্রমাণ করিয়াছে যে, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও আধুনিক পদ্ধতির সাহায্যে, কৃষি সংস্কারের সাহায্যে, শিল্পোন্নয়নের সাহায্যে ভারতের দারিদ্র্যের সমস্যা দূর করা, কৃষকসহ দেশবাসীর আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব। প্রয়োজন আরও দ্রুত কৃষি ও শিল্পে আরও ব্যাপক ও সুগভীর পরিবর্তন। পণ্ডিত সেলিগম্যান বলিয়াছিলেন, জনসংখ্যার সমস্যা নিছক সংখ্যার সমস্যা নহে, উহা দক্ষ উৎপাদন ও সুষম বণ্টনের সমস্যাও বটে। প্রকৃতই আজ ভারতে এই বাক্যের সার্থকতা আমরা লক্ষ্য করিতেছি।

তবে, একথা সত্য যে, উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলির রূপায়ণকালে, উন্নয়ন ব্যয় বৃদ্ধির তুলনায় যদি জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে থাকে তবে, শুধুমাত্র পূর্বের জীবন-যাত্রার মান ও উৎপাদন পরিমাণই কোনও মতে হয়ত বজায় থাকিবে, উল্লেখযোগ্য উন্নতি কিছু পরিলক্ষিত হইবে না। ইহা এড়াইতে হইলে একদিকে চাই জনসংখ্যা পরিকল্পনা,—জনসংখ্যার বৃদ্ধি যাহাতে নিয়ন্ত্রিত, সীমাবদ্ধ থাকে তাহার ব্যবস্থা এবং জনসাধারণের গুণগত উন্নয়ন অর্থাৎ শিক্ষা বিস্তারে দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা আর অপরদিকে চাই ক্রমবর্ধমান হারে বিনিয়োগ অর্থাৎ উন্নয়নমূলক ব্যয়-বৃদ্ধির দ্বারা দ্রুত কৃষির পুনর্গঠন ও সুষম ও ব্যাপক শিল্প সম্প্রসারণ। তবেই খাদ্য ও কাঁচামালের ঘাটতি দূর হইবে, কৃষকের আয় বৃদ্ধি হইবে, জমি হইতে উদ্বৃত্ত কৃষকদের জন্য সম্প্রসারণশীল শিল্পে কর্মসংস্থানের দ্বারা শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি, মোট জাতীয় আয় ও উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটিবে। ভারতের অতি পুরাতন ও সুপরিচিত দারিদ্র্য ব্যাধি দূর হইয়া ভারতবাসী উচ্চ জীবনযাত্রার মানে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে। অতএব জনসংখ্যা নহে, অর্থনৈতিক উন্নতির অভাবই ভারতের প্রকৃত সমস্যা।

দশমিক মুদ্রাব্যবস্থা

॥ অতীত কথা ॥ প্রচলিত পুরাতন ব্যবস্থার ত্রুটি ॥ নূতন পদ্ধতির সুবিধা ॥ অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা ॥ অসুবিধা ॥

ভারতীয় সভ্যতা পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতাগুলির শুধুমাত্র যে অন্যতম তাহাই নহে, প্রাচীন ভারত একাধিক ক্ষেত্রে পৃথিবীকে স্মরণীয় একাধিক বৈজ্ঞানিক

অবদানে চিরঋণী করিয়া রাখিয়াছে। তাহার মধ্যে শুধু সংখ্যা-লিখনের ১ হইতে ৯ পর্যন্ত নূতন পদ্ধতিই নহে, বীজগণিতই নহে, দশমিক হিসাব গণনা-পদ্ধতিও আছে। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে, অর্থাৎ আজ হইতে প্রায় দেড়হাজার বৎসর পূর্বে পণ্ডিত আর্যভট্ট এই দশমিক পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। তাহার পর উহা আরব দেশ ঘুরিয়া ইওরোপে পৌছায়। তথায় রেনেসাঁস যুগে এই সহজ ও সরল হিসাব-পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক সমাজে সাদরে গৃহীত হইয়া বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ও পরিশুদ্ধ হিসাব রক্ষার কাজে প্রচলিত হয়। ধীরে পদার্থের ওজন, ঘনত্ব, দৈর্ঘ্য, তাপমাত্রা প্রভৃতি পরিমাপের ক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া বিভিন্ন দেশের মুদ্রাব্যবস্থাও দশমিক পদ্ধতিকে ভিত্তি করিয়া গঠিত হয়।

বর্তমানে সমস্ত পৃথিবীতে মুদ্রাব্যবস্থাসহ হিসাবের যে দুইটি পদ্ধতি প্রচলিত তাহার মধ্যে একটি দশমিক পদ্ধতি, ইহা আন্তর্জাতিক ও বৈজ্ঞানিক মণ্ডলী কর্তৃক সমর্থিত এবং অপরটি ইংলণ্ডের, ইহা অবৈজ্ঞানিক এবং জটিল। বোধ করি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী সত্ত্বেও ইংলণ্ডের যে রক্ষণশীল মনোবৃত্তি বর্তমান, তার ফলেই এই ভ্রান্ত ব্যবস্থা সংরক্ষণের কারণ।

ইংরেজশাসন কালে, এদেশের মুদ্রাব্যবস্থার সংস্কার ও একীকরণ করিতে গিয়া বিদেশী শাসকগণ যে মুদ্রাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল তাহা দেশের প্রয়োজন মিটাইয়াছে বটে কিন্তু তাহা অনাবশ্যক রূপে জটিলতাপূর্ণ। ওই পদ্ধতিতে হিসাবে যেমন অযথা বিলম্ব ঘটে তেমনি শিক্ষাও সময় সাপেক্ষ। ইহাতে সময়ের ও শ্রমের অপচয় ছাড়া আর কিছুই হয় না। তেমনি ভারতের ওজন, দৈর্ঘ্য, ঘনত্ব প্রভৃতি মাপিবার দেশীয় পুরাতন ও প্রচলিত ব্যবস্থাগুলিও জটিল এবং তার দ্বারাও অনর্থক সময় ও শ্রমের অপচয় ঘটে। আর এই পদ্ধতির হিসাব দেশের সর্বত্র একরূপও নয় বলিয়া তাহাতে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই জন্য স্বাধীনতা লাভের পর এই সকল পুরাতন, জটিল ব্যবস্থার সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সরকার উপলব্ধি করিয়াছেন। আগামী দিনে কৃষির সংস্কারে ও শিল্পোন্নয়নে ভারতের অর্থনীতি যে ভাবে বিকশিত হইতে যাইতেছে তাহাতে সহায়তা করিবার জন্য সারা ভারতে যেমন চাই একই প্রকারের বৈজ্ঞানিক পরিমাপ ব্যবস্থা, তেমনি চাই বৈজ্ঞানিক মুদ্রাব্যবস্থা। ইহাতে সারা দেশের জাতীয় আয়, ব্যয়, উৎপাদনের হিসাব রাখা সরকারের পক্ষে যেমন সুবিধাজনক হইবে, পরিকল্পনাকারীদের যেমন সুবিধা হইবে তেমনি সুবিধা হইবে অশিক্ষিত ও স্বল্পশিক্ষিত দেশবাসীর। অল্পয়াসেই এই পদ্ধতি আয়ত্ত করা যেমন সম্ভব তেমনি হিসাবের সময়ও লাগিবে অল্প। সমগ্র দেশে এই রূপে বিরাট শ্রমের

অপচয় বন্ধ হইবে। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি সহজতর হইয়া উঠিবে। এই কারণে বিশ্বের অগ্রসর দেশগুলির অনুসরণে ভারত সরকার দেশে সকল প্রকারের গণনা ও পরিমাপের ক্ষেত্রে মেট্রিক বা দশমিক গণনা পদ্ধতি প্রচলিত করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই ব্যবস্থার প্রথম পর্যায় হিসাবে বিগত ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল হইতে ভারত সরকার পুরাতন মুদ্রাব্যবস্থার পরিবর্তন করিয়া দশমিক মুদ্রাব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়াছেন।

পুরাতন মুদ্রাব্যবস্থায় এক সঙ্গে বিভিন্ন প্রকারের স্বল্প মূল্যের মুদ্রা প্রচলিত ছিল এবং তাহাতে গোটা ব্যবস্থাটি জটিল করিয়া তুলিয়ছিল, যেমন,—১৲ টাকা ছিল ১৬টি অংশে বা আনায় বিভক্ত। আট আনায় আধুলি বা টাকার অর্ধভাগ, চারি আনায় সিকি বা টাকার সিকিভাগ ও দুই আনায় টাকার এক-অষ্টমাংশ ভাগ হিসাবে আবার পৃথক পৃথক মুদ্রা ছিল। প্রত্যেকটি আনা আবার ৪ পয়সায় ও প্রত্যেকটি পয়সা ৩ পাইয়ে বিভক্ত ছিল। এইভাবে ১৬ আনায়, অথবা ৬৪টি পয়সায় অথবা ১৯২ পাইয়ে এক টাকা হইত। ইহার মধ্যে ইদানীংকালে পাইয়ের অপ্রচলন ঘটায় উহা শুধু হিসাবের খাতাতেই সীমাবদ্ধ ছিল, চলন ছিল না।

নূতন ব্যবস্থায় সরাসরি ১৲ টাকাকে ১০০ ভাগে বিভক্ত করিয়া উহার প্রত্যেক অংশকে ১ নয়া পয়সা নাম দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ এখন হইতে শুধু ১ শত নয়া পয়সায় এক টাকা হইল। পাই পয়সা, পয়সা এবং আনা উঠাইয়া দিয়া হিসাবকে সহজ ও সরল করা হইল। এখন হইতে শুধু ৬ রকমের স্বল্পমূল্যের মুদ্রা থাকিবে, ১ নয়া পয়সা, ২ নয়া পয়সা, ৫ নয়া পয়া, ১০ নয়া পয়সা, ২৫ নয়া পয়সা ও ৫০ নয়া পয়সা আর থাকিবে পূর্বের মত ১৲ টাকার মুদ্রা বা কাগজের নোট। এতে মুখে বা কাগজে কলমে হিসাবের কাজ অত্যন্ত সরল ও সহজ হইয়া পড়িল সন্দেহ নাই।

তবে এই বিরাট দেশে হঠাৎ কোন পরিবর্তন, বিশেষত মুদ্রার মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে অল্প সময়ে সম্পূর্ণ করা সম্ভব নয় বলিয়া এবং নূতন ব্যবস্থার মুদ্রাগুলির সঙ্গে পরিচিত হইতে ও পুরাতন মুদ্রাগুলি নূতন মুদ্রায় ভাঙাইয়া নিতে সময় লাগিবে বলিয়া মধ্যবর্তীকালীন একটি ব্যবস্থা স্থির হইয়াছে। ব্যবস্থাটি হইল এই যে, তিন বৎসরের জন্য পুরাতন ও নূতন মুদ্রাগুলি পাশাপাশি প্রচলিত থাকিবে এবং ঐ সময়ে কোন কোন হারে পুরাতন মুদ্রাগুলি নূতন মুদ্রায় পরিবর্তিত করা যাইবে তাহার সরকারী ঘোষণা প্রবর্তন করা হইয়াছে। এই সময়ে দ্রব্য-সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয়ে উভয় মুদ্রায় বা উভয়ের যে কোন মুদ্রায় আদান-প্রদান চলিতে পারে বলিয়া সরকার ঘোষণা করিয়াছেন। এই সময়ে ধীরে ধীরে বাজার হইতে

পুরাতন মুদ্রা তুলিয়া লওয়া হইবে। সরকার শুধুমাত্র নূতন মুদ্রার সরবরাহ বৃদ্ধি করিয়া যাইবেন, এবং ইহাতে তিন বৎসর পরে সম্পূর্ণ নূতন মুদ্রাতেই কাজকারবার বিনা বাধায় চলিতে পারিবে।

ব্যবস্থা বা পদ্ধতি হিসাবে দশমিক মুদ্রার একটি সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা। সুতরাং ইহার ত্রুটি কিছু নাই। তবে সরকার যে ভাবে পুরাতন ও নূতন মুদ্রার বিনিময় হার স্থির করিয়াছেন তাহাতে আপত্তি করিবার কারণ আছে। যেমন চারি আনা ২৫ নয়া পয়সার সমান, কিন্তু দুই আনা ১২ নয়া পয়সার সমান। এক আনা ৬ নয়া পয়সার সমান, তিন পয়সা পাঁচ নয়া পয়সার সমান অথচ এক পয়সা ২ নয়া পয়সার সমান। এমনি ভাবে বিভিন্ন হারে পুরাতন ও নূতন মুদ্রায় বিনিময় হার নির্দিষ্ট হওয়ায় জনসাধারণের মধ্যে অশেষ বিভ্রান্তি ও গোলযোগের সম্ভাবনা সৃষ্টি করা হইয়াছে। দ্বিতীয়ত, সরকার নিজেই এই সুযোগে ডাকটিকিট, মনিঅর্ডার, রেলভাড়া প্রভৃতি নয়া পয়সায় নির্ধারণ করিতে গিয়া নয়া পয়সায় উচ্চতর মূল্য ধার্য করিয়া মুনাফাখোরী মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন এবং ইহাতে জনসাধারণের দুর্গতি বৃদ্ধি পাইয়াছে। এ ব্যাপার পরোক্ষ কর-বৃদ্ধি ছাড়া আর কিছুই নয়, অথচ সরকার মুখে তাহা স্বীকার করেন নাই। তৃতীয়ত সরকারের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া বহু ব্যবসায়ীও তাহাদের পণ্যসামগ্রী নয়া পয়সায় উচ্চতর মূল্যে বিক্রয় করিতেছে। যেমন দুই আনায় ১২ নয়া পয়সা অথচ ট্রামের পূর্বের দুই আনার টিকিটের জন্য নূতন মুদ্রায় ১৩ নয়া পয়সা দিতে হয়। এইরূপে নানা দিক দিয়া অন্যায়রূপে জনসাধারণের অর্থে সরকারী ও বেসরকারী কোষাগার পূর্ণ হইতেছে।

ফলে, স্বভাবতই জনসাধারণ নূতন দশমিক মুদ্রাকে প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারে নাই। অনেকের মতে হিসাবের খাতাপত্রও নূতন মুদ্রার হিসাবে পরিবর্তিত করিতে গিয়া জনসাধারণ ও সরকারের যে অর্থ ও পরিশ্রম ব্যয় হইবে তাহা অপচয় মাত্র।

কিন্তু এই সকল অসুবিধা ও ত্রুটিগুলি সাময়িক মাত্র। এ কথা সত্য যে নায্যতর হারে নূতন ও পুরাতন মুদ্রার বিনিময় নির্দিষ্ট হওয়া উচিত ছিল এবং সরকারের নিজের ও ব্যবসায়ীদের এই মুনাফাখোরী মনোবৃত্তি অত্যন্ত অবাঞ্ছিত। এই অন্তর্বর্তীকাল শেষ হইলে এই সকল বিনিময় সংক্রান্ত বিভিন্ন হারের অসামঞ্জস্য আর থাকিবে না। তখন একপ্রকার অর্থাৎ শুধুমাত্র নূতন মুদ্রাতেই কাজকারবার, আদান-প্রদান চলিবে। তবে কষ্টকর হইলেও, নূতন শিল্প যুগে প্রবেশোদ্যত ভারত তাহার অতীতের অচল, অকেজো ব্যবস্থাসমূহ ধীরে ধীরে

পরিত্যাগ করিয়া যুগোপযোগী নূতন নূতন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাতে সুসজ্জিত হউক, ইহাই কাম্য। সেই দিক হইতেই বলা যায় যে, নূতন মুদ্রাব্যবস্থার প্রবর্তন সময়োপযোগীই হইয়াছে। আজ পৃথিবীর ১০৫টি দেশে এই ব্যবস্থা প্রচলিত। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ১৭৯৯ সালে, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ১৮৩৯ সালে, জার্মানী ১৮৭৩ সালে, এমন কি জাপানে যে ব্যবস্থা ১৮৭১ সালে গ্রহণ করিয়াছে, ১৯৫৭ সালে ভারতের এই পদ্ধতি আরও বিলম্বে গ্রহণ করা উচিত একথা নিশ্চয়ই কেহ বলিবে না।

স্বাধীন ভারতে সাহিত্যের মর্যাদা ও সাহিত্য আকাদমী

॥ ইংরেজ আমল ॥ বর্তমান অবস্থা ও উদ্দেশ্য ॥ বিপক্ষ সমালোচনা ॥
॥ স্বপক্ষে সমালোচনা ॥ আকাদমীর গঠন পরিচয় ॥ কর্মপরিচয় ॥
॥ ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ॥

ইংরেজ আমলে রাষ্ট্রের সহিত সাহিত্যিক সম্প্রদায়ের তেমন কোন সম্পর্কই ছিল না। তাহার কারণ এই যে, বিচক্ষণ ইংরেজ শাসককুল ভালভাবেই জানিতেন, রুশো, ভলতেয়ার, মণ্টেগু, কার্ল মার্কস্ প্রভৃতি মনীষিগণ চিন্তার রাজ্যে যে বিবর্তন ও বিপ্লব আনিয়া দিয়াছিলেন, তাহাতে নিছক সাহিত্যের জন্যই সাহিত্য-সৃষ্টি হইবে না। সারা দুনিয়ার লেখক-গোষ্ঠী বঞ্চিত ও অবহেলিত মানবজাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার কথাই ব্যক্ত করিবেন তাঁহাদের সাহিত্যের মাধ্যমে। সুতরাং যে যুগে "pen is mighter than sword" এই নীতি সাধারণভাবে স্বীকৃত, সে ক্ষেত্রে ইংরেজ শাসককুলের পক্ষে ভারতীয় লেখক সম্প্রদায়কে সুনজরে না দেখাই স্বাভাবিক। এই কারণে, আমাদের বিগত দুইশত বৎসরের সাহিত্য-ইতিহাসে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতার কোন নজির নাই।

ভারতবর্ষ আজ স্বাধীন হইয়াছে। জাতীয় সরকার বুঝিতে পারিয়াছেন সমগ্র দেশবাসীর প্রাণে যদি শিক্ষা ও সংস্কৃতির ভাবধারা জাগাইয়া না দেওয়া যায়, তাহাদের জাতীয় চেতনায় ও আদর্শে উদ্বুদ্ধ না করা যায়, তাহা হইলে দেশের সত্যিকারের স্থায়ী কল্যাণ কোন দিনই সাধিত হইবে না। এবং যে দেশের আপামর জনসাধারণ অশিক্ষা ও অজ্ঞানতার অন্ধকারে আজও আচ্ছন্ন, সে দেশ ও জাতির পক্ষে আজিকার মতো দ্রুত পরিবর্তনশীল জগতে টিকিয়া থাকা দুরূহ ব্যাপার। আজ তাই স্বাধীন ভারতে সাহিত্যের মর্যাদা স্বীকৃত হইয়াছে :— জাতীয় সরকার দেশের শিল্প-সাহিত্যের উন্নতি ও প্রসারের জন্য সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছেন।

কিন্তু, সাহিত্যক্ষেত্রে সরকারের এই পদক্ষেপ অনেকেই সহজ মনে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের ধারণা, সাহিত্যের মধ্যে যে একটি স্বাধীন মনোভাব আছে, এখন তা ব্যাহত হইবে। সাহিত্যের নামে এখন হইতে যাহা সৃষ্টি হইবে, তাহার অধিকাংশই হইবে ফরমায়েশী রচনা,—যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে হইয়া দাঁড়াইবে নেহাতই প্রচারধর্মী। স্বাধীন মতামত প্রকাশ করিতে গিয়া শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধাচরণ করা হয়ত অনেক লেখকেরই পক্ষে সম্ভবপর হইবে না। সুতরাং সরকারাশ্রিত সাহিত্য যথার্থ সাহিত্যপদবাচ্য কিনা, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ থাকিবে।

উপরোক্ত ধারণাটি একেবারে অমূলক নয়। এই সেদিনও প্রখ্যাত রুশ লেখক পেস্তারনেকের "ডাঃ জিভাগো" গ্রন্থখানি লইয়া আলোচনার ঝড় উঠিয়াছিল। লেখকের স্বাধীনতা ও মতামত সম্পর্কে একশ্রেণীর সমালোচক অত্যন্ত সজাগ। আমাদের দেশের 'নীলদর্পণে'র কথাও আশা করি কেহ ভুলিয়া যাইবেন না। এ ধরনের ভূরি ভূরি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে যেখানে স্বাধীন মতামত প্রকাশের জন্য সাহিত্যিককে রীতিমত রাজরোষে পড়িতে হইয়াছে। তবু, ইতিহাসে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় উৎকৃষ্ট সাহিত্য-সৃষ্টির নজিরও কম নাই। মহাকবি কালিদাস মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভাকবি ছিলেন। কবি ফেরদৌসী কর্তৃক 'শাহনামা' রচিত হইয়াছিল গজনীর মহম্মদেরই অনুরোধক্রমে, এবং ভারতচন্দ্রের "অন্নদামঙ্গল" রচিত হইয়াছিল মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশেই। সুতরাং, দেখা যাইতেছে, সরকার যদি উদার মনোভাব লইয়া সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য আগাইয়া আসেন, এবং লেখক-সম্প্রদায়ও নিছক প্রচারধর্মী সাহিত্য রচনা না করিয়া সত্যিকারের সাহিত্য রচনায় প্রয়াসী হন, তবে একের পৃষ্ঠপোষকতায় অপরের পক্ষে উৎকৃষ্ট সাহিত্য সৃষ্টি একেবারেই অসম্ভব নয়।

এখন, সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার কথা। বর্তমান সরকার জাতীয় সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য যে সব পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন তাহা সবই একটি সংস্থার মাধ্যমেই করা হইয়াছে। সংস্থাটির নাম "সাহিত্য আকাদমী"। সরকার ইহার ব্যয় বহন করা ছাড়া অন্য কোনপ্রকার কার্যাবলীতে হস্তক্ষেপ করেন না।

ইং ১৯৫৪ সালের ১২ই মার্চ নূতন দিল্লীতে এই "সাহিত্য আকাদমী"র উদ্বোধন হয়। ইহার সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু এবং সহ-সভাপতি ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন। এছাড়া, প্রত্যেক রাজ্য হইতে একজন সদস্য,

ভারতীয় সংবিধানে উল্লিখিত চৌদ্দটি ভাষার চৌদ্দজন প্রতিনিধি, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে নির্বাচিত কুড়িজন প্রতিনিধি, আটজন প্রথিতযশা সাহিত্যিক, সঙ্গীত, নাটক ও ললিতকলা আকাদমী হইতে দুইজন করিয়া প্রতিনিধি,—এই লইয়া ইহার পরিচালক-মণ্ডলী গঠিত। ইহা ছাড়া কয়েকজন সরকারী প্রতিনিধিও আছেন।

ইহার সংবিধানে বলা হইয়াছে—a national organisation to work actively for the development of Indian letters, to set high literary standard, to foster and co-ordinate literary activities in all the Indian languages and to promote through them all the cultural unity of the country. আজ পর্যন্ত "সাহিত্য আকাদমী" যে সমস্ত কাজে অগ্রণী হইয়াছে তাহার মধ্যে গ্রন্থ প্রকাশই প্রধান। যে পুস্তকগুলি ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হইয়াছে তাহার মধ্যে আছে,—কালিদাসের "মেঘদূত" (সম্পাদনা ও ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়াছেন ডক্টর সুশীল কুমার দে), "বৈষ্ণব পদাবলী" (শ্রীসুকুমার সেন সম্পাদিত) ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের "আরোগ্য নিকেতনের" হিন্দী অনুবাদ। বর্তমানে, সাহিত্য আকাদমীর পক্ষ হইতে ভারতের বিভিন্ন ভাষার লেখকদের একটি জাতীয় পঞ্জী সংকলনের কাজে হাত দেওয়া হইয়াছে।

এই সমস্ত প্রকাশনার পিছনে রহিয়াছে 'ন্যাশনাল বুকট্রাস্ট'। এটি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকাশ-সংস্থা। সাহিত্যের উন্নয়নকল্পে যে কোন ভারতীয় ভাষায় লিখিত উৎকৃষ্ট পুস্তক প্রকাশ করাই ইহার প্রধান কাজ। তাহা ছাড়া, সুবিধাজনক মূল্যে পাঠাগার, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও জনসাধারণকে সৎ-সাহিত্য কিনিতে সাহায্য করিবে এই সংস্থা।

শুধু উৎকৃষ্ট পুস্তক প্রকাশ করিয়াই "সাহিত্য আকাদমী"র কাজ শেষ নয়। যাহাতে কিশোর, বয়স্ক—সর্বসাধারণের উপযোগী মহৎ ও উৎকৃষ্ট সাহিত্যের সৃষ্টি হইতে পারে তাহার জন্যে আকাদমীর পক্ষ হইতে সাহিত্যিকদের প্রচুর অনুপ্রেরণা দেওয়া হইয়া থাকে। বর্তমানে আমাদের দেশে কিশোরদের উপযোগী পুস্তকের একান্ত অভাব। শিশুদের উপযোগী দুইচারখানা বই যাহা বাজারে মিলে তাহা পর্যাপ্ত নয়। তাহা ছাড়া, শিশু সাহিত্যের নামে যে সমস্ত বই আজও বাজার জাঁকাইয়া আছে, তাহাদের বেশীর ভাগই হয় খাঁটি সাহিত্যের বিচারে সাহিত্যপদবাচ্য নয়, নতুবা তাহারা আদৌ শিশুমনের উপযোগী কিনা সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। এ কারণে, কিশোরদের মনের সঙ্গে মিলাইয়া

জ্ঞানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া নতুন ধরনের পুস্তক প্রকাশ আবশ্যক। সরকার এই প্রকার পুস্তক রচনার জন্য প্রতি বৎসর প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। শ্রেষ্ঠ রচয়িতাকে পাঁচশত টাকা করিয়া পুরস্কার দেওয়া হয়। শিল্প-সাহিত্যেও অনুরূপ ব্যবস্থা আছে। এখানে পুরস্কারের পরিমাপ হাজার টাকা। মৌলিক রচনাই অগ্রগণ্য—তবে নাম-করা বিদেশী রচনার সার্থক অনুবাদকেও গ্রহণ করা হয়।

এ সব ছাড়াও, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিভিন্ন ভাষায় শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্টির জন্য সরকার "সাহিত্য আকাদমী পুরস্কার" দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ১৯৫৪-৫৬ সালের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রচনার জন্য নিম্নলিখিত গ্রন্থকারদের প্রত্যেককে পাঁচ হাজার টাকা করিয়া পুরস্কার দিয়া সম্মানিত করা হইয়াছে :

ভাষা	গ্রন্থ	গ্রন্থকার
বাঙলা	সাগর থেকে ফেরা (কবিতা)	শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র
হিন্দী	বৌদ্ধধর্ম-দর্শন (দর্শন)	৺আচার্য নরেন্দ্র দেব
মালয়ালম্	যেস্মিন (উপন্যাস)	থাকাজী শিবশঙ্কর পিল্লাই
তেলুগু	শ্রীরামকৃষ্ণনি জীবিত চরিত্র (জীবনী)	চিরন্তনানন্দ স্বামী

সম্প্রতি, সরকার ভারতীয় ভাষার নিম্নলিখিত ১০ জন বিশিষ্ট লেখককে তাঁহাদের ১৯৫৫-৫৭ সালের মধ্যে প্রকাশিত উৎকৃষ্ট পুস্তকের জন্য "সাহিত্য আকাদমী পুরস্কার" দিয়াছেন। প্রত্যেক পুরস্কারে এই ব্যাপারের স্মৃতিচিহ্নবাহী একখানি তাম্রফলক ও পাঁচ হাজার টাকার একখানি চেক দেওয়া হইয়াছে।

ভাষা	গ্রন্থকার
বাঙলা	শ্রীরাজশেখর বসু
গুজরাটি	পণ্ডিত সুখলালজী
হিন্দী	শ্রীরাহুল সংকৃত্যায়ণ
কানাড়ি	শ্রীডি. আর. বেন্দ্রে
কাশ্মীরী	শ্রীআক্‌তার মহীউদ্দীন
মালয়ালম্	শ্রীকে. পি. কেশব মেনন
মারাঠি	শ্রীচিন্তামন রাও কোলহাটকর
ওড়িয়া	শ্রীকানুচরণ মহান্তি
তামিল	শ্রীরাজাগোপালাচারী
উর্দু	শ্রীআলী সেকেন্দার
”	জীগর মোরাদাবাদী

সরকারের এই প্রচেষ্টা যে জাতির পক্ষে কতখানি কল্যাণকর তাহা বুঝাইয়া বলা নিষ্প্রয়োজন। ইহাতে একদিক দিয়া যেমন উৎকৃষ্ট সাহিত্য সৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা সূচিত করে, তেমনি আবার দরিদ্র সাহিত্যিক গোষ্ঠীর কাছে ইহা ভগবানের আশীর্বাদ স্বরূপ। প্রতিভাবান সাহিত্যিকরা যদি সরকারের এই শুভ প্রচেষ্টায় সাড়া দেন, তাহা হইলে দেশের ও দশের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইতে পারে, উপরন্তু ইহাতে তাঁহাদের আর্থিক অবস্থাও কিঞ্চিৎ স্বচ্ছল হয়। কিন্তু, দুর্ভাগ্যের বিষয়, আজও পর্যন্ত প্রতিভাবান সাহিত্যিকদের কাছ হইতে তেমন সাড়া পাওয়া যায় নাই। মনে হয়, সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা সম্বন্ধে সাহিত্যিকদের মনে আজও কিছুটা সন্দেহ ও সংশয় আছে। প্রসঙ্গত বলা যাইতে পারে যে, বাঙলা সাহিত্যে আজ পর্যন্ত মোট চারজন সাহিত্যিক আকাদমী পুরস্কারে সম্মানিত হইয়াছেন—লোকান্তরিত কবি জীবনানন্দ দাশ (শ্রেষ্ঠ কবিতা), ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (আরোগ্য নিকেতন), সুকবি প্রেমেন্দ্র মিত্র (সাগর থেকে ফেরা), এবং প্রবীণ সাহিত্যিক রাজশেখর বসু (আনন্দীবাঈ ও অন্যান্য গল্প)।

পরিশেষে, সাহিত্য আকাদমীর শ্রেষ্ঠ রচনা নির্ধারণ-পদ্ধতি এবং সাধারণের মনে তাহার প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলা যাইতে পারে। বিগত দুই বৎসরের শ্রেষ্ঠ রচনা নির্বাচন সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে একটা ধারণা হইয়াছে যে, যে সমস্ত রচনার জন্য সাহিত্যিকদের সম্মানিত করা হইয়াছে, সব ক্ষেত্রে সেগুলি সেই সব সাহিত্যিকের শ্রেষ্ঠ রচনা কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। অথচ, সাহিত্যিকদের নামের পিছনে সেই সেই রচনাগুলিকেই তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-সৃষ্টি বলিয়া প্রচার করা হইতেছে। ইহাতে, সাহিত্য ও সাহিত্যিকের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইতেছে বলিয়াই অনেকের ধারণা। এ ক্ষেত্রে, মনে হয়, ভবিষ্যতে সরকার যদি নির্ধারণ-পদ্ধতির কিছুটা পরিবর্তন করেন, তাহা হইলে এই ভ্রান্ত ধারণা সহজেই দূরীভূত হইতে পারে।

দ্বিতীয় কথা, সাহিত্যের মান নির্ণয়। বাঙলায় মধু, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথের পরে উন্নত সাহিত্যের দৃষ্টান্তের অভাব হইবে না, কারণ তাঁহারাই সে দৃষ্টান্তের স্থল স্বরূপ। তেমনি উর্দু ও হিন্দিতে উন্নত সাহিত্যের উদাহরণ হইলেন প্রেমচাঁদ। অর্থাৎ যে সাহিত্য বিশ্বের গতিশীল চিন্তার সহিত পা ফেলিতে পারে না, যে সাহিত্য সংকীর্ণ স্বাদেশিকতার নামে অন্ধ গোঁড়ামিকেই প্রশ্রয় দান করে—অথবা যে সাহিত্য মানুষের বহু সহস্র বৎসরের কাম্য মানব-মুক্তির বাণী বহন করে না—বলা বাহুল্য, তাহা যতই জনপ্রিয় হউক, উহা নিকৃষ্ট সাহিত্য। দুঃখের বিষয়,

তেমন সাহিত্য যে পুরস্কৃত হইয়া প্রশ্রয় পাইতেছে না—তাহা নয়। এইরূপ ভ্রান্ত নির্বাচন আজ ক্ষমতার জোরে যতই ঢক্কা নিনাদ করিয়া প্রতিষ্ঠিত করা হোক, কালের ভ্রূকুটি ইহাকে একদিন অপদস্ত করিবেই।

বেকার সমস্যা

॥ এ সমস্যা অতীতে ছিল না ॥ বর্তমান সংকটের কারণ ॥ মহাযুদ্ধ ॥ ॥ শিল্পায়ন ॥ দেশবিভাগ ॥ সরকারী পরিকল্পনা ॥ বিশ্ববিদ্যালয়ের দায় ॥ কারিগরী শিক্ষা ও কৃষির উন্নয়ন ॥ সমাধানের পথ ॥

অন্যান্য বহু সমস্যার মধ্যে বর্তমান বাঙলার বেকার সমস্যা একটি প্রধান সমস্যা। ভারতের তথা বাঙলার ইহা চিরন্তন সমস্যা নয়। বাঙলা কৃষিপ্রধান দেশ। সুজলা সুফলা বঙ্গভূমি তার অপর্যাপ্ত ধনভাণ্ডার দিয়া আপন সন্তানকে প্রতিপালন করিয়াছে। বঙ্গবাসী কৃষিকাজ করিয়াছে—গোয়ালভরা গরুর দুধ, বাগানভরা সবজি আর পুকুরভরা মাছের যোগান পাইয়া পরম পরিতৃপ্তিতে দিন কাটাইয়াছে। চাকরির সন্ধানে উদয়াস্ত অফিস আর কারখানার দ্বারে দ্বারে হাত পাতিতে হয় নাই। অন্নবস্ত্রের অভাব ছিল না দেশে। তাই বেকার-জীবন থাকিলেও তাহা সমস্যা হইয়া দেখা দেয় নাই।

কুটিরশিল্প ও কৃষিই এককালে আমাদের জীবিকার প্রধান উপায় ছিল। যন্ত্রশিল্পের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই কুটিরশিল্পের চাহিদা কমিল—হস্তশিল্পের অবনতি ও অবলুপ্তি আরম্ভ হইল। অর্থ উপার্জনের পথ বন্ধ হইলে গ্রামের ঘরে ঘরে বেকারজীবন দেখা যাইতে লাগিল। যাহারা চাষের জীবনে অভ্যস্ত নয়, তাহারাও মাঠে গিয়া নামিল। কিন্তু ক্ষেতের পরিমাণ সীমাবদ্ধ। এত লোকের স্থান তাহার কাছে কোথায়! বিশেষ করিয়া নতুন ভূমি-প্রথার সৃষ্টি হওয়াতে বাঙলার কৃষকের জীবন আরও শোচনীয় হইয়া উঠিল।

কারখানার বাঁশীর ডাক শুনিয়া গ্রাম ছাড়িয়া লোক ভিড় করিল শহরে—বিশ্বাস, যন্ত্রজগৎ তার অন্নসমস্যার, বস্ত্রসমস্যার সমাধান করিয়া দিবে। বেকার জনতার একটি অংশ যে তাহাতে স্থান না পাইল তাহা নয়, কিন্তু অধিকাংশকেই অলসজীবনে আশ্রয় লইতে হইল। কিন্তু তখনও বেকার সমস্যা দেশের একটা প্রধান সমস্যা হইয়া দাঁড়ায় নাই।

তারপর একদিন আসিল পৃথিবীব্যাপী মহাসমর। পর পর বিশ্ববিধ্বংসী দুইটি যুদ্ধ ভারতের জীবনকেও বিপর্যস্ত করিয়া দিয়া গেল। যুদ্ধের বাজারে জিনিস

দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হইলেও যুদ্ধের সাজসরঞ্জামের জন্য বহু নূতন কাজের পত্তন হইল। অনেক বেকার জীবনের সমস্যার সমাধান হইয়া গেল। কিন্তু সে কয়দিনের জন্য? যুদ্ধের নিবৃত্তি হইল,—নূতন নূতন সব কাজ উঠিয়া গেল। অর্থের ও সচ্ছল জীবনের আস্বাদ লইয়া কর্মচ্যুত লোক দলে দলে আসিয়া আবার পথে দাঁড়াইল। ইতিপূর্বেও দেশে বেকার ছিল। কিন্তু তাহাদের সংখ্যা ছিল অল্প, অভাববোধও ছিল তাহাদের কম, তাই সমস্যাও বিরাট আকার ধারণ করে নাই।

প্রতি বৎসর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পাসকরা যে সব শিক্ষিত লোক বাহির হইতেছে, উপযুক্ত কর্মসংস্থানের অভাবে তাহারা অর্থ উপার্জনের কোন পথ খুঁজিয়া পাইতেছে না। কর্মের স্থান নাই, অথচ জীবনের মান বাড়িয়াছে—এই উভয় সংকটে পড়িয়া দেশের শিক্ষিত যুবকবৃন্দ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছে। ব্যবসায়ী বুদ্ধি আমাদের নাই, মূলধনেরও যথেষ্ট অভাব। সুতরাং ব্যবসায়ে নামিয়া জীবনের পথ খুঁজিয়া লওয়াও বাঙালীর পক্ষে সম্ভব হইতেছে না। তদুপরি আর্থনীতিক অবস্থার ফলে তাহারা কর্মক্ষেত্রে নামিয়া সমস্যাটিকে আরও একটু জটিল করিয়াছে।

দেশ বিভাগের ফলে গত কয়েক বৎসর ধরিয়া উদ্বাস্তুরা এখানে আসিতেছে; তাহাদের পুনর্বাসনের সঙ্গে সঙ্গে দেশের বেকার সমস্যা ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম দেশে প্রতিদিনই বাড়িয়া চলিতেছে—অথচ উপার্জন নাই। বেকার বাঙালীর জীবন আজ চরম দুর্দশাগ্রস্ত। প্রকৃত বেকার, ছদ্মবেশী বেকার, উপার্জনক্ষম এবং ক্ষমতাহীন সকলে মিলিয়া এক পশ্চিমবঙ্গেই প্রায় ১৫ লক্ষের উপর বেকার আছে। ইহাদের মধ্যে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বেকারই দেশের সহানুভূতি আকর্ষণ করে বেশী। ইহারা পথে নামিয়া শ্রমিকের কাজে হাত দিতে পারে না, আবার উপযুক্ত কাজ পাইবারও কোন পথ নাই। বেকার সমস্যা ইহাদেরই যেন বেশী করিয়া তিলে তিলে মরণের মুখে ঠেলিয়া দিতেছে।

বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য বহু পরিকল্পনা আরম্ভ হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার সমস্যাটিকে নিজেদের হাতেই তুলিয়া লইয়াছেন। তাহাদের মতে এই সমস্যার সমাধানের উপায় রহিয়াছে যন্ত্রশিল্পের প্রসারের মধ্যে। এই পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার জন্য দেশে নানা রকম 'প্রজেক্ট' ও 'দামে'র প্রতিষ্ঠা হইয়াছে এবং হইতেছে। তাহাতে লোকও নিযুক্ত হইয়াছে অনেক। কিন্তু বেকারজীবনের বিরাট সংখ্যার একটি ক্ষুদ্র অংশকে কাজ দিলে সমস্যার খুব

বেশী কিছু সমাধান ত হইল না। বহু যন্ত্রশিল্পের প্রতিষ্ঠা হইলে সমাধান কিছু হইতে পারে, কিন্তু দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থার পক্ষে বহু বড় শিল্পের দ্রুত সংগঠন সম্ভব নয়। সেইজন্য অর্থের যেখানে খুব বেশী প্রয়োজন নাই, অথচ শ্রমিকের প্রয়োজন আছে, সেইরকম ছোট শিল্প এবং কুটিরশিল্পের প্রতিষ্ঠার দিকেই দেশের দৃষ্টি দিতে হইবে। দেশের এই ঘোর দুর্দিনে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার দিকে আমাদের তাকাইয়া থাকিলে চলিবে না। অবিলম্বেই এই ছোট শিল্প ও হস্তশিল্পের পুনঃপ্রবর্তনের জন্য সচেষ্ট হইয়া উঠিতে হইবে।

শিক্ষিত বেকারজীবনের জন্য আমাদের নিকট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতি ও পাঠ্যতালিকাও কিছু পরিমাণে দায়ী। বিশ্ববিদ্যালয় একটি ডিগ্রির ছাপ দিয়া আমাদের কর্মক্ষেত্রে ছাড়িয়া দেয়—সংসারের পথে চলিবার মতো কোন উপযুক্ত শিক্ষা সে আমাদের প্রায় দেয় না। এই শিক্ষারই পরিবর্তন কিছু করিতে হইবে। বিভিন্ন যন্ত্রশিল্প, কুটিরশিল্প এবং আরও বহু কর্মক্ষেত্রের উপযোগী বৃত্তি শিক্ষারই ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়কে করিতে হইবে। ইওরোপে এই বৃত্তিশিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা রহিয়াছে। যাহারা উচ্চশিক্ষার জন্য অগ্রসর হইতে পারিল না, তাহারাই কোন প্রকার কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া জীবনক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া গেল। শিল্প প্রসারের সঙ্গে সঙ্গেই বহু কারিগর, বহু সুদক্ষ পরিচালকের প্রয়োজন হইবে। এই দায়িত্ব রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয়কেই গ্রহণ করিতে হইবে।

শুধু কারিগরী শিল্পের দিকেই সযত্ন দৃষ্টি দিলে চলিবে না। কৃষির উন্নতির জন্যও সচেষ্ট হইতে হইবে। কৃষির উন্নতির জন্য কৃষকদের উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। অধিক শস্য উৎপাদনের জন্য জমির উর্বরতা বৃদ্ধি ও উপযুক্তরূপে জমি-বন্টন ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টি দিতে হইবে। অনাবাদী জমিকেও ফেলিয়া রাখিলে চলিবে না। এই সঙ্গে পল্লী উন্নয়নের কথাটিও আমাদের মনে রাখিতে হইবে। শ্রীহীন পল্লীতে দুর্ভোগ ভুগিবার জন্য এখন আর আমরা কেহই সেখানে যাইতে চাহি না। পল্লীর সৌন্দর্য আবার যদি ফুটাইয়া তোলা যায়, জীবনযাত্রা যদি সুখকর হইয়া উঠে, তবে শ্বাসরোধকারী নাগরিক আবহাওয়া হইতে অনেকেই আবার পল্লীর কোলে আশ্রয় লইবে। শিক্ষা আর ধনের সহযোগিতায় হস্তশিল্প ও কৃষিশিল্পের বিশেষ উন্নতি হইবে, আর এই অতিরিক্ত জনতার চাপ কমিয়া গিয়া নাগরিক জীবনকেও একটু সচ্ছল করিয়া দিবে।

দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধিও বেকার সমস্যার একটি বড় কারণ বলিয়া ধরা হইয়া থাকে। সরকার তাই জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য পরিবার-পরিকল্পনায় হাত

দিয়াছেন। কিন্তু এই পরিকল্পনার ভিতর দিয়া বেকার সমস্যার আশু কোন প্রতিকারের সম্ভাবনা নাই। লোকসংখ্যা না বাড়িলে ভবিষ্যতে বেকারজীবনের সংখ্যা আর বাড়িবে না বটে; কিন্তু ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সর্বনাশা বেকার সমস্যার আশু প্রতিকারের দিকেই আমাদের মনঃসংযোগ করিতে হইবে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সরকার এই সমস্যা সমাধানের কথা ভাবিয়াছেন। কাজও হয়ত অল্প কিছু হইয়াছে। দ্বিতীয় পাঁচ বৎসরের জন্য রাজ্যসরকার আবার যে পরিকল্পনা তৈয়ারি করিয়াছেন তাহার মধ্যেও এই সমস্যার বিশেষ স্থান আছে। কিন্তু শুধু পরিকল্পনার স্বপ্নজাল বুনিলেই চলিবে না—এই পরিকল্পনা যাহাতে সুচারুরূপে সাফল্যমণ্ডিত হয় সরকারের সজাগ দৃষ্টিকে সেই দিকেই লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যথাসাধ্য বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের প্রতিষ্ঠা করিয়া সেই সঙ্গে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প, গৃহশিল্প, রাস্তাঘাট নির্মাণ এবং জীবন ও যুগের উপযোগী আরও বিবিধ কর্মসংস্থানের প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারকে পাশাপাশি দাঁড়াইতে হইবে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়, শিল্প, শিক্ষা, গৃহনির্মাণ, বাঁধ-বন্ধন প্রভৃতি যে সব উপায়ের কথা চিন্তিত হইয়াছে, সুপরিচালিত হইয়া তাহা কার্যকরী হইলে বেকারজীবনের অভিশাপ যে অনেকখানি হ্রাস-প্রাপ্ত হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু শুধু সরকারের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিলেই চলিবে না। দেশের অধিবাসিগণকেও এ সমস্যা সমাধানের পথে নামিয়া আসিতে হইবে। শুধু চাকরির আশায় বসিয়া থাকিলেই আমাদের চলিবে না। অল্প মূলধন লইয়াই সতর্কতার সহিত ছোট ছোট ব্যবসায় আরম্ভ করিতে হইবে। অকর্মণ্য জীবন যাপন করিতে করিতে আমরা যে শক্তিকে এতদিন ধরিয়া অপচয় করিয়া আসিতেছি, সেই শক্তিকেই পুনরায় জাগ্রত করিয়া তুলিয়া দেশের শক্তি, শ্রীকে ফিরাইয়া আনিতে হইবে।

আর্থনীতিক অবনতি আর কর্মসংস্থানের অভাব বেকার সমস্যাকে আজ এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে আনিয়া দাঁড় করাইয়াছে। এই আর্থনীতিক উন্নতির উদ্ভাবনাই বেকার সমস্যার সমাধানের গোড়ার কথা। দেশের অর্থের উন্নতিতে শিল্পের উন্নতি, ব্যবসার উন্নতি, কর্মসংস্থানের প্রসার, বাজারদরের সমতা নির্ভর করে। আর এই সমবেত সমুন্নতি হইতেই বেকার জীবনের অবসান হইবে। তাই বেকার সমস্যার সমাধানের প্রথম কথাই ভারতের আর্থনীতিক বৈচিত্র্যময় ও সমতামূলক বিকাশ সাধন। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই কাজে অগ্রসর হইতেছে আর আশাও করা যায় যে, জনগণের সহায়তায় এই পরিকল্পনাই একদিন জাতীয় জীবনকে ধ্বংসের মুখ হইতে বাঁচাইয়া তুলিবে।

সর্বোদয় পরিকল্পনা ও ভূদান আন্দোলন*

॥ গান্ধিজীর স্বপ্ন ॥ বিনোবা ভাবে ॥ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ॥
॥ পরিকল্পনার রূপায়ণ ॥ গ্রামের অবস্থা ॥ পরিকল্পনার বিরুদ্ধ সমালোচনা ॥ উপসংহার ॥

এই পরিকল্পনার আলোচনা প্রসঙ্গে এমন একজনের নাম প্রথমেই মনে পড়ে যিনি ছিলেন দরিদ্র, শোষিত ও মূক ভারতের আত্মার আত্মীয়—যাঁর স্বপ্নে ছিল ভারতের নবীন উজ্জ্বল এক জীবন—কর্মে ছিল সেই স্বপ্নকে রূপায়িত করার অক্লান্ত প্রেরণা। সেই মহামানব হইলেন দেশবরেণ্য মহাত্মা গান্ধী। সর্বদর্শী মহাত্মা গান্ধী যে শুধু দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্যই আপনাকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন তাহাই নহে, সেই সঙ্গে ভবিষ্যৎ স্বাধীন ভারতের নূতন সমাজ গঠনের পরিকল্পনাও তিনি করিতেছিলেন। মহাত্যাগীর অক্লান্ত চেষ্টায় দেশ পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত হইল, কিন্তু মহাত্মা তাঁহার নূতন সমাজ গঠনের পরিকল্পনাকে বাস্তবরূপ দিতে পারিলেন না। অকস্মাৎ একদিন এই পৃথিবী হইতে তাঁহাকে বিদায় গ্রহণ করিতে হইল।

মহাত্মার এই সুন্দর সমাজ গঠনের পরিকল্পনার নামই সর্বোদয়। সকলের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিই সর্বোদয় পরিকল্পনার আদর্শ। পশ্চিমের মিল, বেন্থাম চাহিয়াছেন—Greatest good of the greatest number. যথাসাধ্য বেশী সংখ্যক লোকের জন্য যতখানি সম্ভব কল্যাণ কামনা তাঁহারা করিয়াছিলেন। দেশের প্রত্যেকেই উন্নত হইবে এমন আশা তাঁহারা করিতে পারেন নাই। সর্বোদয়ের আদর্শ দেশের প্রত্যেকটি লোকের সার্বিক কল্যাণ।

দেশের স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে মহাত্মার জীবনাবসান ঘটিল। তাঁহার পরিকল্পিত নূতন সমাজ গঠনের আদর্শের দায়িত্ব মহাত্মার অনুগামী সহকর্মিগণ আপনাদের হাতে তুলিয়া লইলেন। গান্ধিজীর কল্পনাকে ব্যর্থ হইতে দিলেন না। ১৯৫০ সালে স্বদেশপ্রেমিক কর্মীরা সর্বোদয়ের এক সম্মিলনী আহ্বান করেন, এবং সেই সভাতে সর্বোদয়ের পরিকল্পনা বিশেষভাবে গৃহীত হইল। পরিকল্পনাকে কার্যকরী করিয়া তুলিবার জন্য এবং তাহার স্বার্থক বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য একটি সঙ্ঘও প্রতিষ্ঠিত হইল—সেই প্রতিষ্ঠান সর্বোদয়-সেবাসঙ্ঘ। সঙ্ঘের ব্রত—অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে, স্বাস্থ্যে, শিক্ষায় এবং সর্বোপরি মানবত্বের পরিপূর্ণ বিকাশে দেশকে শান্তিশ্রীমণ্ডিত করিয়া তোলা। এই সেবাসঙ্ঘেরই একজন প্রধান হইলেন আচার্য বিনোভা ভাবে।

* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৭

সর্বোদয় রাজনৈতিক আন্দোলন নয়। সমবায়ের ভিত্তিতে গ্রামগুলিকে শ্রীমণ্ডিত করিয়া তোলাই এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। গ্রামে গাঁথা দেশ আমাদের। সমাজকে উন্নত করিতে হইলেই গ্রামীণ সমাজের দিকেই দৃষ্টি দিতে হইবে। সর্বোদয় পরিকল্পনায় প্রত্যেকটি গ্রাম এক-একটি পরিবার—বহু পরিবারের সমষ্টি মাত্র নয়। গ্রামকে স্বাবলম্বী হইতে হইবে। গ্রামবাসীর নিত্যপ্রয়োজনের খাদ্যবস্তু, বস্ত্র ও অন্যান্য কুটির শিল্পের উৎপাদনের ও বণ্টনের ভার থাকিবে সম্পূর্ণভাবে তাঁহাদের নিজেদের উপরে। গ্রাম শাসন ও পরিচালনের ক্ষমতা সর্বোদয় সমাজের উপরেই ন্যস্ত হইবে এবং এইজন্য ন্যায়সঙ্গত অর্থসাহায্য আসিবে সরকারের তহবিল হইতে। গ্রামবাসীর শুধু আপন গ্রামের উপরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখিলেই চলিবে না। প্রতিবেশী গ্রামের সঙ্গে আদান-প্রদান ও সহযোগিতা স্থাপন করিয়া সুন্দর ও সম্পূর্ণ হইয়া উঠিবার চেষ্টাও করিতে হইবে।

কিন্তু এই সর্বাঙ্গসুন্দর সর্বোদয়-সমাজ গঠনের জন্য গ্রামবাসীদের শিক্ষার প্রয়োজন। যে বৃত্তির সম্যক স্ফুরণে মানুষ হিংসা দ্বেষ ভুলিতে পারে, প্রতিহিংসার সুযোগ অন্বেষণ করে না, পরস্পর পরস্পরকে আপন আত্মার আত্মীয় বলিয়া গ্রহণ করে, অন্যের সুখে অন্যের দুঃখে সাড়া দিতে পারে—সর্বোদয় সমাজকে গঠন করিতে হইলে মানুষের সেই বৃত্তি, মানুষের সেই মানবত্ব ও মহত্ত্বকেই সর্বপ্রথমে জাগ্রত করিতে হইবে। মানবের মনের এই কল্যাণবুদ্ধিকে জাগ্রত করিবার জন্য, মানবত্ব বিকাশের জন্য সর্বোদয় সেবাসঙ্ঘ নতুন শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্তন করিল। এই শিক্ষাপদ্ধতি 'নঈ-তালিম'। এই শিক্ষার জন্য পুঁথিপত্রের প্রয়োজন হয় না—এই শিক্ষা শিল্প-কেন্দ্রিক। শিক্ষার্থীর মনে আদর্শ সমাজ-চেতনার জাগরণ, দেশপ্রেম ও মানবপ্রেমের উদ্বোধন, আপনাকে স্বাবলম্বী করিয়া তোলার মতো শক্তিসঞ্চার অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধন করাই এই শিক্ষাবিধির মুখ্য উদ্দেশ্য। নঈ-তালিমের বাহন মাতৃভাষা।

গ্রামের কৃষাণ মাটির মানুষ। মাটির মায়ের বুক হইতেই সে তাহার জীবিকা উপার্জন করে। কৃষাণের জীবন তাই মাটির সঙ্গেই ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। সর্বোদয় পরিকল্পনার সঙ্গে তাই ভূদান-যজ্ঞও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এই ভূদান-যজ্ঞের প্রধান হোতা আচার্য বিনোবা ভাবে।

গ্রামগুলিই ভারতের প্রাণকেন্দ্র—কৃষিই ইহার প্রধান ও বলিতে গেলে একমাত্র উপজীবিকা। সুতরাং গ্রাম উন্নয়ন পরিকল্পনায় কৃষি ও কৃষিপ্রণালীর উন্নতির উপায়কেই বিশেষভাবে চিন্তা করিতে হইবে। কৃষিসমস্যার প্রশ্ন উঠিলেই সেই সঙ্গে ভূমিসমস্যার প্রশ্ন আসিয়া পড়ে। এই সমস্যা ও তাহার সমাধানের

দায়িত্ব আপন হাতে গ্রহণ করিয়াছেন মহাত্মা বিনোবা ভাবে এবং সেই দায়িত্বে অংশ গ্রহণ করিবার জন্য ভূদান আন্দোলনে তিনি সমগ্র দেশবাসীকে আহ্বান জানাইয়াছেন। ভূমিহীন কৃষককে ভূমি দিতে হইবে—সেই জন্য চাই প্রভূত পরিমাণ ভূমি। ভূমি ভিক্ষার জন্য বিনোবা ভাবের পদযাত্রা আরম্ভ হইল। প্রথম আন্দোলন আরম্ভ হইল হায়দরাবাদের তেলেঙ্গানা অঞ্চলে ১৯৫১ সালে। তারপর ভারতের দিকে দিকে চলিল সেই অভিযান। এই আন্দোলন ভূম্যাধিকারীর কাছ হইতে ভূমি জোর করিয়া দখলে আনার সাম্যবাদীদের বিপ্লবী পন্থা নয়। মানুষের কারুণ্যকে উদ্বুদ্ধ করিয়া, উপচিকীর্ষার কোমল বৃত্তিকে জাগ্রত করাই ইহার উদ্দেশ্য। প্রয়োজনের অতিরিক্ত যাহার ভূমি পড়িয়া রহিয়াছে—ভূমিহীনের জন্য সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ভূমি দান করিবে। মাটির অধিকার তাহারই, মাটিতে সোনার ফসল ফলাইবে যে। আপন প্রয়োজনের অতিরিক্ত জমির সত্বকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিয়া আরও দশজনকে নিঃস্ব করিয়া রাখিব, উপবাসী রাখিব—বিধাতার ইহা বিধান নহে। জমির মালিক সর্বোদয় সমাজ। সেই সমাজই ভূমির উৎকর্ষ সাধন করিয়া এবং তাহাতে সোনার ফসল ফলাইয়া সকলের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিবে। এই নীতি—এই বাণীই ভূদান-যজ্ঞের মন্ত্রসূক্ত।

এই ভূদান আন্দোলনের মহৎ উদ্দেশ্যকেও কিন্তু সকলে সম্পূর্ণ স্বীকৃতি দিতে পারেন নাই। অনেকে মনে করেন জটিল অন্নসমস্যা ও ভূমিসমস্যার সমাধান এই পদ্ধতিতে হইতে পারে না। এই আন্দোলনে বহুশত লক্ষ একর জমি পাওয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহার অনেকখানিই অনাবাদী জমি। তাহার উপর সমস্ত ভারতময় যে জমি পাওয়া গিয়াছে, বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন গ্রামে সেইসব জমির বণ্টনও নিতান্ত সহজসাধ্য নয়। এ মত একেবারেই যুক্তিশূন্য নয়। কিন্তু তাই বলিয়া ভূদান আন্দোলনের উদ্দেশ্যকে একেবারে নিরর্থক বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না। কারণ, ভাল কাজের আধাও ভাল। বিনোবা ভাবে একটি অত্যন্ত বৃহৎ কাজে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন—সকল দিক দিয়া তিনি সম্পূর্ণ সার্থকতা লাভ নাও করিতে পারেন। কিন্তু ইহাতে মানবমনের মহত্ত্ব কিছুমাত্রও উদ্বুদ্ধ হইবে না, এবং তাহাদের অন্তরের করুণা সমাজের নিপীড়িত, নিঃস্ব বুভুক্ষু জনগণের উপরে বিন্দুমাত্রও বর্ষিত হইবে না—এমন কথাও ত বলা যায় না। আচার্য বিনোবা ভাবে মানুষের আন্তরশক্তিতে বিশ্বাস করেন। সেই শক্তি জাগ্রত হইলে শুধু জমি, শুধু ধন কেন—মানুষ মানুষের জন্য জীবন দান করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। মানুষের সেই সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করিয়া

দেওয়াই আন্দোলনের উদ্দেশ্য। এবং ভূদান-আন্দোলন মানুষের এই শক্তিকে, নীতিবোধকে যে বিশেষভাবেই জাগ্রত করিয়াছে, ভুমিদানের পরিমাণ হইতেই আমরা তাহার প্রমাণ পাই।

তবে এই সঙ্গে আরও একটি কথা ভাবিবার আছে। মহাত্মা বিনোবা এই বিরাট যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু এই কাজের উদ্‌যাপন একজন লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। দেশের রাজ্য সরকারকেও ইহার দায়িত্ব অংশত গ্রহণ করিতে হইবে। আন্দোলনের কাজ কিছু কিছু হইলেও এখনও ইহা প্রাথমিক অবস্থার মধ্যেই আছে। সর্বোদয় পরিকল্পনাকে, বিনোবা ভাবের ভূমিদান আন্দোলনকে সার্থক পরিণতি দান করিতে এবং ভারতকে শান্তির আবাস ও শ্রীমণ্ডিত করিয়া তুলিতে হইলে সমস্ত ভারতবাসীকেই স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া স্বার্থবুদ্ধি ও লুব্ধ প্রকৃতিকে বিসর্জন দিয়া অগ্রসর হইয়া আসিতে হইবে। তাহাদের সমবেত দানদাক্ষিণ্যে, বুদ্ধি, প্রেরণায় ও উৎসাহে, করুণা, প্রেম ও স্বার্থত্যাগে মহাত্মা বিনোবা ভাবের এই বিরাট ভূদান-যজ্ঞের অনুষ্ঠান নিশ্চয়ই সাফল্যমণ্ডিত হইবে। হৃতশ্রী ভারত আবার আপন ঋদ্ধিশ্রীতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে।

স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রভাষার সমস্যা*

॥ তাৎপর্য ॥ রাষ্ট্রভাষা ও সরকারী ভাষা ॥ অর্থতান্ত্রিক সমাধান ॥ সোভিয়েত, কানাডা ও সুইজারল্যাণ্ড ॥ ভারতীয় আপস ॥ হিন্দীর প্রতি শ্রদ্ধার কারণ ॥ হিন্দী বিরোধী মনোভাব ॥ ডাঃ সুনীতিকুমারের হিসাব ॥ হিন্দীর ঐক্যবিধানের ক্ষমতা ॥ ইংরেজীর স্বপক্ষে যুক্তি ॥

দেশ যতকাল পরাধীন থাকে ততদিন বিজেতার ভাষাই রাজভাষার সম্মানে অভিষিক্ত হয়। তাই দুই শত বৎসর ইংরেজ শাসনাধীন থাকায় ইংরেজী ভারতের রাজভাষা বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। পাশ্চাত্ত্যের সমৃদ্ধতম ভাষাকে রাজ-ভাষা বলিয়া মানিয়া লওয়ায় পশ্চাদ্‌পদ দেশের স্বাজাত্যাভিমান ক্ষুণ্ণ হইলেও শিক্ষাদীক্ষা কিংবা মননশীলতার বিকাশে বিশেষ কোন প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয় নাই। সে বাধা না থাকার ফলেই ভারতবাসীর পক্ষে বিজাতীয় ইংরেজী ভাষাতে পারদর্শিতা অর্জন সম্ভব হইয়াছিল। সম্ভব হইয়াছিল পরাধীন থাকিয়াও ভারতের পক্ষে সাহিত্যে ও বিজ্ঞানে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সম্মান অর্জন।

* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৮

কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পরে অবস্থার বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটে। স্বভাবতই স্বাজাত্যাভিমান ও দেশপ্রেমের নিরীখে প্রশ্নটিকে নূতন করিয়া যাচাই করার আবশ্যকতা দেখা দেয়। প্রশ্নটি এমনিতেই জটিল, তাহার উপর বৈচিত্র্যময় ভারতের বহুজাতির লীলাক্ষেত্রে রাষ্ট্রভাষার সমস্যা নূতন তাৎপর্যে উপস্থিত হইল।

রাজভাষা বা রাষ্ট্রভাষার প্রতিশব্দরূপে লাতিন Lingua Franca-র ব্যবহারই সত্যকার অর্থের ব্যঞ্জনার দ্যোতক। ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইবে জনগণের ভাববিনিময়ের সরলতম মাধ্যম জনসাধারণের ভাষা। আপন ভাষার সীমানা পার হইয়া এমন একটি ভাষাকে দূরদূরান্তের সকলে নিজের ভাষা বলিয়া গ্রহণ করিবে—যাহাকে সহজেই বলা চলিবে নিখিল ভারতীয় ভাষা। বৈচিত্র্যময় ভারতের বিভিন্ন ভারতবাসীর সেই ভাষা হইবে রাজভাষা; তাহাকে রাষ্ট্রভাষাই বলি কি সাধারণ ভাষাই বলি।

রাষ্ট্রভাষার পাশাপাশি যে সমস্যা জাগে—তাহা হইতেছে সরকারী ভাষার সমস্যা। ইংরেজীতে ইহাকে বলা চলে State Language। বিভিন্ন ভাষাভাষী দেশের সঙ্গে কেন্দ্রীয় শাসকগোষ্ঠীর প্রশাসনিক সম্পর্ক বজায় রাখিতে হইলে একটি সাধারণ ভাষাকে বাহন করিতে হয়। তাহা না হইলে শাসনকার্যে দেখা দেয় অকারণ ব্যয় বাহুল্য এবং জটিলতা।

এক ভাষাভাষী রাষ্ট্রে রাষ্ট্রভাষা লইয়া কোন সমস্যা উঠে না। তাহার কারণ জনসাধারণ যে ভাষায় কথা বলে সেই ভাষাতেই রাজকার্য চালাইলে কোন অসুবিধা হয় না; কাহারও অভিযোগের কোন কারণ থাকে না।

কিন্তু বহুভাষাভাষী রাষ্ট্রে রাষ্ট্রভাষার সমস্যা অতি বাস্তব জরুরী আকার ধারণ করে। সমস্যাটিকে নানা ভাবে বিচার করা চলে।

গণতান্ত্রিকতার আদর্শ হইতেছে প্রত্যেক জাতির মাতৃভাষার বিকাশ সাধন এবং সম্ভবমত একক ভাষাগোষ্ঠীকে এক-একটি বিশিষ্ট রাষ্ট্রের মর্যাদা দান। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এইজন্যই স্বাধীনতা সংগ্রামের যুগে বৃটিশ নির্বাচিত প্রদেশসমূহের গণ্ডীর বাধা না মানিয়া বিভিন্ন জাতি-চরিত্র অনুপাতে কংগ্রেস নির্বাচিত প্রদেশ-বিন্যাস উপস্থিত করিয়াছিল। তাহাতে পূর্ণ বিকশিত যতগুলি ভাষাগোষ্ঠী ভারতে ছিল তাহাদের সকলেই স্বভাষাভাষী রাষ্ট্রের অধীনে স্বাধীন জীবন বিকাশের ভরসা পাইয়াছিল।

কিন্তু বহু ভাষাভাষীর দেশে কোন্ নীতি অনুসৃত হইবে? এ বিষয়ে চরম গণতান্ত্রিক দেশ সোভিয়েত, চীন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সকল ভাষাকেই সমানাধিকার দেওয়া হইয়াছে। সোভিয়েতের ষোলোটি রাষ্ট্রের সব কয়টি ভাষাই রাষ্ট্রভাষার

মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত। পৃথিবীতে সমৃদ্ধতম ভাষার একটি ভাষা 'রুশ' সংখ্যাধিক্যের ভাষা বলিয়া যে প্রাধান্য অর্জন করিয়াছে তাহা নহে। বরঞ্চ ওই 'সমৃদ্ধ রুশ' ভাষার অত্যাচারের কবলে যাহাতে না পড়ে সেজন্য রাষ্ট্রনায়ক লেনিন-স্ট্যালিন বহু সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন।

ধনতন্ত্রী জগতের সুইজারল্যাণ্ড ও কানাডাতেও ঐ নিয়মই অনুসৃত হয়। কানাডায় ইংরেজী ও ফরাসী দুইই রাষ্ট্রভাষারূপে গৃহীত।

স্বাধীনতা লাভের পরে ভারতে যখন ভাষা সমস্যার উদ্ভব হইল তখন প্রশাসনিক সুবিধার উপরেই সর্ব বিষয়ে প্রধান গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছিল; এমন কি প্রশাসনিক সুবিধার যূপকাষ্ঠে ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের মহত্তম দাবিও উৎসর্গীকৃত হয়।

ইহার ফলে ভারত রাষ্ট্রনায়কগণ কোনও নীতি অনুসরণ করার চেয়ে আপসের পথেই ভাষা সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করিলেন। তাঁহারা ভারতের চৌদ্দটি প্রধান ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিলেন অর্থাৎ ভারত সরকারের সব অনুশাসন ও অন্যান্য সঙ্গতিমূলক কাজকর্ম এই চৌদ্দটি ভাষাতেই প্রকাশিত হইবে। অন্যান্য ভাষাসমূহের উপযুক্ত বিকাশ সাপেক্ষ এই চৌদ্দটিই রাষ্ট্রীয় মর্যাদা লাভ করিবে। সেই সঙ্গে তাঁহারা হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষার আসন দান করিলেন এবং সাময়িকভাবে ইংরেজীকে সহ-রাষ্ট্রভাষার সম্মান দিলেন।

ভারত রাষ্ট্রনায়কগণের এই ব্যবস্থাটিতে অঙ্গ রাজ্যসমূহের স্বীয় ভাষাকে প্রাধান্য দিবার নীতি মানিয়া লেওয়ারও স্বীকৃতি পাওয়া যায়।

কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁহারা আর একটি বিধান দিয়াছেন যে, সর্বভারতীয় ভাষারূপে হিন্দী ও ইংরেজীকে কিছুকাল পাশাপাশি চলিতে দেওয়া হইবে। সর্বভারতীয় ভাষার দাবি তাঁহারা তুলিয়াছেন ভারতে একজাতীয়তাবোধ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। ১৪টি ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিয়া তাঁহারা যেমন ভারতের ভাষা-বৈচিত্র্যের বাস্তবতা মানিয়া লইয়াছেন তেমনি কেন্দ্রীয় ভাষারূপে হিন্দী ও ইংরেজীর চলন দ্বারা তাঁহারা বৈচিত্র্যের মধ্যে মিলনের সূত্র রচনা করিতে চাহিয়াছেন।

এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী স্বর্গত মৌলানা আবুল কালাম আজাদের মত লক্ষণীয়। তিনি স্বীকার করেন যে, ইংরেজী এতকাল যে গৌরবের স্থান অধিকার করিয়া ছিল বর্তমান পরিস্থিতিতে ইংরেজীর আর সে স্থান প্রাপ্য নয়। ভারতীয় কোনও ভাষাকেই ধীরে ধীরে সে স্থানে প্রতিষ্ঠিত করা উচিত। কিন্তু আগ্রহাতিশয্যে রাতারাতি ইংরেজীকে বিদায় করিয়া দিলে ব্যবহারিক জীবনে

বিপর্যয় দেখা দিবার আশঙ্কা থাকিবে। সেইজন্য যে পর্যন্ত না আন্তঃপ্রদেশের ক্ষেত্রে ভাবের আদান-প্রদান ও সরকারী কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্যে হিন্দী ভাষাকে গড়িয়া তোলা যায়, সে পর্যন্ত ইংরেজীকেও হিন্দীর পাশাপাশি চলিতে দেওয়া উচিত।

ভারত রাষ্ট্রনায়কগণ হিন্দীকে যে শুধু আনুষ্ঠানিকভাবে একটি ভাষারূপে দেখিয়াছেন, তা নয়। হিন্দীকে তাঁহারা দেখিয়াছেন প্রগাঢ় শ্রদ্ধার সঙ্গে জাতীয়তা-বাদী যুগে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের হাতিয়াররূপে, জনগণের বিক্ষোভের ভাষারূপে। মহাত্মা গান্ধী ইংরেজী বর্জন করিয়া শোষিত জনগণের ভাষা হিন্দীকে তাঁহার রাজনীতির প্রধান বাহন করিয়াছিলেন। মহাত্মার উত্তরসূরিগণ সেই গৌরবের আসনেই হিন্দীকে পুনঃস্থাপিত করিতে চাহিলেন।

মহাত্মাজীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল ইংরেজী শিক্ষা আমাদের ব্যক্তিত্ব স্ফুরণে বাধা ঘটাইয়াছে; মনুষ্যত্বকেও পূর্ণ বিকশিত করিতে দেয় নাই; জনগণকে ব্যবহারিক জীবনে আত্মনির্ভরশীল হইবার সুযোগ দেয় নাই। ইংরেজীর জগদ্দল চাপে আমাদের প্রাদেশিক ভাষাসমূহ ও জাতীয় ভাষা পঙ্গু হইয়াছে। তিনি সেইজন্য বলেন, "পরাধীনতার নানা দোষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মারাত্মক হইতেছে তরুণদের মানসজগতে একটি বিজাতীয় ভাষার আধিপত্য বিস্তার। ইহার ফলে তাহারা জনগণ হইতে সম্পর্ক বিচ্যুত হইয়া পড়ে।" তাঁহার দৃঢ় ধারণা ছিল—ইংরেজী আমাদের জাতীয়তাকে সঞ্জীবিত করিতে পারে নাই। কাজেই জাতীয় জীবনে ঐ ব্যর্থতার অভিশাপ বহনের কী সার্থকতা থাকিতে পারে?

হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করিবার জন্য উত্তর ভারতীয়দের প্রস্তাবকে একটি বাস্তব অবস্থারই স্বীকৃতিদান বলিয়া বোধ হইবে। কিন্তু দক্ষিণ ভারতের দিকে তাকাইলে ইহার ত্রুটি নজরে না পড়িয়া পারিবে না।

দাক্ষিণাত্যে আবহমানকাল একটা আর্যাবর্তবিরোধী ভাব আছে। ভারত ইতিহাসে দাক্ষিণাত্য চিরকাল অবহেলিত ছিল বলিয়াই তাঁহাদের এই মনোভাব। তাঁহারা হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করিবার মধ্যে 'হিন্দী সাম্রাজ্যবাদের' সশঙ্কিত ছায়ার ভয়ে ত্রস্ত। হিন্দীর স্থানে ইঁহারা ইংরেজীকে বসাইতে চাহেন।

ইহা হইতেই হিন্দী বনাম ইংরেজীর সমস্যা সৃষ্টি হইয়াছে।

ইহাকে শুধু গৃহ-বিরোধের ছায়ায় বিচার করা সঙ্গত নয়। হিন্দী-বিরোধীদের বক্তব্যে যুক্তির অভাব নাই।

তাঁহারা বলেন—হিন্দী অসমৃদ্ধ ভাষা। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে অগ্রগতির যুগে ভাষার যে সমৃদ্ধি থাকিলে বিদেশের সঙ্গে তাল রাখিয়া চলা যায়, হিন্দীতে

তাহার একান্ত অভাব। তাছাড়া তাঁহাদের মতে হিন্দী এমন বহুজনের ভাষাও নয় যে তাহাকে সর্বভারতীয় ভাষারূপে ব্যবহার করা চলে।

এই বিষয়ে তাঁহারা ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের একটি প্রবন্ধকে উদাহরণ-স্বরূপ ব্যবহার করেন। ১৩২১ সালের লোকগণনার ভিত্তিতে ডাঃ চট্টোপাধ্যায় দেখাইয়াছেন যে, আমার মাতৃভাষা হিসাবে ভারতবর্ষে বাঙলাই সর্বাগ্রগণ্য (অবিভক্ত বাঙলায়)। মাতৃভাষা হিসাবে ভারতের আর কোনও ভাষা এত বিস্তৃত নয়।...আমাদের দেশে অবশ্য হিন্দুস্থানী বা হিন্দী ভাষা আছে, আর ভারতবর্ষে এই হিন্দী ভাষার স্থান আর গৌরব বাঙলার চেয়ে ঢের বেশী, তাতে সন্দেহ নাই। বাঙলা ভাষার চেয়ে অনেক বেশী লোক হিন্দী ব্যবহার করে বটে, কিন্তু সেটা পোশাকী ভাষা হিসেবে। সিন্ধুদেশ, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, উড়িষ্যা, বাঙলা, আসাম আর নেপালকে বাদ দিয়ে সমগ্র উত্তর ভারতের লোক রাজস্থানে, পঞ্জাবে, যুক্তপ্রদেশে, মধ্যভারতে, মধ্যপ্রদেশের অনেকখানিতে আর বিহারে হিন্দুস্থানী ভাষাকে (তার হিন্দীরূপেই হউক আর উর্দুরূপেই হউক) তা'দের সাহিত্যের ভাষা ব'লে, বাইরেকার জীবনের ভাষা ব'লে স্বীকার করে নিয়েছে। এইরূপে প্রায় ১৩ কোটি লোকের মধ্যে এখন হিন্দুস্থানীর প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই ১৩ কোটির মধ্যে মাত্র ১ কোটি ৬০ লক্ষ আন্দাজ লোক হিন্দুস্থানীকে ঘরে বাইরে সব জায়গায় ব্যবহার করে, হিন্দুস্থানী তাদের মাতৃভাষা।"...

এই বিচারে ভারতের হিন্দী ভাষাভাষীর চেয়ে অহিন্দী ভাষাভাষীর সংখ্যাই বেশী। দক্ষিণ ভারতে তো হিন্দী একেবারেই অপ্রচলিত।

কাজেই হিন্দীকে দেশের অধিকাংশের কথ্য ভাষা বলিয়া যে তাহাকে রাষ্ট্র-ভাষার সম্মান দেওয়া হইয়াছে তাহা ঠিক নয়। ইহার উপরে আছে ভাষার ঐশ্বর্য বিচার। রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ করিতে হইলে ভাষাটির নিশ্চয়ই সাহিত্যিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারেরও বিচার আবশ্যক। এই নিরীখে হিন্দীর বিচার করিলে সে বিচারে তাহাকে রাষ্ট্রভাষা করা চলে না।

কিন্তু যখন মনে করি, হিন্দীর 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' মন্ত্রে আগস্ট বিপ্লবের দিনে ভারতের তরুণ রক্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল আর নেতাজীর 'দিল্লী চলো' ধ্বনিতে আনিয়াছিল বিদ্যুৎঝলক, তখন স্বাধীনতা সংগ্রামের ভাষা বলিয়া ভারতের ঐক্যের প্রতীকরূপে হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দান অবনতমস্তকে মানিয়া লইতে কোনও বাধা হয় নাই।

তবু—একটি সমস্যা থাকিয়া যায়। সমস্যা হিন্দী-ইংরেজী শিক্ষার।

হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করিলে প্রত্যেক ভারতবাসীর পক্ষে তাহা শিক্ষা করা অপরিহার্য। অর্থাৎ নূতন করিয়া একটি ভাষা আয়ত্ত করিতে হইবে। আজ দুইশত বৎসরের শিক্ষায় ইংরেজী ভারতের শিক্ষিত লোকের মধ্যে কমবেশী সড়গড় হইয়াছে। সে ইংরেজী হয়ত 'রানীর ইংরাজী' না হইতে পারে, সেটা হয়ত ভারতীয় ইংরেজীই হইবে; তবু ইংরেজী তো। সেই ইংরেজী যদি রাষ্ট্রভাষা থাকে তাহা হইলে ভারতীয়দের আর নূতন করিয়া একটি ভাষা শিখিবার প্রয়োজন করে না। ইংরেজী ভাষা পৃথিবীর সমৃদ্ধতম ভাষার একটি বলিয়া ইংরেজী শিখিলে অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষাগুলিও ক্রমেই সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতে পারিবে। কিন্তু হিন্দী হইতে তেমন প্রেরণা লাভের কোনও সম্ভাবনাই নাই তেলুগু, তামিল, অসমিয়া বা বাঙলা ভাষার।

আমরা ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছি ঠিকই, কিন্তু ইংরেজীর বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করিব কেন? শেলী, কীট্‌স, বায়রন, স্পেনসার, নিউটনের ভাষাকে অহেতুক বর্জন করায় স্বাজাত্যাভিমান প্রকাশিত হইলেও, সুবিধার মাপকাঠিতে তাহাকে অচল বলিয়া না মানিয়া উপায় নাই।

স্বাধীনতার প্রথম যুগে অবশ্য স্বাজাত্যাভিমানেরই প্রভাব বেশী থাকা সম্ভব, তাই হয়ত এটা আশা করা চলে যে, কালাতিক্রমে ইংরেজীবিদ্বেষ স্তিমিত হইয়া এই ভাষাই একটি সুস্থ রাষ্ট্রভাষার স্থান লাভ করিবে, অন্যান্য ভাষাকে উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়া লইয়া যাইবে।

স্বাধীন ভারতে ইংরেজীর স্থান *

আজ ভারতবর্ষ স্বাধীন হইয়াছে। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মধ্যে একটা প্রশ্ন জাগিয়াছে যে, আজও কি আমরা ভারতবাসীরা ইংরেজী ভাষাকে শিরোধার্য করিয়া আমাদের মনোভাব প্রকাশ করিব, দেশ শাসন করিব, ব্যবসায়-বাণিজ্য চালাইব? সংক্ষেপে দেশের যাবতীয় কাজ-কারবার হইতে শুরু করিয়া কি ঘরের, কি ব্যক্তিগত, কি সর্বভারতীয় ব্যাপারে আমরা মন চলাচলের জন্য বিদেশীর দ্বারস্থ হইয়া পরাধীন চেতনাকেই প্রকারান্তরে লালিত করিব? ইংরেজী ভাষা যে আমাদের পরাধীন জীবনের একটা কলুষিত অধ্যায়কে স্পষ্ট করিয়া জাগাইয়া রাখিয়াছে—ইহা অত্যন্ত সত্য, তাহা ছাড়া এই ভাষা বিদেশাগত ভাষা, এবং এই ভাষাভাষী বিদেশীয়গণ এতাবৎকাল আমাদের প্রভু ছিলেন, আমাদিগকে

* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৫ সালের প্রশ্নপত্র

দাসরূপে গণ্য করিতেন ; আজ নিজেদের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা পাইবার পরও এই ভাষাকে মর্যাদা দিয়া লালিত করা কোনও জাতির পক্ষেই গৌরবজনক হইতে পারে না, প্রভুর ভাষাকে স্বাধীন জাতির রাষ্ট্রভাষা বলিতে কুণ্ঠা থাকা উচিত। তাই আজ স্বাধীনতা লাভের পর একটা বড় প্রশ্ন জাগিয়াছে—বর্তমানে ইংরেজী ভাষার কি দুর্দশা হইবে ? কোন্ মর্যাদায় ইংরেজী ভাষাকে ভারতে স্থাপিত করিতে হইবে ? আমরা যে জাতির পদানত ছিলাম, আজ স্বাধীন হইয়া সেই ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা বলিয়া চালাইতে পারি না—কারণ ইহা আত্মমর্যাদার দিক হইতে গৌরবের নহে।

কথা উঠিয়াছে, ইংরেজীতে আমরা ভিন্ন প্রদেশবাসীদের সহিত সহজে ও সাবলীলতার সহিত মনোভাব আদান-প্রদান করিতে পারি—সেইজন্য ইংরেজীকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দান করা উচিত। এইরূপ মতবাদ যাঁহাদের—তাঁহারা একথাও বলেন যে, ভারতবর্ষে এক শ্রেণীর ভারতীয় নাগরিক আছেন—যাঁহাদের আমরা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বলি—তাঁহাদের মাতৃভাষা ইংরেজী। সুতরাং ইংরেজীকে মর্যাদার সহিত স্থাপন করা আমাদের অগৌরবের নহে।

কিন্তু চল্লিশকোটি ভারতবাসীর মধ্যে কয়জনের মাত্র মাতৃভাষা ইংরেজী। সামান্য একটি নগণ্য সংখ্যার মানুষ তাঁহারা। সুতরাং সেই দাবিতে বৈদেশিক একটি ভাষাকে নিজের রাষ্ট্রের কৌলীন্য দিয়া জাতীয় ভাষায় পরিণত করা যায় না।

সেইজন্য ইংরেজীর অবস্থা আর যাই হোক, স্বাধীন ভারতবর্ষে তাহাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা দেওয়া যায় না।

কিন্তু এখানে এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বিশেষভাবে আমাদের দেশের রাষ্ট্রনায়কদের স্মরণ রাখিতে হইবে। আজ ভারতবর্ষ স্বাধীন; বিশ্বের স্বাধীন শক্তির মতো আমাদেরও সম্মান এবং গৌরব আজ স্বীকৃত। সুতরাং বিশ্ব জাতিসঙ্ঘের আমরাও এক স্বাধীন সভ্য। বিশ্ববাসী হিসাবে আমাদের একটি বিশ্বভাষাকে শিক্ষা করিতে হইবে, নচেৎ পৃথিবীর সভ্য সমাজের সহিত আত্মিক এবং সাংস্কৃতিক যোগাযোগ রক্ষা করিতে আমরা অক্ষম হইব।

দেশে দেশে আজ ব্যবসায়-বাণিজ্য ব্যাপ্ত এবং প্রসারিত হইয়া পড়িতেছে। এক দেশ হইতে অন্য দেশে প্রতিনিয়তই সাংস্কৃতিক তথা ভাবিক আদান-প্রদান ঘটিতেছে এবং তাহা সম্পাদিত হইতেছে বিশ্বভাষার মাধ্যমে। ইংরেজী আজ বিশ্বভাষার মর্যাদা লাভ করিয়াছে। একদিন ইংরেজের রাজ্যে সূর্যাস্ত যাইত না —এমনই পৃথিবীব্যাপ্ত তাহাদের রাজ্য ছিল। সেই রাজ্য শাসনের নিমিত্ত বা

সেই সব রাজ্যে শাসনব্যবস্থা চালানোর সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজী ভাষা পৃথিবীর সর্বত্র—পূর্ব ও পশ্চিম উভয় গোলার্ধের সকল স্থানেই ছড়াইয়া পড়ে। তাই ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করিলে পৃথিবীর সকল স্থানের সহিত যোগাযোগ রাখিবার একটি ভাষা শিক্ষালাভ করা যায়।

ইহা ছাড়া আর একটি কারণে বর্তমানে ইংরেজীকে আমাদের দেশ হইতে উঠাইয়া দেওয়া চলে না। অন্ধ দেশপ্রেমে মত্ত হইয়া, ইংরেজী ভাষা প্রাক্তন প্রভুর ভাষা বলিয়া আজ ঘৃণাভরে তাহাকে দূরে সরাইয়া দেওয়ার মতো মূঢ়তা আর নাই। খঞ্জ ব্যক্তির পা সারিবার পূর্বেই যদি সে বিদেশী এবং বিজাতীয় লাঠিগাছি ফেলিয়া দেয়—তাহা হইলে তাহার যে দুর্দশা হয়—সেইরূপ ভারতবর্ষ এই সময় ইংরেজী ভাষা শিক্ষার প্রতি বিরূপ মনোভাব দেখাইলে তাহারও ঠিক সেই দশা হইবে। ভারতীয়দের বিজ্ঞান, দর্শন, ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি সকল বিষয়ের উচ্চ শিক্ষালাভ ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে ব্যতীত অন্য কোনও ভারতীয় ভাষায় সম্ভব নয়; জাতীয় ভাষা, রাষ্ট্রীয় ভাষা যতদিন না অধিক দূর উন্নত হয়—ততদিন ইংরেজীকে আমাদের মধ্যে একান্ত প্রয়োজনীয়রূপে রাখিতে হইবে। এই আবশ্যিক দিকটা সম্পর্কে কোনও তর্ক উঠাই সম্ভব নয়, তাই এই বিষয়ে দ্বিমত নাই।

তবে বর্তমান কালে ইংরেজী ভাষা শিক্ষার যে নমুনা দেখা যাইতেছে—তাহাতে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, অদূর ভবিষ্যতে ইংরেজী জাতিও আর ভারতবর্ষে শেখানো বা পড়ানো ইংরেজী ভাষার প্রাণধর্ম বা মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারিবে না। এরূপভাবে ইংরেজী শিক্ষালাভে কোনও ফল হইবে না, কেননা বিশ্বসংস্কৃতির কোনও ভাবিক আদান-প্রদানে সংক্ষেপে শেখা ইংরেজীর কোনও কৃতিত্ব স্বীকার্য বলিয়া গণ্য হইবে না। তাই আজ স্বাধীন ভারতে যথার্থরূপে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা একেবারে অপরিহার্য।

স্বাধীন ভারতে বিজ্ঞান-চর্চার প্রয়োজনীয়তা*

।। সূচনা ।। বিজ্ঞানের কল্যাণীরূপ ।। বিজ্ঞান-চর্চায় বাধা পরাধীনতা ।।
।। স্বাধীনতার পরে প্রয়োজনীয়তা ।। রাশিয়ার তুলনা ।। পারমাণবিক যুগ ।।
।। অর্থনৈতিক প্রচেষ্টার ভিত্তি বিজ্ঞান ।। শিল্পোন্নয়নের ভিত্তি বিজ্ঞান ।।
।। বিজ্ঞানের নব নব শাখা ।। বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োজন ।।

সেই আদিযুগে মানুষ যখন ছিল অসহায়, প্রকৃতির দানে ঘুচিত তাহার অভাব, আর প্রবৃত্তির তাড়নায় সে দিক হইতে দিগন্তরে ছুটিত ; সেই অবস্থাতেও তাহাকে মুক্তির বাণী শুনাইয়াছিল বিজ্ঞান। আগুন আবিষ্কার করিয়া, পাথরের হাতিয়ার আর সাজসরঞ্জাম তৈয়ারি করিয়া বিজ্ঞানীরা মানবসমাজের অগ্রগতির পথ পরিষ্কার করিয়াছিল। মানুষের ইতিহাস সেই আদি জনকদের নাম লিখিয়া রাখে নাই।

সেই যুগেও যেমন বিজ্ঞানের সাহায্যে মানবজীবন সুখসেব্য হইয়া উঠিয়াছিল আজও তেমনি বিজ্ঞানের সাহায্যেই মানুষ প্রকৃতিকে বশে আনিয়া সভ্যতার দিগন্ত বিস্তৃত করিয়াছে। বিজ্ঞান কখনও বর্ষণ করিয়াছে আশীর্বাদ, আবার কখনও দেখা দিয়াছে অভিশাপরূপে।

বিজ্ঞানের কল্যাণীরূপে মানুষের মনের সুপ্ত আশা, কামনা-বাসনা নূতন নূতন আবিষ্কারে নব নব প্রেরণায় সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। সে বিজ্ঞান আকাশকে বিশ্লেষণ করিয়াছে, সমুদ্রের গভীরতা ও পর্বতের বিশালতার সীমা নির্ধারণ করিয়াছে। প্রকৃতির বুকে লুক্কায়িত যত রাজ্যের সম্পদ উজাড় করিয়া মানুষের কোলে তুলিয়া দিতেছে। তাপদাহনদগ্ধ দুঃখ-কষ্ট প্রপীড়িত মানুষের বুকে বিজ্ঞানের কল্যাণীমূর্তিই সান্ত্বনার প্রলেপ বুলাইয়া দেয়। আবার অন্ন-বস্ত্র-আশ্রয়—এ তিন সমস্যারও সে করিয়াছে সমাধান।

বিজ্ঞান পৃথিবীকে সংকীর্ণও করিয়া আনিয়াছে—বিন্দুতে পড়িতেছে যেন জগতের প্রতিবিম্ব। ঘরে বসিয়া মানুষ বিশ্বের অপর প্রান্তের কণ্ঠস্বর শুনিতেছে ; তাহার মূর্তি দেখিতেছে জীবন্ত। ছায়াচিত্র আজ কথা বলিতেছে, শব্দতরঙ্গ অন্ধকে দৃষ্টিশক্তি দান করিয়াছে ; ক্ষুদ্র পরমাণুর অন্তর্নিহিত শক্তি বিচ্ছুরিত করিয়া মানুষ মুহূর্তে লক্ষ হস্তীর কাজ করিতেছে। বস্তুর নিলয় ঘটাইয়া (antimatter) বিজ্ঞানীরা স্বপ্ন দেখিতেছে আলোকের গতি লাভের, আপনার ল্যাবরেটরীতেই বৈজ্ঞানিক উপায়ে সৃষ্টি করিতেছে সূর্যমণ্ডলের তাপ।

* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৬ সালের প্রশ্নপত্র

বিজ্ঞান-চর্চা বর্তমানে তাই মানুষের একটি স্বভাব বিশেষ। এই বিজ্ঞানকে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিয়া বৃহত্তর অংশকে বিজ্ঞান-সেবা হইতে বঞ্চিত করিলে জাতির অগ্রগতি অবরুদ্ধ হইয়া পড়ে। পরাধীন জাতির জীবনে এইটাই অভিশাপের রূপ ধারণ করে। ভারতের বুকেও এতদিন ছিল এই অভিশাপের কলঙ্করেখা। তাই মহাবিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুকে তুচ্ছ ইংরেজ শাসকের দয়ার মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইয়াছিল কতদিন। যেসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা তিনি আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহার অনুশীলন করিয়া পৃথিবীতে বিজ্ঞানের তিনটি বিভাগ হইয়াছে সমৃদ্ধ এবং সেই তিনটি বিভাগের আবিষ্কারকই নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হইয়াছিলেন। আর এই তিনটি বিভাগের মূল আবিষ্কারক স্বয়ং জগদীশচন্দ্রকে সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে। ইহাকেই বলে পরাধীনতার জ্বালা।

আজ ভারতের পায়ে শৃঙ্খল নাই। নাই পরশাসনের জগদ্দল পাথরের চাপ তাহার বুকে। তাই স্বাধীন ভারতে বিজ্ঞান-চর্চার গুরুত্বও আজ অসীম।

বিশ্বসভায় ভারতকে স্থান লাভ করিতে হইলে প্রতি পদে তাহাকে স্বপ্রতিষ্ঠ হইতে হইবে। তাহার শিল্প, তাহার বাণিজ্য, তাহার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, খনিজ সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার, যানবাহনের ও ডাক-তার-বেতার-টেলিভিশনের যোগাযোগ ব্যবস্থা যত দৃঢ় হইবে ততই হইবে তাহার শক্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধি।

মাত্র চল্লিশ বৎসরের মধ্যে, একদা পশ্চাদ্‌পদ রাশিয়া আজ পৃথিবীর সমৃদ্ধতম দেশ আমেরিকার সঙ্গে যে পাল্লা দিতেছে, তাহাও ঐ বিজ্ঞান-চর্চার বলেই।

অনগ্রসর কৃষিপ্রধান দেশ ভারত। তাহাকে অগ্রসর শিল্পপ্রধান দেশে রূপান্তরিত করিতে হইলে চাই নিরলস বিজ্ঞানসাধনা। কলকারখানা গড়িতে, খনিজ সম্পদ আবিষ্কারে এবং সেই সম্পদ ব্যবহারের জন্যে আজ আবশ্যক বিজ্ঞানের সাহায্য।

জগৎ যখন বিদ্যুৎশক্তির যুগ পার হইয়া পারমাণবিক যুগে পদসঞ্চার শুরু করিয়াছে তখন ভারতের বিজ্ঞানীদের মধ্যে পারমাণবিক চর্চার প্রসার না ঘটিলে চলিবে কেন? ভারতীয় বিজ্ঞানাচার্য মেঘনাদ সাহাকে বিশ্বের বিজ্ঞানীরা নিউটন প্রভৃতির স্তরে ফেলেন। তাঁহাদেরই কাছে শিক্ষালাভ করিয়া ভারতীয় বিজ্ঞানীরা আজ ভারতের পারমাণবিক বিজ্ঞান-চর্চা করিতেছে। কিন্তু আজও ভারতে সব রকমের জটিল বিজ্ঞান-চর্চার সুযোগ ঘটিতেছে না বলিয়া বিদেশে গিয়া শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে।

জাতির অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা সফল করিবার মূলেও আছে বিজ্ঞান-চর্চার আবশ্যকতা। স্বাধীন ভারত দারিদ্র্য দূর করার জন্য যে কয়টি পরিকল্পনা গ্রহণ

করিয়াছে তাহা কখনই সফল হইতে পারে না—যদি বিজ্ঞানীদের সার্থক সহযোগিতা না থাকে।

ভারতের তৈলসম্পদের হিসাব এতকাল আমাদের অজানা ছিল। কিন্তু রুমানিয়া ও সোভিয়েত রাশিয়ার বিজ্ঞানীদের সাহচর্যে অনুসন্ধানের ফলে আজ ভারতে প্রচুর তৈলের সন্ধান মিলিয়াছে। ভারতের খনিজ সম্পদের সন্ধান হইতেছে চারিদিকে। ভারতীয় বিজ্ঞানীরা নিত্যনূতন কয়লা, অভ্র, ম্যাঙ্গানীজ, রূপা, লোহা ইত্যাদি মূল্যবান ধাতুর সন্ধান পাইতেছেন। পারমাণবিক শক্তির উৎস মোনাজাইটও আবিষ্কৃত হইয়াছে কেরলে। বিজ্ঞানীরা যাহাকে "ভারী জল" (Heavy water) বলেন তাহারও অনুসন্ধান চলিতেছে। এই ভারী জল হইতেই হাইড্রোজেন পরমাণু বিচ্ছুরিত হয়। ভারতের ভূতাত্ত্বিকরা নূতন প্রেরণায় ভারতের ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা চালাইতেছেন। ভারতের ভূ-প্রকৃতি ক্রমেই তাঁহাদের কাছে সহজ হইয়া উঠিতেছে। বিজ্ঞানের নব দিগন্ত ভূ-রসায়নেও (Geo-chemistry) ভারত প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিতেছে।

কৃষি-জীববিদ্যা (Agrotrology) আজ পৃথিবীর সর্বত্র কৃষিকাজের প্রধান সহায়ক হইয়াছে। ভারতের বিরাট কৃষি-অঞ্চলে সার্থকভাবে কৃষি-জীববিদ্যার প্রয়োগ না করিতে পারিলে কৃষির উন্নতিসাধন অসম্ভব। তাই ভারত সরকার নানাভাবে বিদেশে ছাত্র পাঠাইয়া, অন্য দেশ হইতে বিশেষজ্ঞ আনাইয়া ভারতে কৃষি-জীববিদ্যার সম্প্রসারণে উদ্যোগী হইয়াছেন।

শিল্পায়নের কাজে প্রয়োজন প্রযুক্তিবিদ্যার (Technology) উন্নতি। এর জন্য প্রয়োজন যেমন বিজ্ঞানাচার্যদের তেমনি প্রয়োজন অগণিত বিজ্ঞানকর্মীর (scientific workers)। ইস্পাত কারখানা চালাইতে গেলে, বৃহদায়তন গুরুশিল্পের প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, শ্রমলাঘবের উদ্দেশ্যে যন্ত্রিকরণের (mechanisation) প্রসার করিতে হইলে ভারতের তরুণদের বিজ্ঞানকর্মী তৈয়ারি করিতে হইবে। সেই কাজে ভারত সরকারকে ইতিমধ্যেই হাত দিতে হইয়াছে।

সরকার হইতে বিদেশে প্রতিবৎসর শত শত শিক্ষার্থী পাঠাইয়া বিশেষজ্ঞ তৈয়ারি করিবার সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশে ইঞ্জিনীয়ারিং, পলিটেকনিক ও উচ্চ বিজ্ঞান-সাধনাগার প্রতিষ্ঠা হইতেছে। স্কুলের পাঠক্রম হইতে আরম্ভ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সকল স্তরে আজ বিজ্ঞানের দিকে ছাত্রদের আগ্রহ সৃষ্টির চেষ্টা চলিতেছে। দেশ গঠনের প্রেরণায় ছাত্রদলও আগাইয়া আসিতেছে।

মহাজাগতিক বিদ্যা যে দ্রুতগতিতে প্রসার লাভ করিতেছে—ভারতকে তাহাও অধিগত না করিলে চলিবে না। সোভিয়েত রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা চন্দ্রলোক

জয় করিয়াছে। আমেরিকা তাহাদের ঠিক পিছনেই। চন্দ্রলোকে স্পুটনিক ও লুনিক পাঠাইলেও মানুষের যাত্রা আজও সম্ভব হয় নাই। সে যাত্রা সফল হইবে —যেদিন মানুষ প্রযুক্তিবিদ্যার চরম শিখরে উঠিবে। ভারতকে পিছাইয়া থাকিলে চলিবে কেন?

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের মানুষের কাছে মহাকাশ ভ্রমণের নানা বিষয় জলের মতো সহজ—কিন্তু ভারত পিছাইয়া আছে বলিয়া ভারতের ছাত্ররা আজও মানুষের মাধ্যাকর্ষণ রহিত অবস্থার কথা কল্পনা করিতে পারিতেছে না, তাহারা পারিতেছে না আইনস্টাইনের চতুর্থ আয়তন কালের কল্পনা করিতে। আলোকশক্তির মতো দ্রুতগতিযানে যাত্রা করিলে পৃথিবীর মানুষের তুলনায় মহাকাশযাত্রীর বয়সের তারতম্য কি হইবে—তাহারও ধারণা ভারতবাসীর কাছে এখনও হেঁয়ালী বলিয়াই মনে হইতেছে। আজ ভারতে তাই মহাকাশ-বিজ্ঞানের চর্চা আবশ্যক হইয়াছে।

মহাকাশ-বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ ব্যবহারিক ফল হইতেছে আবহাওয়ার চরিত্র বিশ্লেষণ। ভারতের মতো কৃষিপ্রধান দেশে ইহার যে কত প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ত রেডিও, টেলিভিসন, মুদ্রাযন্ত্র, সংবাদপত্রমুদ্রণ, ফটোগ্রাফী, চলচ্চিত্র প্রভৃতি সর্ববিষয়েই আধুনিক বিজ্ঞানের অলৌকিক অগ্রগতি হইয়াছে। হিসাব-নিকাশের ক্ষেত্রে বৈদ্যুতিক হিসাবযন্ত্রে মুহূর্তে যে হিসাব হয় একটি মানুষের সে কাজ করিতে লাগে বৎসরের পর বৎসর নিরলস প্রচেষ্টা। এমনি একটি যন্ত্র সোভিয়েত রাশিয়া উপহার দিয়াছে ভারতের পরিসংখ্যান পরিষদকে। সে যন্ত্র আজ ভারতীয়রাই চালাইতেছে।

জগদীশচন্দ্রের প্রদর্শিত পথে পৃথিবীর অগ্রসর জাতিসমূহ আজ নূতন এক বিজ্ঞানের বিভাগ আবিষ্কার করিয়া তাহার নাম দিয়াছেন সাইবেরনেটিকস্ (Cybernatics)। ইহা হইতেছে যান্ত্রিক মস্তিষ্ক সৃষ্টির প্রচেষ্টা। যন্ত্রের সাহায্যে মানুষ আজ অনুবাদ অবধি করিতে পারিতেছে। ভারতে সে বিদ্যা আজও তেমনভাবে প্রচলিত হয় নাই।

চিকিৎসা বিজ্ঞানেও আজ অপূর্ব উন্নতি হইয়াছে। মানুষ মৃত্যুকে জয় করিতে চলিয়াছে যেন! ভারতবর্ষ সে বিষয়েও পিছাইয়া আছে অনেক।

জাতিগঠনের কাজে চাই বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ। জলসেচ, জলবিদ্যুৎ তৈয়ারী আর বন্যারোধ এবং নদী শাসনের জন্য বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ অত্যাবশ্যক। আজ সগর্বে ভাবিতে পারি, এদেশেরই বিজ্ঞানীরা গড়িয়া তুলিয়াছেন

ভাকরা-নাঙ্গাল, দামোদর ভ্যালী, হীরাকুদ প্রভৃতি বাঁধ। বিশ্বের একটি উন্নততম ইস্পাত কারখানা ভারতীয়দের শ্রমে ও সোভিয়েত রাশিয়ার সাহায্যে নির্মিত হইয়াছে ভিলাইতে, এবং সুরৎগড় খামারে আজ ভারতীয়রাই যান্ত্রিক পদ্ধতিতে বৃহদায়তন কৃষির খামার পরিচালনা করিতেছে। ভারতীয় পণ্য আজ বিদেশে রপ্তানি হইতেছে, ইহা কি কম গৌরবের কথা ?

কিন্তু তবু এই উন্নতির গতি অতি শ্লথ। স্টালিন যেমন ১৯৩১ সালে সোভিয়েত জনগণকে সতর্ক করিয়াছিলেন এই বলিয়া যে, আগামী দশ বৎসরে তাঁহারা ইওরোপের ১০০ বৎসরের জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়ত্ত করিতে না পারিলে ইওরোপের আক্রমণে ধ্বংস হইতে বাধ্য—আমাদেরও তেমনি আজ বলিবার সময় আসিয়াছে যে, মুহূর্তে শতাব্দীর জ্ঞান সঞ্চয় করিতে না পারিলে এই দ্রুত বিজ্ঞানের যুগে আমাদেরও ধ্বংস অনিবার্য।

ভারতে গণতন্ত্র বনাম সমাজতন্ত্র*

।। গণতন্ত্রের ব্যাখ্যা ।। নির্বাচনের গুরুত্ব ।। সংখ্যাগুরু ভোটে নির্বাচনের দোষত্রুটি ।। হারাহারি নির্বাচন ।। ভারতের গণতন্ত্র ।। গণতন্ত্র ও ধনতন্ত্র ।। ।। কংগ্রেসের আদর্শ সমাজতন্ত্র ।। মার্ক্সীয় সমাজতন্ত্রের সঙ্গে পার্থক্য ।। ।। কংগ্রেসের মধ্যে মতদ্বৈধ ।।

জনৈক জাতীয় নেতা কিছুদিন পূর্বে প্রাচীন ভারতীয় গণতন্ত্রের আদর্শের ব্যাখ্যা করিয়া নূতন ভাবে তাহার পরীক্ষা করার আহ্বান জানাইয়াছিলেন। তাঁহার মতে—পঞ্চায়েতী বৈঠকে সকল গ্রামবাসী উপস্থিত হইয়া প্রত্যক্ষ ভোটের বলে ও সহায়তায় সকল সমস্যার সমাধান করিলেই গণতন্ত্রের চরম সার্থকতা।

কিন্তু এই গণতান্ত্রিক পরীক্ষা পাশ্চাত্ত্য গণতন্ত্রের বিধিসম্মত নয়। পাশ্চাত্ত্যের গণতন্ত্র হইতেছে জনগণের স্বার্থে, জনগণের জন্য জনগণদ্বারা পরিচালিত শাসনতন্ত্র। ইহাতে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের স্থান নাই। গ্রীক যুগের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রেরও অবসান ঘটিয়াছে।

এখনকার পাশ্চাত্ত্য গণতন্ত্র হইতেছে পরোক্ষ। দেশবাসী আপন ইচ্ছানুযায়ী প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া বিধানসভায় প্রেরণ করে। সংখ্যাধিক্যের ভোটের জোরে নির্বাচিত প্রতিনিধিমণ্ডলীর মধ্য হইতে সরকার গঠিত হয় এবং তাঁহারাই দেশ শাসন করেন।

*'আধুনিক গণতন্ত্র'—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫২

গণতন্ত্রী মতবাদে দেশের বিভিন্ন রাজনীতিক দলের স্বাধীন কার্যক্রমের অবাধ সুযোগ থাকে। এইসব রাজনীতিক দলের মাধ্যমেই দেশের বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে জনমত প্রকাশিত হইয়া থাকে। রাজনীতিক দলগুলিরও কাজ হয় জনসাধারণের মতামত সংগৃহীত করিয়া সে দাবি অনুসারে রাজ্য সরকারের কার্য পরিচালনা করা। প্রত্যেক দলেরই কর্মীদের কাজ হইতেছে স্বীয় রাজনীতিক মতানুগামী-দিগের সংখ্যাবৃদ্ধি করা। নির্বাচনের মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলরূপে দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। তাঁহারা নিজেদের মতকে ও কর্মসূচীকে অন্য সকলের তুলনায় শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করেন বলিয়াই এই ব্যবস্থা।

নির্বাচনের পূর্ব মুহূর্তে রাজনীতিক দলগুলি জনসাধারণের সম্মুখে স্বীয় দলীয় কার্যক্রম ও প্রতিনিধি-তালিকা উপস্থাপিত করে। প্রচারকবৃন্দ জনগণের মধ্যে দলের কার্যক্রম লইয়া নিরলস প্রচার চালায়। নির্বাচন শেষে যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে তাহার হাতেই আসে শাসন ক্ষমতা।

এই গণতন্ত্রের দোষগুণ দুইই আছে। নির্বাচন এখানে প্রধান বলিয়া নির্বাচন ব্যবস্থার উপরেই এই গণতন্ত্রের সার্থকতা নির্ভর করে। অধিকাংশ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নির্বাচন হয় সংখ্যাধিক্যের ভোটে। কিন্তু সংখ্যাধিক্যের ভোটের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের মিল-প্রমুখ বহু রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মত প্রকাশ করিয়াছেন। এমন অনেক সময় ইহা ঘটিতে দেখা গিয়াছে যে, সংখ্যাধিক্য ভোটের ব্যবস্থায় কোন রাজনীতিক দল হয়ত একটি কেন্দ্রেও বিজয় লাভ করিতে পারে নাই, অথচ দেশের বহু কেন্দ্রেই সে দলের সভ্য হয়ত দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে। ফলে সারা দেশের অধিকাংশের ভোট পাইয়াও দলটি বিধানসভায় কোন প্রতিনিধিত্ব লাভ নাও করিতে পারে। এইজন্য জনমতের সুস্থ প্রকাশ এই-ব্যবস্থায় হইতে পারে না বলিয়া বহু লোকের বিশ্বাস।

এই ত্রুটি দূর করিবার জন্য ফ্রান্স প্রভৃতি কোন কোন দেশে হারাহারি (Proportional) প্রতিনিধিত্ব প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। হারাহারি ব্যবস্থায় সংখ্যাধিক্যের ত্রুটি অনেক সংশোধিত হয় বলিয়া সেটাকেই পণ্ডিতেরা শ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকেন। তবে ওই ধরনের ভোটদান ব্যবস্থা অত্যন্ত জটিল।

বর্তমানে গণতন্ত্র শব্দটি ধনতন্ত্রের প্রতিশব্দরূপে নানা ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইতেছে। বিশেষ করিয়া সোভিয়েত, চীন প্রভৃতি সাম্যবাদী রাষ্ট্রের সমাজতন্ত্রী জীবনধারার সঙ্গে পার্থক্য বুঝাইবার জন্য পাশ্চাত্ত্য ধনতন্ত্রীদেশসমূহ 'গণতন্ত্র' শব্দটি বিশেষ অর্থে প্রয়োগ করে।

তাঁহারা গণতন্ত্রী ব্যবস্থার তাৎপর্যস্বরূপ বিভিন্ন রাজনীতিক দলের স্বীয়

কর্মপদ্ধতি অনুসরণের স্বাধীন অধিকারের কথা বলেন। এই গণতান্ত্রিক অধিকার ফরাসী বিপ্লবের ফলে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গণতন্ত্রী দেশে সরকার বিরোধী দলেরও স্বীয় কার্যক্রম অনুসরণের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে।

ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রচলিত। কোন রাজনীতিক দলেরই আইনানুগ কার্যক্রমের উপর কোনও বাধা আরোপ করার ক্ষমতা এদেশের আইন কাহাকেও দেয় নাই। গণতান্ত্রিক আদর্শ অনুসৃত হওয়ায় কংগ্রেস শাসকদলের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াও কমিউনিস্ট পার্টি ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম রাজনীতিক দলের মর্যাদা লাভ করিয়াছে। এমন কি, মাধ্যমে নির্বাচনের সাময়িকভাবে কেরল রাজ্যে কমিউনিস্ট শাসনও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্র, কেরল প্রভৃতি রাষ্ট্রে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিপত্তি খুবই বিস্তৃত।

গণতন্ত্রী রাষ্ট্রসমূহের আর্থিক কাঠামো ধনতন্ত্রের উপর রচিত হয়। ভারতের ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। ভারতের আর্থিক ক্ষেত্রে, বৈষয়িক ব্যাপারে ব্যক্তিগত মালিকানা ব্যবস্থা প্রচলিত। কোন কোন ক্ষেত্রে সরকার হইতেও প্রত্যক্ষভাবে কলকারখানা প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। সরকারী উদ্যোগে এই কল-কারখানা প্রতিষ্ঠা করাকে কংগ্রেসীরা নাম দিয়াছে—কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী ধাঁচ।

কংগ্রেস হইতে ভারতরাষ্ট্রের আদর্শরূপে সমাজতন্ত্রের কথাই প্রচারিত হইতেছে। ধনতন্ত্রী ব্যবস্থায় মুষ্টিমেয় লোকের কর্তৃত্বে রাষ্ট্রের সমস্ত উৎপাদনের উপকরণ চলিয়া যাওয়ায় দেশের স্বার্থ অপেক্ষা ব্যক্তির স্বার্থ বড় হইয়া উঠে। সর্বহারা শ্রমজীবী দল দেশের সম্পদ উৎপাদন করিয়াও তাহার ফল লাভ হইতে বঞ্চিত হয়।

ব্যক্তিগত মালিকানায় কাহারও কাহারও সম্পদ মুনাফায় স্ফীত হইয়া উঠে আর অন্যদিকে দারিদ্র্যের পেষণে জনজীবন হয় ক্লিষ্ট। সমাজের দাবির সঙ্গে তাল রাখিয়া আজ আর ধনতন্ত্র অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। সমাজের প্রয়োজন অনুপাতে সক্রিয় নয় বলিয়া ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থার একদিকে বিরাট অপচয়ের পাহাড় জমিয়া উঠে আর অন্য দিকে দেখা যায় অভাবের মহাশূন্যতা। কখনও আসে উৎপাদনের সংকট; আর্থিক পশ্চাদ্বর্তন আর তার আনুষঙ্গিক বেকারী ও দুর্ভোগ। শোষণ, অপচয়, বিলাসব্যসন, দুঃখ-দারিদ্র্য, বেকারী ও সর্বশেষে যুদ্ধ হইতেছে ইহার অনিবার্য পরিণতি।

দেশকে এসব দুর্ভাগ্যের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য পণ্ডিত নেহরুর নেতৃত্বে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রের আদর্শ গ্রহণ করিয়াছে। ইহা শাসকগোষ্ঠীর ঘোষিত রাজনীতিক আদর্শ বলিয়াই আজ আমাদেরও জানিতে হইতেছে, সমাজতন্ত্র বলিতে বাস্তবে কি বুঝায়?

বিজ্ঞানসম্মত সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রবক্তার নাম কার্ল মার্ক্‌স ও ফ্রিড্‌রিখ এঙ্গেল্‌স। ইঁহাদের সমাজতন্ত্রে শোষকশ্রেণীর কোন স্থান নাই। দেশের রাষ্ট্রক্ষমতা শ্রমজীবী জনতার অধিকারে থাকিবে। শ্রমজীবী জনতা দেশের শতকরা নব্বই ভাগ বলিয়া ইঁহারা শ্রমশ্রেণীর শাসনকেই প্রকৃত গণতন্ত্র বলিয়া ঘোষণা করেন।

এই সমাজতন্ত্রে শ্রমজীবী স্বার্থের পরিপন্থী অন্য কোন রাজনীতিক দলের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় না। তাঁহারা বলেন—ধনতন্ত্রের যুগে ভিন্ন ভিন্ন আর্থিক স্বার্থ-বিশিষ্ট বিভিন্ন গোষ্ঠী থাকে বলিয়া তাহাদের স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য এত বিভিন্ন রাজনীতিক দলের উদ্ভব। কিন্তু সমাজতন্ত্রে সকল শ্রেণীর বৈষম্য লোপ করা হয় বলিয়া কোন ভিন্ন রাজনীতিক দলের প্রয়োজনীয়তা থাকে না।

সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রে উৎপাদনের সকল উপকরণই রাষ্ট্রের হাতে থাকে। কেহ তাহাতে ব্যক্তিগত ফল লাভের আশা করিতে পারে না। সর্বত্র রাষ্ট্রেরই মালিকানা থাকায় শ্রমশ্রেণীর উপরেও শোষণের কোন আশঙ্কা থাকে না।

ভারতের কংগ্রেসদল কার্ল মার্ক্‌স প্রণীত এবং সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ও চীনে অনুসৃত সমাজতন্ত্রী আদর্শ হুবহু অনুকরণ করিতে রাজী নন। তাঁহারা চলিতে চান মাঝামাঝি পথে। ইঁহাদের মতে—মার্ক্‌সীয় সমাজতন্ত্র ভারতভূমিতে অচল।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, গণতান্ত্রিক নির্বাচন পদ্ধতিতে জয়লাভ করিয়া কেরল রাজ্যে কমিউনিস্ট পার্টি যে সরকার একদা গঠন করিয়াছিল, পরবর্তী কালে রাষ্ট্রপতির নির্দেশে তাহা বাতিল করা হয়। আবার নূতন নির্বাচনের দ্বারা কংগ্রেসের নেতৃত্বে বর্তমানে ত্রিদলীয় সরকারের শাসন কায়েম করা হইয়াছে।

ভারতীয় কংগ্রেস নেতাদের মধ্যপন্থা বাছিয়া লওয়া হইতে একটা সত্য ফুটিয়া উঠে—তাহা হইতেছে এই যে, ধনতন্ত্রী সমাজব্যবস্থা আজ অচল হইয়া উঠিয়াছে। এবং তাহার স্থানে অবিলম্বে উন্নততর সমাজব্যবস্থার আমদানি করা দরকার। সেজন্যই তাঁহারা সমাজতন্ত্রী ধাঁচের সমাজব্যবস্থার কথা ঘোষণা করিয়াছেন।

কিন্তু একটা বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে যে, কংগ্রেসের প্রগতিশীল অংশ সমাজতন্ত্রের পক্ষপাতী হইলেও একটি বৃহৎ অংশ আজও তাহার বিরোধী। কখনও কখনও কংগ্রেসে তাহাদেরই প্রাধান্য ঘটিয়া থাকে। পণ্ডিত নেহরু সমাজতন্ত্রী সমাজের ভাল জিনিসগুলি গ্রহণ করিয়া খারাপগুলি বর্জন করিতে চান। সে চেষ্টা সত্যই প্রশংসার্হ। কিন্তু সমাজবিজ্ঞানীরা বলেন যে, সমাজতন্ত্র এমন একটি আদর্শ যা লইয়া আপস করা চলে না। সমাজের বৈপ্লবিক রূপান্তর না ঘটানো পর্যন্ত সমাজতন্ত্রের গুণগুলির যথাযথ বিকাশ লাভ হয় না।

আজ পৃথিবীর মানুষ সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র উভয় আদর্শেরই যাচাই করিবার অবকাশ পাইতেছে। একদিকে থাকিতেছে সমাজতন্ত্রের দেশের অগ্রগতি—শিল্পে, বিজ্ঞানে, সংস্কৃতিতে—সর্বক্ষেত্রে; আর অন্যদিকে তারই পাশাপাশি ধনতন্ত্রের পশ্চাদ্বর্তন।

ভারত এক মিশ্রব্যবস্থার দ্বারা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুফলগুলিকে আয়ত্ত করিতে চাহিতেছে। সেইদিক হইতে ভারত রাষ্ট্রনায়কদের প্রচেষ্টার যে যথেষ্ট গুরুত্ব আছে তাহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইহার দ্বারা আমরা সমাজতন্ত্রের সর্বাঙ্গীন সুফল পাইতেছি না। যেমন—উৎপাদনের ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচ প্রয়োগ করা হইতেছে বটে—কিন্তু বণ্টনের ক্ষেত্রে দেশের ক্ষুধার্ত জনসাধারণ তাহার পূর্ণ সুযোগগুলি পাইতেছে না। অথচ এই সুযোগ লাভ করিয়া সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত রাশিয়া ও চীনের জনসাধারণ আজ নিজেদের দুর্ভাগ্য ও দুর্দশা মোচন করিয়া ফেলিয়াছে। সে ক্ষেত্রে ভারতের দরিদ্র মানুষ এখনও পথে পড়িয়া মরে, বেকারীর জ্বালায় জ্বলে, সর্বস্বান্ত হইয়া পথে দাঁড়ায়। ক্ষুধার্ত শিশু নীরবে ভিক্ষার জন্য হাত পাতিয়া আসিয়া দাঁড়ায়।

।। বর্তমান বিশ্বে ভারতের স্থান ও মর্যাদা ।।

।। ভারতের অতীত আদর্শ ।। মধ্যযুগের অন্ধকার ।। বৃটিশযুগ ও স্বাধীনতা ।।
।। অহিংসানীতি ও বিশ্বে ইহার প্রসার ।। রাষ্ট্রনীতি-নূতন বাণী-ভবিষ্যৎ ।।

বিশ্বের প্রাচীন সভ্যতাগুলির মধ্যে অন্যতম ভারতীয় সভ্যতা তাহার অন্তর্নিহিত বাণী অহিংসা, প্রেম ও মৈত্রীর জন্য, বিশ্বমানবের ভ্রাতৃত্বের জন্য, সুদূর অতীতেও বিভিন্ন দেশের মধ্যে একটি সুউচ্চ শ্রদ্ধার আসন অধিকার করিয়াছিল। পরজাতিকে পদানত না করিয়া, শোষণ না করিয়া তাহার মধ্যে কি করিয়া মহৎ জীবনবোধ, মহৎ আদর্শ প্রচার করিয়া তাহাকে নবীন অথচ উন্নত সভ্যতার জ্ঞানালোকে উত্তীর্ণ করানো যায়, তাহার রহস্য সে দিনের ভারতবাসীর করায়ত্ত ছিল। ভারত ইতিহাসের সেই পুণ্যস্মরণীয় রচয়িতাদের স্বর্ণ-করস্পর্শে সেদিন প্রাচ্যের দেশে দেশে নূতন সভ্যতার পুষ্প ফুটিয়া উঠিয়াছিল কম্বোজ, যবদ্বীপ, তিব্বত, মধ্য এশিয়ায়। এই কারণে, সেদিনের পৃথিবীতে ভারত এক মহান নেতৃত্বের পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিল। মৈত্রী ও অহিংসার জন্মভূমি ভারতবর্ষ এই কারণে প্রাচীন সভ্যদেশগুলির ছিল পুণ্যতীর্থভূমি।

তাহার পর দীর্ঘকালের জন্য ভারতে নামিয়া আসিয়াছিল এক অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ। মধ্যযুগের নানা সংস্কার ও সংকীর্ণতার মধ্যে ভারত নিমজ্জিত হইল—নিস্পৃহতা, আলস্য ও চিন্তাহীনতা বহির্বিশ্ব হইতে তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছিল। এই সময়ে তাহার বাহিরের মর্যাদা ও প্রতাপ যেমন ক্ষুণ্ণ হইল তেমনি ভিতরের দুর্বলতাও তাহাকে হীনবীর্য করিয়াছিল। এর পর নামিয়া আসিল মুসলমান শাসনের যুগ। তাহাও প্রায় পাঁচশত বৎসরের। মুসলমান শাসনশক্তির পতনের পর আসিল সাগরপারের ইওরোপীয় শাসনকাল, অষ্টাদশ শতকের শেষাংশে। উনবিংশ শতকের নূতন ভারত ইংলণ্ডের হস্ত হইতে নব্য ইওরোপীয় শিক্ষা ও ভাবাদর্শ গ্রহণ করিল। বাঙলা, তথা ভারতে শুরু হইল বিলম্বিত রেনেসাঁস বা নবজাগরণের দেশে প্রচারিত হইল মিল ও বেন্থামের 'হিতবাদ'—পাশ্চাত্ত্য গণতন্ত্রের মন্ত্র। যুগোপযোগী নবীন ভাবধারায় দীক্ষিত ভারত স্বাধীনতা, সাম্য ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের বাণীতে উদ্বুদ্ধ হইল। আরম্ভ হইল স্বাধীনতার প্রচেষ্টা। বিংশ শতকে ভারতের প্রাচীন অথচ মৌলিক ভাবধারা গান্ধিজীর ব্যক্তিত্বে মূর্ত হইয়া স্বাধীনতার সংগ্রামকে এক অপূর্ব বিশিষ্টতা প্রদান করিল। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের এক মৌলিক পার্থক্য দেখা গেল। ইহার লক্ষ্য ছিল বিদেশী শাসনের অবসান কিন্তু পন্থা ছিল অহিংসা। ভারতবাসীর মনে বিদেশী অন্যায় শাসনের প্রতি ছিল বিরোধিতা, কিন্তু তাহাতে বিদেশীয়দের প্রতি ছিল না তিক্ততা, বিদ্বেষ বা ঘৃণা। সমগ্র পৃথিবী ভারতের 'অহিংস অসহযোগ' পন্থার সাফল্যে আজ বিস্মিত। বিংশ শতকের পঞ্চম দশকে শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরের দ্বারা দীর্ঘ রজনীর অবসানে ভারত স্বাধীনতার উষায় উপনীত হইল। আর একবার ভারত প্রমাণ করিল, প্রাচীনকালের মতই আজও তাহার স্বকীয় প্রতিভার মৌলিকতা অক্ষুণ্ণ।

ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অস্তকালে, অহিংস পন্থায়, শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান, এশিয়া ও আফ্রিকার ঔপনিবেশিক শাসনে নিপীড়িত কোটি কোটি মানবাত্মার মনে এক নূতন আশার আলোক আনিয়াছে। ভারতের স্বাধীনতা পৃথিবীর পরাধীন দেশগুলিতে এক নূতন বৈপ্লবিক সম্ভাবনা সৃষ্টি করিয়াছে। ভারতের অহিংস অসহযোগের মন্ত্র পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জনসমষ্টির নিপীড়িত অংশের হস্তে এক নূতন অমোঘ অস্ত্র তুলিয়া দিয়াছে। অভাবিতরূপে আজ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বর্ণবিদ্বেষীদের সহিত অসম সংগ্রামে তথাকার নিগ্রো জনসাধারণের দ্বারা এই পন্থার সফল পরিণতি ঘটিয়াছে।

শোষণ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে স্বাধীন ভারতের সুস্পষ্ট ঘোষণা, ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সমর্থনের বাণী, ভারতকে আজ পরিবর্তিত বিশ্ব পরিপ্রেক্ষিতে এক নূতন শ্রদ্ধার আসন প্রদান করিয়াছে।

কোটি কোটি নরনারী অধ্যুষিত, দারিদ্র্য ও বুভুক্ষা পীড়িত, ব্যাধি জর্জরিত, অশিক্ষা ও অপশিক্ষায় নিমগ্ন এই দেশে গণতন্ত্রের অগ্নিপরীক্ষা, পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নতির কঠোর প্রচেষ্টা ধনবাদী ও সমাজবাদী, সকল শ্রেণীর দেশের নিকট হইতেই বিস্ময়মিশ্রিত প্রশংসা অর্জন করিয়াছে। ভারতের নূতন সংবিধান ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সমন্বয়ের এক অভূতপূর্ব প্রচেষ্টারূপে স্বীকৃত। ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরীক্ষার সাফল্যের উপর আজ পৃথিবীতে পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে।

পরিশেষে, ভারত আজ আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রেও তাহার স্বকীয় মৌলিক প্রতিভার পরিচয়ে বিশ্বশান্তি ও আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্কের ক্ষেত্রে নূতন পথের ইঙ্গিত দিয়াছে। তাহার 'পঞ্চশীল' নীতি ও ইহার ভিত্তিতে একাধিক রাষ্ট্রের সহিত পারস্পরিক মৈত্রী, পারস্পরিক সার্বভৌমিকতার প্রতি শ্রদ্ধা, পরস্পরের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিশ্রুতি ও নিজ নিজ পৃথক সমাজব্যবস্থার শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের চুক্তি, পরস্পর বিরোধী দুইটি শিবিরে বিভক্ত পৃথিবীতে শুধু বিরোধী রাষ্ট্রগুলির নহে, অপর রাষ্ট্রগুলির সম্মুখেও যুদ্ধ ও ধ্বংসের হাত এড়াইয়া সুনিশ্চিত শান্তির, সমৃদ্ধির সম্ভাবনায় উজ্জ্বল এক নূতন ভবিষ্যৎ পৃথিবীর ভিত্তি স্থাপন করিয়াছে। চীনের নূতন রাষ্ট্রকে স্বীকার করিয়া ও বারংবার জাতিসঙ্ঘে চীনকে স্বীকৃতিদানের প্রস্তাব আনয়ন করিয়া, ভারতই পশ্চিমী দেশগুলির সম্মুখে এক বাস্তবধর্মী রাষ্ট্রনীতির দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে।

স্বাধীন ভারত আজ সমগ্র বিশ্বকে এই শিক্ষাই দিয়াছে যে, জাতি ও বর্ণবিদ্বেষ, ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা এবং পারস্পরিক ক্রোধ ও হিংসার দ্বারা পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি ও গণতন্ত্রের পথ সুনিশ্চিত করা যায় না। ইহার জন্য চাই সকল ভেদ বিভেদের অবসান, চাই ঔপনিবেশিক শাসন হইতে মুক্তি, চাই ক্ষুদ্র ও বৃহৎ, বিভিন্ন দেশের স্বীয় প্রতিভা ও প্রয়োজন অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন সমাজব্যবস্থার পারস্পরিক স্বীকৃতি ও শ্রদ্ধা, চাই শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান, চাই বিবাদ মীমাংসার পন্থা হিসাবে পশুবল ও হিংসার বর্জন, চাই পারস্পরিক উন্নতির জন্য ঘনিষ্ঠ পারস্পরিক সহযোগিতা। ইহাই বর্তমানের বিভিন্ন সমস্যা জর্জরিত, পারমাণবিক বোমা ও ক্ষেপণাস্ত্র বিভীষিত পৃথিবীর নিকট অমর ভারতের নবীন বাণী। এই বাণীর মধ্যে মানবজাতির প্রতিটি অংশের শান্তির আকাঙ্ক্ষা, প্রগতির আকাঙ্ক্ষা,

সুখী ও সম্মানিত জীবনযাপনের আকাঙ্ক্ষা মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে, প্রতিফলিত হইয়াছে বলিয়াই ক্ষুদ্র ও বৃহৎ, দুর্বল ও শক্তিশালী, উন্নত ও অনুন্নত সকল দেশ ও জাতির হৃদয়ে ভারত আজ এক শ্রদ্ধাপূর্ণ আসন, সুমহান মর্যাদা লাভ করিয়াছে।

শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ছাত্রসমাজ

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা ও সমাজচিন্তা

।। সমাজ ও শিক্ষার দুর্দশা ।। ইংরেজী শিক্ষার কুফল ।। কবিগুরুর প্রস্তাব ।। নারী ও অশিক্ষিত সাধারণ সম্পর্কে বক্তব্য ।। নব শিক্ষার উদ্দেশ্য ।। বর্তমান কর্তব্য ও ভবিষ্যৎ ।।

রবীন্দ্রনাথ কবি, রবীন্দ্রনাথ দার্শনিক। দার্শনিক কবির মন আকাশের অনন্ত নীলিমার মধ্যে ডানা মেলিয়া যেমন উড়িতে চায়, নীড়ের বন্ধনও তেমনি তাঁহাকে আবার ধরনীর ধূলির মধ্যে টানিয়া আনে। এই পৃথিবীর সুখদুঃখ, হাসিকান্না, আলোছায়ার বিচিত্র গানকে কবি ভালবাসেন, তাই বারবার ভাবজগৎ হইতে এই নীড়ের মধ্যেই তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে হয়। সংসারের দুঃখদৈন্য কবির হৃদয়ানুভূতির মূলে দোলা দেয়, দেশের সমাজবিধি তাঁহার মনে নূতন চেতনার সাড়া জাগায়, ধর্ম ও রাজনীতির সত্যপথের সন্ধান দেন তিনি; স্বদেশপ্রেম আর স্বদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় তিনি কাতর হন। তাই শুধু বাঁশীর সাধনা লইয়াই তাঁহার জীবন অতিবাহিত হয় নাই, বাস্তব-জগতের বহুদিক তাঁহার প্রতিভার স্পর্শে নূতন অর্থ লাভ করিয়াছে।

অবস্থার দৈন্য আর অশিক্ষার আত্মগ্লানিতে বাঙালী যখন নীচের দিকে তলাইয়া যাইতেছিল, আপন দুর্ভাগ্যের উর্ধ্বে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার আর যখন তাহার কোন শক্তিই ছিল না, কবিমনের সকাতর দৃষ্টি তখন দেশের শিক্ষাবিধির উপরে আসিয়া পড়িল। প্রকৃত শিক্ষার আলো না পাইলে মানুষ মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে না, মানবত্ববোধের উদ্বোধন হয় না, এ সত্য রবীন্দ্রনাথ সমস্ত অন্তর দিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন। শিক্ষার নামে বাংলা দেশের এই অশিক্ষা তাঁহাকে ব্যথিত করিয়া তুলিল, তিনি উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে নূতন সঞ্জীবনী ধারাকে আবার প্রবাহিত করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সুচিন্তিত সমস্ত শক্তিকে লইয়া অগ্রসর হইয়া আসিলেন।

দেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন হইল। নূতন ভাষার আকস্মিক ঔজ্জ্বল্যে মোহগ্রস্ত হইয়া আমরা বিদেশী ভাষাকে অবশ্যপাঠ্যরূপে এবং শিক্ষার বাহন করিয়া গ্রহণ করিলাম। ইংরেজী ভাষাকে আয়ত্ত করিতে না পারিয়া গোটা বইকে মুখস্থ করা ছাড়া আর কোন উপায় আমাদের রহিল না। আস্ত গন্ধমাদন বহন করিতে গিয়া বিশল্যকরণীর সঙ্গে আমাদের জীবনের আর পরিচয়ই ঘটিয়া উঠিল না কোনদিন। এই নীরস শিক্ষায় আমাদের শিক্ষা-জীবনের মাহেন্দ্রক্ষণ অতীত হইয়া গেল। জীবনের এক-তৃতীয়াংশ সময় শুধু এই কথার বোঝা টানিতে

টানিতে অদ্ভুত এক শিক্ষার সঙ্গে আমাদের জীবনের কোন সামঞ্জস্য সাধনই হইল না। প্রাচীন ভারতে শিক্ষার অভাব ছিল না। শুধু তাই নয়, তপোবনচ্ছায়ায় গুরুগৃহের সে শিক্ষার, টোল পাঠশালার সে শিক্ষার এক সর্বজনীন রূপও ছিল। বর্তমান শিক্ষায় স্মৃতিশক্তির সাহায্যে যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী পাইল, শিক্ষিত বলিয়া সমাজে তাহারাই শুধু খ্যাতি লাভ করিল। আর যাহারা বইটাকে মস্তিষ্কের মধ্যে চুরি করিয়া পরীক্ষার হলে প্রবেশ করিতে পারিল না, তথাকথিত শিক্ষিত সমাজে, আধুনিক সভ্যজগতে চিরদিনের জন্য তাহারা অপাঙক্তেয় হইয়া রহিল। ভাষা শিক্ষার সঙ্গে ভাব শিক্ষা আর ভাবের সঙ্গে জীবনের সমন্বয় আমরা করিতে পারিলাম না। রবীন্দ্রনাথের মতে আমাদের আধুনিক শিক্ষাজগতের 'হের-ফের' এইখানেই।

রবীন্দ্রনাথ বলেন—চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তি আমাদের জীবনযাত্রার পক্ষে অত্যাবশ্যক। মানুষের মতো মানুষ হইতে হইলে জীবন হইতে এই দুইটি শক্তিকে বাদ দিলে চলিবে না। কিন্তু বর্তমান শিক্ষায় আমাদের সে পথ একেবারেই রুদ্ধ। আমরা পড়িতেছি, কিন্তু সেই সঙ্গে ভাবিতেছি না। পাঠ্যপুস্তকের স্তূপীকৃত মালমসলারূপ দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরকে অতিক্রম করিয়া মনের মধ্যে ভাবের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিতেছে না। ফলে মানসিক শক্তির অনুশীলনের অভাবে চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তি জড়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া আমাদের এক অদ্ভুত জীবে পরিণত করিতেছে। অনেকে মনে করেন, আমাদের এই নিরানন্দময় পঙ্গু জীবনের জন্য দায়ী বিদেশী শিক্ষা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের সঙ্গে একমত নন। তাঁহার মতে —"আসল কথা, আধুনিক শিক্ষা তার বাহন পায় নাই, তার চলা ফেরার পথ খোলাসা হইতেছে না।" তিনি বলেন বিদেশী শিক্ষা নয়, বিদেশী ভাষাই আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে মাধ্যমরূপে প্রবেশ করিয়া আমাদের সমস্ত জীবন ও জাতির সর্বনাশ করিতেছে। অথচ প্রাচীন ভারত একদিন শুধু আপন সন্তানকেই শিক্ষিত করে নাই, তার জ্ঞানের আলোকে সমস্ত জগৎই ভারতের দিকে ছুটিয়া আসিয়াছিল। ভারতের সেই বাণীর জন্য আজও বিশ্ববাসী উদ্গ্রীব হয়—কিন্তু ভারতের সেই বাণী আজ কই! বিদেশী ভাষা আজ তাহাকে নির্বাক করিয়া দিয়াছে। বিদেশী ভাষার হাতে পড়িয়া আমাদের বিদ্যা আর তার অবগুণ্ঠন খুলিল না।

আমাদের প্রবাসিনী আধুনিকী বিদ্যার বিশিষ্টরূপ আছে, সাধারণ রূপ নাই। রবীন্দ্রনাথ বলেন, "পাথরে গাঁথা কুণ্ডের মত বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যা শুধু কয়েকজন শিক্ষিত লোকের মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া আছে আর গবাক্ষ লণ্ঠনের আলোর মত আমাদের সমস্ত দৃষ্টির লক্ষ্য সেই শিক্ষিত সমাজের দিকেই কেন্দ্রীভূত

হইয়া আছে। বিশেষ শিক্ষার গতিকেই আমরা দেশ-দেখা চোখ হারাইয়াছি। সর্বজনীন শিক্ষার কথা ভুলিতে বসিয়াছি। বিদেশী ভাষার প্রভাবে পড়িয়া আমাদের দেশের সেই সনাতন শিক্ষার ব্যাপ্তি রুদ্ধ হইল, আবার আধুনিক কালের নতুন বিদ্যার যে আবির্ভাব হইল, তাহার প্রবাহও সর্বজনীন দেশের অভিমুখে প্রবাহিত হইল না।" শুধু ইংরেজী ভাষা আয়ত্ত করিতে পারিল না বলিয়া শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা, উদ্যম ও যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও দেশের একটি বৃহৎ শক্তি বিনষ্ট হইয়া গেল। ফলে ইংরেজীশিক্ষিত লোকের সঙ্গে অপাঙ্‌ক্তেয় জনসাধারণের মনের মিলন ভাবের মিলনের পথ রুদ্ধ হইল। শ্রেণীতে শ্রেণীতে দেখা দিল জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা। বর্ণভেদ নয়, শিক্ষাক্ষেত্রের এই শ্রেণীভেদই ভারতের সনাতন মহান আদর্শকে ক্ষুণ্ন করিল।

রবীন্দ্রনাথ বলেন যে, শিক্ষার দৈন্যকে দূর করিতে হইলে বিদেশী ভাষা নয়, মাতৃভাষাকেই আমাদের শিক্ষার বাহন করিতে হইবে। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা কতখানি সজীব হইতে পারে, এবং কত অল্প সময়ের মধ্যে একটি জাতি সর্বাঙ্গীন উন্নতি লাভ করিয়া পুষ্ট হইতে পারে, জাপান সেই আদর্শ জগতের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছে। জাপান বিদেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান সবই গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু বিদেশী ভাষাকে সে সর্বপ্রযত্নে পরিহার করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে অনেকে আপত্তি তুলিতে পারেন যে, উচ্চস্তরের শিক্ষাগ্রন্থ আমাদের মাতৃভাষায় নাই। এবং উচ্চশিক্ষার জন্য গ্রন্থও আমাদের ভাষায় রচনা করা সম্ভব হইবে না। রবীন্দ্রনাথ এ মত সমর্থন করিতে পারেন নাই। তাঁহার মতে—আমাদের ভাষায় উপকরণের অভাব নাই, উদ্যমেরই সম্পূর্ণ অভাব। 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্' বহুদিন আগেই পরিভাষা রচনা ও সঙ্কলনের ভার লইয়াছেন। কিন্তু আমাদের তাগিদ নাই, তাই তাঁহাদের কাজেও শিথিলতা আসিয়াছে। তিনি বলেন যে, আসল কথাটা, আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে গরজ নাই। প্রকৃত শিক্ষার জন্য যেদিন আকাঙ্ক্ষা দেখা দিবে, সর্বজনীন শিক্ষার প্রসারের জন্য যেদিন আমাদের মনে উদ্যম জাগিবে, গ্রন্থের অভাব সেদিন আর নিশ্চয়ই থাকিবে না। বিশেষ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় আপন পীঠস্থানের বাইরেও যদি আপন সত্তা প্রসারণ করেন, তবে যথোপযুক্ত পাঠ্যগ্রন্থ মাতৃভাষায় রচনা করা অবশ্যই সম্ভব হইবে।

ইংরেজী ভাষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকা হইতে সম্পূর্ণ তুলিয়া দিবার কথা রবীন্দ্রনাথ কখনও বলেন নাই। তাঁহার মতে—"বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী এবং বাংলা ভাষার ধারা যদি গঙ্গাযমুনার মতো মিলিয়া যায় তবে বাঙ্গালী শিক্ষার্থীর পক্ষে এটা একটা তীর্থস্থান হইবে। ইহাতেই দেশের শিক্ষা যথার্থ

বিস্তীর্ণ হইবে, গভীর হইবে, সত্য হইয়া উঠিবে।" তাঁহার মতে—প্রেপারেটরি ক্লাস পর্যন্ত একরকম পড়াইয়া তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ের মোড়টার কাছে যদি ইংরেজী বাঙলা দুটি বড় রাস্তা খুলিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে ভিড়ের চাপ কিছু কমিবেই, দ্বিতীয়ত শিক্ষার বিস্তারও অনেক বাড়িবে।

রবীন্দ্রনাথ শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জীবনের কথাই চিন্তা করেন নাই। অন্তঃপুরের মেয়েরা কিংবা পুরুষদের যাহারা নানা বাধায় বিদ্যালয়ে ভরতি হইতে পারে না, তাহাদের জীবনের কথাও রবীন্দ্রনাথ ভাবিয়াছেন। তাহাদের অবকাশ কালে শিক্ষার চর্চা করিয়া তাহারা যাহাতে অশিক্ষার লজ্জা নিবারণ করিতে পারে—সেই ভারও তিনি বিশ্ববিদ্যালয়কে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। দেশজোড়া একটা শিক্ষার বেড়াজাল পাতিলেই তাহাদের মধ্যে পরীক্ষাপাঠ্য বইগুলি স্বেচ্ছায় ও আনন্দে আয়ত্ত করিবার উৎসাহ জাগিবে। এবং ব্যক্তি বিশেষের মনের প্রবণতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই বিশ্ববিদ্যালয়কে এক্ষেত্রে পাঠ্যতালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে।

প্রকৃতির সান্নিধ্যের আনন্দকে শিক্ষার সহচর করিতে হইবে—ইহাও রবীন্দ্রনাথের অভিমত। শুধু পাঠ্য তালিকার জটিল বিষয়বস্তু ও পরীক্ষার ক্লান্তি অনেক সময়ে আমাদের পাঠবিমুখ করিয়া তোলে। শিক্ষাকে আনন্দের সামগ্রী করিয়া তুলিতে হইলে পাঠ্যতালিকার বাহিরে ও খেলাধূলার মধ্যে শিক্ষাকে বিস্তার করিতে হইবে। প্রকৃতির সাহচর্য লাভ না করিলে আমাদের দেহমন পুষ্টিলাভ করিতে পারে না। এই সত্যের উপলব্ধি হইতেই শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথের হাতে অমৃতনিষ্যন্দী শান্তিনিকেতন জন্ম লাভ করে।

কলেজের বাহিরেও যে একটা দেশ পড়িয়া আছে, রবীন্দ্রনাথ আমাদের দৃষ্টিকে সেদিকেও আকৃষ্ট করিয়াছেন। "কলেজের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সমস্ত দেশের সঙ্গেও একটা যোগস্থাপন করিতে হইবে। অন্য দেশে সে যোগ চেষ্টা করিয়া স্থাপন করিতে হয় না। সে সব দেশের কলেজ দেশেরই একটা অঙ্গ। কিন্তু আমাদের দেশের সঙ্গে কলেজের কোন সুন্দর ঐক্য স্থাপিত হয় নাই। প্রত্যক্ষ বস্তুর সহিত সংস্রব ব্যতীত জ্ঞান, ভাব, চরিত্র, সমস্তই নির্জীব ও নিষ্ফল হইতে থাকে। নিজের দেশকে ভাল করিয়া জানিতে পারিলে তবেই আমাদের জ্ঞানের ভিত্তি, জীবনের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে"—ইহাই রবীন্দ্রনাথের অভিমত।

যুগের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার পরিবর্তন ও প্রসার হয়। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও শক্তিতে আজ সমস্ত পৃথিবী জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। ভারতবর্ষকে সেই শক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিলে চলিবে না। জড় বিশ্বের অত্যাচার হইতে আত্মাকে মুক্ত

করার সাধনা চলিতেছে পশ্চিম মহাদেশে। এই সাধনার সিদ্ধি মানুষের ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর করিয়াছে, শীত-গ্রীষ্ম, রোগ-দৈন্যের মূলে আঘাত করিয়া মানুষকে অপূর্ব শক্তিশালী করিয়া তুলিতেছে। মৃত্যুকে পরাভূত করিয়া মানুষ আজ মৃত্যুঞ্জয়ী। এই বিজ্ঞানের কল্যাণে 'ভূগোলের বেড়া আজ আর বেড়া নাই'। সমস্ত জগৎ আজ বড় কাছাকাছি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। একত্রিত হইবার বাহ্যশক্তি আজ হু হু করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে সত্যের সমস্যাও বড় হইয়া দেখা দিয়াছে—এক করিবার যে মানুষের আন্তরশক্তি, পশ্চিম জগতে আজ তাহাই আর খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। জাতিতে জাতিতে আজ একত্রিতই হইতেছে, কিন্তু মিলিতেছে না।

আর পূর্ব মহাদেশের যে সাধনা তাহা তাহার অন্তরাত্মার সাধনা। এই সত্যের সাধনাই ভারতকে একদিন অমৃতের সন্ধান দিয়াছে—এই সত্যের উপরেই ভারতের ঐক্যমন্ত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। ঐক্যমন্ত্রে দীক্ষিত না হইলে অন্যকে জানা যায় না, আপনাকে আর প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। কিন্তু ভারতের এই সাধনা ত্যাগের সাধনা, আন্তরশক্তির সাধনা, বহির্বিশ্বের, বহির্জগতের শক্তির সাধনা এখানে নাই। পশ্চিম মহাদেশ শুধু বস্তুবিশ্বকে করতলগত করিয়া আপন অন্তরের শক্তিকে হারাইয়াছে, পূর্ব মহাদেশ শুধু আত্মার মহাশক্তিকেই জাগ্রত করিতে গিয়া জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ বলেন—"পূর্ব ও পশ্চিমের চিত্ত যদি বিচ্ছিন্ন হয় তাহা হইলে উভয়েই ব্যর্থ হইবে। এই মিলনের অভাবে পূর্ব দেশ দৈন্যপীড়িত ও নির্জীব, আর এই মিলনের অভাবে পশ্চিম অশান্তির দ্বারা ক্ষুব্ধ, সে নির্জীব।" জাতির কল্যাণের জন্য, মানবাত্মার শুভ উদ্বোধনের জন্য উভয় মহাদেশকেই সাধনার পথে মিলিতে হইবে। আর পূর্ব-পশ্চিমের এই মিলনের পথ আমাদের বিদ্যানিকেতনকেই করিয়া দিতে হইবে—ইহাই রবীন্দ্রনাথের অন্তরের কামনা।

মনুষ্যত্ব গঠনের প্রধান ও সুদৃঢ় ভিত্তি মানুষের শিক্ষিত মন। এই মনের সঙ্গে সংযোগ রাখিয়াই জাতীয় জীবনের উত্থান ও পতন হয়। তাই আমাদের শিক্ষাকে শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখিয়া মুষ্টিমেয় কয়েকটি লোককে শিক্ষিত করিলে চলিবে না। দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে ব্যক্তিবিশেষের মনের প্রবণতার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষাকে সর্বত্র ছড়াইয়া দিতে হইবে। বিদেশের সুন্দর শিক্ষার সহিতও নিজের শিক্ষার সামঞ্জস্য বিধান করিয়া ইহাকে সম্পূর্ণাঙ্গ করিতে হইবে। আর এই বিশেষ ব্যবস্থার জন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাতর

আবেদন বিশ্ববিদ্যালয়ের দুয়ারেই উপস্থিত করিয়াছেন। এই গুরু দায়িত্ব বহন করিবার যোগ্যতা একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়েরই আছে। তাই কবি তাহার উপরেই দেশের শিক্ষার ভার অর্পণ করিয়াছেন।

মাতৃভাষায় শিক্ষার উপযোগিতা

॥ প্রাচীন আদর্শ ও শিক্ষার উদ্দেশ্য ॥ শিক্ষার আনন্দময় পরিবেশ ॥
॥ ইংরেজী ভাষার সমালোচনা ॥ স্বদেশী ভাষায় উচ্চশিক্ষার সম্ভাবনা ॥
॥ বিদেশের সহিত তুলনামূলক আলোচনা ॥ পরিভাষা সমস্যা ॥
॥ পরিকল্পনা ॥

আলোতে আমরা মিলি, অন্ধকারে বিচ্ছিন্ন হই। শিক্ষাই আমাদের অন্তরে এই জ্ঞানের আলো জ্বালে। শিক্ষার আলোতে যাহাদের মন উদার হইয়াছে, সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্য দিয়া মানবত্বের পূর্ণ মর্যাদা উপলব্ধি যাহারা করিতে পারিয়াছে, জগতে তাহাদের আসনই সকলের উপরে পাতা হইয়াছে। এই শিক্ষার আলোতেই মানুষের সঙ্গে মানুষের সংযোগ ঘটে, জাতির হাতে জাতি রাখি পরায়, বিশ্বমৈত্রীর বন্ধনে জগতে ঐক্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাচীন ভারতের শিক্ষার মূলমন্ত্রই ছিল এই ঐক্যের সাধনা। তাইতো তাহার গৃহে চলিত বিশ্বের জন্য আতিথেয়তার আয়োজন।

চিন্তাশক্তিকে সচেতন করিয়া তোলা এবং কল্পনাশক্তিকে জাগ্রত করা—শিক্ষার এই দুইটিও বড় উদ্দেশ্য। "যদি মানুষের মত মানুষ হইতে হয়, তবে ঐ দুটা পদার্থ জীবন হইতে বাদ দিলে চলে না।" এবং বাল্যকাল হইতেই ইহাদের চর্চা করিতে হয়, নতুবা ইহারা সম্যক স্ফূর্তিলাভ করিতে পারে না।

কিন্তু আমাদের বর্তমান শিক্ষায় সে আদর্শ, সে উদ্দেশ্য কোথায়? আমাদের দেশে শিক্ষার সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন হইল। ইংরেজী ভাষার মাধ্যমেই আমাদের পঠন পাঠন আরম্ভ হইল। ইংরেজী ভাষা বিদেশী ভাষা—তাহার শব্দবিন্যাস ও পদবিন্যাসের সঙ্গে আমাদের কোন মিল নাই। তাহাদের ভাব ও প্রকাশভঙ্গীর সঙ্গে আমাদের সামঞ্জস্য নাই সুতরাং এই বিদেশী ভাষাকে একবার মস্তকে প্রবেশ করাইয়া পুনরায় তাহা উদ্গিরণ করিতে আমাদের দুর্ভোগের আর অন্ত রহিল না।

আনন্দ শিক্ষার সহচর। আনন্দহীন শিক্ষা নীরস—সে শিক্ষা শিশুর পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। "আনন্দের সহিত পড়িতে পড়িতে পড়িবার শক্তি

অলক্ষিতভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে; গ্রহণশক্তি, ধারণাশক্তি, চিন্তাশক্তি বেশ সহজে এবং স্বাভাবিক নিয়মে বল-লাভ করে।" কিন্তু আমাদের শিক্ষা পদ্ধতিতে আনন্দের স্থান নাই। শৈশবে যাহাদের কাছে আমরা ইংরেজী ভাষার বিদ্যাভ্যাস করি, ইংরেজী ভাষা সম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞান যে খুব বেশী থাকে এমন কথা বলা চলে না। সুতরাং ইংরেজী ভাষার গোড়ার কথাটা বুঝিতে না পারিয়া আমাদের ভাব ও চিন্তাধারার মধ্য দিয়া তাহাকে আয়ত্তে আনিতে পারি না—স্মৃতির সাহায্যে শুধু তাহাকে মস্তিষ্কে বোঝাই করিয়া রাখিতে হয়। এই বোঝার ভার সহ্য করিতে না পারিয়া পড়ার আনন্দ আমরা হারাইতে থাকি। ফলে শিক্ষা নিরানন্দ হয়, মানসিক শক্তি দুর্বল হইয়া পড়ে, চিন্তাশক্তি আপনার পরিপুষ্টির উপযুক্ত খোরাক না পাইয়া নিশ্চেষ্ট হয়, আর ভাব আপনার প্রকাশের কোন পথ না পাইয়া নিজের সৃজনীশক্তিকে হারাইতে থাকে।

এই ইংরেজী বাহনই আমাদের শিক্ষা ও জীবনের মাঝে প্রকাণ্ড বড় অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইল। আমরা 'লজিক' পড়ি, ইতিহাস পড়ি। কিন্তু ভাষাকে কণ্ঠস্থ করিতে করিতেই সময় কাটে, বিষয়বস্তুর সঙ্গে আমাদের আর পরিচয় ঘটিয়া উঠে না। "তাই অনেক স্থলেই বিশল্যকরণীর পরিচয় ঘটে না বলিয়া আস্ত গন্ধমাদন বহিতে হয়; ভাষা আয়ত্ত হয় না বলিয়া গোটা ইংরেজী বই মুখস্থ করা ছাড়া আর উপায় থাকে না।" স্মৃতিশক্তির প্রতিযোগিতাই আমাদের বর্তমান শিক্ষার আসল কথা। বিদ্যার কথা, জ্ঞানের কথা—সে শুধু আমরা মুখেই বলিয়া থাকি। বিদ্যার জন্য, জ্ঞানের জন্য আকাজ্ক্ষা আমরাও করি না, আমাদের শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষও হয়ত আমাদের কাছ হইতে তাহার আশা করেন না।

দুইশত বৎসরের উপর হইল আমরা ইংরেজী ভাষার ভিতর দিয়া শিক্ষা লাভ করিবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু কোটি কোটি ভারতবাসীর মধ্যে কয়জন লোক শিক্ষিত বলিয়া অভিনন্দিত হইবার যোগ্যতা রাখে? বাধ্যতামূলক শিক্ষা আমাদের দেশে না থাকায় একেই শিক্ষাবিস্তারের পথ রুদ্ধ হইয়াছে। তাহার উপরে ইংরেজী ভাষার বিভীষিকা আমাদের নিরুৎসাহ করে, উদ্যম নষ্ট করে। ফলে অতি অল্পসংখ্যক লোক বিদ্যা মন্দিরে প্রবেশ করে, এবং তাহাদেরও অধিক-সংখ্যকের মাথাতেই মা সরস্বতীর প্রসাদীফুলের একটি পাপড়িও বর্ষিত হয় না। প্রকৃত শিক্ষালাভ তাহাদের হয় না, যেমন তেমন একটি ছাড়পত্র পাইয়া সংসার ক্ষেত্রে তাহাদের প্রবেশ করিতে হয়।

আমাদের জীবনের এই নিরানন্দ, নৈরাশ্য ও অশিক্ষাকে দূর করিতে পারে শুধু আমাদের মাতৃভাষা। মাতৃভাষার ভিতর দিয়া যখন আমরা শিক্ষা গ্রহণ

করিব, তখন মাতৃস্তন্যের মতই এই শিক্ষা অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিকভাবে আমাদের বুদ্ধি, চিন্তা ও ভাবধারাকে পরিপুষ্টি দান করিবে। ভাষার মধ্য দিয়া ছাঁকিয়া ছাঁকিয়া ভাব ও বিষয়বস্তু গড়াইয়া পড়িয়া আর হারাইয়া যাইবে না। ভাষা মুখস্থ করিবার জন্য যে সময়ের অপব্যবহার করি, সেই অপচয়ের অপরাধ হইতেও নিষ্কৃতি লাভ করিব। অন্তরের আনন্দের সহযোগেই পাঠ গ্রহণ তখন আমাদের পক্ষে অত্যন্ত সহজ হইয়া উঠিবে। জীবিকার পক্ষে সে শিক্ষা কার্যকরী ত হইবেই, জীবনের মধ্যে মাধুর্যেরও সে-ই সৃষ্টি করিয়া দিবে।

উচ্চ শিক্ষাকে পাইতে হইলে ইংরেজী ভাষাকেই আমাদের শিক্ষার বাহন করিতে হইবে—এ মত যাঁহারা পোষণ করেন, জাপানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তাঁহারা নিজেদের ভ্রম বুঝিতে পারিবেন। জাপান বিদেশের জ্ঞান, বিজ্ঞান সবই গ্রহণ করিল, শুধু গ্রহণ করিল না বিদেশী ভাষাকে। তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিল যে, বিদেশী ভাষার সংকীর্ণ পথ দিয়া তাহারা সকলে চলিতে পারিবে না, তাহাতে জাতির ও দেশের উন্নতি ব্যাহত হইবে। জাপানের ভাষা অপেক্ষা বাঙলা ভাষা শক্তিহীনা নয়। চিন্তাকে বহন করিবার, ভাবকে প্রকাশ করিবার বাঙলা ভাষার শক্তি যে কতখানি, রবীন্দ্রনাথের যুগে এ সত্য প্রমাণ করিবার সাক্ষীর অভাব হইবে না।

তবে প্রশ্ন উঠিতে পারে বাঙলায় উচ্চশিক্ষা দিবার মতো উপযুক্ত শিক্ষাগ্রন্থ আমাদের ভাষায় নাই। ইচ্ছা থাকিলে উপায়ের অভাব হইবে না। পরিভাষার কাজ কিছু কিছু আমাদের আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে ইহার তাগিদ যদি থাকে, তবে পরিভাষা বাঙলা ভাষার সম্পদকে যে বাড়াইয়াই তুলিবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। প্রয়োজনের তাগিদ আসিলে আর উপযুক্ত উৎসাহ পাইলে জ্ঞান কি বিজ্ঞান কোন বিষয়েই উচ্চস্তরের গ্রন্থের অভাব বাঙলা ভাষা রাখিবে না।

ইংরেজী শিক্ষার মোহ একটা আমাদের আছে। অনেকে তাই মনে করেন যে, বাঙলা ভাষা শিক্ষার মাধ্যম হইলে অনেকেই শিক্ষায় বিমুখ হইয়া পড়িবেন। কিন্তু সেই আশঙ্কার কোন কারণ নাই। বাঙলা ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে গ্রহণ করিলেও ইংরেজীকে ত শিক্ষার তালিকা হইতে উঠাইয়া দেওয়া হইবে না। ইংরাজী ভাষা আমাদের সমস্ত জাতির শিক্ষাক্ষেত্রে সুফল প্রদান না করিলেও ইহা যে আমাদের কিছু উপকারও করিয়াছে, এ কথা অস্বীকার করিলে ত চলিবে না। ইংরেজী ভাষাই আজ আমাদের বিশ্বের সমস্ত জাতি ও জাতীয় সাহিত্যের সহিত পরিচয় করিয়া দিয়াছে। আমাদের দেশের অগ্রগতির মূলে

ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের কিছুই অবদান নাই—এ কথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। সুতরাং শিক্ষাক্ষেত্রে মাতৃভাষার পাশে ইংরেজী ভাষা থাকিলে সেখানে কোন গোলযোগের সৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা নাই। শিখিবার আকাঙ্ক্ষা আছে, বুদ্ধির অভাব নাই—এমন শিক্ষার্থী যাহারা, বাঙলা ভাষার দুয়ার তাহাদের জন্যই বিশেষ করিয়া খোলা থাকিবে। ইংরেজী ভাষার বাধাকে অতিক্রম করিতে না পারিয়া শত শত ছাত্রছাত্রীর জীবন যে অশিক্ষায় ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে, এই কথাটাই মহামতি আশুতোষকে উৎকণ্ঠিত করিয়া তুলিয়াছিল। এবং তাঁহারই একান্ত চেষ্টায় সর্বপ্রথমে বাঙলা দেশের শিক্ষামন্দিরে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বাঙলা ভাষা প্রবেশ লাভ করিল। তাঁহার এই প্রচেষ্টা যে কতখানি সুফল প্রসব করিয়াছে, তাহা আজ আর কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। স্নাতকোত্তর বিভাগের পাঠেও বাঙলাকে মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করিবার কথা বর্তমানে শিক্ষাবিদেরা চিন্তা করিতেছেন।

আমাদের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাজ শেষ হইতে চলিল। তৃতীয় পাঁচ বৎসরের জন্য পুনরায় পরিকল্পনা করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনায় শিক্ষার স্থান আছে। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য, শিক্ষাকে তার প্রকৃত মর্যাদা দিবার জন্য রাজ্য সরকারের অর্থ ও উৎসাহের একান্ত প্রয়োজন। এই পঞ্চবার্ষিক শিক্ষা পরিকল্পনা যদি সেই গুরু দায়িত্ব যোগ্যতার সঙ্গে বহন করে, তবে আমাদের শিক্ষায় নিশ্চয়ই সর্বজনীনত্ব আসিবে, আর শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রের বহু সমস্যার সমাধান করিয়া বাঙলার সমাজে যে এক নূতন রূপ আনিয়া দিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

দেশভ্রমণ ও শিক্ষা

॥ মানুষের চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা ॥ ভ্রমণের অর্থ ও উদ্দেশ্য ॥ ভ্রমণে শিক্ষা ও শিক্ষার সম্পূর্ণতা : প্রত্যক্ষ জ্ঞান ॥ শিক্ষায়তনের বর্তমান ব্যবস্থা ॥

সমাজ-জীবনে মানুষ ঘর বাঁধিয়াছে। আত্মীয়স্বজনের মায়ার বন্ধনে সে ধরা দিয়াছে নিজেকে। কিন্তু এই বন্ধন তাহার অন্তরের যাযাবর বৃত্তিকে ত বাঁধিতে পারিল না। তাহার মন তাই যখন তখন বাহিরের ডাকে সাড়া দিতে থাকে; দূরের পিয়াসী মানুষের মন তাই ঘরছাড়া হয়; সংসারের কর্তব্যের বোঝাটিকে পিছনে ফেলিয়া রাখিয়া মানুষ হালকা মনটাকে লইয়া বাহির হইয়া পড়ে নূতনের সন্ধানে। দেশভ্রমণ মানুষের তাই এত প্রিয়।

বিশাল এই বিশ্বের মাঝে মানুষের জন্য কত আয়োজন—কত গন্ধ স্পর্শ রসে ভরা, রহস্যে ঘেরা। বিশ্বের এই বিরাট আয়োজনকে পূর্ণ পরিণতি দিবার জন্য প্রকৃতি আর মানুষের অবদান হাত ধরাধরি করিয়া চলিয়াছে। সুন্দর সৃষ্টি করিয়াই সে ক্ষান্ত হয় নাই—সুন্দরের পূজারীকে, সৌন্দর্যের উপভোক্তাকে বার বার হাতছানি দিয়া ডাকে। এই আহ্বানে মানুষ সাড়া না দিয়া পারে না। অজানাকে জানিবার জন্য, বিচিত্রকে দেখিবার জন্য অনন্ত রহস্যের অবগুণ্ঠনখানিকে খুলিবার জন্য, দেশে বিদেশে তাই মানুষের পদচিহ্ন পড়ে। ভ্রমণের এই দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষার আঘাতেই তাই আমাদের কবির "ঘরের দেয়াল ফাটিয়া চৌচির হয়।"

একটুখানি ছুটির অবকাশেই মানুষ ঘর ছাড়িয়া বাহিরে আসে। কিন্তু এই অবকাশটি মানুষ উপভোগ করে আপনার রুচি ও শিক্ষা দিয়া। শুধু কাজ হইতে অব্যাহতি লাভ করাই যাহাদের উদ্দেশ্য—তাহাদের দিন কাটে শুধু অকারণে। কাজের হাত হইতে ছুটি একটু পাইলেই সে আলস্যে ভরা দিনগুলিকে বৃথাই অপচয় করে। দেশভ্রমণ তাহাদের জীবনে কোন সার্থকতা আনে না। দুইটি চোখ থাকিলেই আমরা সব জিনিস দেখিতে পাই না। হিমালয়ে গিয়া সে দেখিল শুধু পাথর আর গাছ, সমুদ্রবক্ষে সে দেখিল জলের রাশি, তাজমহলের মধ্যে কাঁচ আর পাথরের সমাবেশ ছাড়া যে আর কিছু দেখিল না—চোখ তাহাকে সার্থকতা কোথায় দিল! দেশভ্রমণের জন্য তাই জিজ্ঞাসু মন আর সজাগ দৃষ্টিই মানুষের সঙ্গী—ইহারাই আমাদের 'গাইড'।

জ্ঞান সঞ্চয়নই ভ্রমণের উদ্দেশ্য। সংসারের কর্তব্য কাজের চাপে জগৎটা আমাদের জীবনের অন্তরালে ঢাকা পড়ে। ভ্রমণের অবকাশে সেই জগৎ আসিয়া তখন আমাদের সামনে দাঁড়ায়। তার এই সৌন্দর্যসম্ভারের মহিমা যদি বুঝিতে না পারি তবে এ অপমান একদিন আমাকেই আঘাত করিবে। ইতিহাসের প্রাচীন কীর্তি আর ভূগোলের গুপ্ত রহস্যকে যেন আমরা চোখ মেলিয়া দেখিতে পারি। মন যেন বলিতে পারে—আমি পাইয়াছি। কুতুবমিনারের শুধু দৈর্ঘ্য আর আফ্রিকার ঘন অরণ্যানীর শুধু বিস্তারই যেন আমাদের চোখকে না ভুলায়। মন যদি আমাদের মধুমক্ষিকা না হয়, তবে আমরা ভ্রমণই শুধু করিব—রস সঞ্চয় হইবে না কিছু, শিক্ষা লাভ ব্যর্থ হইবে।

দেশভ্রমণ ব্যতীত মানুষের শিক্ষা সম্পূর্ণতা লাভ করে না। দেশে দেশে মানুষের সমাজের আদর্শ ভিন্ন, শিক্ষা ভিন্ন। তাই বিভিন্ন দেশের এই শিক্ষা, সংস্কৃতি ও আদর্শকে না জানিলে মানুষ অপূর্ণ থাকে, সমাজ পঙ্গু হয়। ভ্রমণ শুধু ব্যক্তিগত লাভ ক্ষতির দিকেই দৃষ্টি রাখে না, সমাজকে সে পরিপূর্ণতা দেয়, জাতির

উন্নতির সে সহায়ক। পুণ্যকামী যাত্রী যাঁহারা তীর্থভ্রমণে যান, তাঁহারা যে শুধু ধর্মজীবনের সম্বল লইয়াই ঘরে ফিরেন তা নয়। অন্তরের দৃষ্টি দিয়া যখন তাঁহারা জীবনের সত্যকেও উপলব্ধি করেন, তখন নূতন এক শিক্ষাও লাভ করেন তাঁহারা। এ শিক্ষা কেতাবী শিক্ষা নয়। জীবনের মর্মমূল হইতে এ শিক্ষা আসে, এ শিক্ষাই সত্যকারের শিক্ষা।

দেশ ভ্রমণ শ্রমসাধ্য অর্থসাপেক্ষ। কিন্তু অনুসন্ধিৎসু যে মন, অজানাকে জানিবার অদেখাকে দেখিবার জন্য আকুলতা যাহার মনে জাগিয়া উঠিয়াছে—পথের বাধা তাহাকে ভয় দেখাইতে পারে না। সমুদ্রের ভয়াল উত্তাল তরঙ্গ, হিমালয়ের তুষার পর্বত তাহার আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিরোধ করিতে পারে না, মরণজয়ী তাহার শক্তিকে করিতে পারে না ব্যাহত। তাই দেখি, কলম্বস অজানার উদ্দেশ্যে বিক্ষুব্ধ সাগরতরঙ্গের উপরে তাঁহার জাহাজের পাল তোলেন, ভাস্কোডিগামা নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করেন, তেনজিং মরণকে পণ করিয়া অভ্রভেদী হিমালয়শৃঙ্গের দিকে অগ্রসর হন। তেনজিং-এর এ অভিযান শুধু এভারেস্টের উপরে প্রথম পদচিহ্ন আঁকিয়া দিবার গৌরবই আনিয়া দেয় নাই, এ অভিযান তাঁহার জীবনে আনিয়া দিয়াছে অনেক অভিজ্ঞতা, অনেক শিক্ষা। এই অভিজ্ঞতা, এই শিক্ষা লাভের জন্যই আজ তিনি পর্বতারোহণের বিদ্যায়তনের শিক্ষাগুরু।

আজকাল দেশে শিক্ষামূলক ভ্রমণের ব্যবস্থা আরম্ভ হইয়াছে। অনেক বিদ্যালয় হইতেই ছাত্রছাত্রীদের বিদেশ ভ্রমণের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু সেই ভ্রমণে তাহারা শিক্ষালাভ কতটুকু করে তাহা ভাবিয়া দেখা দরকার। তবে ব্যবস্থা যখন একবার আরম্ভ হইয়াছে তখন সুব্যবস্থারও আশা করা অন্যায় হইবে না। মনে রাখিতে হইবে যে, অকারণ দেশভ্রমণে অবকাশের দিনগুলি যেন আমাদের ব্যর্থ না হয়। সচেতন চোখ, সজাগ কান আর সদাজিজ্ঞাসু মনকে লইয়াই আমাদের ভ্রমণ করিতে হইবে—তাহা হইলেই আর রিক্ত হস্তে আমাদের ঘরে ফিরিতে হইবে না।

সহশিক্ষার উপযোগিতা

॥ মূল সমস্যা ॥ বিদেশের সহিত তুলনা ॥ বিরুদ্ধ সমালোচনা ॥ ॥ চিন্তাশীলদের সমর্থন ॥ সহশিক্ষার অসুবিধা ॥ নারীশিক্ষার বিশিষ্টতা ॥ সহশিক্ষার সুফল কুফল ॥

সহশিক্ষা লইয়া আমাদের দেশে কিছুদিন হইতেই বিতর্ক চলিতেছে। এখনও এবিষয়ে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসিয়া আমরা পৌঁছাইতে পারি নাই। কিন্তু এই

সহশিক্ষা আমাদের দেশে নূতন কিছু নয়। প্রাচীন ভারতে যে সহশিক্ষার প্রচলন ছিল বেদে উপনিষদে তাহার প্রমাণের অভাব হইবে না। তারপর দেশে যখন পর্দাপ্রথার প্রচলন হইল, সহশিক্ষাও ধীরে ধীরে তখন বিদায় নিল। শিক্ষায়তনের সংখ্যালঘুত্বের জন্যই হউক, কিংবা অর্থনৈতিক পরিস্থিতির জন্যই হউক সেই সহশিক্ষা আমাদের দেশে পুনঃপ্রচলিত হইয়াছে।

এই সহশিক্ষার প্রচলনের উপরে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব যে নাই একথাও আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। পাশ্চাত্য দেশে কিন্তু সহশিক্ষা কোন সমস্যার সৃষ্টি করে নাই। সভ্যতার প্রথম হইতেই সে দেশে নরনারীর, যুবক-যুবতীর মিলনে সমাজের কঠিন বিধিনিষেধ কিছু ছিল না। সুতরাং শিক্ষায়তনেও সহশিক্ষার কোন প্রশ্ন জাগে নাই সেখানে। সমাজে স্বচ্ছন্দে চলাফেরার মতো শিক্ষাক্ষেত্রেও তাহাদের একত্রে শিক্ষাগ্রহণ ছিল অত্যন্ত সহজ ও সাবলীল। কিন্তু অন্তঃপুর হইতে পর্দা তুলিয়া যেদিন আমরা বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম এবং ক্রমশ নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হইয়া যখন শিক্ষাক্ষেত্রে পুরুষের পাশে দাঁড়াইয়া শিক্ষা গ্রহণ করিতে মনস্থ করিলাম, সমাজে আমাদের তখনই সৃষ্টি হইল আলোড়ন ও বিক্ষোভ এবং তাহাকে আশ্রয় করিয়াই বিতর্কের ঝড় বহিল।

সহশিক্ষার বিপক্ষবাদী যাঁহারা, সহশিক্ষার প্রচলনে তাঁহারা শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। নারীর স্থান অন্তঃপুরে—নারীর জীবনের পরম সার্থকতা তাহার মাতৃত্বে। এই মাতৃত্বের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিবার যথাযোগ্য যোগ্যতা অর্জন করিবার স্থান গৃহ। বাহিরে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্ষেত্রে পুরুষের পাশে দাঁড়াইয়া সে শিক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব নয়। পুরুষের শিক্ষা ভিন্ন প্রকৃতির। বিশ্বের দিকে দিকে তার অভিযান। ভবিষ্যতের এই উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই তাহার শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হয়। সুতরাং পুরুষ ও নারীর শিক্ষা একই বিদ্যায়তনে হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

সহশিক্ষার বিরুদ্ধে বিপক্ষবাদীদের আরও যুক্তি রহিয়াছে। তাঁহাদের মতে বিদ্যালয়ে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায়তনে যুবক যুবতীর অবাধ মিলনে তাহাদের পদস্খলন ও নৈতিক অবনতি হইবার আশঙ্কা যথেষ্ট পরিমাণে রহিয়াছে। সুতরাং এই সহশিক্ষার ব্যবস্থায় ছেলে মেয়েরা প্রকৃত শিক্ষা ত লাভ করিতেই পারে না, উপরন্তু জীবনে তাহাদের উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দেয়। পরিবার ও সমাজের আদর্শ-নষ্ট হয়, সমাজে ব্যভিচার প্রবেশ করে। ফলে এই আদর্শভ্রষ্ট সামাজিক জীবনে এক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়।

বিরুদ্ধবাদীরা আরও বলেন যে, সহশিক্ষার প্রবর্তনে নারীর মনে সমানাধিকারের প্রশ্ন জাগিবে। সহশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কর্মক্ষেত্রেও সমানাধিকারের প্রশ্ন আসিলে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতা দেখা দিবে তাহাতে কর্মক্ষেত্রে যেমন সমস্যার সৃষ্টি হইবে তেমনি ধর্মজীবন ও সমাজ-জীবনেও অনর্থ ও বিপর্যয় আসিবে। সহশিক্ষার ফলে নারীর কল্যাণ হস্ত হইতে হয়ত আর আমাদের ঘরে ঘরে সেবা ও শান্তির অমৃতবারি সিঞ্চিত হইবে না।

সমাজের সকলেই কিন্তু সহশিক্ষার বিরুদ্ধে দাঁড়ান নাই। সমাজের বহু নেতারাই ইহার সমর্থনে সহশিক্ষার সুফলের গুণকীর্তনও করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, মাতৃত্ব যে নারীজীবনের চরম সার্থকতা, একথা কোন দেশে কোন কালে কেহই অস্বীকার করিবে না। পুরুষের মতো নারীও জ্ঞান অর্জন করিবে—এ ঋষিদের মুখের বাণী। কিন্তু এই জ্ঞান, এই শিক্ষা বহির্বিশ্বের শিক্ষা। মাতৃত্বের শিক্ষা, গৃহিণীদের দীক্ষা, নারী জীবনের কর্তব্য—বিদ্যালয় কিংবা কলেজের ক্লাশে শিক্ষক অধ্যাপকের বক্তৃতা শুনিয়া অথবা পাঠ্যপুস্তক মুখস্থ করিয়া শিক্ষা লাভ করা যায় না। এই জ্ঞান লাভ করিতে হয় আদর্শ মাতার চরিত্র হইতে, পরিবারের পরিবেশ ও গুরুজনের শিক্ষা হইতে। স্ত্রীবিদ্যালয় হইতে শিক্ষিত হইলেই যে সকলে সুগৃহিণী ও সুমাতা হইবে এমন কথা কি আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি? যখন আমাদের দেশে সহশিক্ষার প্রচলন ছিল না, তখন কি আমাদের স্ত্রীবিদ্যালয়গুলি সব নারীকেই আদর্শ মাতা ও আদর্শ গৃহিণীরূপে সৃষ্টি করিয়াছে? অনেকের মতে মেয়েদের পাঠ্যতালিকায় রন্ধন-প্রণালীর ব্যবস্থা থাকা উচিত। নতুবা মেয়েদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইবে না। সপ্তাহের মধ্যে একদিন বিদ্যালয়ে দশ মিনিট রান্না করিয়া কেহ কি কখনও রান্না শিখিতে পারে? নিজেদের ঘরে আমরা গৃহস্থালীর কোন কাজে হাত দিব না, অথচ বিদ্যালয়ে রান্না শিখিব, এই অদ্ভুত মত পোষণ না করাই ভাল। গৃহস্থালীর শিক্ষা গৃহে মায়ের আদর ও অনুশাসন হইতে, মায়ের পরিচালনা ও গৃহের পরিবেশ হইতে—শিক্ষায়তন ও শিক্ষকের কাছ হইতে নয়, এই কথাটিই আমাদের মনে রাখিতে হইবে।

সহশিক্ষার ক্ষেত্রে যুবকযুবতীর অবাধ মেলামেশাতে তাহাদের পদস্খলন ও নৈতিক অবনতি হইবার যে আশঙ্কা নাই, এমন কথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সমাজে দুর্নীতির প্রচলন কি এই সহশিক্ষার সঙ্গেই আরম্ভ হইয়াছে? যেখানে সহশিক্ষা দূরের কথা, শিক্ষারই প্রচলন নাই, সেই তথাকথিত অশিক্ষিতা অন্তঃপুরচারিণীদের কি কখনও কোন দুর্নীতির পাপ স্পর্শ করে নাই? সমাজের কোন যুগে কি ব্যভিচার ছিল না? এই দুর্নীতিকে উপলক্ষ্য করিয়া সহশিক্ষার

অপপ্রচার করিলে চলিবে কেন? দুর্নীতির বীজ থাকে মানুষের মনে। নীতি-পরায়ণ ব্যক্তি শিক্ষা, সংযম ও শাসনের দ্বারা আপন মনের আকাঙ্ক্ষাকে সুপরিচালিত করেন। বিশেষ কোন অবস্থা বা ক্ষেত্র তাহার সংযমের বাঁধ ভাঙিতে পারে না। সুতরাং সহশিক্ষাই যে এজন্য সম্পূর্ণ দায়ী এমন কথা বলিতে পারা যায় না।

নারী আজ পুরুষের সহিত সমানাধিকার দাবি করিতেছে। কিন্তু ইহা কি সহশিক্ষা প্রবর্তনের ফল? নারীর প্রগতি যেদিন হইতে আরম্ভ হইয়াছে, যেদিন অন্তঃপুরের আঙিনা পার হইয়া গৃহলক্ষ্মী বৃহৎ কর্মক্ষেত্রে পুরুষের পাশে দাঁড়াইয়াছে, সেইদিন হইতেই সে পুরুষের পদক্ষেপের তালে তালে আপনার পা ফেলিতে শিখিয়াছে। স্ত্রী-শিক্ষায়তনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা লাভ করিয়া যাহারা বাহির হইয়াছে, তাহারা কি পুরুষের সহিত সর্বক্ষেত্রে আজ সমান অধিকারের দাবি করিতেছে না? রাজনীতিক্ষেত্রে যে প্রগতিশীলা নারীগণ আজ রাজদণ্ড হাতে লইয়া দেশের শাসনবিধি পরিচালনা করিতেছেন, তাঁহারা কি সকলেই সহশিক্ষা পাইয়াছেন? পুরুষের সহিত সমান অধিকারের দাবি ভাল কি মন্দ সে বিচার এখানে হইতেছে না। মানুষের দাবি তার অন্তরের, তার শিক্ষা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ফল। পুরুষের সহিত এক বিদ্যালয়ে শিক্ষা করিলেই যে পুরুষের সহিত সমানাধিকার নারী চাহিয়া বসিবে—এ মত অগ্রাহ্য।

নারী ও পুরুষ, পুরুষ ও প্রকৃতি একে অন্যের পরিপূরক। ইহাদের মিলনেই সমাজ পূর্ণাঙ্গ, সুন্দর ও আনন্দময়। রবীন্দ্রনাথ বোম্বাই শহরের বর্ণনা দিতে গিয়া বলিয়াছেন—"নারীবর্জিত কলিকাতার দৈন্যটা যে কতখানি তাহা এখানে আসিলেই দেখা যায়। কলিকাতায় আমরা মানুষকে আধখানা করিয়া দেখি, এই জন্য তাহার আনন্দরূপ দেখি না।" অবশ্য একথা যখন লিখিয়াছিলেন তখন বাঙলার রাজধানী কলিকাতায় বাঙালী মেয়েরা অবাধে চলাফেরা করিত না। যাই হোক, কবির বক্তব্য এই যে, সহশিক্ষা না থাকিলে শিক্ষাক্ষেত্রেও এমনি আমাদের আধখানা মানুষকে দেখিতে হইবে। ভবিষ্যৎ জীবনে নরনারীকে মিলিত হইয়া যখন ঘর বাঁধিতেই হইবে, তখন প্রথম জীবনে তাহাদের মাঝখানে এই ব্যবধানের প্রাচীর গাঁথিয়া না তুলিলে কি চলে না? সংসারে প্রবেশ করিয়া যাহারা পরস্পরের হাত ধরিয়া চলিবে, শিক্ষাক্ষেত্রে পাশাপাশি থাকিয়া তাহারা যদি জ্ঞান লাভ করে, তাহাতে সমাজ-ধর্ম ক্ষুণ্ণ হইতে পারে না। তবে অনেকের মনে আবার এ প্রশ্ন জাগে যে, এই সহশিক্ষা কি বাল্যকাল হইতেই প্রচলিত হইবে, না স্নাতকোত্তর বিভাগ হইতে আরম্ভ হইবে। অনেকে মনে করেন—বিদ্যালয়ে

কিংবা কলেজে পাঠ্যাবস্থায় ছেলেমেয়েদের বয়স থাকে কম, সুতরাং বুদ্ধির এই অপরিণত অবস্থায় সহশিক্ষা কুফলই প্রদান করে। সেজন্য স্নাতকোত্তর বিভাগ হইতেই সহশিক্ষার প্রচলন যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু আবার এ যুক্তিও অগ্রাহ্য করা যায় না যে, বাল্যকাল হইতেই যদি ছেলেমেয়েরা এক সঙ্গে শিক্ষা লাভ করে তবে অকস্মাৎ তাহাদের যৌনচেতনার সম্মুখীন হইতে হয় না। এই উভয় মতের মধ্যেই যুক্তি কিছু আছে বটে, কিন্তু তাহা অকাট্য নয়। বাল্যকালে সহশিক্ষা লাভ করিলেও যৌনচেতনা অকস্মাৎ জাগ্রত হইতে পারে, আবার স্নাতকোত্তর বিভাগে সহশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রথমে আসিলেও যৌনচেতনা বিভ্রান্তি ঘটাইতে নাও পারে। ইহা অনেকাংশেই মানুষের পরিমার্জিত রুচি, সুশিক্ষা, মহৎ আদর্শ এবং সুপরিকল্পিত বুদ্ধির উপর নির্ভর করে। সুতরাং সহশিক্ষাকে শিক্ষার কোন বিশেষ ক্ষেত্রে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার প্রয়োজন আছে—এমন কথাও সঠিক বলা চলে না।

স্ত্রীশিক্ষা

॥ অতীত কথা ॥ ইংরেজ আমলে নূতন রূপ ॥ নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ॥ পাঠ্যতালিকার বিশিষ্টতা ॥ ভবিষ্যৎ ॥

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নত—মহানির্বাণতন্ত্রের বাণী।

প্রাচীন ভারতে এই বাণী অনুসৃত হইয়াছে। ঋষি বালকেরা যেমন গুরুর আশ্রমে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়াছে, ঋষি বালিকারাও তেমনি একই পদ্ধতিতে একই ব্রহ্মবিদ্যা গুরুর কাছ হইতে লাভ করিয়াছে। এই উদার শিক্ষার ফলেই আমরা পাইলাম গার্গী আর মৈত্রেয়ীকে, পাইলাম খনা আর লীলাবতীর মতো উজ্জ্বল রত্নকে। ভারতের প্রাচীনযুগে, বৈদিক যুগে স্ত্রীশিক্ষার অপ্রতুলতা ছিল না। সুভদ্রার সুদক্ষ হস্তে রথ পরিচালনাও সেই সময়ের স্ত্রীশিক্ষারই সাক্ষ্য বহন করে।

কিন্তু এই স্ত্রীশিক্ষা অবিচ্ছিন্নভাবে চলিয়া আসিতে পারে নাই। ভারত ক্রমে বিদেশী পাঠান আর মোগলের করতলগত হইল। চেঙ্গিশ খাঁ আর তৈমুরলঙের অত্যাচারে দেশে হাহাকার উঠিল। পুরুষেরা প্রাণ দিল, মন্দিরে মন্দিরে বিগ্রহ বিচূর্ণ হইল, আর উন্মুক্ত আকাশতলের পবিত্র আশ্রম হইতে শঙ্কিত নারীরা আপনাপন গৃহের ভিতরে আসিয়া আশ্রয় নিল।

ইহার পর কিছুদিন পর্যন্ত স্ত্রীশিক্ষা-প্রবাহে ছেদ পড়িয়াছে। শুধু স্ত্রীশিক্ষা নয়, বাঙলা দেশে কয়েক শতাব্দী পুরুষের শিক্ষারও তেমন কোন ব্যবস্থা ছিল না।

তারপর নবাবের আমল গেল; পশ্চিমের শিক্ষা ও সংস্কৃতির বাহন ইংরেজ আসিয়া এদেশে ইংরেজ রাজত্বের ভিত্তি স্থাপন করিলেন। বাঙলা দেশের শাসন ও শিক্ষার ভার পড়িল তাহাদের হাতে। ইংরেজী সভ্যতার আওতায় আসিয়া বাঙলার শিক্ষা এক নূতন রূপ ধারণ করিল। ইংরেজরা যে শুধু পুরুষের জন্যই নূতন শিক্ষা পদ্ধতির প্রচলন করিলেন তাহা নহে, আপনাদের দেশের প্রথানুযায়ী স্ত্রীশিক্ষারও প্রবর্তন করিলেন। শিক্ষার এই নূতন রূপ নারীর চোখে এক মোহের অঞ্জন পরাইয়া দিল। তৎকালীন সমাজের কঠিন বিধি নিষেধকে অমান্য করিয়া কেহ বা পর্দার অন্তরালে থাকিয়া আবার কেহ বা পর্দার অবগুণ্ঠনকে অমান্য করিয়া বাহিরে আসিয়া শিক্ষা গ্রহণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই নারীগণের সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য। তবে নগণ্য হইলেও নারীশিক্ষার প্রবর্তন যে বস্তুত-পক্ষে সেই সময়েই প্রথম আরম্ভ হইল একথা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই। তাহার পর ঈশ্বরচন্দ্র, বেথুন সাহেবের যুগে তাঁহাদেরই অক্লান্ত চেষ্টায় স্ত্রীশিক্ষার বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠিত হইল।

পুরুষের মতো নারীরও শিক্ষার প্রয়োজন। নারী শুধু আপন সন্তানের জননী নয়, সে সমাজের ধাত্রী, পালয়িত্রী। সন্তানের শিক্ষা মায়ের কাছেই আরম্ভ হয়। শুধু তাহাই নয়। বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সময়েও সন্তান আপনাপন গৃহে মায়ের কাছেই শিক্ষা পাইয়া থাকে। শিক্ষিত মায়ের সুশিক্ষিত সন্তানই সমাজের সম্পদ। নারীর দায়িত্ব তাই শুধু গৃহস্থালীর রন্ধনশালায় নয়, তাহার দায়িত্ব সমাজের প্রত্যেক স্তরে। নারী অশিক্ষিত থাকিলে সমাজের, দেশের কল্যাণ আমরা আশা করিতে পারি না। নারীর হাতেই প্রকৃতপক্ষে দেশের শাসন ভার। 'The hand that rocks the cradle, rules the nation.' মা যখন দোলা দিতে দিতে ঘুম পাড়ানি গান গাহিয়া তাঁহার শিশুকে লালন করেন, তখন ঐ গান—ঐ দোলার ভিতর দিয়াই তিনি ভবিষ্যৎ নাগরিককে সৃষ্টি করিতে থাকেন। সুতরাং নারীরও যে শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন, একথা এখন আর আমাদের সমাজনেতাদের অস্বীকার করিলে চলিবে না। শিক্ষার অধিকার সকলেরই আছে—যেমন পুরুষের তেমনি নারীর। কিন্তু অধিকারের প্রশ্ন ছাড়িয়া দিলেও সমাজের ও দেশের কল্যাণ ও উন্নতির জন্যই নারীকে পুরুষের মতই সর্ব-প্রযত্নে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে।

নারীশিক্ষা প্রবর্তনের প্রথম অবস্থা হইতে এখন পর্যন্ত বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ে পুরুষ ও নারীর পাঠ্যতালিকার ধারা একই রকম ভাবে চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু নারী-প্রগতির বর্তমান স্বরূপকে লক্ষ্য করিয়া এবং দেশের অবস্থার কথা

বিবেচনা করিয়া নারী-শিক্ষার প্রকৃতি সম্বন্ধে শিক্ষাব্রতীদের মনে এখন নানা সমস্যার প্রশ্ন জাগিয়াছে।

সংসারের কর্মক্ষেত্রে পুরুষ আর নারীর আদর্শ এক নয়। বহির্জগৎ পুরুষের কর্মস্থল। রাজনীতি, সমাজনীতি, আপনার জীবিকার্জন—বহুক্ষেত্রে তাহার পদচারণা। কিন্তু নারীর রাজত্ব তাহার গৃহ। মাতৃত্বেই নারীত্বের পূর্ণ বিকাশ। রন্ধনে নিপুণতা, সেবায় ধৈর্য ও ত্যাগই নারীকে মণ্ডিত করে গৌরব ও মহিমায়। নারীর কল্যাণ-দৃষ্টিই গৃহে স্বর্গসুখ রচনা করে। পুরুষের জগৎ নারীর জগৎ এক নয়। সুতরাং শিক্ষাক্ষেত্রেও তাহাদের উভয়ের পাঠ্যতালিকা কিংবা শিক্ষাপদ্ধতি এক হইলে চলিবে না—ইহাই অনেক শিক্ষাব্রতীর অভিমত।

কিন্তু এই মতটিকে সম্পূর্ণভাবে মানিয়া লওয়া সম্ভব নয়। একই পাঠক্রম অনুসরণ করিয়া নারী বিদ্যা ও বুদ্ধির প্রতিযোগিতায় পুরুষকে পরাজিত করিতেছে এই দৃষ্টান্ত আজকাল আর বিরল নয়। এবং এই প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করিয়াও প্রত্যেক শিক্ষিতা নারীই কর্মবিমুখ ও শ্রমকাতর এবং গৃহিণীপদের অনুপযুক্তা—এই মতও স্বীকার্য নয়। সুতরাং পুরুষের জন্য নির্দিষ্ট পাঠ্যতালিকা পড়িলে মেয়েরা সংসারের পক্ষে অনুপযুক্ত হইবে—এই অভিমত যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। এবং তাহার চাইতেও বড় কথা—সংসারের গৃহস্থালীর উপযুক্ত পাঠক্রম কি হইবে? সূচীশিল্প? রন্ধনশিল্প? সঙ্গীত? সঙ্গীতের উপযুক্ত কণ্ঠস্বর সব ছেলেমেয়ের থাকে না। বিশেষ করিয়া অল্প একটু সময়ের জন্য সমবেত কণ্ঠে সঙ্গীতসাধনায় সঙ্গীত শিক্ষা করা চলে না। এবং এই সঙ্গীত না শিখিলেও মনে হয় সংসারের শান্তি নষ্ট হইবার কোন আশঙ্কা থাকিবে না। অনেক বিদ্যালয়েই রন্ধন শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু সংসারের প্রবেশ করিবার পর রন্ধনের সে বিদ্যা কতটুকু আমাদের সাহায্য করে, তাহা ভাবিয়া দেখিবার কথা। তবে সূচীশিল্প, উলশিল্প হয়ত কিছুটা কাজে লাগে। কিন্তু সেই শিক্ষারও সার্থকতা পাত্রীবিশেষে। সুতরাং গৃহস্থালীর উপযুক্ত পাঠক্রম তৈয়ার করিয়া মেয়েদের শিক্ষা দিলেই যে তাহারা সম্যকরূপে এবং সর্বতোভাবে সংসার করিবার উপযুক্ত হইয়া উঠিবে এমন কথা বলা যাইতে পারে না।

স্কুল ও কলেজের শিক্ষা শুধু সাধারণ জ্ঞান অর্জনের কয়েকটি ধাপ মাত্র। ইহা চিত্তবৃত্তির বিকাশের সহায়ক। স্কুল ও কলেজের ইতিহাস ভূগোলের পাঠ পুরুষের পরবর্তী জীবনে যেমন বিশেষ প্রয়োজনে আসে না, মেয়েদের জীবনেও তাহা প্রয়োজনের বাহিরেই থাকিয়া যায়। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে রুচিজ্ঞান যাহার নাই, স্কুলের গৃহ-বিজ্ঞান কি স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের পাঠ তাহাদের জীবনের

কোনই উপকারে আসে না। সংসারের জন্য উপযুক্ত হইতে পাঠ নিতে হয় সংসারেই এবং মায়ের কাছে—বিদ্যালয়ে শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীর কাছে নয়। মাতা-পিতার আদর্শ চরিত্র, পরিবারের পবিত্র পরিবেশ, মায়ের শাসন ও সৎশিক্ষাই মেয়েকে সুগৃহিণীর উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিতে থাকে। বিদ্যালয়ের প্রভাব যে আমাদের উপরে পড়ে না, তাহা নয়, কিন্তু আপনাপন সংসারের প্রভাব ও মাতা-পিতার শিক্ষার প্রভাবের কাছে তাহার স্থান অনেক নিম্নে। রন্ধনশালায় আমরা প্রবেশ করিব না, সংসারের কোন কাজে হাত দিব না, শুধু বিদ্যালয়ের বিদ্যার উপরে নির্ভর করিয়া গৃহিণীর পদে সুপ্রতিষ্ঠিত হইব, এমন আশা না করাই ভাল।

স্ত্রীশিক্ষার আলোচনাক্ষেত্রে সহশিক্ষার কথাও আসিয়া পড়ে। সহশিক্ষাকে অনেকেই অকল্যাণকর বলিয়া মনে করেন। তাহাদের মতে সহশিক্ষা নারী-চরিত্রের মাধুর্য ক্ষুণ্ণ করে, পুরুষের পাশে দাঁড়াইয়া একই পদ্ধতিতে একই শিক্ষা গ্রহণ করিতে করিতে সংসার করিবার পক্ষে তাহারা অনুপযুক্ত হইয়া উঠে। ফলে আমাদের ঘরের আরাম ও শান্তি বিনষ্ট হয়। সর্বোপরি নারী ও পুরুষের এই অবাধ মেলামেশাতে তাহাদের চরিত্রে নৈতিক অবনতি আসে এবং ক্রমে সেই অবনতি সমাজকেও আক্রান্ত করিয়া বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে। কিন্তু শিক্ষার যদি প্রকৃত গুণ থাকে এবং শিক্ষার্থীদের মনোবল যদি পবিত্র, রুচিসম্পন্ন ও দৃঢ় হয় তবে এই সহশিক্ষা কোন ক্ষতি না করিয়া উপকারই করিয়া থাকে। সহশিক্ষা মাধুর্যকে ক্ষুণ্ণ করে না, মাতৃত্বের বিকাশের ব্যাঘাত করে না—সংসারের গৃহিণীপদে নারীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সহশিক্ষা সহযোগিতই করিতে পারে, তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের গৌরবের পথে বাধার সৃষ্টি করে না।

স্বাধীন ভারতে ছাত্রদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

।। অতীত আদর্শ।। বর্তমান শিক্ষা।। রাজনীতির সম্পর্ক রাখা উচিত কি-না।। স্বাধীনতা আন্দোলনে ছাত্রসমাজের অবদান।। রাজনীতির বিপদ।। বিদেশের সহিত তুলনামূলক আলোচনা।। বর্তমান কর্তব্য।।

ছাত্রাণাম্ অধ্যয়নং তপঃ। ছাত্রজীবনের দায়িত্ব—পড়াশুনা। কর্তব্য—লাভ করা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি। এই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া যখন আমরা ছাত্রজীবনের দিকে তাকাই, তখন তাহাকে শুধু ছাত্র হিসাবেই দেখি; পরিবারের, সমাজের বা দেশের সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ আমরা রাখি না। প্রাচীন ভারতের ছাত্র

জীবনের রূপ এইটাই ছিল। পিতামাতার নিকট হইতে সে চলিয়া যাইত গুরুগৃহে —ব্রহ্মচর্য আর অধ্যয়নের তপস্যা চলিত সেখানে। শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া গার্হস্থ্য আশ্রমে যখন ফিরিয়া আসিত, তখনই সে পরিবারের একজন হইত, সম্বন্ধ স্থাপন হইত তাহার সমাজ আর দেশের সঙ্গে। এখন আর সেই গুরুগৃহ নাই। আপনাপন ঘর হইতেই আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করিতে হয়—ছাত্রাবস্থায়ই তাই আমরা সমাজের একজন, রাষ্ট্রের আমরা নাগরিক।

ভারতের অতীত আদর্শকে বর্তমানের ভারত ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। যুগে যুগে ধর্মের পরিবর্তন অনিবার্য আর সেই যুগধর্মের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই আমাদের ছাত্রদের দায়িত্ব আর কর্তব্য স্থির করিতে হইবে। আধুনিক যুগ রাজনীতির যুগ। সুতরাং ছাত্রদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিলে প্রথমেই এই জিজ্ঞাসা জাগে যে, রাজনীতিতে তাহাদের যোগ দেওয়া কর্তব্য কি না। বিভিন্ন রাষ্ট্রবিদ্‌দের এ বিষয়ে মত বিভিন্ন। সুরেন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধীর মত রাজনীতিতে যোগ দিবার সপক্ষে। সুরেন্দ্রনাথ বলেন—ছাত্ররা অবশ্যই রাজনীতিতে যোগ দিবে—তবে তাহাদের সামনে যেন অভিজ্ঞ পথপ্রদর্শক থাকে। স্বদেশী আন্দোলনে মহাত্মার আহ্বানে বার বার শিক্ষার্থীরা বিদ্যায়তন হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে। আর ভারতের এই স্বাধীনতালাভের মধ্যে ছাত্রদের অবদান যে অনেকখানি তাহা বর্তমান ভারতবাসীর অবিদিত নাই। ঘর ছাড়িয়া বিদ্যায়তন ছাড়িয়া দলে দলে ছাত্রছাত্রীরা পথে বাহির হইয়াছে, স্বাধীনতা আন্দোলনের যজ্ঞে আহুতি দিয়াছে তাহাদের প্রাণ। আর যাহারাও বাঁচিয়া আছে, তাহারা বাঁচিয়া আছে হৃতসর্বস্ব হইয়া, শিক্ষাহীন অবস্থায় পঙ্গু হইয়া। আজ তাহাদের অনেকেরই কোন খবর দেশ রাখে না।

স্বাধীনতা আন্দোলনের সেই বিরাট প্লাবনের যুগ অতীত হইয়া গিয়াছে। ভারত পরাধীনতার পাশ হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। স্বাধীন ভারতে শিক্ষার্থীদের কি কর্তব্য, রাজনীতিক্ষেত্রে তাহাদের দায়িত্ব কিছু আছে কিনা এ বিষয়ে সমস্যা এখনও আবার দেখা দিতে পারে। স্বাধীনতার এই শৈশবে ভারতের সমস্যার অন্ত নাই। বেকার সমস্যা, বস্ত্রসমস্যা, উদ্বাস্তু সমস্যা, খাদ্যসঙ্কট, শিক্ষাক্ষেত্রের বহু দুর্নীতি ভারতের চারদিকে প্রতিনিয়তই বিক্ষোভের আলোড়ন তুলিতেছে। দেশের জনগণের মধ্যে ছাত্রসংখ্যা একটি বিশেষ অংশ। সুতরাং দেশের মধ্যে যখনই এই জাতীয় কোন সমস্যা বড় হইয়া দেখা দেয়, জনগণের মধ্যে বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ জাগে, তখন ছাত্রসমাজ প্রত্যক্ষভাবেই হউক আর পরোক্ষভাবেই হউক, তাহার সঙ্গে জড়িত না হইয়া পারে না। অর্ধশত

বৎসরের স্বদেশী আন্দোলনের প্রচণ্ড আঘাতে আমাদের মনের মধ্যে রাজনীতিবোধের যে চেতনা জাগিয়াছে, স্বাধীনতালাভের সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দেওয়া সম্ভব নয়। এই চেতনা দায়িত্ববোধের, এই চেতনা কর্তব্যবুদ্ধিপ্রসূত। সুতরাং দেশে যখনই কোন অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়, প্রবল যখন দুর্বলকে শোষণ করিয়া গ্রাস করিতে থাকে, তখন দেশের এই যুবশক্তিই দুর্বলের, উৎপীড়িতের পাশে আসিয়া দাঁড়ায়—ভুলিয়া যায় তাহার ভবিষ্যতের কথা। ভুলিয়া যায় তাহার তপস্যার—তাহার সাধনার কথা। বিপদ দেখা দেয় সেইখানেই। শক্তির অপচয় যাহাতে না হয় সেই দিকেই আমাদের দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বৃক্ষ নিজের মধ্যে ধীরে ধীরে সমস্ত সঞ্জীবনী শক্তিকে সঞ্চয় করিয়া নিয়াই তবে ফল দান করে। ছাত্রজীবন এই শক্তি সঞ্চয়নের যুগ। ধর্মনীতি, রাজনীতি সমাজনীতির জ্ঞান সে পরিপূর্ণভাবে অর্জন করিবে—চিন্তাশক্তিকে যথাসম্ভব ক্ষুরধার করিয়া আপনার বিশ্লেষণী বুদ্ধি দিয়া প্রত্যেকটি চিন্তনীয় বিষয়ের গভীরতার মধ্যে প্রবেশ করিবার শক্তি সঞ্চয় এই পাঠ্যাবস্থাতেই তাহাকে করিতে হইবে। শিক্ষার্থীকে মনে রাখিতে হইবে, সে নাগরিক হইলেও সে ছাত্র—আর ছাত্রের প্রথম ও প্রধান কর্তব্যই তাহার জ্ঞানার্জনের একনিষ্ঠ তপস্যা।

কিন্তু পাঠ্যপুস্তকের মধ্যেই শুধু এই সাধনাকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিলে চলিবে না—কিংবা কেবলমাত্র গ্রন্থকীট হইয়া থাকিলেও এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা সম্ভব হইবে না। শুধু পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে যদি আমরা আমাদের জ্ঞানকে সীমাবদ্ধ রাখি, তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি হয়ত গৌরবের সঙ্গেই অর্জন করিব—কিন্তু শিক্ষা আমাদের সম্পূর্ণ হইবে না। বিদ্যায়তনের বাহিরে যে একটি দেশ আছে, আমাদের চারিদিকেও যে আমাদের জগৎ আছে—আমরা সে কথাটা একেবারেই ভুলিয়া যাই। সমস্ত দেশের সঙ্গে জগতের সঙ্গে আমরা আমাদের শিক্ষার কোন সংযোগ স্থাপন করি না। রবীন্দ্রনাথ বলেন—আমাদের শিক্ষার গলদ ঐখানেই। বিদ্যায়তনের শিক্ষার পরিপূরক হিসাবেই—সমস্ত দেশের দিকে তাকাইয়া আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। বিশেষ করিয়া বর্তমানে কোন দেশ আর পৃথক হইয়া নাই। আন্তর্জাতিক আদান-প্রদানে এখন সমস্ত জগৎটা বড় কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে। দেশের সঙ্গে দেশান্তরের সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন। সুতরাং এই পরিস্থিতিতে শিক্ষাকে সম্পূর্ণাঙ্গ করিতে হইলে শুধু বিদ্যায়তনের শিক্ষা নয়—বাইরের জগতের দিকেও আমাদের জ্ঞানকে প্রসারিত করিয়া দিতে হইবে। রাজনীতিকেও বাদ দিলে চলিবে না।

তবে রাজনীতিতে বিপদ আছে অনেক—তাহা আগেই বলা হইয়াছে। সেজন্যই এই ক্ষেত্রে ছাত্রকুলকে পরিচালনা করার জন্য পরিণতবুদ্ধি অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদের প্রয়োজন। পশ্চিম মহাদেশে রাষ্ট্রবিদ্‌রা আপনাদের অভিজ্ঞতা-প্রসূত বক্তৃতা দিয়া ছাত্রদের মনে রাষ্ট্রচেতনাকে পরিস্ফুট করিয়া তোলেন। আলাপ আলোচনার ভিতর দিয়া তাহারা প্রত্যেকটি সমস্যার ভালমন্দ দেখিতে শিখে। কিন্তু আমাদের দেশে এই শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই নাই। ফলে ছাত্রছাত্রীরা বিপথে চালিত হয়। ভাবপ্রবণতায় অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করিবার শক্তি হারাইয়া ফেলে, ফলে কর্তব্যের নামে তাহারা অপকীর্তিই করে বেশী। যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার আগে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিতে হয়। ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রস্তুতির সময়ই এই ছাত্রজীবন। এই সময়ে যতদূর সম্ভব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ত গ্রহণ করিতেই হইবে। আর সেই সঙ্গে চারিত্রিক দৃঢ়তা, নিয়মানুবর্তিতা, আত্মপ্রত্যয়, সুদূরপ্রসারী চিন্তাশক্তিকে অর্জন করিতে হইবে। সমস্ত জীবন ভরই কাজ করা চলে—কিন্তু শিক্ষার সময় আমাদের জীবনে সীমাবদ্ধ। শিক্ষার এই সময়টাকে একবার অপচয় করিলে জীবনটাকেই সেখানে বলি দিতে হয়। শিক্ষার ব্যাঘাত করিয়া জীবনের মূল শক্তিতে সর্বনাশের আঘাত করিয়া সক্রিয়ভাবে তাই রাজনীতিতে যোগদান করার কোন সার্থকতা নাই। ভারত এখন স্বাধীন, গোলযোগ যা—তা আভ্যন্তরীণ। সমস্যা যা কিছু তা আমাদের নিজের। সমস্যা গুরুতর হইতে পারে—আর তার জন্য ছাত্রসম্প্রদায়ের সহানুভূতি অবশ্যই থাকিবে, কিন্তু তাদের সক্রিয় সহযোগিতা যুক্তিহীন। ছাত্রসম্প্রদায়ের তাই প্রধান কর্তব্য শিক্ষা গ্রহণ—আর যখন এই শিক্ষার ভিতর দিয়াই সে চরিত্র বলে বলীয়ান হইয়া উঠিবে, সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে বিচারবুদ্ধিকে বিকশিত করিবে, মৈত্রী আর করুণায় পরদেশকেও বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিবে তখনই জীবনের তার এই পরম লগ্নটি ভরিয়া উঠিবে সার্থকতায়। মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধন করাই ছাত্রসম্প্রদায়ের সর্বপ্রধান কর্তব্য—সেইখানেই জীবনের সার্থকতা।

কলেজ পত্রিকার সাহিত্যিক উদ্দেশ্য

॥ কলেজ পত্রিকা কী ॥ বাজারের পত্রিকার সহিত পার্থক্য ॥ কলেজ পত্রিকার পরিচালক কাহারা ॥ ইহার প্রয়োজন কী ॥ আদর্শ কি হইতে পারে ॥ উপসংহার ॥

বৈচিত্র্যের প্রয়াসী মানুষ। বৈচিত্র্য অভ্যস্ত কাজ, অভ্যস্ত জীবনের মাঝেও নূতন স্বাদের সন্ধান আনিয়া দেয়। একটানা কাজের মধ্যে নূতন রসের সঞ্চার করে। নিত্য নৈমিত্তিক পাঠ্য তালিকার পাঠ অনুসরণ করিতে করিতে শিক্ষার্থীদের মন যখন ক্লান্ত হইয়া পড়ে, ক্লান্তি আসে শরীরে, চিন্তাধারার গতি শ্লথ হইয়া আসে, তখনই তাহাদের মন বিশ্রাম খোঁজে অন্য কোন কাজে। তাই তাহাদের গঠন করিয়া লইতে হয় 'ইউনিয়ন', ব্যবস্থা করিতে হয় খেলাধূলা ও স্পোর্টসের, আর তখনই হয় কলেজ পত্রিকার উদ্বোধন।

সাময়িক পত্রিকার অভাব নাই আমাদের দেশে। ছোট, বড়, মাসিক, পাক্ষিক বহু পত্রিকা বিজ্ঞ সাহিত্যিকরা বিশেষ যোগ্যতার সঙ্গেই পরিচালনা করিতেছেন। শুধু বড়দের জন্যই নয়, রঙ-বেরঙের বহু 'রামধনু', গন্ধেভরা বহু 'সন্দেশ', হাসির উচ্ছলতায় ঢেউ খেলানো বহু 'ফোয়ারা' শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্য অনেক সাহিত্যিক পরিবেশন করিয়াছেন। কিন্তু এই সব পত্রিকারই রসদ যাঁহারা জোগান, তাঁহারা সকলেই লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক। বহু অর্থব্যয়েও পরিচালকমণ্ডলী তাঁহাদের রচনা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হন না। কিন্তু প্রতিষ্ঠা যাঁহারা লাভ করে নাই, অথচ ভিতরে আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে—তাহাদের ভাব, তাহাদের চিন্তাধারার বাহন হইবে কে? কোন্ খাতার পাতায় প্রথম হাতে-খড়ি হইবে এই শিশু সাহিত্যিকদের?

কলেজের ছেলেমেয়েরা জানে, বড়দের আসরে তাহাদের স্থান নাই। কলেজ পত্রিকার তাই আবির্ভাব। এই পত্রিকা শুধু অকাজের কাজ নয়, শুধু সময় কাটাইবার 'আলস্যের সঞ্চয়' নয়। নবীন সাহিত্যিকের ভাবের অভিব্যক্তির বাহনই এই পত্রিকা, এই পত্রিকার ভিতর দিয়াই ত তাহাদের চিন্তার প্রবাহ বহিয়া চলিবে। নূতন ভাবের মধ্যে দৈন্য থাকে অনেক, ভাষার মধ্যে থাকে শিথিলতা, কিন্তু সেজন্য সঙ্কোচ কি শঙ্কার কোন কারণ থাকে না। ইহা তাহাদের নিজেদেরই জিনিস। তাহার উপরে এই দোষ ক্রটি সংশোধনের জন্য শিক্ষক-মণ্ডলীই আছেন। আজ যাহার ভাব ভাষা খুঁজিয়া পায় না, যাহার লেখা আজ প্রত্যাখ্যাত হইল, হয়ত আগামী সংখ্যায় তাহারই রচনা প্রথম পৃষ্ঠায় মুদ্রিত

হইবে। অনভ্যাসে বিনা উদ্যমে চিন্তা সজীব হইতে পারে না। যাহার ভিতরে কিছুমাত্র সৃজনীশক্তি আছে, অক্লান্ত চেষ্টা, নিবিড় নিষ্ঠার পর তাহা নিশ্চয়ই বিকশিত হইয়া উঠিবে। যাহার কিছু দিবার আছে, আর যাহার দিবার মতো কিছু নাই, তাহাদের সকলকেই কলেজ পত্রিকা আহ্বান জানায়, তাহাদের লেখা শিক্ষকদের কাছে পায় পরিপূর্ণ সহানুভূতি ও পক্ষপাতহীন সমালোচনা। পরীক্ষার খাতায় যাহার লেখা সমাদর পায় না, পত্রিকার পাতায় একদিন হয়ত তাহারই লেখা সকলের প্রশংসা অর্জন করিয়া বসে। কাহার ভিতরে কোথায় কি গুণের অঙ্কুর লুকানো থাকে, মানুষ নিজেও তাহা বুঝিতে পারে না। উপযুক্ত আবহাওয়ায় হঠাৎ একদিন সে দেখা দেয়। কলেজ পত্রিকা আমাদের অচেতন নীরব কবি, নির্বাক সাহিত্যিকদের জন্য সেই আবহাওয়ারই সৃষ্টি করে।

কলেজ পত্রিকার তাই এই আপাততুচ্ছ লেখার ভিতর দিয়াই যে আবার একদিন কোন বঙ্কিম, মধুসূদন, শরৎ জন্ম লইবে না, এমন কথা কি আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি? আজ লব্ধপ্রতিষ্ঠ মাসিক পত্রিকায় যাহার লেখার স্থান হইল না, ভবিষ্যতে হয়ত সেই পত্রিকায় আরও দশজন লেখকের লেখার স্থান করিয়া দিবার ভার পড়িবে তাহারই উপরে। ভবিষ্যৎ সম্পাদক, কবি, ভাবী সাহিত্যিক ও প্রবন্ধকারের জন্মভূমি হইল এই কলেজ পত্রিকা—এই পত্রিকাই তাহাদের চিন্তাধারাকে লালন করে, ভাষার রীতিকে সাবলীল ও পুষ্ট করে আর সুন্দর শব্দ চয়নের শক্তিটুকুকে জাগ্রত করিয়া সাহিত্যিকদের জননী-স্নেহে পালন করে। এই পত্রিকা নবীন সাহিত্যিকদের তাই শুধু জন্মভূমি নয়—সে তাহাদের জননীও বটে।

কলেজ পত্রিকা তাই নিজে বড় না হইলেও তাহার উদ্দেশ্যটি কিন্তু ছোট নয়। সৃষ্টি করাই ইহার কাজ, ইহার উদ্দেশ্য। চিন্তাধারাকে সঞ্জীবিত করিয়া ভাষা ও রীতিকে সতেজ ও সাবলীল করিয়া নবীন সাহিত্যিকের প্রতিভা স্ফুরণ করাই কলেজ পত্রিকার কাজ এবং এই কাজ করিতে পারিলেই ইহার মহৎ উদ্দেশ্য হয় সার্থক।

কলেজ পত্রিকা তাই কলেজের শিক্ষার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। ইহাকে বাদ দিলে শিক্ষার একটি বৃহৎ অংশই একেবারে বাদ যায়। কিন্তু এই অতি প্রয়োজনীয় জিনিসটির প্রতিও ছাত্রছাত্রীর তেমন মনোযোগ দেখা যায় না। অনেক সময় ইহাকে চালাইবার জন্য সমস্ত দায়িত্ব যেন অধ্যাপকদের উপরেই আসিয়া পড়ে। তাহাতে পত্রিকার উদ্দেশ্য ও স্বার্থ, দুইই ব্যর্থ হয়। ছাত্রছাত্রীর রচনায় পুষ্ট হইয়া তাহাদের দ্বারা পরিচালিত হইলে তবেই কলেজ পত্রিকার সাহিত্যিক উদ্দেশ্য সার্থকতা লাভ করে।

গ্রন্থাগার

॥ গ্রন্থাগারের স্বরূপ ॥ জ্ঞানের মহামিলন ক্ষেত্র ॥ ইহার প্রয়োজনীয়তা ॥
॥ গ্রন্থাগার ও পাঠাগার ॥ গ্রন্থ নির্বাচনের দায়িত্ব ॥

যুগের পর যুগ কালের স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে। লোকজন, সাম্রাজ্য, রাজত্ব, ঐশ্বর্য, বৈভব, লোকের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না সবই কালের অনুসরণ করিয়া চলিতেছে। মানুষ ভাবে সবই বুঝি হারাইয়া গেল। মহাকবির উদাত্ত কণ্ঠের যে দৈববাণী একদিন ভারতের আকাশ-বাতাসকে মুখর করিয়া তুলিয়াছিল, মহাযোগী বুদ্ধের যে বাণী সমস্ত ভারতবাসীকে প্রশান্তিতে আশ্বস্ত করিয়াছিল, বুঝিবা সে বাণী আর কোনদিনও শোনা যাইবে না। কিন্তু তাহা হারায় না। অতীত তাহার সমস্ত সম্পদ লইয়া বাঁচিয়া থাকে, বাঁচিয়া থাকে আমাদের বর্তমানের মধ্যে। যুগ যুগান্তরকে, সমস্ত অতীতকে যে বাঁচাইয়া রাখে, সে জীয়ন কাঠি 'গ্রন্থ', সে সোনার কৌটা 'গ্রন্থাগার'। "বিদ্যুৎকে মানুষ লোহার তার দিয়া বাঁধিয়াছে, কিন্তু কে জানিত মানুষ শব্দকে নিঃশব্দের মধ্যে বাঁধিতে পারিবে! কে জানিত সঙ্গীতকে, হৃদয়ের আশাকে, জাগ্রত আত্মার আনন্দ-ধ্বনিকে, আকাশের দৈববাণীকে সে কাগজে মুড়িয়া রাখিবে! কে জানিত মানুষ অতীতকে বর্তমানে বন্ধ করিবে! অতলস্পর্শ কাল-সমুদ্রের উপর কেবল এক-একখানি বই দিয়া সাঁকো বাঁধিয়া দিবে!" কিন্তু গ্রন্থ সে অসাধ্য সাধন করিয়াছে।

এক অপরিসীম বিস্ময় এই গ্রন্থাগার। কত দেশ, কত বিভিন্ন রাজ্য, কত যুদ্ধ-বিগ্রহ, কত বিভিন্ন মত, বিভিন্ন নীতি মহা কোলাহলের মধ্যে নিস্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে। তপোবনচ্ছায়ার স্নিগ্ধ পবিত্র শান্তির কাছে রক্তাক্ত যুদ্ধভূমি, বুদ্ধ ও খ্রীষ্টের অহিংসার বাণী আর তৈমুর লঙ্, কালাপাহাড়ের কালজয়ী নিষ্ঠুরতা একই জায়গায় বাসা বাঁধিয়াছে। ফকির ও সম্রাটের, পণ্ডিত ও মূর্খের জন্য এখানে আলাদা পঙক্তি পাতা হয় নাই। সমস্ত জগতের সহস্র বাণী সহস্র বৎসরের শত শত কল্লোল অক্ষরের কারাগারে বন্দী হইয়া নিঃশব্দে গ্রন্থাগারে আশ্রয় লইয়াছে। "মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে, সে ঘুমাইয়া-পড়া শিশুটির মতো চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহাশব্দের সহিত এই লাইব্রেরীর তুলনা হইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে।···হিমালয়ের মাথার উপরে কঠিন বরফের মধ্যে যেমন কত বন্যা বাঁধা আছে, তেমনি এই লাইব্রেরীর মধ্যে

মানব-মনের বন্যা কে বাঁধিয়া রাখিয়াছে।” রবীন্দ্রনাথের এই বাণীও আজ অক্ষরের জালে ধরা পড়িয়া গ্রন্থাগারে বন্দী হইল। কাল ইহাকে আর হরণ করিতে পারিল না।

গ্রন্থাগারের মতো এমন নির্দোষ সুন্দর সহচর আর মানুষের নাই। পারস্পরিক সাহচর্য ও মিলনাকাঙ্ক্ষা মানুষের আদিমতম প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়াই মানুষ ঘর বাঁধিয়াছে—সংসারী হইয়াছে। আবার এই মানুষের কাছ হইতেই মানুষ আঘাত পায়, প্রতারিত হয়, বঞ্চিত হইয়া ক্লেশ ভোগ করে। বিশ্বব্যাপী প্রকৃতিও মানুষকে তার সঙ্গ দানের জন্য দাক্ষিণ্য প্রকাশ করে। তাহার ঐশ্বর্য, মাধুর্যের আকর্ষণ আমরা অনুভব করি। কিন্তু সে ত সহজলভ্য নয়। সেই ক্ষোভে রবীন্দ্রনাথ চিত্রময়ী বাণী কুড়াইয়া আনা ভিক্ষালব্ধ ধন দিয়াই আপন দৈন্যের ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে প্রয়াস পান। সহজসঙ্গ মানুষের এই গ্রন্থাগার। ইহা প্রবঞ্চনা মিথ্যাচার জানে না। আপনার যা আছে—ভালমন্দ, ছোট বড় সবই সে নিঃসঙ্কোচে দান করে। গ্রন্থাগারের মহামিলনক্ষেত্রে যখনই গিয়া মানুষ দাঁড়াইল, জগতের অনন্ত রহস্য শতদল তাহার একটি একটি করিয়া পাপড়ি মেলিয়া অতিথির অভ্যর্থনা রচনা করিল। সেখানে শেলীর স্কাইলার্কের সঙ্গে মন আমাদের আকাশে পাখা মেলে, ওয়ার্ডসওয়ার্থের ডেফোডিলের সঙ্গে হাওয়ায় দোল খায়; সেক্সপিয়ারের সঙ্গে সঙ্গে মিরাণ্ডা-ডেসডিমনা, শাইলক-ডানকানের আমরা অনুসন্ধানে ফিরি। জগদীশচন্দ্র, এডিসন, মাদাম কুরি আর মার্কনি বিজ্ঞান জগতের রহস্যের গভীরে আমাদের হাত ধরিয়া লইয়া যান। শঙ্কর আর এ্যারিস্টটলের কাছে যখন যাই, বেদ আর রবীন্দ্রনাথের পাদস্পর্শ যখন করি, তখন যেন জগৎ ও জীবনধারাকে চিনি চিনি বলিয়া মনে হয়। গ্রন্থাগারের গ্রন্থরাজি তাই মানুষের বড় আদরের সামগ্রী, অমূল্য সম্পদ। বাল্যের সে সহচর, যৌবনের পথপ্রদর্শক, বার্ধক্যের বারাণসী। ধর্ম জগতে, শিক্ষা জগতে সে আমাদের গুরু, আমাদের জ্ঞান, উপদেশ; আর কর্মজগতে সে-ই আমাদের উৎসাহ উদ্দীপনা।

বর্তমানে গ্রন্থাগারের মধ্যেই পাঠাগারেরও প্রতিষ্ঠা চলিতেছে। এই পাঠাগারের প্রয়োজন অল্প নয়। জিজ্ঞাসু পাঠকদের সম্মিলনে বহু সমস্যার সমাধান হয়, বহু মন জ্ঞানাকাঙ্ক্ষী হইয়া বিবেক ও সৎচিন্তার অনুগামী হয়। চলন্ত গ্রন্থাগারেরও ব্যবহার আজকাল দেখা যাইতেছে। চলন্ত গ্রন্থাগার নগরের উপান্তে, গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বহুলোকের জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তিসাধন করিতেছে। বরোদা রাজ্যে এই ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে।

কিন্তু গ্রন্থাগারের পরিচালক যিনি, তাঁহার দায়িত্ব সমধিক। গ্রন্থ চয়ন গ্রন্থাগারের সবচেয়ে কঠিন কাজ। সব গ্রন্থেই জ্ঞান ও শিক্ষা, রুচি ও রস সমান থাকে না। জনমনের কল্যাণের দিকে, সমাজ ও দেশের আদর্শের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পরিচালককে গ্রন্থ চয়ন করিতে হইবে। নতুবা গ্রন্থাগারের সমস্ত উদ্দেশ্য, সমস্ত আদর্শই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে।

কলেজ জীবনের আনন্দ

বাঙলা দেশের মেয়ে আমি—আর পাঁচজন মেয়ের মতই আমি স্বপ্ন দেখি কলেজের। আমারই মতো ইস্কুলে পড়তে পড়তে সব ছেলে-মেয়েরাই হয়ত কলেজের রঙিন জীবনের স্বপ্ন দেখে। কিন্তু সনাতন প্রথার পরিবেশে মানুষ আমি—কলেজে পড়ি, শুধু একখানি খাতা আর একটি কলম নিয়ে ক্লাশ করব, পড়া তৈরি করার তাড়া থাকবে না, কেহ পড়া ধরবে না, শাসন ও শাস্তির বিভীষিকা থাকবে না সেখানে—এমন স্বপ্ন দেখার মতো সাহস ছিল না আমার। মফঃস্বলের ছোট একটি শহর, তারই মাঝে আরও ছোট একটি ইস্কুলে পড়ি। ঘর আর ইস্কুল—এই আমার জগৎ—এরই মাঝে আমাদের গতিবিধি সীমাবদ্ধ। এর বাইরের জগৎ আমাদের কাছে নিষিদ্ধ—সুতরাং অজ্ঞাত। প্রগতির পদধ্বনি মাঝে মাঝে যে শুনতে না পাই তা নয়, কিন্তু সে তখনও সদর দরজা পার হয়ে আমাদের অন্দরমহলে প্রবেশ করে নি। এমনি এক আবহাওয়ার ভেতরে থেকে কিছুটা পড়ে এবং কিছুটা না পড়েই একদিন ম্যাট্রিক পাস করে গেলাম।

কিন্তু তারপর? শুনি, সমপাঠীদের অনেকেই কলেজে পড়বে, কেউ বা পড়বে দেশের কলেজে ছেলেদের সঙ্গে, কেউ বা আসবে কলকাতায়। বসে বসে নিজের কথা ভাবি; কিন্তু লাভ কি, কলেজে পড়ার পথ কোথায়? পরিবারের আভিজাত্যের মর্যাদা, তার উপরে অর্থের প্রশ্ন। দিনের পর দিন কেটে মাস চলে গেল। যে ক্ষীণ আশা মনের ভেতরে মাঝে মাঝে উঁকি মারত, শেষ অবধি তাকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে ঘরের কাজেই যখন মন দিলাম, এমন সময়ে মায়ের একান্ত চেষ্টায় ও উৎসাহে একটি বাক্সে কয়েকখানি কাপড়-জামা ও একটি ছোট বিছানা নিয়ে একদিন রেলগাড়ি চেপে বসলাম। সঙ্গে আমার আরও পড়ুয়ার দল—কেউ বা বি. এ. ক্লাশের ছাত্রী, কেউ বা পড়েন এম. এ.। তাঁদের অভিভাবকত্বে এবং পথে তাঁদের শত উপদেশে মানুষ হতে হতে পরদিন সন্ধ্যায় শেয়ালদা ইস্টিশনে পৌছলাম। গোধূলি লগ্নে

মহানগরীর সঙ্গে আমার দৃষ্টি বিনিময় হল। গলায় সাত লহরী আলোর মালা পরে কলকাতা সম্মুখে ঝলমল করছে। মিলনের উপযুক্ত সজ্জাই বটে; কত লোকজন কত বিচিত্র তাদের বেশভূষা। হাঁক ডাকের অন্ত নাই। এমনি সমারোহের মাঝে শঙ্কায় সঙ্কোচে গাড়ি থেকে নামলাম। এই সমারোহে মন কিন্তু ভুলল না। মনে পড়ল বহুদূরে ফেলে-আসা আমার ঘর, আমার মা। ভাবলাম কেন এলাম, কী দরকার পড়াশুনার। কিন্তু তখন আর উপায় নেই। আমার এই চিন্তার ভেতর দিয়েই গাড়িখানা আমায় নিয়ে বেথুন কলেজের প্রকাণ্ড ফটকের ভেতর এক সময়ে ঢুকে পড়ল।

কলেজ জীবন আরম্ভ হল। প্রকাণ্ড বড় বোর্ডিং, তারই কয়েক গজ দূরে কলেজের আরও বড় বাড়ি। সেই স্বপ্নে-দেখা একখানি খাতা জোগাড় হল। কলম কিন্তু পাই নি—তার বদলে জুটল একটি পেনসিল—তাই নিয়ে কলেজে যাই। অবাক হয়ে অধ্যাপকদের 'লেক্‌চার' শুনি। মনে হয়, আমার ক্লাশের অনেক মেয়েই বেশ বুঝতে পারে। আমি কিন্তু সব পড়া তেমন বুঝতে পারি না। তবু দিন কয়েক পরেই ভাল ছাত্রীদের দলেই আমি পড়ে গেলাম। মনে হয়, বেশি কথা না বলাতেই আমার বিদ্যেটা কেউ বুঝতে পারে নি।

কিন্তু এই নতুন জীবন ভাল লাগে না। শুধু কলেজে নয়, বোর্ডিং গিয়েও ঘণ্টা ধরে চলতে হয়। ঘণ্টার শব্দে উঠতে হবে, খেতে হবে, শুতে হবে—এমনকি স্নানও করতে হবে। স্নানের জন্য দশ মিনিট সময়, তাও আবার নির্দিষ্ট করা আছে। দু'মিনিট আগে গেলে দেখব দরজা বন্ধ। স্নান করতে এক মিনিট দেরি হলেই কড়া বেজে উঠবে। ভাল লাগে না। বোর্ডিংয়ে ছোট বড় সকলের, এমন কি কর্তৃপক্ষেরও আদর যত্নের ত্রুটি নেই বরং আধিক্য আছে, কিন্তু মন তাতে বসে না। সামনের বারন্দায় একটি বেঞ্চ পাতা থাকে—বিকালে সন্ধ্যার অন্ধকারে সেখানে নিরালায় চুপচাপ বসে থাকি। মনে পড়ে নিজের ঘরের সন্ধ্যারতির কথা; আমার বহু যত্নের তুলসীতলা, ঠাকুরঘর—কে তাদের প্রদীপ দেখায়, ধূপ জ্বালে, আরতি করে! শাঁখ হয়ত এখন আর কেউ বাজায় না। মা কি একলা হাতে এত কাজ পারেন? আমার ঘরের ওপরের তারাগুলির গায় আমার আকুল দৃষ্টি হাত বুলোতে থাকে। চোখের জলে ঝাপসা হয়ে আসে দৃষ্টি। তাড়াতাড়ি মুছে ফেলি, হয়ত বা কেউ দেখতে পাবে।

এভাবে বসে থাকায় তাড়া খেলাম। বিকালে মাঠে বেড়াতে হবেই। সারাদিন পড়ার পর বিকালে একটু না বেড়ালে স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যাবে। সারাদিন যা পড়ি একমাত্র মা সরস্বতীই তার খবর জানেন। কিন্তু

বেড়াতে হবেই। মাঠে যাই। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মাঠ। সামনের দিকে রাস্তার প্রায় ধারেই একটি—সেটি ছোট। পিছনে খেলাধূলার মাঠ—খুব বড়। দু-চার দিন মাঠে যাবার পর ক্লাশের আরও কয়েকটি মেয়ের সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠ আলাপ হয়ে গেল। মাঠের চারদিকে নানাজাতের গাছপালা। কোনটা চিনি, কোন গাছ জীবনে প্রথম দেখলাম। উদ্ভিদবিদ্যা পড়তে আরম্ভ করেছি, সকৌতুক দৃষ্টিতে তাই তাদের দিকে তাকিয়ে থাকি। এমনি ঘুরে ফিরে দেখতে দেখতে যেদিন হঠাৎ মাঠের দক্ষিণ কোণে দুটি ফলন্ত পেয়ারা গাছ আবিষ্কার করে ফেললাম সেইদিন সেই গাছ দুটিকে একান্ত আপনার ধন মনে করে বড় আরাম বোধ হল। এখন আর মাঠে যাবার জন্য তাড়া খেতে হয় না। আমরা তিন চার জনে পেয়ারা গাছ দুটির রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিজেদের হাতেই তুলে নিলাম। রোজ তাদের দেখি, তার কোথায় কোন্ ফলটি কত বড় হল, কোনটা ঝরে পড়ল কি না, সব হিসাব আমাদের কণ্ঠস্থ। এবং একটু বড় হলেই তার সদ্ব্যবহার—সেও আমরাই করি। দিন কয়েক পর হলদে একটি ফুল দেখে আবিষ্কার করে ফেললাম একটি কুমড়ো গাছের—অযত্নবর্ধিত। কিন্তু তার দেমাকের অন্ত নাই—পাতায়, লতায় অনেকখানি জায়গা জুড়ে রাজত্ব করছে সে। এখন শুধু বিকাল নয়, সকালেও মাঠে একবার যেতে হয়। কুমড়ো ফুল তুলতে হবে। কিন্তু সকালে মাঠে যাবার নিয়ম নেই। তাই অতি সন্তর্পণে মাঠে গিয়ে ফুল তুলি এবং শাড়ীর আঁচলে তাদের লুকিয়ে রান্নাঘরের পেছন দিক দিয়ে অনেকখানি ঘুরে গিয়ে শিশুর মা-র হাতে তাদের জমা দিয়ে তবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি। শিশুর মা রাঁধুনী—ফুল ভেজে পালা করে সে আমাদের খেতে দেয়। একটি ফুল ভাজা—তাতে কী আসে যায়! কী অমৃতের স্বাদই না তাতে পেয়েছি।

বোর্ডিংয়ে যাঁদের উপরে ছিল আমাদের ভার, ইস্কুলে শিক্ষকতা করতেন তাঁরা। কী অপরিসীম স্নেহ ও মমতা পেয়েছি তাঁদের কাছ থেকে। আমার উপর ক্লাশে যাঁরা পড়তেন, তাঁদের আদর যত্ন—সেও কলেজ জীবনের এক অমূল্য সম্পদ। স্মৃতির ভাণ্ডারে তা অক্ষয় হয়ে আছে। কলেজ জীবনের কথা মনে হলেই 'বাঙালের' কথা মনে পড়ে। সে পূর্ববঙ্গের বাঙাল নয়—বাড়ি তার বিহারে—পূর্ব পশ্চিম সব বাঙলারই বাইরে। এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে একদিন তাকে আবিষ্কার করলাম। খুব ভোরে উঠে মাঠে গেছি। ভোরের পাতলা অন্ধকার তখনও সম্পূর্ণ মিলিয়ে যায় নি। খেলার মাঠটা পূর্ব দিক দিয়ে ঘুরে গিয়ে সরু পথটার বাঁকে যেখানে শেষ হয়েছে—আমরা ক'জন ঘুরতে ঘুরতে

হঠাৎ একদিন সেখানে গিয়ে পড়লাম। সেটা আমাদের নিষিদ্ধ স্থান—প্রিন্সিপালের আবাস। সেই প্রিন্সিপাল আবার একেবারেই খাঁটি বিলিতি। যে কারণে সেই ভয়কেও সেদিন অতিক্রম করেছিলাম, সে আকর্ষণ ছিল একটি করমচা গাছ। থোকা থোকা করমচায় গাছটি বোঝাই। কে গাছে হাত দেবে, এই পরামর্শ যখন করছি, এমন সময়ে হঠাৎ চমকে উঠলাম—"ক্যায়া মাঙ্‌তা বাবা?" সর্বনাশ, কে বুঝি দেখে ফেললে! বক্তা আড়াল থেকে বাইরে এল। বুঝলাম মেমসাহেবের বেয়ারা। মুখে আঙুল দিয়ে চুপ করতে ইশারা করে তাকে ডাকলাম। জিজ্ঞাসা করে জানলাম তার নাম বাঙাল। বললাম—"বাঙাল, দুটি করমচা পেড়ে দেবে?"

"ইতনা সবেরে করমচামে ক্যায়া হোগা বাবা?"

সর্বনাশ! গলা তো নয় যেন আশ্বিনের মেঘ। বললাম, "বাঙাল, আস্তে কথা বল—তোমার মেমসাহেব শুনলে যে মেরে ফেলবে।"

যাই হোক, বাঙাল একটি ডাল থেকেই অজস্র করমচা পেড়ে আমার দু'হাত ভরে দিল। কিন্তু এ কি! আমার সঙ্গীরা কোথায়? বাঙালের হুমকি শুনে তারা কি সরে পড়ল! করমচার ভাগ দেব কাকে? আমি ত টক একটুও খাই না। একবার ভাবলাম ফেলে দি। কিন্তু বড় কষ্টের উপার্জন—ফেলতে কষ্ট হল। বড় মাঠে পা দিয়ে দেখি আমার সঙ্গী দুটি অখণ্ড মনোযোগের সঙ্গে কি একটা বই পড়ছে। করমচা দেখে তাদের মুখে আর হাসি ধরে না। তাদের মুখে সেদিন ঐ নির্লজ্জ হাসি দেখে হতবাক হয়েছিলাম বটে, কিন্তু করমচাগুলো তাদের হাতে তুলে দিয়ে তৃপ্তিও যে পেয়েছিলাম, তাও ত অস্বীকার করতে পারি না।

দিন কেটে চলেছে। পড়াশুনা, খেলা-ধূলা, প্রিন্সিপালের স্নেহস্নিগ্ধ ব্যবহার, সুকোমল পরিবেশ সোনার তুলি বুলিয়ে জীবনটাকে স্বপ্নমধুর করে তুলছে। ইতিমধ্যে গেজেট প্রকাশিত হল। প্রিন্সিপাল খবর পাঠালেন—বৃত্তি পেয়েছি। স্বস্তি পেলাম, একটা সমস্যা ত দূর হল। পড়ায় উৎসাহও একটু বাড়ল। উদ্ভিদবিদ্যা বড় ভাল লাগে। উদ্ভিদবিদ্যার রহস্যের এক-একটি পাপড়ি শিক্ষক আমাদের সামনে মেলে ধরেন, আমরা অবাক হয়ে যাই। কে জানত প্রজাপতি, মৌমাছি আমাদের জন্য ফুলের ভেতরে সুরসাল ফলের পত্তন করে দেয়। গাছ নাকি আমাদের মতই খায়। শুধু যে খায় তা নয়, পোকা-মাকড় খেয়েও জীবন ধারণ করে। তারা মাংসাশী—এ কথা কি বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে? কিন্তু এ নাকি একেবারে প্রত্যক্ষ সত্য।

ইংরেজী সম্বন্ধে একটা বড় ভয় ছিল। ম্যাটিকে ইংরেজী ত প্রায় পড়িই নি। ইংরেজী বাঙলার পাঠ্য পুস্তক ত আমাদের ছিল না। এখন সেই ইংরেজী পড়তে হবে এবং বেশ বেশি করেই। কিন্তু দিন কয়েক পরেই ভয়টা কেটে গেল—বিশেষ করে পদ্য পড়ার ক্লাশে। হঠাৎ আমার অনুবাদের ঝোঁক চাপল মাথায়। ঐ ক্লাশে প্রথম বেঞ্চিতে বসতে সাহস পাই না। দ্বিতীয় কি তৃতীয় বেঞ্চিতে গিয়ে একটু জায়গা করে বসি। অধ্যাপক একটি করে লাইন বুঝিয়ে যান, নোটের খাতায় ছন্দের ভেতর দিয়ে তাকে আমি তর্জমা করে ফেলি। মাঝে মাঝে ভয়ে বুক কেঁপে ওঠে—ধরতে পারলেই একেবারে ক্লাশের বাইরে নির্বাসন। খাতার পর খাতা ভরে ওঠে—ধরা পড়ি নি কোনদিন।

এমনি করে দু' বছর পার হয়ে গেল। বি. এ. ক্লাশে পুরানো বন্ধুদের মাঝে আবার নতুন করে ফিরে এলাম। সেবার কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন—১৯২৮ সাল। সমস্ত নগরীতে উৎসবের জয়ডঙ্কা বেজে উঠেছে। বেথুন কলেজের আভিজাত্য তখন ছিল পুরা মাত্রায়। রাস্তায় বার হওয়ার রীতি আমাদের ছিল না। কংগ্রেসের এত বড় অধিবেশন দেখতে পাব না? বিশেষ করে স্বদেশ-প্রাণতায় তখন অল্পবিস্তর দীক্ষিত হয়ে উঠেছি। প্রিন্সিপালের কাছে আবেদন পাঠানো হল—বিনা আপত্তিতেই মঞ্জুর হয়ে গেল। পড়াশুনা, খাওয়া, ঘুম সব গেল। সকাল বিকাল অধিবেশনে যোগ দেই। মতিলাল প্রেসিডেণ্ট—কিন্তু তিনি তেমন সুস্থ নন। প্রেসিডেন্টের কাজ তাই করতে হয় তাঁর সুযোগ্য পুত্র জওহরলালকে। গান্ধিজী সব সময়েই সভায় উপস্থিত থাকেন। সুভাষ বসু অধিবেশনের মস্ত বড় কর্মী—ছাত্রমহল সব সময় তাঁকেই ঘিরে থাকে। তাঁদের বক্তৃতা শুনে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠি। মনে মনে ভবিষ্যতের একটা ছকও বা বুঝি কেটে ফেলি। আনন্দে উল্লাসে দিনগুলো তর তর করে কেটে যায়। শেষ দিন এল—অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করে যে যাঁর পথে ফিরে গেলেন। মণ্ডপ থেকে যখন বাইরে আসি, তখন আমাদের পাশেই ছিলেন কমলা নেহরু, জওহরলালের সহধর্মিণী। আজ তিনি আর এ পৃথিবীতে নেই।

আবার সেই পড়া—পরীক্ষার দিন আসতে বেশী দেরি হল না। কলেজের পড়া সমাপ্ত করে বাড়ি ফিরলাম। পিছনে পড়ে রইল আমার চারটি বছরের আনন্দের হাট, আমার শিক্ষক, আমার নতুন জীবনের গুরু, আমার আনন্দের সহচর ছোটবড় সব সঙ্গীরা। আমাদের পরিচারিকারা, যাঁরা কত যত্নে আমাদের আহারের আরামের ব্যবস্থা করেছেন, এমন কি—ছটু, যে আমাদের হাঁটার পথটি, চলার পথটিকে অতি যত্নে পরিষ্কার করে রেখেছে তাকেও ত আজও

ভুলতে পারি নি। তার পর কতদিন কেটে গেল! এখনও নিস্তব্ধ নিরালায় জীবনের সেই অধ্যায়ের পাতাগুলি যখন উল্টাই, এক অজানা বেদনায় মনটা ভরে উঠে—সে যে বহু দূরের পথ—বহু পেছনে তাকে ফেলে এসেছি। সেই আনন্দমুখর দিনগুলিকে ফিরে পাবার আর কোন উপায়ই তো আজ নেই।

বৃত্তি শিক্ষার সমস্যা

॥ মানুষের শিক্ষা ॥ দেহের ক্ষুধা ও মনের ক্ষুধা ॥ বৃত্তি শিক্ষার উদ্দেশ্য ॥ সমস্যা ॥ বর্তমান অবস্থা ॥ সমাধান ॥

মানুষ হইয়া জন্মাইবার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের কতকগুলি মানবিক দায়িত্ব ঘাড়ে আসিয়া পড়িয়াছে—এ বিষয়ে অস্বীকার করিয়া লাভ নাই। ফুল ফুটিয়া উঠে এবং সর্বজনের মনোরঞ্জন করে, কিন্তু সেই ফুলকে কেহ—'বন্ধু তুমি ফুটিয়া উঠো'—এই কথা বলিয়া আবেদন জানায় না। কিন্তু মানুষকে সকলেই বলে—উঠো, জাগো, ভূমাকে প্রাপ্ত হও। অর্থাৎ মনুষ্যত্ব লাভের পথ সহজ নয়, অন্তত পুষ্পত্ব লাভের চেয়ে মনুষত্ব লাভ শ্রমসাধ্য, সাধনাসাপেক্ষ।

শুধু পুষ্পত্ব কেন, পশুত্ব অর্জনেও পশুর কোনও দায়িত্ব বা কর্তব্য নাই, জন্মাইবার সঙ্গে সঙ্গেই তা অর্জিত হয়; কিন্তু মানুষকে ক্রমোন্নতির পথে জীবনকে বিকশিত করিয়া মনুষ্যত্ব অর্জনের পথে চলিতে হয়, তাই সৃষ্টির গোড়াতে মানুষকে শুধু ফলমূল খাইয়া যাযাবরের মতো জীবন কাটাইয়া চলিতে হইয়াছিল, কিন্তু খাওয়া বা ঘুমানোর পূর্ণতা হইলেই সে ভাবিয়াছে—এবং সেই ভাবনাজাত ফসল হইতে তাহার সাহিত্য, শিল্প, দর্শন—সব কিছুই সৃষ্টি হইয়াছে। মানুষ বুঝিয়াছে, দেহের ক্ষুধা মিটিলেই মনের ক্ষুধা মিটাইবার দায়িত্ব তাহার উপর অর্পিত হয়।

মনুষ্যত্ব বিকাশের জন্য মানব সম্প্রদায়ের সামগ্রিক চেষ্টা চলিয়াছে, কিন্তু তবু এককভাবে প্রত্যেক মানুষের জন্যই তাহার অভিভাবককে ভাবিতে হইতেছে—কি করিয়া সে দেহের ক্ষুধা প্রথমে মিটাইবে এবং তাহার পর সে মনের খোরাক মিটাইবার জন্য কাজ করিবে। তাই সমাজে যতটা সভ্যতা বিস্তৃত হইতেছে, সংস্কৃতি চর্চার যত ব্যাপকতা এবং রূপবদল ঘটিতেছে, ততই মানুষকে ভাবিতে হইতেছে কোন্ পথ অবলম্বন করিয়া সে সভ্য সমাজে অগ্রসর হইবে এবং মনুষ্যত্ব লাভের ও বিস্তারের পথে একজন সংস্কৃতিকর্মী হিসাবে কাজ করিবে।

অবশ্য আমাদের দরিদ্র দেশের অভিভাবকেরা ছাত্রকে বিদ্যালয়ে পাঠাইবার সময় এমন করিয়া সূক্ষ্ম চিন্তায় বিভোর হন না। তাঁহারা মোটামুটি দেখেন যে,

ছেলেটি কি করিয়া দুমুঠো অন্নের সংস্থান করিবে, কোন্ ধারায় লেখাপড়া শিখাইলে মোটামুটি তাহার জীবনে অন্নবস্ত্রের সংস্থান হইবে।

কিন্তু ক্রমেই জীবন এবং তাহার সমস্যাগুলি বর্তমান যুগে জটিলতর হইয়া পড়িতেছে। তাই বৃত্তি শিক্ষা ও বৃত্তি নির্বাচনের প্রশ্নও আজ বিশেষ চিন্তার ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আগে যেমন মানুষ বৃত্তি নির্বাচনের সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যত্ব অর্জনের চিন্তা করিত—এখন বর্তমান সময়ে ঠিক সে চিন্তাটা আর নাই; কারণ এখন অন্নবস্ত্র সংস্থানের প্রশ্নটাই বড় সাংঘাতিক আকার ধারণ করিয়াছে।

প্রাচীন কালে বৃত্তি নির্বাচনের খুব বেশী কেন, আদৌ কোন সমস্যা ছিল না। সাধারণ শিক্ষা শেষ করিয়া মানুষ সাধারণত পিতৃপুরুষের বংশানুক্রমিক বৃত্তি গ্রহণ করিত এবং পৈতৃক বৃত্তিতে দক্ষতা লাভের জন্য বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ করিত। ফলে তাঁতীর ছেলে তাঁত বুনিত, জেলের ছেলে মাছ ধরার ব্যবসায় করিয়া অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিত।

আমাদের গ্রামে-গাঁথা দেশ—সেখানে ছিল পুরাতন ধারার কুটির শিল্পবৃত্তি—কিন্তু যন্ত্রযুগে কুটির শিল্পের ক্ষতি হইল। শুরু হইল বিপর্যয় ও সমস্যা। একদিকে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা মানুষকে কিছুটা আত্মাভিমানী করিয়া তুলিল। অন্যদিকে উন্নত ধরনের যন্ত্রশিল্প লক্ষ মানুষের কাজ নষ্ট করিয়া দিল। ফলে মানুষ স্বীয় বৃত্তির প্রতি আস্থা হারাইয়া নিজের অধীত বিদ্যাবলে অন্য রকমে জীবিকা অর্জনের চেষ্টায় রত হইল। ওদিকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া মানুষ শুধু জ্ঞান রাজ্যের সীমা বাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিতে চাহিল। তাই পেটের ক্ষুধা মিটাইবার আগেই মনের ক্ষুধা দূরের চেষ্টা করিতে শুরু করিল। কিন্তু পেটের ক্ষুধা বড় ক্ষুধা। নিজের অধীত বিদ্যার দ্বারা যখন মানুষ দেহের ক্ষুধা দূর করিতে পারে না, তখন সে যে কোন কাজেই নামিয়া পড়ে। ইহার ফলে বৃত্তি নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিপর্যয় আসে।

আগে ইংরেজীয়ানায় শিক্ষিত লোকের সংখ্যা ছিল খুব কম। তাই সামান্য লেখাপড়া জানা লোকেরই অফিসে চাকরি হইত। কিন্তু এখনকার ছবি সম্পূর্ণ আলাদা রকমের। লক্ষ লক্ষ উচ্চ শিক্ষিত যুবক বেকার বসিয়া আছেন, অর্ধাহারে দিন কাটাইতেছেন। ডাক্তারি, ওকালতি, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি ক্ষেত্রে বহু লোকজন উপযুক্ত শিক্ষা লইয়া ভিড় করিতেছেন। ব্যবসায় ক্ষেত্রে নানা ধরনের প্রতিযোগিতা। কৃষিপ্রধান দেশে অকৃষিসুলভ কাজেই আমাদের বেশী অধ্যবসায়। ফলে আজ আমরা এক বিপর্যয়ের সম্মুখীন।

ইহা ছাড়া আমাদের বৃত্তিক্ষেত্রে বিপর্যয়ের আর একটা প্রধান কারণ আছে। অভিভাবক নিজের ইচ্ছা ও রুচি অনুযায়ী ছেলের বিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা করেন, ছেলের নিজের রুচিকে মর্যাদা দেওয়া হয় না। ফলে যে ছেলের ডাক্তার হইবার বাসনা—তাহাকে উকিল হইতে হয়, আর যে শিল্পী হইবার জন্য উদ্গ্রীব—তাহাকে অভিভাবকের তাড়নায় ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িতে হয়।

অবশ্য আজকের দিনে শহুরে শিক্ষা ও সভ্যতার ফলে বহু রকমের বৃত্তির আমদানি হইয়াছে। ছবি আঁকিয়া বা সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া বা অভিনয় শিল্পে আত্মনিয়োগ করিয়া আজ দেহের ও মনের ক্ষুধা মিটানো সম্ভব। এতদিন তাহা ছিল না।

তবে যে কোনও বৃত্তিই গ্রহণ করা হোক না কেন, সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ শিক্ষালাভ করা যেন হয়। নচেৎ কোন বৃত্তি শিক্ষা লাভ করিয়া সেই বৃত্তি গ্রহণ দ্বারা নিজের দেহের ক্ষুধা মিটাইবার পর দেশের সেবা এবং মনুষ্যত্বের বিকাশ, তার দ্বারা সম্ভব হইবে না। বৃত্তি শিক্ষাই হউক আর সাধারণ শিক্ষাই হউক—তাহার উদ্দেশ্য ও আদর্শকে বৃহত্তর সমাজকল্যাণমুখী না করিয়া তুলিতে পারিলে তাহা সম্পূর্ণতা পাইবে না। এ ক্ষেত্রে দেশের সরকারী ব্যবস্থা এবং শিক্ষক সম্প্রদায়ের দায়িত্ব ও সাহায্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করিয়া সরকারী উদ্যোগ ও সাহায্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

বর্তমানে সরকারী ব্যবস্থা বৃত্তি শিক্ষার প্রতি নজর দিয়াছে বটে তবে প্রয়োজনের তুলনায় তাহা মোটেই যথেষ্ট নহে। ব্যবসায় শিক্ষা, বাণিজ্য শিক্ষা, শিক্ষণ শিক্ষা—এবং জীবনে তাহার সফল প্রয়োগ, আজ আমাদের জীবনের আর্থিক দুর্গতি ও বেকার সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করিতে পারে। ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াই কয়েক বৎসর পূর্বে সুবিখ্যাত 'এ্যাবট উড রিপোর্ট' প্রকাশিত হইয়াছিল। গান্ধিজী রচিত 'ওয়ার্ধা শিক্ষা পরিকল্পনা' এবং ভারত সরকারের শিক্ষা-বিষয়ক কেন্দ্রীয় পরামর্শ সমিতিও এ বিষয়ে গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছিল—কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগ ও সাফল্য উৎসাহব্যঞ্জক নহে।

ব্যবসা-বাণিজ্যমূলক শিক্ষার উদ্দেশ্য

॥ প্রাচীন ও বর্তমান শিক্ষার দৃষ্টির ভিন্নতা ॥ ইংরেজ আমলের পরিচয় ॥
॥ শিক্ষার ত্রিধারার পরিচয় ॥ ব্যবসা-বাণিজ্যমূলক শিক্ষার উদ্দেশ্য ॥
॥ উপসংহার ॥

সুদূর অতীতে প্রাচীন ভারতের তপোবনে মুনিঋষিগণ যে জ্ঞানসাধনায় নিমগ্ন থাকিতেন, নবীন শিক্ষার্থীদের যে শিক্ষা দিতেন, সে শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল, বিশ্বরহস্য ভেদ, আত্মজিজ্ঞাসা, আত্মোপলব্ধি। 'আত্মানং বিদ্ধি'ই ছিল সে দিনের শিক্ষার, জ্ঞানচর্চার একমাত্র লক্ষ্য। বেদ, উপনিষদ্, বেদান্ত এই শিক্ষার বাণীই বহন করিয়াছে। সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা এই খাতেই প্রবাহিত হইয়াছে।

মধ্যযুগের তিমিরাবসানের পর ইওরোপে যেদিন হইতে রেনেসাঁসের, পুনরভ্যুদয়ের, নবজীবনের সূত্রপাত হইল, সেদিন হইতে জীবন-প্রবাহের নবীন বন্যায় ইওরোপীয় শিক্ষাব্যবস্থাও নূতন রূপ পরিগ্রহ করিল। কুসংস্কারাচ্ছন্ন পুরাতন প্রগতিবিরোধী শিক্ষার ধারা ও দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তিত হইল। নবীন শিক্ষার সতেজ প্রবাহ মানবমনের উষর ভূমির নব নব দিকদিগন্তে সযত্ন জলসিঞ্চনে বহুবিচিত্র সম্ভার সৃষ্টি করিল। সে শিক্ষা দুইটি প্রধান খাতে প্রবাহিত হইয়াছিল—উহার একটি ছিল প্রাচীন পথিকৃৎগণ-নির্দিষ্ট জ্ঞানচর্চার পথ। দর্শনালোচনা, কাব্যচর্চা, সাহিত্যসাধনা। ইহার সহিত পুনর্জীবিত হইল প্রাচীন গ্রীক মনীষিগণের সৃষ্ট রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতির চর্চা ও শিল্পকলা, ভাস্কর্যের উপাসনা। অপরটি ছিল, বিজ্ঞানসাধনা। প্রকৃতির রহস্য অনুসন্ধান, প্রকৃতির অবগুণ্ঠন উন্মোচন এবং প্রকৃতির জয়ের সাধনা। শিক্ষার এই গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমের পূত সলিলে স্নাত হইয়া সমগ্র মানবসমাজ ধন্য হইয়াছে। রেনেসাঁসের যুগে বিজ্ঞানসাধনার সূত্রপাত ঘটিলেও সেদিনের জ্ঞানচর্চার, শিক্ষাব্যবস্থার মূল সুর ছিল কলা-ভিত্তিক, মানবধর্মী। মানবকল্যাণের দৃষ্টিভঙ্গী, সৃজনশীল প্রচেষ্টায় উৎসাহ, গণতান্ত্রিক চেতনাই ছিল তাহার বৈশিষ্ট্য।

বিগত উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজশাসনের সূত্র ধরিয়া ভারতে এই শিক্ষাধারারই ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। এ'দিকে শিল্প-বিপ্লবের পরে পাশ্চাত্ত্য জগতে যন্ত্রভিত্তিক বৃহদায়তন উৎপাদন শিল্প যেদিন হইতে প্রতিষ্ঠিত হইল, সেদিন একদিকে যেমন পুরাতন সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ভিত্তি ভাঙিয়া নূতন ধনবাদী সমাজব্যবস্থার ইমারত গড়িয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে নূতন সমাজব্যবস্থার

প্রয়োজনে শিক্ষা ব্যবস্থাতেও আর একটি নূতন স্রোত প্রবাহিত হইতে শুরু করিল। দেশে দেশে বৃহদাকার শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইতে লাগিল। যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি সাধিত হওয়ায় দেশে বিদেশে পণ্যের বাজার প্রসারিত হইল। আমদানি ও রপ্তানি বানিজ্য অভূতপূর্ব পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য সুপ্রসারিত হইতে লাগিল। এই সকল প্রচেষ্টায় প্রয়োজন হইল সুশিক্ষিত কর্মীর, যাঁহারা উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া এই সকল ক্ষেত্রে উদ্যম গ্রহণ করিতে পারে, ইহাদের সম্প্রসারণে ও পরিচালনায় নেতৃত্ব ও সহায়তা দান করিতে সমর্থ হইবে। সুতরাং ব্যবসা বাণিজ্যের ও শিল্পের প্রতিষ্ঠায় এবং উন্নতিতে সহায়তা করিবার জন্য উপযুক্ত শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে শিক্ষাব্যবস্থাকেও তদনুযায়ী নূতন রূপদান করা হইল। আরম্ভ হইল শিক্ষার আর একটি নূতন ধারার—ব্যবসা ও বাণিজ্যমূলক শিক্ষার।

আধুনিক জ্ঞানচর্চা, শিক্ষাব্যবস্থা এই তিনটি ধারায় প্রবাহিত—প্রথমত, কলা-ভিত্তিক শিক্ষা, যাহাকে আজ বলা হইতেছে 'Humanities' অর্থাৎ মানব-ধর্মী। যথা—কাব্য, সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, রাষ্ট্রনীতি এবং অর্থনীতির আলোচনা। ইহাদের উদ্দেশ্য প্রধানত জ্ঞানচর্চা, আত্মোপলব্ধি, সৃজনশীল মানবশক্তির বিকাশ।

দ্বিতীয়ত, বিজ্ঞান শিক্ষা। ইহার দুইটি শাখা। একটি হইল শুধুমাত্র প্রকৃতির রহস্য অনুসন্ধান, প্রাকৃতিক রহস্য উন্মোচন ও প্রাকৃতিক শক্তি জয়ের সাধনা এবং তাহার পথ নির্দেশ। ইহা প্রধানত তত্ত্বগত। অপরটি হইল সাধনা-লব্ধ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ। মানুষের ব্যবহারিক জীবনে, শিল্পব্যবস্থায় নব নব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও উদ্ভাবনীসমূহকে কার্যত প্রয়োগ করা, প্রয়োগের কলকৌশল স্থির করা। ইহাকে কারিগরী বিদ্যা বলা হয়।

তৃতীয়টি হইল ব্যবসা ও বাণিজ্যমূলক শিক্ষা। কলকারখানা, বাণিজ্য ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন কার্যকলাপে উহাদের প্রয়োজনীয় নিম্নতম পর্যায়ের কর্মী হইতে আরম্ভ করিয়া ঊর্ধ্বতম পর্যায়ের দায়িত্বশীল পদের উপযুক্ত কর্মী সৃষ্টি করা এবং ঐ সকল ব্যবসা, বাণিজ্য ও শিল্পপ্রচেষ্টায় যাহারা উদ্যোগ গ্রহণ করিয়া ভবিষ্যতেও দেশের এই সকল অর্থনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টাকে শুধু অব্যাহত নহে, আরও সমৃদ্ধ করিতে সক্ষম হইবে এমন সুশিক্ষিত নবীন কর্মী প্রস্তুত করাই ব্যবসা ও বাণিজ্যমূলক শিক্ষার উদ্দেশ্য। সাধারণ কলাভিত্তিক, মানবধর্মী শিক্ষার সহিত ইহার গভীর পার্থক্য রহিয়াছে। মানবধর্মী সাধারণ শিক্ষার উদ্দেশ্য হইল

বিভিন্ন বিষয়ে নিছক তত্ত্বগত জ্ঞান প্রদান করা। আর ব্যবসা এবং বাণিজ্যমূলক শিক্ষার উদ্দেশ্য হইল—ব্যবসা, বাণিজ্য ও শিল্পব্যবস্থার বিভিন্ন বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক শিক্ষায় সুশিক্ষিত করিয়া বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ করিয়া তোলা। এই শিক্ষার মধ্যে সাধারণ জ্ঞানচর্চার ব্যাপকতা নাই, মানবসমাজের সুপ্রাচীন জ্ঞানচর্চার বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা নাই, আত্মজিজ্ঞাসা নাই; কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে, আধুনিক শিল্প, বাণিজ্য, ব্যবসায়ের অতি প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বিষয়ে, সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে গভীর তত্ত্বগত এবং ব্যবহারিক বা কার্যগত, হাতেকলমে, শিক্ষার ব্যবস্থা রহিয়াছে। আধুনিক সমাজব্যবস্থার বাস্তব প্রয়োজনেই এই শিক্ষার উদ্ভব।

আন্তর্জাতিক ও চিন্তামূলক

পঞ্চশীল ও শান্তিনীতি

॥ পঞ্চশীলের প্রাচীন তাৎপর্য ॥ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সমস্যা ॥ ॥ আমেরিকা ও সোভিয়েট ইউনিয়ন: দুই শিবির ॥ ভারতের সহিত সোভিয়েট নীতির তুলনা ॥ পঞ্চশীলের স্বরূপ ও উদ্দেশ্য ॥ জাতিসঙ্ঘের সনদ ॥ উপসংহার ॥

দুই হাজার বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষে ভগবান তথাগত যে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাতে ব্যক্তির আচরণ সম্বন্ধে পাঁচটি নীতি ছিল। এই পাঁচটিই ছিল বৌদ্ধ ধর্মের মূল নীতি এবং ভিত্তিস্বরূপ। ইহাদের বলা হইত 'পঞ্চশীল'। ইহাদের বাণী ছিল অহিংসা, প্রেম ও মৈত্রীর।

দুই হাজার বৎসর পরেও আজিকার দ্বন্দ্বক্লিষ্ট পৃথিবীতে এই মহৎ বাণীর সার্থকতা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। বরং নূতন করিয়া মৃত্যু ও ধ্বংসের সম্মুখীন মানবসমাজ আজ ইহাদের সম্যক্ গুরুত্ব উপলব্ধি করিতেছে।

দ্বিতীয় মহাসমরের অবসানে মানুষের মনে এই আশাই জাগিয়াছিল যে, মানববিদ্বেষী ফাসিস্ত পশুশক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ দেশগুলি নিজেদের বিভিন্ন সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিন্নতা সত্ত্বেও পারস্পরিক মৈত্রীতে আবদ্ধ থাকিয়া শান্তির ভবিষ্যৎকে সুনিশ্চিত করিবে, সমগ্র মানবসমাজের শান্তির উদগ্র আকাঙ্ক্ষা সকল রাষ্ট্রগুলির আন্তর্জাতিক নীতিতে সদা প্রতিফলিত হইবে, আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধানের পন্থা হিসাবে হিংসাত্মক পন্থা ও পাশবিক শক্তির ব্যবহার চিরতরে বিসর্জিত হইবে।

কিন্তু সকল জাতির ও দেশের জনসাধারণের এই ঐকান্তিক কামনাকে বিফল করিয়া যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশগুলির শোকার্ত জনসাধারণের, সন্তানহীনা মাতার, স্বামীহীনা পত্নীর ও পিতৃহারা সন্তানের আর্তনাদ আকাশে বাতাসে মিশিতে না মিশিতেই যুদ্ধদানবের রথচক্র-ঘর্ঘরে নতুন করিয়া কোরিয়ার প্রান্তর, ভিয়েৎনামের শস্যক্ষেত্র, বার্লিনের রাজপথ, আফ্রিকার মরুভূমি, সুয়েজের জলপ্রণালী মুখরিত হইয়া উঠিল। সমগ্র পৃথিবী পরস্পর বিরোধী দুইটি শিবিরে বিভক্ত হইয়া গেল। একটি পুরাতন প্রতিক্রিয়াশীল, স্থবির অথচ সমগ্র পৃথিবীর উপর পূর্বের মতো নিজ কায়েমী স্বার্থ বজায়ে ব্যগ্র ধনতান্ত্রিক, ঔপনিবেশিক, সাম্রাজ্যবাদী শিবির। অপরটি হইল নবীন প্রাণশক্তিতে পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক শিবির। একটির নেতা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও অপরটির নেতা সোভিয়েট ইউনিয়ন।

এই শক্তিসমবায়ের যুগে মানুষ আণবিক শক্তি করায়ত্ত করিতে সমর্থ হওয়ায়, পৃথিবীতে অপরিসীম ধ্বংসের এক ভয়াবহ ভবিষ্যতে সমগ্র মানবজাতির আত্ম-বিলুপ্তির সম্ভাবনা বাস্তব হইয়া দেখা দিয়াছে। শুধু আণবিক ও হাইড্রোজেন বোমাই নহে, নবতর জ্বালানি আবিষ্কারে উভয় শক্তি-শিবিরই আজ আরও মারাত্মক ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণে সমর্থ হইয়াছে। তাই আজ মানুষের মনে প্রশ্ন উঠিয়াছে—'Quo Vadis' ; কুতোঃ পন্থা ; পথ কোথায় ?

দুই হাজার বৎসর পূর্বেই ভারতবর্ষ সঙ্কীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থ দ্বন্দ্বের অর্থহীনতা প্রদর্শন করিয়া এই পথের ইঙ্গিত দিয়াছিল। সেই পথ ছিল অহিংসা ও মৈত্রীর পথ। বর্তমান যুগের দ্বিতীয় দশকে মহানায়ক লেনিন এই পথের আহ্বান জানাইয়াছিলেন। লেনিনের সেই পথ ছিল পৃথক সমাজ ও রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থা সম্পন্ন জাতিগুলির মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পথ। বিখ্যাত ব্রেস্টলিটভস্কের চুক্তিতে সদ্যবিপ্লবোত্তর সোভিয়েট রুশ এই পথের দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছিল। দ্বিতীয় মহাসমরের মাত্র দশ বৎসর পরে, আর একটি বিশ্বক্ষয়ী মহাসমরের মুখোমুখী দাঁড়াইয়া কালজয়ী ভারত অমৃতের পুত্রগণকে আহ্বান করিয়া আর একবার অমৃতের বাণী শুনাইল, পথ নির্দেশ করিল, ১৯৫৪ সালে চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাইয়ের সহিত তিব্বতের সীমান্ত সংক্রান্ত চুক্তিতে। এই চুক্তি যে পাঁচটি মূল নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা নূতন কালের নূতন পরিপ্রেক্ষিতে সকল জাতির পারস্পরিক আদর্শ, আচরণ ও সম্পর্ক নির্দেশ করিয়াছে। তাই ইহারা আধুনিক পৃথিবীর নব মানবধর্মের 'পঞ্চশীল নীতি', মানবসমাজের ও সভ্যতার প্রগতির 'পঞ্চশীল', বিশ্বশান্তির 'পঞ্চশীল'। এই পঞ্চশীল বা নীতি হইল,—

১. পরস্পরের আঞ্চলিক ঐক্য ও সার্বভৌমত্বের প্রতি পারস্পরিক শ্রদ্ধা।

২. পারস্পরিক অনাক্রমণ।

৩. পরস্পরের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপে নিবৃত্তি।

৪. পারস্পরিক মঙ্গল ও সমতা।

৫. শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান।

প্রথম শীলটি প্রতি রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সার্বভৌমত্বে স্বীকৃতি প্রদান করিয়া আন্তর্জাতিক শান্তির পথ সুগম করিয়াছে। দ্বিতীয় শীলটি আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানে হিংসার পথ বর্জন করিয়াছে। তৃতীয় শীলটি এক রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে অপরের হস্তক্ষেপের অন্যায় অধিকার অস্বীকার করিয়াছে। চতুর্থ শীল পৃথিবীর ক্ষুদ্র, বৃহৎ, দুর্বল ও শক্তিশালী—সকল রাষ্ট্রের সম-অধিকার স্বীকার করিয়াছে। তাহার ফলে একদিকে এতদিন পর্যন্ত বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিত এবং ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলিকে অবহেলা করিয়া জাতিতে জাতিতে যে অসন্তোষের বীজ বপন করিত, তাহার সম্ভাবনা দূর করিয়াছে। পঞ্চম শীলটি সকল শীলগুলির মধ্যে সর্বপ্রধান ও মৌলিক। ইহার তাৎপর্য এই যে, পৃথক রাষ্ট্র-ব্যবস্থা সত্ত্বেও প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই জীবনযাত্রা ও সমাজব্যবস্থার ক্ষেত্রে নিজ পন্থা অনুসরণের অধিকার আছে। ইহার প্রতি অকুণ্ঠ আনুগত্যই আন্তর্জাতিক শান্তি ও প্রগতির একমাত্র পথ।

এই পাঁচটি মূলনীতি জাতিসঙ্ঘ সনদের সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। ইহাদের মধ্যে সমগ্র মানব জাতির শান্তির ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা পূরণের প্রতিশ্রুতি রহিয়াছে। ইহাদের ভিত্তিতে বিভিন্ন জাতিগুলি যতই পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভাব লইয়া পরস্পরকে বুঝিতে চেষ্টা করিবে, পরস্পরের উন্নতি ও মঙ্গলের জন্য সহযোগিতামূলক কার্যে যোগদান করিবে ততই অশান্তি ও অমঙ্গলের সম্ভাবনা দূর হইয়া পৃথিবীতে এক অক্ষুণ্ণ শান্তি ও অব্যাহত প্রগতি ও মঙ্গলের যুগ নামিয়া আসিবে। ইহা ছাড়া আর পথ নাই—"নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।" ইহাই পঞ্চশীলের বাণী।

বিশ্বশান্তির পথ

॥ আদিম সমাজে সভ্যতার রূপ ॥ শ্রেণীবিভক্ত সমাজে সংগ্রাম ॥
॥ বর্তমান সভ্যতায় মানুষের সমস্যা ॥ দুইশক্তি : সমাজতন্ত্র ও ধনতন্ত্র ॥
॥ গান্ধিজী ও টলস্টয়ের বাণী ॥ দ্বন্দ্বের বীজ কোথায় ॥ সমাধানের পথ ॥

প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ। প্রাণিসমাজের মধ্যে দুর্বলতম সৃষ্টি মানুষ তাহার অপূর্ব চিন্তা ও উদ্ভাবনী শক্তিতে স্বল্পকালের মধ্যেই অন্যান্য শক্তিশালী প্রাণীদের বশ্যতা স্বীকার করাইয়া তাহাদের উপর নিজ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। ধীরে প্রাকৃতিক রহস্য ভেদ করিয়া একের পর এক প্রাকৃতিক শক্তি করায়ত্ত করিয়াছে। শুরু হইয়াছে সভ্যতার সূত্রপাত ও জয়যাত্রা। মানুষের সভ্যতার ইতিহাস, প্রাকৃতিক অন্ধশক্তি ও দুর্ধর্ষ মনুষ্যেতর প্রাণীর সহিত মানুষের সঙ্ঘর্ষের ইতিহাস। উহাদের উপর মানুষের জয়লাভের ইতিহাস। এমনি করিয়াই সভ্যতার গোড়াপত্তন হইয়াছে। এই পথেই সভ্যতা ক্রমোন্নতির পর্যায়ে আরোহণ করিয়াছে।

কিন্তু আদিম মানুষের সংগ্রাম যেমন একদিকে ছিল প্রাকৃতিক ও বন্যপ্রাণী-সমাজের সহিত, অপরদিকে তেমন ছিল এক মানবগোষ্ঠীর সহিত অপর মানবগোষ্ঠীর। সেদিনের নবীন মানব সভ্যতার সূতিকাগারে সদ্যভূমিষ্ঠ মানুষের

উপর ইতর প্রাণীদের মতই আদিম রিপুগুলির ছিল অপ্রতিহত প্রভাব। লোভ, হিংসা ও ক্রোধের তাড়নায় এক মানবগোষ্ঠীর সহিত অপরের বিবাদ ও লড়াই ছিল প্রতিনিয়ত। তাহার পর মানব সভ্যতা ধীরে যতই আরও উন্নত হইয়াছে ততই মানুষের আদিম প্রবৃত্তিগুলি তাহার জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিবেকের আড়ালে আবরিত হইয়াছে।

আরও পরবর্তীকালে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের অভ্যুদয়ে সেই আদিম হিংসা ও লোভ নূতন রূপে আত্মপ্রকাশ করিল। অন্ধ প্রাকৃতিক শক্তি সমূহের.ও শক্তিশালী বন্যপ্রাণীর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার সংগ্রামে যে মানুষ পারস্পরিক সহযোগিতার সেতু বন্ধন করিয়া জীবনসংগ্রামে উত্তীর্ণ হইয়াছিল, মানব সভ্যতার জন্মদান করিয়াছিল, উন্নততর সভ্যতা ও সমাজব্যবস্থায় উহাতে ফাটল ধরাইল সেই পুরাতন আদিম রিপুগুলি। ইহাদের তাড়নায়, বারবার একজাতি অপর জাতিকে, এক সভ্যতা অপর সভ্যতাকে, এক দেশ অপর দেশকে আক্রমণ করিয়াছে, লুণ্ঠন করিয়াছে, ধ্বংস করিয়াছে। ইতিহাস এই আত্মবিধ্বংসী যুদ্ধের কাহিনীতে ভরপূর। ইহারই প্রতিরোধ ও প্রতিকারে বার বার যুগে যুগে মানবাত্মার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা মহামানবের রূপ ধরিয়া মানবসমাজকে এই ধ্বংস ও হিংসার পথ হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। যিশু প্রেমধর্ম প্রচার করিয়াছেন। গৌতমবুদ্ধ অহিংসার বাণী শুনাইয়াছেন। হজরত মহম্মদ ভ্রাতৃত্বের বাণী প্রচার করিয়াছেন। টলস্টয়ের লেখনীতে নিপীড়িত মানবের ক্রন্দন ফুটিয়া উঠিয়াছে। কার্ল মার্কসের লেখনীতে ধ্বনিত হইয়াছে বর্তমান সমাজের প্রতি সাবধানী বাণী ও আগত দিনের সুসংবাদ। মহাত্মা গান্ধীর কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছে সেবা, শান্তি ও অহিংসার ব্যাকুল আবেদন।

মানব সভ্যতার বর্তমান সমুন্নত অধ্যায়ে, মানুষ এক অভূতপূর্ব দ্বন্দ্বের সম্মুখীন। একদিকে তাহার প্রতিভা ও সৃজনীশক্তি বিশ্বসৃষ্টির গোপনতম রহস্য করায়ত্ত করিয়াছে। পারমাণবিক শক্তি করায়ত্ত করিয়া আজ সে গ্রহ হইতে গ্রহান্তরে যাত্রায় প্রস্তুত হইতেছে। বিপুল উৎপাদনী শক্তি লাভ করিয়াছে। অক্ষম, দুর্বল মানুষ আজ স্রষ্টার সহিত পাল্লা দিয়া গ্রহ, উপগ্রহ সৃষ্টিতে সক্ষম হইয়াছে। আজ মানুষ এক অনাস্বাদিত সমৃদ্ধির যুগে উপনীত হইয়াছে। অফুরন্ত সম্ভাবনা তাহার সম্মুখে। অথচ অপর দিকে, মানুষের সমাজব্যবস্থা, সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো, মানুষে মানুষে অর্থনৈতিক সম্পর্ক আজও পুরাতনপন্থী, শোষণধর্মী। সম্মুখে আজ উৎপাদন-উপায়ের বিপুল ক্ষমতা, অথচ উহাদের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা আজ উৎপাদন বৃদ্ধির পথে চরম অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছে। ইহার সমাধানে সে

গ্রহণ করিয়াছে উপনিবেশ সৃষ্টির পথ, অর্থনৈতিক শোষণ ও সাম্রাজ্যবাদীপন্থা। ইহাতে যেমন এক দেশের সহিত অপরের অর্থনৈতিক সজ্ঘাতে প্রতিনিয়ত আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্ব সূচিত হইতেছে তেমনি নিপীড়িত, ঔপনিবেশিক শাসনে ও শোষণে জর্জরিত মানুষের নিরন্তর বিদ্রোহের বীজ উপ্ত হইতেছে। বর্তমান যুগে ইহাই যুদ্ধের মূল কারণ। ইহার সহিত আর একটি নূতন কারণ যুক্ত হইয়াছে; তাহা হইল উদীয়মান সমাজতান্ত্রিক শক্তির প্রতি পুরাতন ধ্বংসোন্মুখ ধনতান্ত্রিক শক্তির বিজাতীয় ক্রোধ। লোভ, ক্রোধ ও হিংসার এই নূতন বিস্ফোরণ অতিক্রমের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার উপর আজ মানবজাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে।

একদল পণ্ডিত আছেন, যাঁহাদের মতে মানুষের মনে যে আদিম রিপু ও প্রবৃত্তিগুলি রহিয়াছে তাহাদের দমন না করিতে পারিলে যুদ্ধের অবসান ঘটিবে না। তাই তাঁহারা প্রেম ও মৈত্রীর প্রচারের উপর, ক্ষমা ও ত্যাগের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ইহাদের মধ্যেই বিশ্বশান্তির বীজ নিহিত রহিয়াছে বলিয়া তাঁহারা মনে করেন। টলস্টয় ও গান্ধিজী এই পথের প্রদর্শক।

অপর একদল পণ্ডিত ও সমাজ-বিজ্ঞানী এই সকল মানবিক গুণাবলীর মূল্য স্বীকার করিয়াও মনে করেন যে, বর্তমান কালের মহাযুদ্ধগুলির বীজ নিহিত রহিয়াছে শ্রেণীভেদমূলক ধনতান্ত্রিক সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে। এই বিশেষ জাতীয় ব্যবস্থা মানুষকে আত্মসর্বস্ব ও সমষ্টি-স্বার্থবিমুখ করে। এই ব্যবস্থার অপরিহার্য ফল ঔপনিবেশিক শোষণ, জাতিতে জাতিতে অর্থনৈতিক স্বার্থের দ্বন্দ্ব। অতএব ইহার আমূল পরিবর্তন দ্বারা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা সকল দেশে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত স্থায়ী শান্তি স্থাপিত হইবে না। একমাত্র সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রই মানুষের আত্মকেন্দ্রিক চিন্তাধারাকে পরিবর্তিত করিয়া সমষ্টিকেন্দ্রিক করিয়া তুলিতে সক্ষম। আদিম রিপুগুলির অবদমনের উপযুক্ত পরিবেশ একমাত্র তখনই সৃষ্টি হইতে পারে।

কিন্তু তত্ত্বগত আলোচনার কথা ছাড়িয়া দিলে, বাস্তবে কোন্ পথে বিশ্বশান্তির পথ সুনিশ্চিত হইতে পারে, এই প্রশ্নের উপযুক্ত উত্তর কি? এই সম্পর্কে বলা যায় যে, পৃথিবীর সকল দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের যুদ্ধের বিরুদ্ধে দৃঢ়কণ্ঠে প্রতিবাদ তুলিতে হইবে। মানুষের অন্তর্নিহিত মঙ্গলবুদ্ধিকে জাগরিত করিতে হইবে। অপর দিকে যুদ্ধের কারণ ঔপনিবেশিক-সাম্রাজ্যবাদী শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইতে হইবে, উহার অবসানের জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে। সকল দেশের সম-অধিকার, আত্মোন্নতির অধিকার, সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতার

অধিকার মানিয়া লইতে হইবে। তৃতীয়ত, বিভিন্ন দেশগুলির নিজ নিজ জাতীয় প্রতিভার উপযোগী রাষ্ট্র ও সমাজ-ব্যবস্থা অনুসরণ করিবার অধিকার মানিয়া লইতে হইবে। এক দেশ কর্তৃক অপরের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ হস্তক্ষেপ বন্ধ করিতে হইবে। বিভিন্ন জাতিগুলির মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, অর্থনৈতিক উন্নতির প্রতিযোগিতা ও উহার জন্য উন্নত দেশগুলির অনুন্নত দেশের সহিত সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। পারস্পরিক বুঝাপড়া ও জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আদান-প্রদান বাড়াইতে হইবে। আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য হিংসার, বলপ্রয়োগের পন্থা বর্জন করিয়া আলাপ-আলোচনার পথ গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাই বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার একমাত্র সুনিশ্চিত পন্থা।

বিজ্ঞান আশীর্বাদ, না অভিশাপ ?

॥ বিজ্ঞানের অতীত অবদান ॥ বর্তমান প্রশ্ন কেন ॥ গত মহাযুদ্ধের ভয়াবহতা ॥ আণবিক আবিষ্কার ও হিরোসিমা ॥ মানবতা ও বিজ্ঞানের মিশ্রণ ॥

যে কল্যাণবুদ্ধিতে মানুষ আরণ্যক জীবন হইতে আসিয়া সমাজে সংসার বাঁধিয়াছে, সেই কল্যাণপ্রসূ বুদ্ধিতেই সে জগতের অপার রহস্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বিজ্ঞানকে আপন আয়ত্তে আনিয়াছে। আলো আর গতি, শব্দ আর উত্তাপকে যন্ত্রের মধ্যে বাঁধিয়া মানুষ অসাধ্য সাধন করিয়াছে, মানুষ অপার শক্তিশালী হইয়াছে। মানব সভ্যতার কত বিভিন্ন দিক বিজ্ঞান জগতের সামনে মেলিয়া ধরিতেছে। মহাসমুদ্রের শত লক্ষ বিক্ষুব্ধ তরঙ্গভঙ্গকে, আকাশের অনন্ত রহস্যকে অতিক্রম করিয়া সমস্ত বিশ্ব আমাদের ঘরের আঙিনায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। যে বিজ্ঞান মানুষকে প্রকাশ করিয়াছে, জগৎকে এক অভূতপূর্ব নূতন রূপ দিয়াছে, সেই বিজ্ঞান সম্বন্ধেই আজ পৃথিবীতে প্রশ্ন জাগিয়াছে—বিজ্ঞান আমাদের কি দিল, আশীর্বাদ, না অভিশাপ ? জগতের এই প্রলয়ের তাণ্ডবলীলা, অন্তর বিদীর্ণকরা বিশ্ববাসীর এই হাহাকারের জন্য আজ দায়ী কে ?

হিংসা আর লিপ্সা মানুষের সহজাত প্রকৃতি—এইখানেই মানুষ পশু। হিংসা লোভ যখন দেখা দেয় মানুষের মনে, জয়েচ্ছা তখনই জাগে। সবল দুর্বলের উপরে অত্যাচার করে, একে অন্যের রাজত্বের দিকে হাত বাড়ায়, জগতে সৃষ্টি হয় শত্রুর—দেখা দেয় যুদ্ধ। প্রাচীন জগৎ, সত্যের জগতেও এই দুষ্কৃতির পদচিহ্ন আছে। তাই দেখি কুরুকুলের ধ্বংস, রামের বনবাস, তাই সৃষ্টি হয়

মহাভারতের, বাল্মীকির কণ্ঠে জন্ম নেয় রামায়ণ। কিন্তু জিগীসা ও জিঘাংসা তখন মানুষের নীতিবোধ ও ধর্মবোধের অবলুপ্তি ঘটায় নাই। বিমূঢ় মহারথী অর্জুনের মনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেই যুদ্ধের প্রেরণা জাগাইয়া দিতে হইয়াছিল। দুর্নীতি লিপ্সার সহচর হইলেও প্রাকৃবিজ্ঞান যুগে নীতির লঙ্ঘনের মধ্যে বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধার উদ্রেক দেখা দেয় নাই। তাই কুরুক্ষেত্র ধর্মক্ষেত্র—যুদ্ধক্ষেত্র নয়।

মানুষ তারপর ধীরে ধীরে সভ্যতার ধাপে ধাপে অগ্রসর হইতে লাগিল, বিজ্ঞানের সাধনা আরম্ভ হইল—দুর্নীতিও আপনার স্বরূপ প্রকাশ করিয়া মানুষের নীতিবোধ ও ধর্মবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিল। মোহপীড়িত মানুষ বলিল, "মারি অরি পারি যে কৌশলে"। শত্রুকে জয় করিতে হইবে, অন্যের রাজত্বকে কাড়িয়া আনিতে হইবে, নীতির আশ্রয় লইলে চলিবে কেন? আজ আমাদের আর 'কৌশলে'র অভাব হয় না। বিজ্ঞানের হাতেই সমস্ত 'কৌশলে'র চাবিকাঠি রহিয়াছে।

সামান্য কারণকে উপলক্ষ্য করিয়া পৃথিবীর প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। অন্যায়কে শাস্তি দিবার, দমন করিবার অজুহাতে বিজ্ঞানকে বাহন করিয়া পৃথিবীর রাষ্ট্রসমূহ যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল। সেই যুদ্ধে বিজ্ঞানের কৌশল দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি, কিন্তু আতঙ্কে হতবাক হই নাই। তবুও বিজ্ঞানই সে মহাযুদ্ধকে পরিচালনা করিয়াছিল। এই যুদ্ধের অবসানে কিন্তু মানুষের হিংসার আগুন নিভিল না; যুদ্ধের বিরতিতে জগদ্বাসী কয়েকদিন বিশ্রাম করিল মাত্র। তারপরই আবার দ্বিতীয় মহাসমরের দাবানল জ্বলিয়া উঠিল। বোমারু বিমান দলে দলে পক্ষ বিস্তার করিয়া আকাশে ভীড় করিল—সাইরেনে নিরাপত্তার জন্য সঙ্কেত ধ্বনি বাজিয়া উঠিল, বিমানবিধ্বংসী কামান আপনার লক্ষ্য স্থির করিয়া আকাশের দিকে অগ্নি বৃষ্টি করিল। আকাশ, মাটি আর জলতল ত্রিভুবন মহাসমরের সন্ত্রাসে প্রকম্পিত হইয়া উঠিল।

আগুনে আগুন নিভে না। হিংসা হিংসাকে প্রজ্বলিত করে, হিংসার আগুনকে নির্বাপিত করে না। বিমানবিধ্বংসী কামান বোমারুকে ভূপাতিত করিতে পারে, কিন্তু যুদ্ধের কামনাকে সে নিবৃত্ত করিতে পারে না। আণবিক বোমা হিংসার নূতন রূপ ধরিয়া হিরোসিমা আর নাগাসাকিকে পৃথিবী হইতে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিল। আণবিক বোমার প্রলয়ঙ্করী মূর্তি দেখিয়া সমস্ত জগৎ আতঙ্কে স্তব্ধ হইয়া গেল। কিন্তু শক্তিমদগর্বিত দেশ যেন তার বিজয়যাত্রায় আরও এক নূতন পথের সন্ধান পাইল। আণবিক বোমার শক্তিকে অতিক্রম ও প্রতিরোধ করিবার জন্য দেশে দেশে গবেষণাগারে পরীক্ষা-কার্য আরম্ভ হইয়া গেল। হয়ত তৃতীয় মহাসমর এই গবেষণাগারের অন্তরালেই অপেক্ষা করিতেছে।

কল্যাণকামনা নিয়াই বিজ্ঞানের উদ্ভব হইয়াছিল। মরণের পথ হইতে বিজ্ঞানের কল্যাণে মানুষ ফিরিয়া আসিতেছে। অন্ধ সংস্কারকে অপসারিত করিয়া মানবত্বের উদ্বোধনে মানুষ আজ নতুন জন্ম লাভ করিয়াছে। জীবনকে যুগোপযোগী করিয়া জীবনের আদর্শ যে-বিজ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, যে-বিজ্ঞান আমাদের প্রতিদিনের জীবনকে, প্রতিদিনের কর্মকে আরাম ও উদ্দীপনায় ভরিয়া তুলিতেছে, সেই বিজ্ঞানই আজ মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দিতেছে কেন? এই প্রলয়ঙ্করী বুদ্ধি বিজ্ঞানের মাঝে কে আনিয়া দিল?

জানি, বিজ্ঞানের শক্তি অসীম। তার এক হাতে অমৃতের অপরিমেয় সম্পদ আছে বটে, কিন্তু অন্য হাতে আছে তার বিষের ভাণ্ডার। আজকের এই দানবীয় সভ্যতার যুগে মানুষের বিপরীত বুদ্ধি বিষভাণ্ডকেই অমৃত বলিয়া ভুল করিয়াছে—সর্বনাশের বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠিয়াছে সেইখানেই। বিজ্ঞান তার কল্যাণময়ী শক্তিতেই আমাদের আশীর্বাদই করিয়াছে। মানুষ যখন সেই আশীর্বাদকে অবহেলা করিয়া দুরাকাঙ্ক্ষার লিপ্সাকেই আলিঙ্গন করিল, সর্বনাশ তখনই পৃথিবীর বুকে নামিয়া আসিল। অভিসম্পাত আর আশীর্বাদ—বিজ্ঞানের দুই শক্তি—বর্তমান সভ্যতা অভিসম্পাতকেই বরণ করিয়াছে।

মানুষের এই বিপরীত বুদ্ধির মূলে আছে তার ঐশ্বর্য আর প্রভুত্বের প্রতি তার অপরিসীম লোভ, রক্তপিপাসার পৈশাচিক আনন্দ। ধনিক আর শক্তিশালীর অন্ধ স্বার্থ আজ রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সঙ্ঘাতের সৃষ্টি করিয়াছে। মানবসভ্যতার আদর্শ জীবনদর্শন আজ বিপন্ন। সোভিয়েট ইউনিয়ন আর আমেরিকার প্রতিদ্বন্দ্বিতার সামনে দাঁড়াইয়া জগৎ আজ সন্ত্রাসকাতর হইয়া পড়িয়াছে। শান্তি আন্দোলন আর শান্তির বাণী বিফল হইয়া ফিরিতেছে। জগতের ঘরে ঘরে পতিপুত্রহীনা নারীহৃদয়ের আকুল ক্রন্দন কেহ শুনিতেছে না। শুনিবে কে? স্বার্থ আর লোভ, দম্ভ আর প্রভুত্বের মোহ আমাদের বুদ্ধিকে শুধু হত করে নাই, কর্ণকেও বধির করিয়াছে।

শুধু শান্তির বাণীতে আজ আমরা সত্যের পথের, ন্যায়ের পথের সন্ধান পাইব না। অন্তরে বিষ যেখানে বাসা বাঁধিয়াছে সেখানেই সর্বপ্রথমে হাত আমাদের লাগাইতে হইবে। একবার আমরা আমাদের অতীত জীবনের, অতীত দিনের দিকে ফিরিয়া তাকাই। সেই প্রীতি, সেই মৈত্রীকে আর একবার আমাদের জীবনে আহ্বান করিয়া আনি। বর্তমান সভ্যতার নগ্ন বীভৎস রূপকে পরিত্যাগ করিয়া মানুষের মনে যদি প্রকৃত মানবত্ববোধ জাগিয়া উঠে, অন্ধ স্বার্থকে পরিত্যাগ করিয়া মানুষ যদি পরের দিকে একবারও সহানুভূতির দৃষ্টিতে তাকায় তবে এই

সাম্রাজ্যবাদ, ফ্যাসীবাদ সমূলে বিনষ্ট হইবে। পশুশক্তির উপর মানুষের আত্মিক শক্তি, শুভদা শক্তি প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে। বিজ্ঞান তাহার অভিশাপের আগ্নেয়াস্ত্রকে সংবরণ করিয়া জগতের শুভবুদ্ধির উপরে আপন আশীর্বাদের পুষ্পাঞ্জলি আবার বর্ষণ করিবে।

স্বদেশপ্রেম

॥ স্বদেশপ্রেম কী ? ॥ স্বদেশপ্রেমের উৎস ॥ ইতিহাসের উদাহরণ ॥
॥ বর্তমান কালের দৃষ্টান্ত ॥ স্বদেশপ্রেম ও রাজ্যলোভ ॥ সত্যকার আদর্শ ও উদ্দেশ্য ॥

'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'। স্বর্গ আকাঙ্ক্ষার বস্তু, প্রিয় কিন্তু সেই স্বর্গ হইতেও জননী মহীয়সী, মাতৃভূমি গরীয়সী। এই মাতৃভূমিকে ভালবাসার নামই স্বদেশপ্রেম।

যাহাকে ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি তাহাকেই আমরা সর্বাঙ্গসুন্দর, দোষমুক্ত দেখিতে আকাঙ্ক্ষা করি। প্রেমের ভিতর দিয়া মাতৃভূমিকেও আমরা তেমনি সুন্দর ও সমৃদ্ধিশালিনী দেখিতে চাই। দেশবাসীর সমৃদ্ধিতেই দেশের গৌরব, জাতির উন্নতিই স্বদেশের সম্পদ। স্বজাতির সমৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্য মমত্ববোধের, স্বজাতির প্রতি আন্তরিক প্রেমেরই নামান্তর স্বদেশপ্রেম। বস্তুত জাতীয়তা-বোধই দেশপ্রেমের ভিত্তি।

এই প্রেম আমাদের স্বার্থবদ্ধ ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখে না। কোথায় দেশে অভাব-অনটন, কোথায় ক্ষুৎপীড়িত বুভুক্ষু সকাতরে আর্তনাদ করিতেছে, কোথায় কে কাহারা অশিক্ষায় কৃষ্টির অভাবে অন্ধকারে পড়িয়া রহিয়াছে, দেশপ্রেম সেই দিকেই আমাদের কর্তব্যবুদ্ধিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে।

যে দেশ স্বাধীন, দেশ পরিচালনার ভার যেখানে দেশবাসীর নিজেদের উপরে, সেখানে দেশের দুঃখ-দুর্দশা অল্প এবং সেজন্য দেশবাসীর সক্রিয় কর্তব্যও হয়ত কিছু পরিমাণে কম। কিন্তু পরাধীন যে দেশ, অন্যের কাছে হাত পাতিয়া, অন্যের মুখের দিকে চাহিয়া যাহাদের দিন যাপন করিতে হয়, দেশের প্রতি কর্তব্যের গুরুত্ব তাহাদের অত্যন্ত বেশী। এই বিরুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যে পড়িলেই তখন জাতীয়ভাবোধ, স্বদেশপ্রেম সম্যকরূপে আত্মপ্রকাশ করে। মুসলমানের আক্রমণে হিন্দু রাজত্ব যখন বিধ্বস্ত হইয়া পড়িল, শিবাজীর দেশপ্রেমের বহ্নিদাহ তখন মারাঠাশৈলকে প্রজ্বলিত করিয়া তুলিল। স্বদেশপ্রেমের ক্ষাত্রতেজের মূর্ত বিগ্রহ

প্রতাপ আজও বাঁচিয়া আছেন। তাঁহার হলদিঘাট, তাঁহার চৈতককে আজও আমরা ভুলিতে পারি নাই। জাতির এই সঙ্কট দিনে শুধু পুরুষের প্রাণেই স্বদেশপ্রেম উদ্ভূত হয় না, নারীও আপন দেশকে ভালবাসে, তাহার অন্তরের ভালবাসা দিয়া স্বদেশকে স্বদেশবাসীকে সেও রক্ষা করিতে যুদ্ধে নামিয়া আসে। তাই যুদ্ধক্ষেত্রে দেখিলাম লক্ষ্মীবাঈকে। ঝান্সীর রানী যোদ্ধবেশে উন্মুক্ত তরবারি হস্তে বিপক্ষের সৈন্যদলের অগ্রগতিকে রোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। প্রাচীন ইওরোপেরও এই জাতীয়তাবোধের স্বদেশপ্রেমের সাক্ষী বহন করিতেছে ইতিহাস।

দেশের দুঃখ-দুর্দশা, পরাধীন দেশের উৎপীড়ন, অবিচার যখন দেশপ্রেমিকের মনে আঘাত করে, তখন গৃহের মায়া-মমতা, আরাম-বিলাস কিছুই আর তাহাদের বাঁধিয়া রাখিতে পারে না। বাঙালী যতীন তখন বাঘা যতীন হইয়' পর্বত কন্দর কাঁপাইয়া তোলে, বৃটিশসিংহের হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়। ক্ষুদিরামের গলায় পড়িয়া ফাঁসির দড়ি তখন পবিত্র হয়। স্বদেশপ্রেমের কাছে মানুষের ক্ষুদ্র স্বার্থ, জীবন ধারণের বিলাসোপকরণ, অহংবুদ্ধি সবই তুচ্ছ হইয়া যায়। এবং স্বার্থের আহুতি হইতেই যে প্রদীপ্ত অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত হয়, তাহার শক্তি অপরিসীম। তাই ত দেখি অর্ধনগ্ন ক্ষীণকায় মোহনচাঁদের কটাক্ষে ব্রিটিশ সিংহাসন কম্পিত হইয়া উঠিয়াছে। সুভাষচন্দ্রের প্রবুদ্ধ শক্তির দিকে তাকাইয়া ইংরেজ-রাজ প্রমাদ গণিয়াছে। এবং একদিন এই শক্তির অগ্নিশিখা যখন প্রত্যেক ভারতবাসীর অন্তরে আগুন ধরাইয়া দিল, সেইদিন সেই অগ্নিতেজের দীপ্তদাহ সহ্য করিতে না পারিয়া ইংরেজ ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিল। ভারতবাসী স্বাধীনতা লাভ করিল—কিন্তু যুদ্ধ করিয়া নয়। শুধু তাহার স্বদেশকে স্বদেশবাসীকে আপন অন্তরের সমগ্র সত্তা দিয়া ভালবাসিয়া। এই অপূর্ব ত্যাগ, এই স্বার্থবুদ্ধিহীন প্রেম জগতের ইতিহাসে বিরল।

কিন্তু শুধু আমার দেশটিই ভালবাসিব, আর স্বদেশের উন্নতির জন্য, রাজত্ব বিস্তারের জন্য পররাজ্যে হস্তক্ষেপ করিব—এ সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তি, এ স্বার্থ প্রবৃত্তি যেন স্বদেশপ্রেমকে মলিন না করে। সমগ্র বিশ্ব আজ আমাদের ঘরের দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের স্বার্থ, আমাদের উন্নতি বিশ্বের প্রতি দেশের শুভাশুভের সহিত যুক্ত হইতে চলিয়াছে। তাই শুধু নিজের দেশের স্বার্থ, শুভ দেখিলে চলিবে না। শুধু মানবতার পূজা করিলে চলিবে না, বিশ্বমানবতার মহাপূজার দিন আজ আসিয়াছে। যেখানে সঙ্কীর্ণতা, সেখানেই স্বার্থবুদ্ধি, সেখানেই হিংসা। এই হিংসার আগুনেই হিরোসিমা পৃথিবী হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। আজ তাই সমস্ত বিশ্বব্যাপী শান্তির বাণী প্রচারিত হইতেছে। কিন্তু শুধু বাণী প্রচার করিয়া

লাভ নাই। প্রেমের সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তিকে ত্যাগ করিতে হইবে ; পরদেশের পরকে আজ আর পর করিয়া রাখিলে চলিবে না ; বিদেশের স্বার্থে নিজের স্বার্থকেও প্রয়োজনমত বিধিমত বিসর্জন দিতে হইবে ; তবেই বিশ্বমৈত্রীর বন্ধনে বাঁধা পড়িয়া বিশ্বপ্রেমের আলোকে স্বদেশপ্রেম পবিত্র ও জ্যোতির্ময় হইয়া উঠিবে।

আত্মমর্যাদা ও সম্ভ্রমবোধ

॥ আত্মমর্যাদার স্বরূপ ॥ শিক্ষাই ইহার ভিত্তি ॥ উদাহরণ : রামমোহন, বিদ্যাসাগর—নেতাজী, বিবেকানন্দ ॥ ইহার সার্থকতা কী ॥ অহঙ্কার ও দম্ভের সহিত পার্থক্য ॥ সমাধান ॥

নিজের সম্বন্ধে মানুষের ধারণা কী ?—এই প্রশ্ন যদি কাহাকেও করা যায়, তাহা হইলে সরাসরি জবাব পাওয়া যাইবে, "খুব উঁচু"। কথাটা বলিতে যতটা সহজ লাগে, ইহার তাৎপর্য বুঝিতে ততটা সহজ নয়। কেহ যদি নিজেকে মর্যাদা দিতে গিয়া পাণ্ডিত্যে একেবারে বিদ্যাসাগর বলিয়া মনে করেন, অথবা পাছে আত্মগরিমা প্রচার হইয়া যায় এই আশঙ্কায় নিজের বিদ্যা ও বুদ্ধিকে বিসর্জন দিয়া কোন মূর্খ অথচ প্রভাবশালী ব্যক্তির অসার মতবাদকে মাথা পাতিয়া লন—তাহা হইলে এই উভয়ক্ষেত্রেই আত্মমর্যাদাবোধকে ক্ষুণ্ণ করা হইবে। আসলে আত্মমর্যাদা অর্থ আত্মগরিমাও নয়, আবার আত্মনিবেদনও নয়—এই দুইয়ের মাঝামাঝি এমন একটা কিছু যাহার উৎপত্তি নিজের উপর সত্যকারের বিশ্বাস ও সম্ভ্রমবোধ হইতে।

তাহা হইলে কথা দাঁড়ায়, এই আত্মবিশ্বাস আসিবে কোথা হইতে, যাহার নাকি সার্থক পরিণতি হিসাবে মানুষের মনে জাগিবে আত্মমর্যাদা ও সম্ভ্রবোধ ? এখানে, একটা কথা আসিয়া পড়ে : "Self-criticism is the root of all knowledge", অর্থাৎ কিনা মানুষ যদি বুঝিতে শিখে তাহার মধ্যে সত্যকারের কী কী 'গুণ' আছে, এবং 'দোষ'-ই বা কোনখানে, তখনই সে আত্মসচেতন হইয়া উঠিবে। আর, তাহা হইতেই জন্মাইবে আপন বিশ্বাস। এই আত্মবিশ্বাসই মানুষের প্রাণে জাগাইয়া দিবে আত্মমর্যাদা ও সম্ভ্রমবোধ। সুতরাং দেখা যাইতেছে, আগে মানুষকে শিক্ষা-দীক্ষায়, জ্ঞানে-কর্মে, ভাবনা-চিন্তায় সব দিক দিয়া উপযুক্ত হইতে হইবে ; তখন নিজের উপর বিশ্বাস আপনা হইতেই জন্মাইবে, আর তখনই মানুষ বুঝিতে শিখিবে আত্মমর্যাদা ও সম্ভ্রমবোধ কাহাকে বলে।

কিন্তু, আরও একটু কথা আছে। মানুষ কিছুটা শিক্ষিত হইলেই বুঝিতে পারে, আত্মনিবেদন করিয়া অপরকে তোষামোদ এবং চাটুকারিতা করা পাপ। শিক্ষা ও সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ অল্প-বিস্তর আজকাল সেই কথাটা বুঝিতে শিখিয়াছে। তাই আগেকার দিনের বিদূষকেরা, যাহারা হাস্য-পরিহাস সৃষ্টির জন্যে রাজা-মহারাজার দরবারে কায়েমীভাবে স্থানলাভ করিত, তাহাদের বেশীর ভাগেরই স্থান এখন "সার্কাস পার্টিতে"। সেদিক দিয়া যতটা দুশ্চিন্তা না থাকুক, আসল বিপদ হইল তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়কে লইয়া। আজকাল দেখা যায়, ইহাদের অনেকেই আত্মমর্যাদার নামে 'আত্মশ্লাঘা' বা আত্মগুণগান করিয়া থাকেন। এর অনিবার্য ফল হিসাবে এই দাঁড়াইয়াছে যে, অনেকেই হয় প্রকাশ্যে, না হয় পরোক্ষে বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের কাছে হাস্যাস্পদ হইয়া উঠিতেছেন। তাহাতে আত্মমর্যাদা অপেক্ষা আত্মঅপমান করাই বেশী হইয়া উঠিতেছে। এই প্রসঙ্গে, কবিগুরুর একটি সাবধান বাণীর কথা মনে পড়ে: "নিজেরে করিতে সম্মান দান, নিজেরেই আমি করি অপমান।" এই জিনিসটি অত্যন্ত অমর্যাদাকর। আত্মমর্যাদার নামে এই দুষ্ট ব্যাধি জাতীয় চরিত্রে আজ উৎকট ভাবে দেখা দিয়াছে।

অথচ, আত্মমর্যাদাবোধ সম্বন্ধে আমাদের সাহিত্যে কম লেখালেখি হয় নাই, আর আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিও আমাদের মধ্যে কম জন্মান নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ধরা যাক "বাবুই ও চড়াই"-এর বিখ্যাত কবিতাটির কথা। কী সুন্দর এবং সহজভাবে বাবুই পাখীর মুখ দিয়া বলান হইতেছে "নিজ হাতে গড়া মোর কাঁচা ঘর খাসা।" এইখানেই সত্যকারের আত্মমর্যাদাবোধ; নিজের সাধনা-লব্ধ, নিজের বুদ্ধি-লব্ধ, নিজের পরিশ্রম-লব্ধ জিনিসের উপর দিয়া আত্মমর্যাদা লাভ করিবার কী ঐকান্তিক প্রচেষ্টা। রবীন্দ্রনাথও এক জায়গায় স্পষ্টভাবেই বলিয়াছিলেন: "আমি ভূষণ বলে কিনব না আর, পরের ঘরের গলার ফাঁসি।" এখানেও সেই একই কথা,—আত্মমর্যাদাবোধকে জাগাইয়া তুলিবার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত।

পূর্বে আমাদের মধ্যে এমন অনেক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যাঁহারা তাঁহাদের জীবনের এক একটি টুকরা টুকরা কাহিনীর মধ্য দিয়া জাতির সম্মুখে আত্মমর্যাদা ও সম্ভ্রমবোধের জলন্ত স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন। প্রথমে রাজা রামমোহন রায়ের কথা বলি। তখন তিনি উচ্চপদস্থ ইংরেজ রাজপুরুষের দেওয়ান; পালকিতে করিয়া ভাগলপুর শহরে কোথাও যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে অন্য একজন ইংরেজ রাজপুরুষের সঙ্গে দেখা। সে সময় কালা আদমি সাদা সাহেবদের

সম্মুখ দিয়া পালকি চাপিয়া যাইতে পারিত না। সাহেব রামমোহনকে পালকি হইতে নামিয়া হাঁটিয়া যাইতে বলিলেন। রামমোহন সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া চলিয়া গেলেন এবং ইহার পর ইহা লইয়া বড়লাটের কাছে এক কড়া চিঠি লেখেন। বড়লাট রাজপুরুষটিকে বেশ ধমক দিয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগরের জীবনের ঘটনাটি আরও কৌতূহলোদ্দীপক। বিদ্যাসাগর মহাশয় তখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ। একবার তিনি শিক্ষাবিভাগের সাহেব কর্তার সঙ্গে দেখা করিতে যান। কর্তাটি তাঁর বুটশুদ্ধ পা টেবিলে তুলিয়া দিয়া চেয়ারে বসিয়াছিলেন, বিদ্যাসাগরকে দেখিয়াও পা নামাইলেন না—পরাধীন জাতির একটা লোকের সঙ্গে আবার ভদ্রতা! কয়দিন পরে কাজের ব্যাপারেই সাহেব আসিলেন বিদ্যাসাগরের কাছে, বিদ্যাসাগরও চটিশুদ্ধ পা টেবিলে তুলিয়া অভ্যর্থনা করিলেন সাহেবকে। এইভাবে বিদ্যাসাগর একটি জাত্যাভিমানী বিদেশী রাজপুরুষকে শিখাইয়া দিয়াছিলেন—জাতীয় জীবনে আত্মমর্যাদা ও সম্ভ্রমবোধের মূল্য কতখানি। সুরেন্দ্রনাথের মধ্যেও আত্মমর্যাদা ও সম্ভ্রমবোধ ছিল প্রখর। যাঁহারা তাঁহার জীবনের সঠিক খবর রাখেন, তাঁহাদের কাছে অবিদিত নাই যে, বাল্যাবস্থাতেই যেইদিন পাঠশালায় গুরুমহাশয় চটিয়া গিয়া তাঁহাকে 'ভেড়া' বলিয়া তিরস্কার করিয়াছিলেন, তার পরের দিন হইতে বালক সুরেন্দ্রনাথ আর পাঠশালায় পড়িতে যান নাই। পরবর্তী জীবনে সুরেন্দ্রনাথ যে ম্যাজিস্ট্রেটের পদ ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহার একমাত্র কারণ বিদেশী উপরওয়ালা সাহেবের ব্যবহারে আত্মসম্মানবোধে আঘাত লাগিয়াছিল বলিয়া। আশুতোষের জীবনেও এই ধরনের অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে। একবার তিনি মহীশূরে যান সেখানকার মহারাজার নিমন্ত্রণে। বাঙালীরা কোনকালে পাগড়ি বা টুপি পরে না। তিনিও খালি মাথায় গিয়াছিলেন। কিন্তু মন্ত্রীরা জানাইল যে, খালি মাথায় দেখা করিলে মহারাজাকে নাকি অপমান করা হইবে, সুতরাং আশুতোষকে একটি পাগড়ি বা টুপি পরিতে হইবে। আশুতোষ রাজী হইলেন না, ফিরিয়া গেলেন স্টেশনে—জাতীয় পোশাক পরিয়া যদি মহারাজার সঙ্গে দেখা করিতে না পান, তবে দেখাই করিবেন না—এমনি আঘাত লাগিয়াছিল আশুতোষের গভীর আত্মমর্যাদা ও সম্ভ্রমবোধে! পরে, অবশ্য মহারাজা ব্যাপারটি বুঝিতে পারিয়া অনেক সাধ্যসাধনা করিয়া আশুতোষকে ফিরাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন।

এই আত্মমর্যাদা ও সম্ভ্রমবোধ রবীন্দ্রনাথ ও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মধ্যেও গভীরভাবে বর্তমান ছিল। আর সেই কারণে রবীন্দ্রনাথ জালিয়ানওয়ালাবাগের

ব্যাপারে জাতীয় মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বলিয়া প্রতিবাদে 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং ঠিক একই কারণে সুভাষচন্দ্র ছাত্রজীবনে অধ্যাপক ওটেন সাহেবের ভারতবাসীদের গালাগালি দেওয়াকে বরদাস্ত করিতে না পারিয়া সক্রিয় প্রতিবাদ জানাইয়াছিলেন। মহাপুরুষদের জীবনী হইতে এই ধরনের আরও অনেক ঘটনা জানিতে পারা যায়।

এখন যদি প্রশ্ন উঠে, আত্মমর্যাদা ও সম্ভ্রমবোধের সার্থকতা কী? এই প্রশ্নের জবাবে এক কথায় বলা যাইতে পারে—জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হওয়া। মানুষ যদি নিজেকে যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা দিতে শিখে, তখন তাহার পক্ষে সমগ্র জাতিকে ভালবাসা দুরূহ ব্যাপার হইবে না। উপরে বর্ণিত ঘটনাগুলি তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। দেখা যাইতেছে, প্রত্যেকটি আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিই ছিলেন জাতীয়তাবাদী দেশবরেণ্য নেতা, এবং ইঁহাদেরই আত্মমর্যাদা ও সম্ভ্রমবোধের স্বীকৃতি হিসাবে যুগে যুগে সমগ্র ভারতবাসী বিশ্ববাসীর কাছে জাতীয় সম্মান ও জাতীয় মর্যাদা লইয়া মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছে। তাই স্বামী বিবেকানন্দ সমগ্র ভারতবাসীর জীবনাদর্শ ও উচ্চ ভাবধারা বিশ্ববাসীর কাছে উদ্ঘাটিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। এবং সারা বিশ্বে তিনি যতখানি 'স্বামীজি' হিসাবে পরিচিত ছিলেন, তাহার চেয়ে অনেক বেশী পরিচিত ছিলেন একজন প্রজ্ঞাবান ভারতীয় সন্ন্যাসী হিসাবে। সুতরাং একথা বলা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না যে, আত্মমর্যাদা ও সম্ভ্রমবোধ যদি জাতীয় মর্যাদাবোধের পর্যায়ে গিয়া উঠে, তবে তাহা হইতে সুফল সুনিশ্চিত।

আত্মমর্যাদাবোধ বা সম্ভ্রমবোধ যেমন ব্যক্তিত্ব তথা জাতীয়তাবোধের স্ফুরণ করে, মানুষকে তাহার আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠা করে, ঠিক তেমনি বিপরীতভাবে অত্যধিক আত্মসচেতনতা মানুষকে তথা জাতিকে খাটো করিয়া ফেলে। এই অত্যধিক আত্মসচেতনতার নাম অহঙ্কার বা দম্ভ। এই অহঙ্কার বা দম্ভ যখন ব্যক্তির মধ্যে প্রকাশ পায়—তখন উহা নিজেকেই কেবল বাড়াইয়া ও ফাঁপাইয়াই দেখে না—সবলে কখনও অন্যকেও গুঁড়াইয়া চলে। চারিদিকে সকলের উপর অপমানের বোঝা চাপাইয়া দিয়া সগৌরবে শুধু নিজেই চলিতে চায়। অহঙ্কারী ও দাম্ভিক অন্যকে অপমান করিতে দ্বিধাবোধ করে না। আবার এই অহঙ্কার ও দম্ভ যখন জাতির মধ্যে প্রকাশ পায়—তখন তাহার এক সর্বগ্রাসী রূপ লক্ষ্য করা যায়। এই মারাত্মক ও ভয়ানক সম্ভ্রমবোধ অন্য জাতিকে শুধু অবমাননাই করে না, তাহাকে পদদলিত করিতেও বাধে না। এই অহঙ্কার ও দম্ভের বহু দৃষ্টান্ত ইতিহাস হইতে মিলিবে। সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের অহঙ্কার ও দম্ভ আমাদের

পরাধীন ভারতের বুকে একদিন লাঞ্ছনার গভীর ক্ষত সৃষ্টি করিতে দ্বিধা করে নাই। তেমন আর এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত জার্মানীর হিটলারী রাজত্বকাল। জাতি হিসাবে ইহুদীদের উপরে তাহাদের ঘৃণা ও পীড়ন ইতিহাসে এক কলঙ্কিত অধ্যায় সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে। তাই দেখিতে হইবে, আমার মর্যাদাবোধ ও সম্ভ্রমবোধ যেন অন্যের মর্যাদা বা সম্ভ্রমকে আঘাত না করে।

ইহার যে কি পরিমাণ কুফল—তাহা আমাদের সমাজের দিকে চাহিলেই স্পষ্ট বুঝা যায়। উচ্চ শ্রেণী বা বর্ণশ্রেষ্ঠের আক্রমণাত্মক অহঙ্কার ও দম্ভ এতদূর পর্যন্ত গিয়াছে যে, আমাদের সমাজের নিম্ন শ্রেণীর মধ্য হইতে মনুষ্যত্ববোধ, মর্যাদাবোধ চিরতরে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। সেই জড় বৃহৎ একটা শ্রেণী জাতির গলায় জগদ্দল পাথরের মতো বাঁধা রহিয়াছে—ইহা হইতে মুক্তি চাই। এই মুক্তির ঘোষণা প্রাথমিক কর্তব্য—এ কথা স্মরণ করাইয়া গিয়াছেন স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধিজী।

বর্তমানকালে আমাদের দেশে প্রকৃত আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির সংখ্যা নেহাত নগণ্য। তবে আশার কথা, সমাজতন্ত্রবাদের মাধ্যমে দেশের অগণিত অশিক্ষিত নরনারীকে—অন্তত জীবন ধারণের তাগিদেও—আত্মসচেতন ও আত্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ করিবার প্রচেষ্টা চলিতেছে। ইহাতে আর কোন সুফল হউক আর না হউক, অদূর ভবিষ্যতে সমগ্র জাতি পৌরুষহীন নিষ্ক্রিয়তায় ও আত্মবিস্মৃতির অতলতায় নিজেদের তিলে তিলে নিঃশেষ করিয়া ফেলিবে না। বিশেষ করিয়া সমাজের নিম্নতম শ্রেণীর মানুষ—যাহারা নিজের মানবীয় অস্তিত্ববোধটুকুকে পর্যন্ত হারাইয়া বসিয়াছে—তাহারা আবার মনুষ্যত্ববোধ ও মর্যাদাবোধে জাগ্রত ও সচেতন হইয়া উঠিবে।

বিবিধ

আমোদপ্রমোদের প্রয়োজনীয়তা

।। জাতীয় অভ্যাস আনন্দবিমুখ ।। ।। কর্মজীবনে আনন্দের প্রয়োজন ।।
।। আমোদপ্রমোদে শিক্ষা ।। আনন্দের বৈচিত্র্য ।। সুস্থ আমোদপ্রমোদ ।।
।। অসুস্থ আমোদপ্রমোদের বিপদ ।। আমোদপ্রমোদের সামাজিক অবদান ।।

অবিশ্রান্ত একটানা কাজে মানুষের দেহকে ক্লান্ত করিয়া, মন কর্মবিমুখ হয়। তাই মানুষের মন বিষয়ান্তরে আশ্রয় খোঁজে—যেখানে গেলে তাহার চিন্তার ভার হালকা হইবে, মন ভাবনার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবে। শুধু তাহাই নয়, মনের মতো দেহকেও সুস্থ করা এবং উদ্দীপনা ও উৎসাহ দিয়া শরীরের মধ্যে শক্তি সঞ্চয় করাও আমাদের মাঝে মাঝে প্রয়োজন হইয়া পড়ে। তাই কাজ হইতে একটু অবসর পাইলেই আমরা ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়ি—নানারকম ক্রীড়া-কৌতুকে যোগদানকরি, টিকিট কাটিয়া চলচ্চিত্রের সামনে গিয়া বসি, জলস্রোতে নৌকা ভাসাইয়া দিয়া হাল ধরি, তেনজিংকে জীবনের আদর্শ করিয়া পর্বত আরোহণের চেষ্টা করি, কিংবা অকারণ ঘুরিয়া বেড়াইয়া দেহ-মনকে হালকা করিয়া ঘরে ফিরি।

কিন্তু আমরা বাঙালীরা কাজের জগৎ হইতে অবসর বেশী খুঁজিয়া লইতে পারি না। জীবনের উচ্চ আদর্শের দিকেও আমাদের লক্ষ্য থাকে না। সেজন্য গতানুগতিক ক্রীড়া ও আমোদপ্রমোদই আমাদের অবসরের আশ্রয়। বাঙালী ভাবপ্রবণ। আমোদপ্রমোদ খেলাধূলাকে আমরা সাংসারিক জীবনে সহজ ও সুন্দর ভাবে গ্রহণ করিতে পারি না। আমাদের ধারণা খেলাধূলা শুধু শৈশব ও কৈশোর জীবনেরই সহচর। সেজন্য পাঠ্যজীবনে যদিও বা খেলাধূলা করি, সংসার জীবনে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই তাহাকে জীবন হইতে ঝাড়িয়া মুছিয়া ফেলি। কিন্তু সমস্ত জীবন ধরিয়াই গুরুত্ব ও দায়িত্বপূর্ণ কাজের মাঝে মাঝে আমোদপ্রমোদ আমাদের জীবনে অবশ্য প্রয়োজন। তবে স্বাস্থ্য ও বয়স এই দুইয়ের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া খেলাধূলা ও আমোদপ্রমোদের প্রকৃতিকে আমাদের বাছিয়া লইতে হয়।

আনন্দই মানুষের জীবনের সহচর, মানুষের কর্মজীবনের সঞ্জীবনী সুধা। আমোদপ্রমোদের মধ্যেই এই সঞ্জীবনী শক্তি রহিয়াছে। আনন্দহীন জীবন ত যন্ত্রের মতো। যে জীবন কাজ করে না, সেখান হইতে আমাদের কাজ আদায় করিয়া লইতে হয়। দীর্ঘদিনের অবসরে যখন কাজ হইতে দূরে যাই, চলিয়া যাই

বিদেশ ভ্রমণে, কিংবা 'টিম' লইয়া কোথাও খেলিতে যাই, তখন আমরা শুধু দেশ দেখিয়াই বেড়াই না, শুধু খেলার ভিতর দিয়া জয়পরাজয়কেই লইয়া আসি না—জীবনভাণ্ডারে অনেকখানি আনন্দকেও সঞ্চয় করিয়া লইয়া আসি। এই আনন্দ দেহমনে সঞ্চারিত হইয়া শরীরের শক্তি ও মনের উৎসাহকে পুনরুজ্জীবিত করে। দৈনন্দিন কাজের ছোট বড় অবসরেও আমরা এই আনন্দকে সঞ্চয় করিতে পারি। নিরালায় একটু শিল্পের সাধনা, ঘরের আঙিনায় একটু ফলফুলের কেয়ারি, ছিপ লইয়া একটু মাছ ধরা—স্বল্প অবসরের মধ্যেও আমাদের আনন্দ দিতে পারে। ঘরে এবং বাইরে সর্বত্রই আমরা আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা করিতে পারি, কিন্তু আমাদের বাঙালীর মনে ইচ্ছারই অভাব। অবসরের সুযোগ জীবনে অনেকই আসে, তাহাকে আমরা গ্রহণ করিতে পারি না, তাহার সদ্ব্যবহার করিতে আমরা জানি না। আমাদের মনের জড়তাই আমাদের জীবনের আমোদপ্রমোদের অন্তরায়—সুযোগের অভাব নয়।

আনন্দদান ছাড়াও জীবনে আমোদপ্রমোদের আরও একটি বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। আমোদপ্রমোদ, ক্রীড়াকৌতুক নূতন জ্ঞানের উন্মেষ করে, শিক্ষার বিস্তার করে আমাদের জীবনে। খেলার ভিতর দিয়া আমরা পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা রক্ষা করিয়া চলিতে শিখি। নিষ্ঠা, রুচি ও কর্তব্যে অনুরাগ জীবনের আমোদপ্রমোদের ভিতর দিয়া আমরা অনেকখানিই লাভ করি। খেলা করিতে যখন উন্মুক্ত প্রান্তরে যাই, নদীর ধারে যখন চড়ুইভাতি করি, তখন শুধু আমরা আনন্দকেই পাই না, প্রকৃতির সঙ্গেও আমাদের পরিচয় ঘটে। প্রকৃতির প্রভাব আমাদের জীবনকে অনেকখানি শিক্ষা দেয়। সৌন্দর্য সম্ভোগের স্পৃহা আমাদের এমনি করিয়াই মনে জাগে। কাজের মধ্যে শৃঙ্খলা, নিয়মের অনুবর্তিতা আমরা আমাদের কর্মিজীবনের বাহির হইতেই লাভ করি।

অবসরে আনন্দ সঞ্চয়ের জন্য চলচ্চিত্রের জগতে আমরা আশ্রয় খুঁজি। চলচ্চিত্রজগৎ আমাদের জন্য অনেকখানি আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা রাখে, আবার এই চলচ্চিত্র আমাদের শিক্ষার বাহনও বটে। পুঁথিগত যে বিদ্যা আমাদের কাছে নীরস হইয়া উঠে, যে বিদ্যা আমাদের মনের উৎকর্ষ সাধন করিতে পারে না, চলচ্চিত্রের ভিতর দিয়া সে শিক্ষা সবুজ, সুন্দর ও আকর্ষণের বস্তু হয়। ফলে শিক্ষা জীবনের আনন্দের সামগ্রী হইয়া দেখা দেয়। অতীত আমাদের কাছে অন্ধকার, বহু দূর দেশ আমাদের কাছে স্বপ্ন। সেই অতীত ও স্বপ্নকে চলচ্চিত্র আমাদের সামনে বাস্তবে রূপায়িত করিয়া দেয়। পৌরাণিক জগৎ সত্য হইয়া সামনে দাঁড়ায়; ইতিহাস আর ভূগোলের আবিষ্কারকে পর্দার উপরে দেখিয়া

বিদেশ ভ্রমণের ফল লাভ করি। আনন্দ ও জ্ঞান পরিবেশনে চলচ্চিত্রের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

কিন্তু সর্বাবস্থাতেই এই আমোদপ্রমোদের প্রকৃতির দিকে আমাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আমোদপ্রমোদ যখন আমাদের দেহ ও মন উভয়েরই পুষ্টিবর্ধক, তখন আমাদের সেইরকম আমোদপ্রমোদকেই সাধারণত বাছিয়া লইতে হইবে। ঘরের ভিতর হইতে ঘরের বাহিরের আমোদপ্রমোদের দিকেই আমাদের লক্ষ্য যেন থাকে বেশী। আবার শরীরের সামর্থ্যানুযায়ীও আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করা উচিত। বিশেষ করিয়া আমোদপ্রমোদ যাহাতে নির্দোষ হয় এবং নীতিবিগর্হিত না হয়, সেদিকেই আমাদের একান্ত সতর্ক দৃষ্টি দিতে হইবে। এই সতর্কতার বিশেষ প্রয়োজন হয় ছবিঘরে। চলচ্চিত্র আমাদের যেমন শিক্ষা ও জ্ঞানের সহায়তা করে, তেমনি আবার অবনতির দিকে লইয়া যাইবারও তাহার যথেষ্ট শক্তি আছে। সুতরাং যে যে ছবি জীবনের উন্নতির পথে পরিপন্থী তেমন ছবির আকর্ষণ আমাদের জীবনে যেন না আসে।

দেহ ও মনকে সুস্থ রাখাই আমোদপ্রমোদের কাজ। শিক্ষা, সংযম ও জ্ঞান সঞ্চয়নের পথে, জীবনের সর্বাঙ্গীন উন্নতি বিধানে এই আমোদপ্রমোদই আমাদের সহচর ও সহায়ক। নির্দোষ সহচরই জীবনে কাম্য। অনেক সময় আমোদ-প্রমোদের নেশায় আমরা কর্তব্য ভুলিতে বসি, খেলার নেশায় উন্মত্ত হইয়া জীবনটাকে বিনষ্ট করি। সংযমের প্রয়োজন সেখানেই। সজাগ মনের নির্দোষ রুচিসম্পন্ন খেলাধূলা, আমোদপ্রমোদ শুধু ব্যক্তিগত জীবনকেই সুন্দর করে না, জাতীয় জীবনকেও গঠন করে, আর দেশকে করে উন্নত, সুন্দর ও সমৃদ্ধশালী।

বর্তমান নগরজীবন—আকর্ষণ ও অসুবিধা

॥ ভাঙাগ্রাম ॥ গড়ে-ওঠা শহর ॥ শহরের নানা আকর্ষণ ॥ নানা সুবিধা: কর্ম, বিদ্যা, চিকিৎসা ও আরাম ॥ অসুবিধা: সহানুভূতির অভাব, অধঃপতনের উপকরণের প্রাচুর্য, কুরুচিপূর্ণ সিনেমা, বাসগৃহের অভাব ॥ মুক্তস্থানের অভাব ॥

সোনার পল্লী আজ রিক্ত, হৃতসর্বস্ব। শোভায় অতুলনীয়, সম্পদে অভাবনীয় পল্লীর বুক আজ দৈন্যপীড়িত, অবহেলিত। সভ্যতা আর সংস্কৃতির জন্মভূমি ছিল যে পল্লীতে, আজ সেখানে নাই কোন শিক্ষা, সাংস্কৃতিক অগ্রগতির কোন পদচিহ্নই আর পড়ে না সেখানে।

আকাঙ্ক্ষাতাড়িত মানুষের মন বর্তমান লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। ঐশ্বর্য বৈভবে তাই ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠে শহর। অন্য দিকে পল্লীর বুকে নামিয়া আসে দীনতা। শিল্পের দুর্ভিক্ষে শিল্পী নামিয়া আসে মাঠে—কৃষির দুর্ভিক্ষে তাহারা হয় অন্নহারা। আর এই অন্নহারা পল্লীবাসী ধীরে ধীরে হয় গৃহছাড়া।

এদিকে বিদেশী সভ্যতার আওতায় শহরের রূপ পরিবর্তিত। তাহাদের সভ্যতা, সংস্কৃতি প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে নগরে নগরে। বিদেশের চোখঝলসানো পণ্যদ্রব্যে আর বিলাসের উপকরণে দেশের হাট বাজার, দোকানপাট ভরিয়া যায়। প্রতিষ্ঠা হয় যন্ত্রশিল্পের। আর কারখানার বাঁশীর ডাকের আকর্ষণে পল্লীবাসীর ভিড় জমে নগরে শহরে।

শহরের আকর্ষণের অন্ত নাই। শিল্প-নগরীতে চাকরির অভাব নাই। নগদ টাকা প্রতি সপ্তাহে, মাসে মাসে হাতে আসে। কাজের সময় নির্ধারিত। অতিরিক্ত যদিও খাটিতে হয়, তাহার জন্য মজুরিও আসে অধিক পরিমাণে। সে পরিশ্রম শরীরে ক্লান্তি আনিলেও মনে দেয় তৃপ্তি। বাসস্থানের জন্যও খুব বেশী ভাবনার প্রয়োজন পড়ে না। কারখানার মালিক কর্মচারী আর জনমজুরের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করেন। সেই ব্যবস্থা ক্রমশই উন্নতির পথে চলিয়াছে। ডাক্তার বৈদ্যের অভাব হয় না—মালিক তাহারও যেমন হউক একটা ব্যবস্থা করেন। কলের জল, বৈদ্যুতিক আলো, খেলাধূলা—আরাম আর আনন্দের ব্যবস্থার সেখানে অভাব হয় না। দুঃস্থ পল্লীবাসী তাই শহরের আকর্ষণে ঘরছাড়া হয়।

কারখানার প্রতিষ্ঠা যেখানে নাই—এমন বড় বড় শহরেও আকর্ষণের বস্তুর অভাব নাই। সরকারী বেসরকারী আফিসে আফিসে শহর ছাইয়া আছে। আছে দোকানপাটের বেচাকেনা। কোথাও নদী আর সমুদ্রের তীরে তীরে বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্যের জন্য বড় বড় বন্দর। উচ্চপদস্থ কর্মচারী আর মুটে মজুর সকলের জন্যই সেখানে যথোপযুক্ত স্থান আছে। শুধু যোগ্যতানুসারে খুঁজিয়া লইতে হইবে। যাহারা বেশী পাইল না—সামান্য কিছু পাইল, তাহাদেরও দুবেলা দুটি ভাত কোন রকমে যোগাড় হইয়া যায়। না খাইয়া মরিতে হয় না তাহাদের। শুধু আফিস আর বন্দর নয়—শহরে বহু প্রতিষ্ঠান আছে, দোকান হাট আছে, স্বাধীনভাবে ব্যবসা করার বহু সুযোগ আছে—একটু পরিশ্রম করিলেই অন্নাভাবে পীড়িত হইবার আশঙ্কা থাকে না এখানে। সন্তান প্রতিপালনের এ যোগ্যতা পল্লীমায়ের কোথায়।

বর্তমান যুগে বিদ্যাশিক্ষা আমাদের একান্ত প্রয়োজন। নিরক্ষরের স্থান আর আজকাল নাই। শহর এই শিক্ষাকেন্দ্র। শুধু বিদ্যায়তন আর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা নয়, ব্যবহারিক সকল রকম শিক্ষা, শিল্প শিক্ষা, কৃষিবিদ্যা সব কিছুরই লালনভূমি এই শহর। সামর্থ্যানুযায়ী আপনাপন প্রবণতার মতো কোন শিক্ষা লাভের জন্য ভাবিতে হয় না এখানে। শুধু শিক্ষার আকর্ষণেও আমরা গ্রাম ছাড়ি, শহরে আশ্রয় লই।

শহরে বিলাসের উপকরণের অভাব নাই। দরিদ্রের উপযোগী দ্রব্য হইতে কোটিপতির বিলাসের উপকরণ কোন কিছুরই অভাব হয় না। আহার সংস্থানেরও ব্যবস্থা প্রচুর। আর তাহা সংগ্রহ করার জন্য হাঁটিয়া বা নৌকা করিয়া গ্রামান্তরে যাইতে হয় না। প্রতি পাড়াতেই আঞ্চলিক অধিবাসীর জন্য তাহার ব্যবস্থা করা আছে।

যদিও বা দূরে যাইতে হয় তাহার জন্য আছে যানবাহনের ব্যবস্থা। ট্রাম আছে, বাস আছে—হাতে টানা গাড়ি আছে। গাড়ির অন্ত নাই। আরামপ্রিয় মানুষ এত আরামে আকৃষ্ট না হইয়া পারে না। যানবাহনের সুবিধা যদিও বা অনেক সময় গ্রহণ করিতে না পারি, তথাপি নগর আর শহরের রাজপথে চলার কষ্ট নাই। প্রশস্ত অপ্রশস্ত বহু পথ শহর ছাইয়া আছে। পঙ্কিলতায় আর কর্দমে তাহা দুর্গম হয় না। পৌরবিভাগের তদারকে পরিচ্ছন্ন রাজপথে অতি স্বচ্ছন্দেই চলাফেরা করিতে পারি।

রোগ জীবনের সঙ্গী আর বিচিত্র রোগ নিত্য নূতন দেখা দিতেছে। শহর জনবহুল—ফলে যে কোনও রোগ এখানে অতি তাড়াতাড়ি ছড়াইয়া পড়ার সুযোগ পায়। অবশ্য শহরে তাহার প্রতিকারেরও যথেষ্ট ব্যবস্থা রহিয়াছে। অভিজ্ঞ সুচিকিৎসকের অভাব নাই শহরে। হাসপাতালের সাহায্য আমাদের জন্য সব সময়েই আছে। ঔষধ সংগ্রহের জন্য দিন দু'দিনের পথ আর ছুটিয়া যাইতে হয় না। ঔষধ আর ডাক্তার মানুষের দুর্দিনের বন্ধু—বিপদে ত্রাণকর্তা।

জীবনধারণের জন্য শুধু প্রয়োজনীয় জিনিস আমাদের তৃপ্তি দিতে পারে না, আমাদের মন অপ্রয়োজনীয় জিনিসেরও আকাঙ্ক্ষা করে। তাই পরিশ্রান্ত দেহ লইয়াও ময়দানে, উন্মুক্ত প্রান্তরে বেড়াইতে যাই। ভারাক্রান্ত মন লইয়া খেলার মাঠে বসিয়া সারাদিন কাটাই। খেলাধুলা দেহ-মনের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য অপরিহার্য। যে খেলে না, শুধু দেখে—সেও আনন্দ পায়, শিক্ষা পায়। এই খেলাধুলার পূর্ণ সুযোগ শহরে—শহরের আকর্ষণ তাই আমাদের কাছে লোভনীয়।

অবসর বিনোদনের আরও একটি জিনিসের প্রাচুর্য আছে শহরে—তা ছবিঘর। ছোট-বড় ধনী-নির্ধন শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলেরই আকর্ষণের বস্তু চলচ্চিত্র। ছবিঘরে ভীড় থাকে না এমন দিন বোধ হয় খুব কমই দেখা যায়। শ্রান্ত দেহ আর ক্লান্ত মন লইয়া মানুষ যখন একটু আরাম একটু আনন্দ চায়, তখন ছবিঘরই তাহাদের আশ্রয় দিয়া ক্লান্তির ভার লাঘব করে।

শহরের বহুমুখী আকর্ষণ। এই আকর্ষণের ডাকে পল্লী আজ শূন্য—শহর পূর্ণ। কিন্তু শহরের এই আকর্ষণের পাশে পাশে অসুবিধাও আছে যথেষ্ট। আরাম বিলাসের মোহে শহরে ভীড়ের চাপ দিন দিনই বাড়িতেছে: শহরে কাজের সংস্থান যথেষ্ট আছে বটে, কিন্তু ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার তুলনায় তাহা নগণ্য। বিশেষ করিয়া ভারত বিভাগের ফলে উদ্বাস্তুরা শহরের কোলে আসিয়া আশ্রয় লইতেছে, ফলে বেকার সমস্যা দিন দিনই বিরাট আকার ধারণ করিতেছে। রাস্তা ঘাটে বেকারের দলের অন্ত নাই। উপার্জন নাই কিন্তু অর্থের প্রয়োজন। সুতরাং দুর্নীতি অবলম্বন করা ছাড়া আর উপায় থাকে না। পকেটমার, জুয়া-খেলার তাই সৃষ্টি হইতে থাকে। পশুর মতো পথে ঘাটে তাহাদের আবাস, পথের উপরেই তাহাদের জন্মও মৃত্যু। শুধু দুর্নীতি নয়, দুরারোগ্য ব্যাধিও তাহাদের আক্রমণ করে।

শহরে আরামের অভাব নাই বটে, কিন্তু অভাব সহানুভূতির। অগণিত লোক—উদয়াস্ত স্বার্থ অন্বেষণেই থাকে সকলে ব্যস্ত। বিপদ-আপদেও আমরা প্রতিবেশীর কোন খবর রাখিতে পারি না। কোথাও আমরা আমাদের সহানুভূতি প্রসারিত করার প্রয়োজন বোধ করি না। কোটিপতি আর নির্ধন শহরে পাশাপাশি বাস করে। ধনীর অবজ্ঞা অবহেলায় সে পীড়িত নির্যাতিত হইয়া দিন দিন অধঃপতনের দিকে তলাইয়া যায়—আর ধনমদে গর্বিত বিত্তশালী করুণা বিবর্জিত হইয়া মনুষ্যত্বের সর্বনাশ করে। স্নেহ প্রীতি সৌহার্দ্যের অভাবে সমাজবন্ধন শিথিল হইয়া আসে—যন্ত্রনগরী প্রাণহীন যন্ত্রেই পরিণত হয়।

সিনেমা আমাদের আরাম দেয় অনেকখানি নিঃসন্দেহ। শুধু আরাম নয়, শিক্ষাও দেয়। ছবি দেখিয়া বহু সুশিক্ষা ও সুন্দর অভিজ্ঞতা লাভ করি আমরা কিন্তু সব ছবিই শিক্ষামূলক নয়—পরন্তু কুৎসিত রুচিসম্পন্ন। আর সেই সব ছবিই আমাদের দুর্নীতির পথে আগাইয়া দেয়। হীনবল চরিত্রের সংখ্যা দেশে দিন দিন যে এত বাড়িতেছে তাহার প্রধান কারণই এই কুরুচিপূর্ণ ছবির প্রাচুর্য।

শহরে ভীড়ের চাপ বেশী—বাসস্থানের সংখ্যা কম। বাড়ির সংখ্যা কম, বস্তিতে লোক ধরে না, পথের উপরে তাই কুঁড়ে বাঁধিতে হয়। এই ভীড়ের

চাপে শহরের স্বাস্থ্য হয় নষ্ট আর একবার যখন কোন রোগ দেখা দেয় তখন দাবাগ্নির মতো এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত সে গ্রাস করিয়া চলে।

শহরের এই সর্বনাশা বিপদের কথা আমাদের অবিদিত নয়। তবুও এই অশান্তি অসুবিধার কথা আমরা ভাবি না। শহরের আরাম আমাদের মোহমুগ্ধ করে, ঐশ্বর্য আর বিলাসের উপকরণ মনকে করে প্রলুব্ধ, খেলাধুলা আমোদপ্রমোদ জাগায় মত্ততা। আর তাহা ছাড়া জীবিকার্জনের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা ত সে করেই। তাই শহরকেই আমরা ভালবাসি, আর ঘর বাঁধি এই শহরেরই বুকে।

খেলাধুলা—মানবজীবনে ইহার প্রভাব

।। কর্মক্লান্ত জীবনে খেলার আনন্দ ।। বাঙালী জাতির ক্রীড়া-বিমুখতা ।। খেলার প্রয়োজনীয়তা ।। মানসিক শক্তি, দৈহিক শক্তি বৃদ্ধি ।। শৃঙ্খলাবোধ—সঙ্ঘবোধ ।।

কাজের ভিতর দিয়াই মানুষের জীবনটা গড়িয়া উঠিতে থাকে। সমস্ত জীবনটাই মানুষের কর্মময়। জীবনব্যাপী এই কাজের পিছনে থাকে মানুষের জীবিকা অর্জনের তাগিদ। আমরা শিক্ষকতা করি, আফিসে আদালতে যাই, প্রচণ্ড গরমের দিনেও উত্তপ্ত বয়লারের পাশে দাঁড়াইয়া আগুনকে সজীব রাখিবার জন্য তৎপর হইয়া থাকি। আধি, ব্যাধিকে উপেক্ষা করিয়াও আমরা কাজ করিয়া চলি—জীবিকা নির্বাহের জন্য কাজ আমাদের করিতেই হইবে—অর্থ যে জীবন-ধারণের প্রধান সম্বল। জীবনব্যাপী এই অবশ্যকরণীয় কাজ তাই কর্তব্যে পরিণত হয়। কঠিন কর্তব্যের আঘাতে মানুষের জীবনে যখন ক্লান্তি আসে, শ্রান্তিতে দেহ অবসন্ন হয়, মানুষ তখনই বিরাম খোঁজে—অবকাশের আশ্রয় লইতে চায়। এই অবকাশে কেউ বা আমরা অকারণ ঘুরিয়া বেড়াই, কেউ যাই টিকিট কাটিয়া ছবি দেখিতে সিনেমা হলে, কেউ বা আশ্রয় খুঁজি বইএর পাতায়, আবার কেউ বা খেলাধুলার ভিতর দিয়া অবসাদ-ক্ষীণ দেহমনকে নূতন করিয়া সজীব করিয়া তুলি।

রুচিসঙ্গত সব কাজই আমাদের ক্লান্তশক্তিকে পুনর্জাগরিত করে সত্য, কিন্তু নির্দোষ খেলাধুলা মানুষের দেহমনে যে শক্তি ও আনন্দের সঞ্চার করে, এমন বোধ হয় আর কিছুতেই পারে না। খেলা দিয়াই জীবন আরম্ভ হয় আমাদের। খেলার ভিতর দিয়াই শিশু তার ভবিষ্যৎ জীবনের শক্তি সঞ্চয় করিতে থাকে। তারপর একদিন সংসারের পূর্ণ দায়িত্ব যখন জীবনের উপরে আসিয়া পড়ে, তখন খেলাধুলা পড়িয়া থাকে পিছনে—কাজের মাঝে ডুব দিতে হয় আমাদের। কিন্তু

এই নিরানন্দময় কর্মজীবন—এ বাঙালী জাতিরই বৈশিষ্ট্য। বাঙালী জাতি জন্মবৃদ্ধ। তরুণদের সম্বন্ধে ত কোন কথাই নাই, এমন কি বালক-বালিকার ক্রিয়াচাপল্যও আমরা সব সময়ে ক্ষমার চোখে দেখি না। কৈশোরের মধ্যেও বার্ধক্যের স্থবিরতা দেখিতে পাইলেই যেন আমরা খুশী হই। আমোদপ্রমোদ, খেলাধুলা শুধু বালসুলভ চপলতা নয়, কর্মজীবনের অমূল্য সময়ের সে অপচয় করে না। যতি যেমন সুরের প্রবাহের মধ্যে বিরতি আনিয়া ছন্দের সৌন্দর্য ও গতিবেগের শক্তিকেই বাড়াইয়া দেয়, খেলাধুলার বিরতিও তেমনি মানুষের জীবনপ্রবাহের ছন্দে গতিতরঙ্গের সৃষ্টি করে, সৌন্দর্যশক্তির মূলে যোগান দেয় রসের। খেলাধুলা তাই মানবজীবনে অবশ্য প্রয়োজন। শুধু দৈনন্দিন একটানা কাজ হইতে অবকাশ লাভের জন্য ইহার প্রয়োজন নয়, সুষ্ঠু জীবন গঠনের জন্য ইহা প্রয়োজনেরও অতিরিক্ত আরও কিছু।

এই অতিরিক্ত আরও কিছু কি—তাই আমরা এখন দেখিব। খেলাধুলা আমাদের স্তিমিত শক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করে এ কথা সত্য। কিন্তু বাল্যে কি কৈশোরে শক্তির পুনর্জাগরণের প্রশ্ন তেমন আসে না। শৈশবে, বাল্যে, কৈশোরে প্রয়োজনের অতিরিক্ত শক্তি (surplus energy) আমাদের ভিতরে কাজ করিতে থাকে, তাই ত অত্যন্ত অসুস্থ শিশুকেও আমরা খেলা করিতে, ছুটাছুটি করিতে দেখি। প্রথম জীবনের খেলাধুলা আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনকে গঠন করে, ভবিষ্যৎ জীবনের পটুতা, সম্ভাবনাকে ধীরে ধীরে জাগাইতে থাকে। বাল্যকালে খেলার মধ্যে যে ধৈর্য, নিপুণতা ও সহিষ্ণুতার পরিচয় আমাদের দিতে হয়, সেই সহিষ্ণুতা, ধৈর্য ও নৈপুণ্যই মানুষের উত্তর জীবনকে ঔদার্য ও দাক্ষিণ্যের মন্ত্রে দীক্ষিত করে। সুরুচিবোধ খেলার একটি অতি সুন্দর ফল। দশ জনে খেলা—একে অন্যকে আক্রমণ ও অপমান করি না, খেলায় যে জয়লাভ করে, পরাজিত হইয়াও তার সেই শক্তির সম্মান দিব—এই সুরুচিবোধ ও উদারতা খেলারই ধর্ম। সংসারের পথ কুটিল। কুটিল পথের উপরে এই ধর্মই আলো ধরিয়া মানুষের জটিল জীবনগ্রন্থিকে সহজ ও সুন্দর করিয়া দেয়। পরিণত বয়সেও খেলার মধ্যে এই ধর্মেরই সাধনা চলিতে থাকে। এই খেলাকে আশ্রয় করিয়া শিশুর দল ভবিষ্যৎ জীবনের যে রঙিন স্বপ্নের জাল বুনিতে থাকে, সেই স্বপ্নই হয়ত একদিন তাহাদের জীবনকে সার্থক ও প্রখ্যাত করিয়া তুলিবে। বালিকার পুতুল খেলাই ত তাহার গৃহিণীপনার, তাহার মাতৃত্বের ভিত্তিভূমি। খেলাধুলার প্রভাব তাই মানবজীবনে নিতান্ত অল্প নয়, এই প্রভাব তাহার সমস্ত জীবনেরই সম্পদ ও সহচর।

প্রভাব যেখানে শক্তিশালী সেখানে তাহার উপযুক্ত প্রয়োগের দিকেই সব সময় লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। খেলা যেমন মানুষকে সংযত, স্থির ও ক্ষমাশীল করে, তেমনি আবার নীচ ও নিষ্ঠুর প্রকৃতি সৃষ্টি করার ক্ষমতাও সে রাখে। সেই কুপ্রবৃত্তি যাহাতে প্রশ্রয় না পায়, সেদিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আমরা অনেকেই খেলার এই দিকটাকে সম্পূর্ণভাবেই অবহেলা করিয়া চলি। ভাবি—খেলা ত খেলা মাত্রই। কিংবা মনে করি খেলাধুলা আমাদের শরীর চর্চারই শুধু সহায়তা করে—তার চেয়ে বেশী আর কিছু নয়। খেলাটা যদি শুধু স্বাস্থ্যচর্চাই হইত, তবে ব্যায়ামের সঙ্গে ত আর তাহার কোন পার্থক্যই থাকিত না। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে খেলাটা ব্যায়াম নয়, শুধু স্বাস্থ্যরক্ষার উপায়মাত্র নয়। সংযমের সঙ্গে যে সহযোগিতা, স্থিরবুদ্ধির সঙ্গে যে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং যে ঔদার্য ও ক্ষমা আমাদের জীবনকে সুন্দর ও সম্পদশালী করিয়া তোলে, তাহা এই খেলাধুলারই অবদান। সেই জন্যই খেলার প্রকৃতিকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিয়া সুন্দর জীবন গঠনের দিকে আমাদের দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

আমার জীবনের একটি স্মরণীয় দিন

দিনের পর দিন গাঁথিয়া আমরা জীবনের মালা রচনা করি। সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ ও বিষাদে ভরা আমাদের দিন নিত্য আসে নিত্য যায়। দিনের হিসাব আমরা রাখি না, রাখিতে পারি না। জীবনের অসংখ্য ঘটনার অনেকখানিই বিস্মৃতির অতল গহ্বরে ডুব দেয়, আর ভাসে না; অতীতের কোন স্মৃতি মনে হয়ত জাগে, কিন্তু সাড়া জাগায় না। কিন্তু জীবনে আমাদের এমন দিনও আসে, এমন ঘটনাও ঘটে যাহা বিস্মৃতিতে হারাইয়া যায় না। জীবনের আর সব কিছুকে ছাপাইয়া শুধু সেই দিনটি তাহার স্বাদ বিস্বাদ লইয়া মানুষের পরম সম্পদ হইয়া জাগিয়া থাকে। তাহার পদচিহ্নের গভীর ছাপ মানুষ তাহার মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারে না। এমনই দুইটি একটি ঘটনা হয়ত সকল মানুষের জীবনেই দুই-একবার আসে। আমার জীবনেও এমনি একটি দিন আসিয়াছিল—যেদিন প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যের সামনে দাঁড়াইয়া আনন্দ ও আতঙ্কে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম। কত বছর ত তারপর পার হইয়া গেল; কিন্তু সেই দিনের সেই স্মৃতি আজও ভুলি নাই, ভুলিতে পারি না।

পূজার ছুটি, এক মাসের অবকাশ। গিয়াছি পুরীতে—কিন্তু কেন জানি না, পুরীর জীবন সেবার আর তেমন ভাল লাগিল না। আরও বহু দূর—সমুদ্রের

আকর্ষণ যেন মনটাকে টানিতে লাগিল। সমুদ্র ত দিন রাতই দেখিতেছি—ভাল লাগে না। দুই দিনের পর মনটাকে ঠিক করিয়া লইয়া একদিন মাদ্রাজ মেলে গিয়া উঠিলাম। বহু জনপদ পার হইয়া বিচিত্র দৃশ্য ও বিচিত্র মানুষের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিতে দিতে দুই দিন পর গাড়ি আমাদের মাদ্রাজ স্টেশনে পৌঁছাইয়া দিল। বাঙলা ভাষা এখানে অচল। নিম্নশ্রেণীর মধ্যে ইংরেজী ভাষাও অজানা। আমরা বাঙালী তাই সেখানে হতবাক। বিমূঢ় অবস্থায় প্লাটফরমে দাঁড়াইয়া যখন যানবাহন কি বাসস্থানের সন্ধানের কোন কূল কিনারাই করিতে পারিতেছি না, এমনই সময়ে স্পষ্ট ইংরেজী ভাষায় কে আমাকে অভিবাদন জানাইল। চমকাইয়া উঠিলাম—লোকটি টাঙ্গাচালক। আমাকে দেখিয়াই সে বুঝিতে পারিয়াছে—আমি নবাগত, শুধু নবাগত নই, বিপদাপন্নও বটে। কি রকম জায়গা আমি পছন্দ করি, এইটুকুই সে শুধু আমার নিকট হইতে জানিয়া লইল। নিজের হাতেই আমার মোটঘাট সব গাড়িতে তুলিয়া লইল। মোট ছিল মাত্র চৌদ্দটি—কারণ সঙ্গে ছিলেন মা। মিনিট তিরিশ শহরের দুই চারিটি রাস্তা ঘুরাইয়া একটি ছোট বাড়ির দরজার সামনে গাড়িটি আসিয়া দাঁড়াইল। টাঙ্গওয়ালা আমাকে একটি মহিলার হাতে সমঝাইয়া দিল, বলিল কোন অসুবিধা হইবে না, কারণ এ বাড়ির ছেলে ইংরেজী জানে। সময়ান্তরে সে আবার আমার খবর লইবে বলিয়া 'নমস্তে' জানাইয়া বিদায় লইল। ইহাদের আতিথেয়তায় মাদ্রাজকে পরদেশ বলিয়া আর আমার মনে হয় নাই।

একদিন দুইদিন করিয়া মাদ্রাজে চার দিন কাটিয়া গেল। সমুদ্র দর্শনে গিয়াছিলাম। সমুদ্রের বিপুল তরঙ্গ এখানে নাই। বিস্তীর্ণ বেলাভূমি পার হইয়া জলে নামিলাম। মনে কোন অনুভূতি জাগিল না। মনে পড়িয়া গেল পুরীর সমুদ্রের কথা। সেই রাজ-ঐশ্বর্য এখানে কোথায়? কোথায় সেই "অভ্রভেদী সঙ্গীত"? এই সমুদ্রের জন্য মন লালায়িত হয় নাই। মাদ্রাজ ছাড়িলাম।

বাহির হইয়া পড়িলাম রামেশ্বরের পথে। রামেশ্বর, ধনুষ্কোটিকে চারিদিকে জড়াইয়া ধরিয়া আছে বঙ্গোপসাগর। সম্মুখে, বামে যে দিকে তাকাই—নীল সমুদ্রের অনন্ত বিস্তার। মহিমার পার নাই, কিন্তু সম্রাটের ভূষণ কই? আবার পথে নামিলাম। মাদুরার মীনাক্ষীকে প্রদক্ষিণ করিয়া, গোপুরমের প্রতিটি তলার সৌন্দর্যকে উপভোগ করিয়া একদিন গভীর রাত্রের নির্জন অন্ধকারে আসিয়া পা দিলাম টিনেভেলীর ছোট স্টেশনটিতে—উদ্দেশ্য কন্যাকুমারিকা। ক্ষীণ আলোর অস্পষ্ট ছায়ালোকে ঘেরা টিনেভেলীর ছোট স্টেশন ঘরটিকে মনে হইল যেন স্বপ্ন-রাজ্যের মায়াপুরী। ঘর হইতে একটি লোক বাহিরে আসিল—ঘরের তদারক

করিবার ভার ইহারই উপরে। কাছে আসিয়াই পথের কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া ঘরে ডাকিয়া লইয়া গেল। মনে হইল যেন আমার কত আপন জন। বাহির হইতে ডাকিয়া আনিল আর একটি লোককে—এ-ই আমাদিগকে অন্তরীপে পৌছাইয়া দিবে। যাইতে হইবে বাসে—বাস ছাড়িবে রাত্রি তিনটায়। কিন্তু সেজন্য আমাদের কিছুই ভাবিতে হইবে না। সময় হইলে সে-ই আসিয়া আমাদিগকে ডাকিয়া নিবে। শুইবার ব্যবস্থা করিলাম—কিন্তু ঘুম আসিল না। আমার এ কয়দিনের নূতন জীবনের সঙ্গে আবার নূতন করিয়া পরিচয় করিবার জন্য জাগিয়া রহিল মন আগামী দিনের আনন্দের পুলকে।

শরতের জ্যোৎস্নাভরা আকাশ—রূপার পাতলা চাদরে ঢাকা সমস্ত পৃথিবী। রাত তখন শেষের দিকে—পিচ্-ঢালা, মসৃণ রাস্তার উপর দিয়া বাস ছুটিয়া চলিয়াছে। ভিতরে আমরা কয়েকটি প্রাণী। গগনচুম্বী পাহাড়ের কোল ঘেঁষিয়া ঘন বনের বাসিন্দাদের মাঝে মাঝে চমকাইয়া দিয়া গাড়িখানা আসিয়া হাঁফ ছাড়িল নফারকয়েলে। এবার আমরা পা দিলাম সেণ্ট্রাল স্টেটে। আর একটু পরেই ত মহাসমুদ্রের কাছে যাইয়া দাঁড়াইব। জানি না সে দেখিতে কেমন হইবে—আনন্দে কি আতঙ্কে জানি না মনটা বারবার দুরুদুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। পথের ধারে ধারে দুই চারখানি মাটির ঘর—তামিল অধিবাসীদের বস্তি। পথের দুই ধারের দৃশ্যের সাথে আমার দুই চোখের দৃষ্টি কখন আটকাইয়া গিয়াছিল জানি না। হঠাৎ স্বাগত সম্ভাষণ শুনিয়া চাহিয়া দেখি আমি একেবারে অনন্ত জলধির উপল উপকূলে। মনে রহিল না আমার অসংখ্য মোটের কথা, ভুলিয়া গিয়াছিলাম মায়ের কথা। ছুটিয়া গিয়া দাঁড়াইলাম মহাসিন্ধুর কোলে।

এই ভারত মহাসাগর! হ্যাঁ, মহাসাগরই বটে। নীল মহাসিন্ধুর আদি-অন্তহীন বিস্তারের সীমারেখা নাই। ছোট একখণ্ড ভূমির উপরে দাঁড়াইয়া আছি আমি, ডান দিকে, বাম দিকে, পিছনে যতদূর দৃষ্টি চলে—শুধু জলধির জলের বিস্তার। ডান দিক হইতে আসিয়া মিলিয়াছে বঙ্গোপসাগর, বাম দিকে তাহার আরবসাগর। সামনের দিকে দৃষ্টি যেন আর চলে না। মহাকাশ কোথায় আসিয়া সিন্ধুর হাত ধরিয়াছে—তাহা আর দেখা যায় না। দিগন্তরালের রেখা আবছা হইয়া গিয়াছে। লক্ষ লক্ষ ফেনার সাপ নাচিয়া নাচিয়া ফণা তুলিয়া আসিতেছে। কূলের কাছে আসিতেই মাথা তাহাদের আপনি নত হইয়া পড়িতেছে। কাহাকে প্রণাম করিতেছে ইহারা? যুগ যুগান্তর ধরিয়া কাহার উদ্দেশ্যে তাহাদের এই প্রণাম নিবেদন? অপূর্ব, অপূর্ব! কী এক অনাস্বাদিত মাধুর্যে প্রাণ আমার ভরিয়া আসিল। নত হইয়া প্রণাম করিলাম। কাহাকে?

তাহা জানি না। উঠিয়া দাঁড়াইলাম। এই সেই পূণ্যভূমি—কুমারীকন্যা ভগবতী মহাদেবের জন্য তপস্যা করিতে করিতে সেই সাধনাজীবনের দেহকে এই মহাসাগরেই বিসর্জন দিয়াছিলেন। তাহার পরের জন্মই তাঁহার হিমালয়ের কোলে। মনে হইল—মনে হইল বলিলে ঠিক হইবে না, বুঝি বা দেখিতেই পাইলাম, নীলাম্বরী শাড়িটি পড়িয়া যেন কুমারীকন্যা দাঁড়াইয়া আছেন। প্রবালে মুক্তায় তাঁহার মাথার মুকুট রচনা করিয়াছে—রচনা করিয়াছে তাঁহার কাঞ্চন কণ্ঠী, বলয় আর চন্দ্রহার। দক্ষিণে বামে তাঁহার দুই সখী—জয়া বিজয়া। মায়ের দেহ হইতে অপূর্ব জ্যোতি বিচ্ছুরিত হইয়াই যেন আকাশের চন্দ্রাতপ রচনা করিয়াছে। নিস্পন্দ আমি—পলকহীন দৃষ্টিতে এই অপূর্ব শোভা দেখিয়া ধন্য হইলাম, পবিত্র হইলাম।

সম্বিৎ ফিরিয়া পাইলাম একটি ছোট কোমল হাতের স্পর্শ পাইয়া। ছোট্ট একটি তামিল শিশু আমার হাত ধরিয়া তামিল ভাষায় বলিল—তোমার মা ডাকিতেছেন। তাইতো,—কর্তব্যে অবহেলা করিয়াছি। স্থান নিলাম ধরমশালায়। স্নান করিতে ফিরিয়া আসিলাম আবার সাগরের কোলে। সামনেই পাথর দিয়া ঘেরা একটুখানি জল। মহাত্মাজীর পবিত্র ভস্মকে বুকে ধরিয়া আছে। তাহারই একটু দূরে মহাযোগী স্বামীজীর উপাসনার বেদী—জলের কোলে একটি পাহাড়। তাঁহার সাধনার ঐ মহামন্ত্র কান পাতিলেই বুঝি জলকল্লোলে শুনিতে পাওয়া যায়। দুই হাতে জল তুলিয়া মাথায় দিলাম—সমস্ত শরীরটিকে ডুবাইয়া দিলাম গভীর জলে। অপূর্ব এক পবিত্র স্নিগ্ধতায় শরীর আমার জুড়াইয়া গেল।

মন্দির দর্শনে গিয়াছিলাম। কালো পাথরের কন্যামূর্তি দাঁড়াইয়া আছেন। হাতে জপের মালা। পুরোহিতের হাতে চন্দন প্রসাধনেই তিনি গৌরাঙ্গী হইয়া উঠিলেন। এমন স্নিগ্ধ-কোমল রূপ কোন দেবতার ত আর দেখি নাই। বহু মন্দিরে দেবদর্শন হইয়াছে। এমন জীবন্ত বিগ্রহ আর কোথাও চোখে পড়ে নাই। স্নান, ভোগারতিতে প্রায় ঘণ্টা দুই তিন সময় লাগে। মন্দির রাজ-সরকারের সম্পত্তি—পুরোহিতও তাঁহারাই নিযুক্ত করিয়াছেন। সন্তানবাৎসল্যে পুরোহিত মাকে রত্নে বেশভূষায় সাজাইয়া দিয়াছেন। মন্দিরের দরজা বন্ধ হইল। ঘরে ফিরিয়া আসিলাম।

কুমারিকা জায়গাটি অত্যন্ত ছোট—কিন্তু নির্জনশোভায় সে অপূর্ব। একদিকে বালিয়াড়ি পাহাড় গগনচুম্বী নারিকেল বনকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। মাঝে মাঝে নারিকেল গাছের মাথাগুলি শুধু জাগিয়া আছে। একদিকে পথের ধারে সারি সারি ছোট কয়েকটি ঘরে কাপড়জামা ও অবশ্য প্রয়োজনীয় জিনিসের বেচা-

কেনা চলিতেছে। মন্দিরের নীচে আর একটি ছোট পথের ধারে চাল ডাল মুদির দোকান। এই সব লইয়াই কুমারিকা। ইহা শহর নয়—এখানে শহরের ঐশ্বর্য আড়ম্বর নাই। গ্রামও নয়—কিন্তু গ্রামের স্নিগ্ধ শান্তির আবেশটুকু বাতাসের গায়ে মাখানো আছে। ঘরে বসিয়াই দেখিলাম, পশ্চিম দিগন্তে সূর্যদেব পাটে নামিলেন। রক্তজবা আর রক্তচন্দনের শেষ অঞ্জলি নিবেদন করিয়া ধীরে ধীরে সাগরের কোলের মধ্যে আশ্রয় লইলেন তিনি।

একটি দিন কাটিয়া গেল। এক অনাস্বাদিত আবেগ, অপূর্ব এক মোহ আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। কত দেশেই ত গিয়াছি। ভারতের পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ কিছুই ত প্রায় বাদ দেই নাই। রাজপুতানার মরুভূমিতে রুদ্রদেবের দীপ্তদাহকে আলিঙ্গন করিয়াছি—লাল পাহাড়ে ঘেরা বিকানীর, যোধপুরের সৌন্দর্য ভাল লাগিয়াছে। চিতোরের দুর্গের মধ্যে সমস্ত ভারতের অতীত গৌরবের কাছে আপনা হইতেই মাথা নত হইয়া আসিয়াছে। দেখিয়াছি পূর্বভারতের শৈলশহরের সৌন্দর্যকে। হিমালয়ের উত্তুঙ্গ শৈলশৃঙ্গের কোলে বদ্রীনাথের পাদস্পর্শ করিয়াও ধন্য হইয়াছি। হিমালয়ের ঐ ভীমকান্ত গম্ভীর রূপ, অলকনন্দা ভাগীরথীর অনন্ত হিমবাহ সঙ্গমের সঙ্গীত মাধুর্য দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছি। বারে বারে সে বিস্ময় আমায় নূতন করিয়া সজাগ করিয়া দিয়াছে।

হিমালয় আজও আমায় টানে। তাহার শৈলশৃঙ্গ হাতছানি দিয়া আমাকে ডাকে। কিন্তু কুমারিকার মহিমা অতুলনীয়। সে আমার মনে বিস্ময় জাগায় না—আমার দেহমনের সমস্ত শক্তিকে স্তিমিত করিয়া দেয়। আমি আচ্ছন্ন হইয়া পড়ি। তাহার কোল ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছি বহুদিন। জীবনে বিপর্যয় আসিয়াছে অনেক—কিন্তু কুমারিকার সেই দিনের ঐ পবিত্রস্মৃতি এতটুকুও ত ম্লান হইল না। একটি পাপড়িও ত সেখান হইতে ঝরিয়া গেল না। মহাম্বুধির সেই অপরূপ রূপ আজও আমি দেখিতে পাই। জলতরঙ্গের সেই নূপুরনিক্কণ আজও কানের কাছে আমার বাজিতে থাকে। তাহার আকাশ-বাতাসের পবিত্র স্নিগ্ধ স্পর্শ আজও আমি সর্বাঙ্গ দিয়া অনুভব করি। ভুলিতে পারি না কুমারীকে—আর ভুলতে পারি না সেই অন্তরীপকে—যে যুগ যুগান্তরের সহস্র ঝঞ্ঝা তুফানকে সহ্য করিয়াও বুকের মাঝে সযত্নে রক্ষা করিয়া আছে তাহার কন্যাকে।

ছুটি

॥ ছুটির স্বরূপ ॥ ছুটির উদ্দেশ্য ॥ সার্থকতা ॥ ইংল্যাণ্ডের সহিত তুলনা ॥
॥ ছুটি কর্মবিরতি নয় ॥ প্রস্তুতি ॥ প্রয়োজনীয়তা ও সমাধান ॥

ছুটি কথাটি আমাদের বাঙলা ভাষার নিজস্ব সম্পদ নয়—হিন্দী ছুট্টি শব্দ হইতে সহজ করিয়া উহাকে আমরা ছুটি করিয়া লইয়াছি। ইহার অর্থ অবসর, কর্ম হইতে বিশ্রাম।

ইংরেজের ছুটি Holiday। ইংরেজী Holy day শব্দটি হইতে ইহার উৎপত্তি—অর্থাৎ পবিত্র দিন। প্রতি সপ্তাহে একটি দিন বিশ্রাম লইতে হইবে—ভগবানের আদেশ। ছয়টি দিন কাজ করার পর রবিবার বিশ্রাম—Sabath Day. কিন্তু Sabath Day-কে অতিক্রম করিয়া এই বিশ্রাম এখন ব্যাপকতা লাভ করিয়াছে অনেক—তাই Holy dayও এখন Holiday-তে রূপান্তরিত হইয়াছে। ইওরোপের সর্বত্র শীতের দীর্ঘ তিন মাসের ছুটি এখন আর শুধু খ্রীষ্টের পবিত্র জন্মদিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া নাই। 'হলিডে' তাই এখন আর শুধু পবিত্র দিন নয়, এখন সেটিও আমাদের ছুটির মতো ইওরোপবাসীর জন্য আনে বিশ্রাম ও অবসর।

মানবজীবন কর্মচঞ্চল, জীবন কর্ম-প্রবাহ। যে জলে গতি নাই, প্রবাহ নাই, তাহা বোবা, সৌন্দর্য নাই তাহাতে। প্রবাহে উত্থান আছে, আছে পতন, তাই তাহার বুকে দেখা দেয় তরঙ্গ, এই তরঙ্গ-ভঙ্গই গতির সৌন্দর্য। কর্মচঞ্চল জীবনপ্রবাহের সৌন্দর্য সম্পাদন করে এই কর্মবিরতি। একটানা কাজ আমাদের জীবনে শ্রান্তি আনে, দেয় ক্লান্তি, কর্মবিমুখিতা; তখনই নবীন উদ্দীপনা, নূতন কর্মশক্তি সঞ্চয়ের জন্য আমরা অবসরের, বিশ্রামের আকাঙ্ক্ষা করি।

প্রতিদিনের প্রভাত স্নিগ্ধ আলো দিয়া সমস্ত জগতকে নিমন্ত্রণ জানায় কাজের। ঘরে ঘরে আমরা জাগিয়া উঠি; সারাদিনের কর্মব্যস্ততা গোধূলির ম্লান আলোতে যখন নিস্তেজ হইয়া আসে, তখনই রাত্রির সুষুপ্তি জগতকে কোলে টানিয়া লয়—ধীরে ধীরে তাহার সুপ্ত বুকে জাগায় নূতনের প্রেরণা, অনাগতের জন্য নবীনা শক্তি। রাতের বুক হইতে প্রভাত জন্ম লয় নূতন রূপ লইয়া। প্রতিদিনের সকাল তাই লক্ষ কোটি বৎসরের অতি পুরাতন হইয়াও চির নবীন। রাতের এই বিরাম, এই অবসর তাই প্রতিদিনের কাজকে নূতন করিয়া রূপ দেয়। রাত্রির বিশ্রাম তাই শুধু নিদ্রা নয়—নিদ্রার ভিতর দিয়া নবীন শক্তি সঞ্চয় করাই রাত্রির সার্থকতা; দীর্ঘদিনের কাজের পর ছুটিও তাই আমাদের একান্ত

প্রয়োজন। এই ছুটি এই বিশ্রাম "শুধু দিন যাপনের গ্লানিতে" ভরা আলস্যের সঞ্চয় নয়, এই বিরতি নূতন কর্মশক্তির পুনর্জাগরণের একটি বিশেষ অবস্থা মাত্র।

কিন্তু ছুটির এই সার্থকতা আমাদের জীবনে নাই। আমরা বাঙালী স্বভাব-কর্মবিমুখ। অল্প পরিশ্রমে, এমন কি বিনা পরিশ্রমেও আমরা কাতর, ক্লান্ত হইয়া পড়ি। কাজের মধ্যে তাই ফাঁকি পড়ে, অহরহ অবসরের সুযোগই শুধু আমরা অন্বেষণ করি। এবং যখনই সেই অবসর আসে, আমরা তখনই সেই অবসরের পূর্ণ সুযোগ লইয়া একেবারে আলস্যের মাঝে নিজেদের ডুবাইয়া দিই। এই নিষ্ক্রিয়তাই আমাদের বাঙালী জীবনের বৈশিষ্ট্য। উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরিয়া বেড়ান, কিংবা তাস পাশা খেলা এবং দ্বিপ্রহরিক নিদ্রা—এই আমাদের ছুটির দিনের কাজ। কাজকে ফাঁকি দিতে গিয়া আমাদের জীবনেই ফাঁক থাকিয়া যায়—সার্থকতায় তাহা ভরিয়া উঠে না। এবং আশ্চর্য এই যে—এই আলস্যভরা কর্মহীন দিন-যাপনের কোন গ্লানিও আমাদের অন্তরকে স্পর্শ করে না।

কর্মব্যস্ত জীবন হইতে পলায়ন করা সহজ, কিন্তু তাহ'তে পালন করা হয় না জীবনধর্ম। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের হিসাব আমাদের দিতে হইবে। কাজ ছোট, কি বড়, তাহা বিচার করার ভার আমাদের উপরে নয়। ছোট বড় কোন কাজ, জীবনের কোন ধনই বৃথা নষ্ট হয় না। শুধু দেখিতে হইবে সেই কাজের মধ্যে নিষ্ঠা আছে কিনা, শ্রদ্ধা আছে কিনা। আর সেই কাজ আমাদের জীবনে কি ধন সঞ্চয় করিয়া আনিতেছে। উদ্দেশ্যহীন নিষ্ফল কাজের সার্থকতা নাই কোন জীবনেই। মানবজীবনে কর্মবিরতির ছুটি তাই লক্ষ্যহীনভাবে দিন যাপন নয়। ছুটির এই অবকাশ—কর্মের পরিবর্তন। অনেক দিনের একই রকম কাজের ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে যখন একটি দিনের জন্য কোন নূতন কাজে হাত দিই, তখন যেন আমাদের দেহমনের সমস্ত ক্লান্তি দূর হইয়া যায়। এই একটি দিনের নূতন কাজের আনন্দই আমাদের মনকে নূতন করিয়া দেয়। কাজের পরিবর্তিত রূপ এই ছুটির ভিতর দিয়াই আমাদের পাইতে হইবে। ছুটি তাই পরিপূর্ণ অবকাশ নয়।

আপনাপন রুচি অনুসারে বিভিন্ন লোক বিভিন্ন কর্মের ভিতর দিয়া ছুটির অবকাশটুকুকে সার্থকতায় ভরিয়া তুলিতে পারে। ক্লাশ করিতে করিতে স্কুলে ছুটির ঘণ্টা বাজে—আধ ঘণ্টা কি এমনি একটু স্বল্প সময়ের জন্য কাজের বিরামের ইঙ্গিত। অমনি ছেলেমেয়ে ছুটিয়া বাহিরে আসে মাঠে। হা ডু-ডু, দৌড়-ঝাঁপ কত রকমের খেলা আরম্ভ হয়। এই খেলা নেহাত অকাজের কাজ নয়। খেলাধুলার ভিতর দিয়া শরীরের শক্তিকে একটু ঝালাইয়া তুলিয়া পরবর্তী সময়টুকুর মতো

শিক্ষা গ্রহণের জন্য মনটাকে উপযুক্ত করিয়া তুলিবার প্রস্তুতি-সময়ই এই ছুটি। আবার খেলায় যোগ দিল না যে ছেলে যে মেয়ে - যে আপন মনে নিরালায় চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, কেমন করিয়া বলিব যে বৃথাই সে তাহার সময় নষ্ট করিল। মন যদি তার বিশ্লেষণ করা যায়, হয়ত দেখা যাইবে কোন বিশেষ ধ্যান, কোন বিশেষ ধারণায় চিত্ত তাহার মগ্ন হইয়া ছিল। বৃহত্তর জীবনসাধনায় এই সময়টুকুই তাহার জীবনে গোপনে এক অবদান রাখিয়া যায়।

মাছ-ধরা বাঙালী জীবনের একটি বিশেষ সখ। শহরের লোকেরা কর্মবিরতির অবকাশে শহর হইতে বহু দূরে মাছ ধরার জন্য বাহিরে যায়। আপাতদৃষ্টিতে ইহার মধ্যে জীবনের কোন সার্থকতা দেখিতে পাওয়া না গেলেও ইহাকে একেবারেই উদ্দেশ্যহীন বলা বোধ হয় সঙ্গত হইবে না। ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজনীয়তার কথা ছাড়িয়া দিলেও এই মাছ-ধরা কাজের মধ্যে আমাদের যে ধৈর্য, যে নিষ্ঠা ও চিত্তের একাগ্রতার প্রয়োজন হয়, জীবনের বহু অমূল্য সঞ্চয়ের মধ্যে তাহারও মূল্য নিতান্ত কম নয়। বাগান-করা নেশা যাহাদের আছে—ছুটির দিনগুলি তাহাদেরও কাটে বড় সুন্দরভাবে। শাকসবজি দিয়াই হোক, আর ফুল দিয়াই হোক, বিশ্বের সৌন্দর্য সম্ভারকে আপন রুচি দিয়া যে আর একটু সুন্দর করিয়া দিতে পারে তাহার জীবন, তাহার জীবনের সেই দিনটি সার্থক।

লণ্ডনের ইস্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা নির্দিষ্ট সময়ের ছুটির এই অবকাশের অপেক্ষা রাখে না। বাদলা হাওয়ার দেশ ইংল্যাণ্ড। আকাশ তাহার নিত্য মেঘমেদুর—তাহার উপরে কলের ধোঁয়া। সেই দেশের আকাশ তাই—"ছিঁচ্‌ কাঁদুনে ছেলের মতো যখন তখন চোখের জল ঝরাচ্ছে।" ইহার মধ্যে যেদিন "আকাশের উঠোন নিকিয়ে নির্মল রূপালি সূর্য উঠে নগরীকে অভ্যর্থনা জানায়," অমনি ছাত্র-ছাত্রীর দল ক্লাশ ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়ে প্রকৃতির কোলে। শিক্ষক, অধ্যাপকেরাও পিছনে পড়িয়া থাকেন না। প্রকৃতির এই মধুর রূপকে উপভোগ করাই তাহাদের শিক্ষার একটি বিশেষ অঙ্গ।

দীর্ঘ দিনের ছুটির অবকাশে তল্পিতল্পা লইয়া আমরা কর্মস্থল হইতে বাহির হইয়া পড়ি প্রবাসে। সেখানে থাকে না আফিস আদালতের কাজের তাগিদ; বড় সাহেব, বড় বাবুর রক্ত চক্ষুর শাসন সেখানে সৃষ্টি করে না কোন আতঙ্কের। পরিবেশ সেখানে নূতন, জীবনের চলার গতি সেখানে মন্থর, তাই কর্মমুক্তির আরামে গা ভাসাইয়া দিয়া ছুটির দিনের আনন্দ আমরা উপভোগ করিতে থাকি। কিন্তু এ আনন্দ জীবনের ভোগে লাগে না। পৃথিবীর যেখানে গেলাম, তার মধুর কি রুদ্র রূপকে যদি চোখ মেলিয়া না দেখিলাম, মন দিয়া না পাইলাম, প্রকৃতির

সেই রূপ যদি আমার জীবন চৈতন্যকে জাগ্রত না করিয়া তুলিল, তবে কোথায় আমার সেই ভ্রমণের সার্থকতা—ব্যর্থ হইয়া গেল আমার ছুটির সব দিনগুলি—জীবনের সঞ্চয়ন-মালায় গাঁথা পড়িল না আরও কয়েকটি ফুল।

ছুটি তাই শুধু কর্মবিরতি নয়—কর্মজীবন ও নূতন কর্মজীবনের জন্য প্রস্তুতি। দেহকে সঞ্জীবিত করা, মনকে উদ্দীপনা ও উৎসাহে ভরিয়া তুলিয়া কর্মের অভিমুখে প্রধাবিত করিয়া দিবার জন্যই এই ছুটি। যদিও এই ছুটির দিনে আমরা কেয়া পাতার নৌকা গড়িয়া তাল দিঘিতে ভাসাইয়া দিয়া তাহার ঢেউএর দোলা বসিয়া বসিয়া দেখি, কিংবা রাখাল ছেলের সঙ্গে বেণু বাজাইয়া বাজাইয়া ঘুরিয়া বেড়াই, তবুও এই কেয়া পাতার নৌকার দোলা ও বেণুর স্বরই যখন 'আকাশ ভেঙে বাহিরটা' লুট করিয়া আনিবে, তখনই হইবে ছুটির পরিপূর্ণ সার্থকতা।

সামাজিক মানুষ আমরা। শিক্ষার অন্বেষণে আর জীবিকা অর্জনের তাগিদে দিন আমাদের কাটে। মন আমাদের তাই সংসারের জটিল চক্রপথ হইতে মুক্তির পথ পায় না। কিন্তু জগৎ ও জীবনের জিজ্ঞাসা জাগে যখন আমাদের প্রাণে, তখনই মন একটু নিরালায় অবসর লইতে চায়। কর্মবিরতির ছুটি এই নিরালায় অবসর আনিয়া দেয় মানুষের জীবনে। কর্মজীবনের মাঝেই এই ছুটি যখন অধ্যাত্ম জীবনের পথের সহায়ক হয়, তখনই আমাদের মন সংসারের ঝড় ঝঞ্ঝার ঊর্ধ্বে তাহার পাখা মেলিয়া উড়িবার সুযোগ পায়, কর্মের বন্ধনের মধ্যেও মুক্তির স্বাদ আসে; এই আস্বাদই আম'দের ছুটি।

একটি হকারের রোজনামচা

'সাবান তরল আলতা চাই, মাথার কাঁটা কিলিপ চাই'—দিনের দশটা ঘণ্টা শুধু এই এক আপ্তবাক্য উচ্চারণ করেই দিন কাটে। কোথায় ঈশ্বরের নাম করলে পরকালের কাজ হবে—বা একালেরও হয়তো কোন আত্মিক মুক্তি ঘটবে, এমন একটা নাম করেও ত চেঁচাতে পারি! তা নয়, আমাকে পারত্রিক কল্যাণের চেয়ে আরও বেশী জরুরী হিতধর্মে নিজেকে নিযুক্ত করতে হয়েছে। অর্থাৎ আমার নিজের এবং আমার উপর নির্ভরশীল পরিজনবর্গের পেট চালাবার জন্যে আমাকে হকারি করতে হচ্ছে।

হকার জীবনের কোন বৈচিত্র্য নেই বটে, কিন্তু তবু এক-একটা দিনে কেমন যেন সাবান তরল আলতা, মাথার কিলিপ কাঁটা প্রভৃতি বিক্রি করার মধ্যেও একটু বৈচিত্র্যের ছিটেফোঁটা যে দেখা না যায় এমন নয়।

গত মাসের দশ তারিখের দিনটার কথাই বলি। সকালে হাতমুখ ধুয়ে চা পাউরুটি খেয়ে নিলাম এক প্রস্থ। আজ ঘরভাড়ার দশ টাকা সংগ্রহ করে আনতে হবে। ছুটির দিন, তার উপর মাসের শেষের দিক। দুটো ব্যাপারই আমার পক্ষে শুভ বা সুবিধাজনক নয়। ছুটির দিনে কর্তাবাবুরা বাড়ি থাকেন—ফেরিওয়ালার ডাকাডাকি তাদের পছন্দ হয় না, আর মাসের শেষের দিকে প্রায় মানুষের ভাত-ডালের সমস্যাই সমাধান করা দুষ্কর হয়, তখন আর প্রসাধনের সামগ্রী কিনছে কে ?

তবু বের হলাম একটু সকাল সকাল। অন্যদিন এক মুঠো ফ্যানে ভাতে খেয়ে বের হই, আজ এমনিই দুটো বড় বড় মোট—বেসাতির পসরা নিয়ে পথে নামলাম—'সাবান তরল আলতা চ'ই, মাথার কাঁটা কিলিপ চাই।'

বেলা দশটা পর্যন্ত কিছু হলো না। শহরের উপকণ্ঠ অঞ্চলেই ঘুরতে হয়। কেউ ডাকে, কেউ ডাকে না। কেউ ডাকে জিনিসপত্র দেখার জন্যে, কেউ ডাকে বাজার-দর জানার বা যাচাই করার জন্যে। কেউ কেনে। কেউ উপদেশ দেয়, কেউ আমাদের—হকারদের জোচ্চর ভাবে, কেউ বা আবার কখনো কখনো সহানুভূতির দৃষ্টি নিয়ে বিচার করে। কিন্তু আমরাও ত জনসমাজের ঈষৎ সেবা কার। বাড়িতে বসে আছেন, আমরা প্রয়োজনীয় জিনিসটি বাজারের দরে বাড়ি বয়ে দিয়ে আসছি দরকারমত।

দশটার পর একটা বাড়িতে একটি বৃদ্ধা প্রায় এক হাত ঘোমটা টেনে আমাকে ডাকলেন—সাবান'ওলা, তোমার কাছে ভালো এক শিশি তরল আলতা, আর এক কৌটো স্নো হবে ?

আমি মোট নামিয়ে দরজার কাছে বসলাম। মোট খুলে জিনিস দেখালাম। দাম দুটো জিনিসের দেড়টাকা হবে। বললাম।

দেড়টাকা ? বড্ড বেশী বলছো! আমরা কালীঘাটে গিয়ে ত এই সব জিনিস খুব কমেই কিনে আনি।

দাম ঠিক হলো না দেখে উঠ্‌ছি এমন সময় ভেতর থেকে একটি ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে আমাকে ধমক দিলেন—পাজি, বদমায়েশ, জোচ্চুরির আর জায়গা পাও নি। তিন আনার জিনিসের দাম তুমি তেরো আনা চাইছো!

আমি কোন কথা বললাম না। নীরবে নিজের মালপত্র গুছোতে লাগলাম। লোকটি শুধু আমার দিকে চেয়ে রইলো। আমি বাইরে এলে সে বললে—ভাইরে, তোমাকে যে তিরস্কার করলাম—এর জন্য কিছু মনে করো না। উনি আমার মা; মাথা পাগল। আমার বোনকে এক বছর পুজোর সময় উনি একশিশি

আলতা আর স্নো দেবার কথা বিস্মৃত হয়েছিলেন—বোন ছিল তার শ্বশুর বাড়িতে, পাঠাতে পারেন নি। তারপর সেই বছরই বোনটি আমার মারা যায়। সেই থেকে মার মাথাটা একটু—

আমি হকচকিয়ে গেলাম। কেমন ধারা বিহ্বল, বেদনার্ত বোধ করলাম। লোকটি বলতে লাগলো—যখনই কোনও ফেরিওয়ালা আসে, মা ওই দুটো জিনিস চান, কালীঘাট থেকে কিনে আনার কথা বলেন। কিনলে আর উপায় থাকে না। ওই দুটো জিনিস দেখলে শোকের বাঁধ ভেঙে যায়, কোথা থেকে যে পুরানো স্মৃতির দরজা খুলে যায়—তাই আমাদের কাজ হলো, ফেরিওয়ালা দেখলেই আমরা নিন্দা মন্দ করে তাড়িয়ে দিই যাতে আর উনি কিছু কিনতে না পারেন। তা ভাই, আমার গোটা দুয়েক সাবানের দরকার, তুমি দাও আমাকে।

বোধ হয় আমাকে খুশী করার জন্যেই লোকটি সাবান কিনলে এক টাকার। আমি নির্বাক হয়েই বিদায় নিলাম। আবার পথে, আবার আমার কণ্ঠে সেই নাম জপ—'সাবান তরল আলতা চাই, মাথার কাঁটা কিলিপ চাই'।

হাঁটতে হাঁটতে কোলকাতার সীমান্ত ছাড়িয়ে প্রায় মাইল ছয়েক পুবে চলে গেছিলাম সেদিন। এক বাড়িতে এক গন্ধতেল আর এক শিশি আলতা বিক্রি করলাম। সে কথা আজও মনে আছে। খুব বেশী দামের তেল কিনবেন বললেন খরিদ্দার। একজন পুরুষ মানুষই দরদাম করলেন। আমি মাঝারি দামের একটি গন্ধ নারিকেল তেল দেখালাম—দাম দুটাকা শিশি বললাম। তিনি হেসে বললেন—এর দাম কোলকাতায় বড়জোর দশ আনা হবে, আমার আত্মীয়ের তেলের কারবার আছে আর আমি জানি না।

সেকথা ঠিক। এর চেয়ে খুব খারাপ তেল বের করে আমি বললাম—আপনার ত জানা আছে—এর দাম কত বলুন ত? তিনি কিছু বললেন না, আমি নীরব থাকলাম। কিন্তু ভেতর থেকে তেল কেনার হুকুম এল। আমি বললাম, ওটি থেকে আমি আর আট আনা কম করছি—নেন। আর এটি অর্ডারী মাল, দিতে পারবো না। তা ছাড়া, আপনি অন্তত আন্দাজ করতে পারবেন এর দাম কত। তেল বাবু, অনেক রকম আছে। তা কি করবেন?

এটার দাম কত বলো? হোক অর্ডারী, তুমি আর একটা এনে তাকে দিয়ো—যার অর্ডার।

এর দাম পড়বে তিন টাকা তিন আনা।

সে কি?

আপনি ত তেল চেনেন বাবু! আচ্ছা এটা ছেড়ে দিন, আগের তেলটি এক টাকা দিয়েই নেন বাবু, ও আমার কেনা দাম।

পুরো তিন টাকাই নাও, তিন আনা ছেড়ে দাও।

পারবো না দাদা। তিন টাকা দিয়ে তেল কিনতে পারেন আর ঘাড়ে করে ঘুরছে যে, যে অন্যের অর্ডারী জিনিস দিয়ে যাচ্ছে আপনাকে, তাকে তিন আনা দান করতে পারেন না?

শেষ পর্যন্ত মোট আট টাকার সওদা গছিয়ে চলে এলাম। এই রকম করে একঘেয়ে জীবনেও এক আধটা দিন একটু বর্ণরঙিন হয়ে ওঠে। কোথাও বেদনার স্মৃতি, কোথাও প্রতারণার জ্বালা, কোথাও বা বিস্ময়ের বিমূঢ় ভাব। পথে পথে শুধু আমরা হেঁকে চলি 'সাবান তরল আলতা চাই, মাথার কাঁটা কিলিপ চাই!' এই সুরের মধ্যে দিয়ে কি আমাদের মনকেও ছড়িয়ে দিই না?

॥ ১ ॥

বাঙলা সাহিত্য

[সাধারণ আলোচনা]

লোকসাহিত্য

॥ সাহিত্য ও লোকসাহিত্যের পার্থক্য ॥ লোকসাহিত্যের উৎস ॥
॥ দৃষ্টান্ত—লোকসাহিত্য ও গল্প ॥ সৌন্দর্য ও মানবীয়তা ॥ লোকসাহিত্য
সম্পর্কে আধুনিক আগ্রহ ॥

সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের কথাগুলি যখন কোনও সংবেদনশীল মানুষ সকলের জন্য উপস্থিত করেন এবং সুদীর্ঘকালের আস্বাদনের বস্তুরূপে রূপান্তরিত করেন—তখনই তাহা আর সাধারণের থাকে না, চিরকালের ও সর্বজনের আস্বাদনের বস্তুতে পরিণত হয়, ইহার নামই সাহিত্য। কিন্তু সাধারণ মানুষ, গ্রাম্য মানুষ, অশিক্ষিত মানুষ যখন তাহার কথা, তাহার সম্প্রদায়ের কথা সহজ ভাবে ব্যক্ত করিয়া বসে অথচ তাহাতে উন্নত সাহিত্য সুরভির সঞ্চার হয় না তখন তাহা হয় লৌকিক সাহিত্য। সাহিত্য বিচারের মাপকাঠির মারফত এ সাহিত্যের মূল্যায়ন হয় না, মনের অনুরাগের দ্বারা ইহার বিচার করিতে হয়। শিক্ষিত মনের খোরাক জোগাইবার জন্য এ সাহিত্যের জন্ম নয়, নিজের মনের কাব্যরস ও আনন্দবেদনার প্রকাশনার জন্যই স্রষ্টা সরল মনে এই সাহিত্যের সৃষ্টি করেন। যেমন ছেলে ভুলানো ছড়া। কে বা কাহারা কবে যে এই সব ছড়ার সৃষ্টি করিয়াছিলেন—তাহা আজ হাজার গবেষণা করিয়াও আবিষ্কার করা যাইবে না, কিন্তু ওই সহজ ছড়াগুলির মধ্যে স্রষ্টা তাঁহার মনের সংবেদনশীলতাকে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন—তাহাতেই এইগুলি আজও টিকিয়া আছে। রাজদরবারি সাহিত্যের উপমা অলঙ্কার ইহার নাই, ভাষার লালিত্য বা রূপকল্পের অপূর্বতাও ইহার নাই—উন্নত ছন্দের কারিকুরিও ইহাতে নাই। যাহা আছে, তাহা সুদূর অতীত এক কালের ছেঁড়া কাটা জীর্ণ পাতার মতো। লোকজীবনের সুদূর বিস্মৃত এক স্মৃতিকে অতি সহজভাবেই ইহা বহন করিতেছে। এই সহজতা ও সারল্যই লোকসাহিত্যের স্বরূপ।

অশিক্ষিত মানুষেরও মনের একটা ভিতর মহল আছে—লৌকিক সাহিত্যের মূল জন্মভূমি সেই জায়গাটা বলিয়াই মনে হয়। ছোট ছোট শিশুর মনে কল্পনার রোশনাই জ্বালাইয়া রাঙাইয়া দিবার জন্য মা দিদিমারা কত রকমের গল্প বলিতেন, ছড়া কাটিতেন, কখনও তাহাতে বাঙালী জীবনের ছায়া বা অনুভূতি রূপ লাভ করিত, কখনও বা অতীন্দ্রিয় এক সাহিত্যিক মাহাত্ম্যে তা ঝলমল করিয়া উঠিত। কখনও তাহাতে সুর দিয়া ছন্দে গাঁথিয়া গান করা হইত বা আবৃত্তি করা হইত। বাঙালীর শিক্ষিত অশিক্ষিত, বুদ্ধিমান নির্বোধ—সমস্ত স্তরের সমগ্র

লোকমণ্ডলীর হৃদয়ের উপরেই এই সাহিত্যের প্রভাব—তাই এই সাহিত্যকেই লোকসাহিত্য বলা হয়।

ছোটদের জন্য রচিত ছড়া, মেয়েলী বারব্রতের গল্প, ধর্মমূলক কাহিনী, পল্লীগ্রামের সংস্কার লইয়া উদ্ভট কথা বা প্রবচন জাতীয় ছন্দোবদ্ধ রচনা প্রভৃতিকেই লোকসাহিত্য বলিতে পারা যায়। রূপকথা বা উপকথা জাতীয় রচনাও লোক-সাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে। লোকে সাধারণ কথাকে যখন সাধারণের বাহিরে কোনও রসলোকের সম্পদ করিয়া তোলে তখনই তা লোকসাহিত্য। দৈনন্দিন জীবনের ছোট কথাকে যখন অনির্বচনীয় এক রসের মাধুর্যে অপূর্ব করিয়া তোলা হয়—তখনই তাহা লোকসাহিত্য। তবে এ জাতীয় টুকরা কথা যেমন সৃষ্টি হইতেছে তেমনি হারাইয়াও যাইতেছে—তাই লোকসাহিত্য নিত্য নির্মীয়মাণ হইয়াও ইহার পরিসর ব্যাপকতর হইতে পারিতেছে না। ফলে যেগুলি বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে—সেগুলিই লোকসাহিত্যের বিচার ও বিশ্লেষণের উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছে।

লোকসাহিত্য কোনও অলঙ্কার, শাস্ত্রসম্মত সাহিত্যরসের ধার ধারে না। ছেলে ভুলানো ছড়ার কথাই ধরা যাউক। কোন্ রসের বিচারে যে সেগুলিকে উদাহরণ হিসাবে খাটানো যাইবে—তাহার সঠিক খবর কেহ দিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথ ছেলে ভুলানো ছড়া সম্পর্কে তাঁহার লোকসাহিত্য গ্রন্থে বলিয়াছেন—"সদ্যঃকর্ষণে মাটি হইতে যে সৌরভটি বাহির হয়, অথবা শিশুর নবনীতকোমল দেহের যে স্নেহোদ্বেলকর গন্ধ, তাহাকে পুষ্প চন্দন গোলাপ-জল আতর বা ধূপের সুগন্ধের সহিত এক শ্রেণীভুক্ত করা যায় না। সমস্ত সুগন্ধের অপেক্ষা তাহার মধ্যে এমন একটি অপূর্ব আদিমতা আছে; ছেলে ভুলানো ছড়ার মধ্যে তেমনি একটি আদিম সৌকুমার্য আছে; সেই মাধুর্যটিকে বাল্যরস নাম দেওয়া যাইতে পারে। তাহা তীব্র নহে, গাঢ় নহে, তাহা অত্যন্ত স্নিগ্ধ সরস এবং যুক্তিসংগতিহীন।" অতি পরিচিত একটি ছড়া এই সূত্রে স্মরণ করা যাইতে পারে—

খোকা যাবে নায়ে লাল জুতুয়া পায়ে।
পাঁচশো টাকার মলমলি থান
সোনার চাদর গায়ে॥
তোমরা কে বলিবে কালো।
পাটনা থেকে হলুদ এনে গা করে দিব আলো॥

কিংবা,
যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে।
যমনা যাবেন শ্বশুরবাড়ি কাজিতলা দিয়ে॥

কাজি-ফুল কুড়তে কুড়তে পেয়ে গেলুম মালা।
হাত-ঝুম ঝুম পা-ঝুম ঝুম সীতারামের খেলা॥
নাচো তো সীতারাম কাঁকাল বেঁকিয়ে।
আলোচাল খেতে দেব টাপাল ভরিয়ে॥
আলোচাল খেতে খেতে গলা হল কাঠ।
হেথায় তো জল নেই ত্রিপূর্ণির ঘাট॥

এই ছড়ার আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উক্তি সতত স্মরণীয়। তিনি বলিয়াছেন—ইহার মধ্যে ভাবের পরস্পর সম্বন্ধ নাই ঠিকই। যেন কবিত্বের সিংহদ্বারে নিস্তব্ধ শারদ মধ্যাহ্নের মধুর উত্তাপে দারোয়ান বেটা দিব্যি পা ছড়াইয়া দিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কথাগুলো ভাবগুলো কোনও প্রকার পরিচয়-প্রদানের অপেক্ষা না রাখিয়া, কোনও রকম উপলক্ষ খোঁজ না করিয়া অনায়াসে তাহার পা ডিঙাইয়া এমন কি মাঝে মাঝে লঘুকরস্পর্শে তাহার কান মলিয়া দিয়া, কল্পনার অভ্রভেদী মায়াপ্রাসাদে ইচ্ছাসুখে আনা গোনা করিতেছে; দারোয়ানটা যদি ঢুলিতে ঢুলিতে হঠাৎ একবার চমক খাইয়া জাগিয়া উঠিত—তবে সেই মুহূর্তেই তাহারা কে কোথায় দৌড় দিত তার আর ঠিকানা পাওয়া যাইত না।

লোকসাহিত্যের যথার্থ সাহিত্যিক তাৎপর্য যদি কোথাও থাকে, তবে ছেলে ভুলানো ছড়ার চেয়েও তা রূপকথা এবং মেয়েলী বারব্রতের গল্পকথার মধ্যে বিশেষ-ভাবে ধরা পড়ে। শঙ্খমালা, কাঞ্চনমালা, দুধকুমার, বন্দিনী রাজকুমারী, সাতসমুদ্র তেরনদী পার হইয়া তেপান্তরের মাঠ, ব্যাঙমা ব্যাঙমীর গল্প, সোনার কাঠির স্পর্শ, রাক্ষসীর ছদ্মবেশ—এ সবের মধ্যে স্রষ্টা হয়তো অজ্ঞাতসারেই জীবনের বৃহত্তর সত্যকে রূপকের আড়ালে প্রকাশ করিয়াছেন। এসব লোক-সাহিত্যের রচয়িতার নাম আমরা জানি না, কিন্তু তবু আমাদের জীবনের ঘরোয়া কথাকে গল্পের যাদুতে কি সুন্দর রূপদান করা হইয়াছে!

মেয়েদের ব্রতকথার মধ্যেও একটি গল্প তথা সাহিত্যের একটি পরিচ্ছন্ন আবেদন থাকে। কাব্য করিয়া বলা একটা কাহিনী—এবং সেই কাহিনীর মধ্যে উত্থান-পতন, ক্লাইম্যাক্স-য়্যান্টিক্লাইম্যাক্স, সবই উপস্থিত থাকে। এই ব্রতকথার মধ্য দিয়া নারীজীবনের, বাঙালী মেয়েজীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং সংসার-জীবনের বহুবিধ সাধ-আহ্লাদের রূপায়ণ থাকে। সাবিত্রী ব্রত, পুণ্যিপুকুর ব্রত, যমপুকুর ব্রত প্রভৃতি ব্রতকথা এবং অগ্রহায়ণ মাসে সূর্যপূজার কাহিনী, বারের পূজার গল্প প্রভৃতির মধ্যেও উন্নত জাতের সাহিত্য দেখিতে পাওয়া যায়।

ব্রতকথার গল্পাংশ বা বারব্রতের কাহিনীই একটু বেশী বিখ্যাত হইয়া ধর্ম-সাহিত্য নাম ধারণ করিয়াছে। শনিপূজার কাহিনী ছড়ায় গাঁথা হইয়া নাম লইয়াছে শনির পাঁচালি। সত্যনারায়ণের কথার ক্ষেত্রেও তাই। এই রকম সাহিত্য হইতেছে মনসার পাঁচালি, মঙ্গল চণ্ডীর পাঁচালি ;—এই গল্প-কাব্যগুলিই ধর্মমঙ্গল, মনসামঙ্গল, শিবায়ন প্রভৃতি মঙ্গল কাব্য নাম লইয়া বিখ্যাত হইয়াছে। ধর্ম-সাহিত্যের মধ্যে বৃহদাকার এই কাহিনীগুলি ছাড়া আরও ছোটখাটো কত শত যে গল্প প্রচলিত আছে তাহার সীমা সংখ্যা নির্ণয় করা রীতিমত কষ্টকর ব্যাপার। শ্যামাসঙ্গীত, উমাসঙ্গীত, রামপ্রসাদী গান, দেহতত্ত্বের গান, ভজন গান, মানিক-চাঁদের গান, ঘেঁটুর গান, সারি গান, জারি গান, তরজা গান, কবির গান—প্রভৃতি লোকসাহিত্য একেবারে অবহেলার বস্তু নয়।

লোকসাহিত্যের ক্ষেত্র বিরাট এবং ইহার বিষয়বস্তু জীবনের সমস্ত উপলব্ধি এবং অনুভূতিকে কেন্দ্র করিয়াই বিধৃত আছে। প্রায় প্রত্যেকটি ছড়া বা কাহিনীর মধ্যে যে সব ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে—সেই সব ছবিতে বাঙলা দেশের মূর্তি, বাঙালী জীবনের একটা সঙ্গীত ফুটিয়া উঠিয়াছে।

'ছেলেভুলানো ছড়া' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই ছড়াগুলির বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"এ ছড়াগুলিকে একটি আস্ত জগতের ভাঙা টুকরা বলিয়া বোধ হয়। উহাদের মধ্যে বিচিত্র বিস্মৃত সুখ-দুঃখ শতধা বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। যেমন পুরাতন পৃথিবীর প্রাচীন সমুদ্রতীরে কর্দমতটের উপর বিলুপ্তবংশ সেকালের পাখিদের পদচিহ্ন পড়িয়া ছিল—অবশেষে কালক্রমে কঠিনচাপে সেই কর্দম, পদচিহ্নরেখা-সমেত, পাথর হইয়া গিয়াছে—সে চিহ্ন আপনি পড়িয়াছিল এবং আপনি রহিয়া গিয়াছে—কেহ খোন্তা দিয়া খুদিয়া রাখে নাই, কেহ বিশেষ যত্নে তুলিয়া রাখে নাই—তেমনি এই ছড়াগুলির মধ্যে অনেকদিনের অনেক হাসিকান্না আপনি অঙ্কিত হইয়াছে, ভাঙা চোরা ছন্দগুলির মধ্যে অনেক হৃদয়বেদনা সহজেই সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। কতকালের এক-টুকরা মানুষের মন কালসমুদ্রে ভাসিতে ভাসিতে এই বহুদূরবর্তী বর্তমানের তীরে আসিয়া উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে; আমাদের মনের কাছে সংলগ্ন হইবামাত্র তাহার সমস্ত বিস্মৃত বেদনা জীবনের উত্তাপে লালিত হইয়া আবার অশ্রুরসে সজীব হইয়া উঠিতেছে।

ওপারেতে কালো রঙ,
বৃষ্টি পড়ে ঝম ঝম,
এপারেতে লঙ্কা গাছটি লাল টুক টুক করে।
গুণবতী ভাই আমার, মন কেমন করে॥

আর একটি দৃষ্টান্ত :—এ মাসটা থাক্ দিদি, কেঁদে ককিয়ে।
ও মাসেতে নিয়ে যাব পালকি সাজিয়ে॥
হাড় হল ভাজা-ভাজা, মাস হল দড়ি।
আয়রে আয় নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ি॥

এই অন্তর্ব্যথা, এই রুদ্ধ সঞ্চিত অশ্রুজলোচ্ছ্বাস কোন্ কালে কোন্ গোপন গৃহকোণ হইতে, কোন্ অজ্ঞাত অখ্যাত বিস্মৃত নববধূর কোমল হৃদয়খানি বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইয়াছিল! এমন কত অসহ্য কষ্ট জগতে কোন চিহ্ন না রাখিয়া অদৃশ্য দীর্ঘ নিশ্বাসের মতো বায়ুস্রোতে বিলীন হইয়াছে!"

এই জন্যই বলা বোধ হয় অসমীচীন নয় যে, বাঙলার লোকসাহিত্য বাঙালীর হৃদয় হইতে উৎসারিত হইয়াছে। কিন্তু শ্রোতাকে আনন্দ দান হইতে লোক-সাহিত্য কখনও বিরূপতা করে নাই। লোকসাহিত্যের মধ্যে কল্পনার সামঞ্জস্য থাক বা না থাক—একটা আনন্দের সুর দেখিতে পাওয়া যায়। তাই লোক-সাহিত্যের জনপ্রিয়তা এত বেশী। বাঙলা দেশের পরিবেশ ও পটভূমি মিলাইয়া যদি পড়া যায় তাহা হইলে লোকসাহিত্যের অনবদ্যতা এবং আনন্দ দানের সহজ ক্ষমতাটুকু সহজেই উপলব্ধি করা যাইবে।

লোকসাহিত্য সম্পর্কে বর্তমান বাঙালী মনীষীদের কিছু কৌতূহলের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথমে রেভারেণ্ড লালবিহারী দে বাঙলার লোকসাহিত্যের কিছু কাহিনী সংগ্রহ করিয়া ইংরেজীতে প্রকাশ করেন। তারপর রবীন্দ্রনাথ কিছু ছড়া সংগ্রহ করেন, এই ছড়ার সংগ্রহকালে তিনি ছড়ার উপর যে আলোচনা করেন—তাহাতে বাঙলার রসিক সমাজে ছড়াগুলি সম্পর্কে একটা নূতন ঔৎসুক্য জাগিয়া উঠে। তারপর স্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেন এবং দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার মহাশয়ও লোকসাহিত্য সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করেন—স্বর্গীয় দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার লোকসাহিত্যের শিশুমানসের আনন্দকর কাহিনীগুলির প্রতিই বিশেষ মনোযোগ দিয়াছিলেন। শ্রদ্ধাস্পদ ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ই লোকসাহিত্য সম্পর্কে বর্তমানে এক বিরাট গ্রন্থ রচনা করিয়া লোকসাহিত্যের সংশ্লেষণ এবং বিশ্লেষণ সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে কৌতূহলী করিয়া তুলিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

বাঙলা মহাকাব্য

॥ মহাকাব্যের স্বরূপ ॥ পাশ্চাত্য, সংস্কৃত ও বাঙলা মহাকাব্য ॥ মহাকাব্যের দুই জাতি ॥ প্রথম বাঙলা মহাকাব্য ॥ মধুসূদন—হেম—নবীন ॥

প্রাচীন সাহিত্যের বিচারকদের কাছে কাব্যের দুইটি ভাগ স্বীকৃত হইয়াছে—গীতিকাব্য আর মহাকাব্য। বর্তমান কালে ঠিক এই সময় অর্থাৎ বিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে মহাকাব্য রচনার রেওয়াজ নাই। তবু এককালে বাঙলা কাব্য সৃষ্টির ইতিহাসে একাধিক মৌলিক মহাকাব্য রচিত হইয়াছিল একথা অস্বীকার করা চলে না। অবশ্য সেই মহাকাব্যের মূলে যে বিদেশী প্রেরণা ছিল না একেবারেই—এ রকম কথা বলা আবার ঠিক হইবে না।

মহাকাব্য সাহিত্য প্রকরণের একটি বিশেষ সৃষ্টি। প্রাচীন সাহিত্যের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, প্রায় সকল দেশেই এই মহাকাব্য রচিত হইত। সুতরাং মহাকাব্য সম্পর্কে সকল দেশেই মোটামুটি একটা সংজ্ঞা বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে।

সংস্কৃত সাহিত্যে বা বাঙলা ভাষায় যাহাকে আমরা মহাকাব্য বলি, পাশ্চাত্য দেশে সাহিত্যের সমালোচকরা এই জিনিসকেই এপিক (Epic) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সংজ্ঞা মিলাইয়া দেখিলে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে পার্থক্য দেখা যাইবে, তবে স্বরূপ লক্ষণের বিচারে মহাকাব্য এবং এপিক যে এক জাতের—তাহা আর বিশ্লেষণ করিয়া বলার দরকার করে না।

সংস্কৃত 'সাহিত্য দর্পণ' গ্রন্থে বিশ্বনাথ মহাকাব্যের যে সংজ্ঞা দিয়াছেন—তাহাতে আমরা দেখি যে, মহাকাব্য কোনও একটা বড় ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া বর্ণিত হইবে। ইহার কাহিনী মূলত ইতিহাস, পুরাণ বা কোনও বিখ্যাত ঘটনাশ্রয়ী হইবে। নায়ক হইবে ধীরোদাত্ত গুণযুক্ত, সদ্বংশজাত, বিনয়ী, নম্র, সত্যবাদী এবং সর্বগুণ-সমন্বিত। তাহা ছাড়া মহাকাব্যকে হইতে হইবে শৃঙ্গার, বীর অথবা শান্ত রসাশ্রিত। সর্গ থাকিবে অষ্টাধিক, এবং প্রতি সর্গে নূতন ছন্দ থাকিবে। গ্রন্থের আদিতে নমস্কৃত্য, আশীর্বচন এবং বস্তুনির্দেশ থাকিবে, গ্রন্থের বর্ণিতব্য বিষয়ের পটভূমিতে নৈসর্গিক বর্ণনা, মৃগয়ার কথা, যুদ্ধবিগ্রহের বিবরণ থাকিবে আর স্বর্গ মর্ত এবং পাতালেও ইহার বিস্তৃতি থাকিবে। ইহার ভাষা গম্ভীর এবং তেজোদীপ্ত হইবে। নায়কের জয় বা আত্মপ্রতিষ্ঠার মধ্যে ইহার সমাপ্তি ঘটিবে আর কবির বা কাব্যের বা নায়কের নামানুযায়ী মহাকাব্যের নাম রাখিতে হইবে।

'পাশ্চাত্য মহাকাব্য আলোচনা করিলেও বুঝা যায় যে, ইহা সাধারণত

বস্তুনিষ্ঠ, আদি-মধ্য-অন্ত-সমন্বিত বর্ণনাত্মক কাব্য; ইহার বস্তু উপাদান জাতীয় জীবনের ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক তথ্য; ইহার অনুপ্রেরণা অধিকাংশ সময়ই ঐশী শক্তি; ইহাতে মানব, দানব ও দেবদেবীর চরিত্রের সমাবেশ ও প্রয়োজনবোধে অতি লৌকিক স্পর্শও থাকিতে পারে। মহাকাব্যের পরিসমাপ্তি সকল সময়েই শুভান্তিক হইবে এমন কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নাই। ইহাতে জটিল ঘটনাবর্তের সৃষ্টি এবং বহুবিধ চরিত্র-সন্নিবেশ থাকিলেও সমগ্র কাব্যটিতে একটি অখণ্ড শিল্পসঙ্গত সৌন্দর্য-বোধ ও মহত্ত্ব-ব্যঞ্জক গাম্ভীর্য থাকিবে।' [সাহিত্য সন্দর্শন]

মহাকাব্য দুই রকমের—Epic of Growth আর Epic of Art. প্রথম জাতের মহাকাব্যে জাতির সভ্যতা, সংস্কৃতি হইতে শুরু করিয়া চিন্তাভাবনার সর্বস্তরের পরিচয় লিপিবদ্ধ থাকে। আমাদের দেশের রামায়ণ-মহাভারত সেই জাতের মহাকাব্য। আর যুগ-মানসের পরিচয় দিয়া ব্যক্তিগত শিল্প নৈপুণ্যের কারুকার্যে যে মহাকাব্য রচিত হয়—তাহাকেই Epic of Art বলা যায়, যেমন কুমারসম্ভব কাব্য, মেঘনাদবধ কাব্য।

বাঙলা মহাকাব্য এই দ্বিতীয় জাতের, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। বিখ্যাত সমালোচক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এক জায়গায় বলিয়াছেন—'কুমারসম্ভব ও কিরাতার্জুনীয় যে অর্থে মহাকাব্য, রামায়ণ-মহাভারত কখনই সে অর্থে মহাকাব্য নহে।' Epic of Growth হইতে টুকরা অংশ লইয়া Epic of Art হইতে পারে, তাই একের নাম মহাকাব্য দিলে তদংশসম্ভূতকে কখনই মহাকাব্য বলা যায় না। কিন্তু Epic of Art-এর বাঙলা প্রতিশব্দ হিসাবে অন্য কোন শব্দের চলন না থাকায় আমরা Epic of Art-কেই মহাকাব্য বলিয়া ধরিয়া লইতে বাধ্য হইতেছি এবং বাঙলায় রচিত Epic of Art-গুলিকে বাঙলা মহাকাব্য বলিয়া অভিহিত করা হইতেছে।

বাঙলা ভাষায় মহাকবি মধুসূদন প্রথম পাশ্চাত্য আদর্শে দীক্ষিত হইয়া মহাকাব্য রচনা করেন—'মেঘনাদবধ কাব্য'। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের অনুশাসনে মেঘনাদ-বধ কাব্য মহাকাব্য নয়, কারণ অষ্টাধিক সর্গ ইহাতে থাকিলেও প্রতি সর্গে ছন্দের বৈচিত্র্য নাই, নায়ক রাবণকেও ধীরোদাত্ত গুণযুক্ত বলা যায় না বা তিনি সদ্বংশ জাত নন, তিনি নিন্দিত রাক্ষস কুলেই জন্মিয়াছেন। রাবণের জয় বা আত্মপ্রতিষ্ঠার মধ্যে মেঘনাদবধ কাব্যের সমাপ্তি ঘটে নাই, তাছাড়া মেঘনাদের হত্যা আদৌ মহাকাব্যোচিত হয় নাই।

মধুসূদন পাশ্চাত্য আদর্শে এই গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইলেও সম্পূর্ণ বাঙালী আদর্শে, বাঙালী জীবনের মাহাত্ম্য দিয়া, বাঙালী মানসের সম্পূর্ণ সংবেদন দিয়াই 'মেঘনাদবধ

কাব্য' রচনা করিয়াছেন। দেশীয় বিষয় লইয়া দেশীয় পরিকল্পনাতেই তাঁহার মহাকাব্য রচিত।

অবশ্য মধুসূদনের কাব্যগুরু ছিলেন যেমন বাল্মীকি, তেমনি হোমর; যেমন ব্যাস, তেমনি ভার্জিল; যেমন কালিদাস, তেমনি মিল্টন; যেমন মাঘ, তেমনি দান্তে বা ট্যাসো।

মাইকেল প্রবর্তিত মহাকাব্যের ধারায় সাহিত্য সৃষ্টি করিলেন কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ইঁহার 'বৃত্রসংহার' কাব্যখানি মহাকাব্য। এই মহাকাব্যের ছন্দোমাধুর্য এককালে পাঠক সমাজকে খুশী করিয়াছিল এবং দধীচির আত্মত্যাগের বর্ণনাকে সকলেই মহাকাব্যোচিত ভাবিয়া এক সময় মেঘনাদবধ কাব্যের চেয়েও বড় বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু হেমচন্দ্র অধ্যবসায়ী কবি, জাত কবির মতো স্বতঃস্ফূর্ত কবিত্ব মাধুর্যের প্রকাশ তাঁহার কাব্যে দেখা যায় না। তাই বহু স্থানে তিনি মধুসূদনের অক্ষম অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এক ছন্দ ছাড়া আর সব ব্যাপারেই তিনি মধুসূদনকে অনুসরণ করিয়াছেন। ইরম্মদ, দম্ভোলি, যাদঃপতি প্রভৃতি শব্দ পর্যন্ত ব্যবহার করিতে দ্বিধা করেন নাই। মেঘনাদবধের চতুর্থ সর্গের সীতা সরমা হইয়াছে বৃত্রসংহারের চতুর্থ সর্গের শচী ও চপলা। ঐন্দ্রিলা যে শচীর সন্ধানে যাইতেছেন—তাহার পরিকল্পনাও মেঘনাদবধের তৃতীয় সর্গে লঙ্কাভিমুখে প্রমীলার অভিযাত্রা হইতে নেওয়া। রুদ্রপীড়ের মৃত্যু শুনিয়া বৃত্রের অবস্থা মধুসূদনের পুত্র-শোকাহত রাবণকে স্মরণ করায়। এই রকম অনেক অনেক উদাহরণ দেওয়া চলিতে পারে।

মহাকাব্যের তৃতীয় স্রষ্টা হইলেন কবি নবীনচন্দ্র সেন। রৈবতক, কুরুক্ষেত্র এবং প্রভাস এই তিনটি কাব্যগ্রন্থে বর্ণিত একটি ঘটনা লইয়াই তিনি কাব্যত্রয়ী বা মহাকাব্য রচনা করেন। প্রথমটিতে সুভদ্রাহরণ, দ্বিতীয়টিতে অভিমন্যুবধ এবং তৃতীয়টিতে যদুবংশধ্বংসের কথা বলা হইয়াছে। 'আধুনিক কালের ঐতিহাসিক মনোবৃত্তির আলোকে এবং সমসাময়িক আর্য জাগৃতির তাগিদে নবীনচন্দ্র মহাভারত নাট্যের সূত্রধার শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া মহাভারত আদর্শের নূতন ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টিত হইলেন। নিষ্কাম কর্ম ও নিষ্কাম প্রেমের রজ্জুতে আর্য-অনার্যের মিলন এবং অখণ্ড হিন্দু সংস্কৃতির পত্তন এই মহাকাব্যের মর্মকথা।' (ডাঃ সুকুমার সেন—বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস)।

নবীন সেন জাত কবি ছিলেন। তাই ইঁহার মহাকাব্য সত্যিই খুব উন্নত রুচির পরিচয় বহন করে। আমরা নবীনচন্দ্রেই সর্বপ্রথম দেখিলাম লাঞ্ছিত মানবতার বিদ্রোহী অভিযান। বর্ণহিন্দুর সযত্ন প্রসারিত ভেদবুদ্ধির বেড়াজাল

ছিঁড়িয়া তারা বাহির হইয়াছে, বর্ণাশ্রমের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইয়াছে বিপ্লবারক্ত চোখে, যাহার মুখে শ্রীকৃষ্ণের ধর্মরাজ্য স্থাপনের মহৎ পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত পর্যবসিত হইল প্রভাসের প্রসন্ন সমাপ্তিতে। কবিত্ব ভাবের এই রসঘনতা রবীন্দ্র যুগেরই পূর্বাভাস সূচনা করে।

মধুসূদনের পর তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া আরও কয়েকটি মহাকাব্য রচনার প্রয়াস হয়, কিন্তু সাহিত্যে সেগুলি কালজয়ী আসন লাভ করে নাই। বর্তমান সময়ে এই জাতীয় মহাকাব্যও আর রচিত হইতেছে না। গল্প বা উপন্যাসের মধ্যেই পাঠক কাহিনীর রস পাইতেছে ও কৌতূহল মিটাইতেছে। আর ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিন্তার যুগে কবিও সমষ্টির হইয়া ফতোয়া দিতে পারিতেছেন না। তাছাড়া গণতান্ত্রিক চেতনায় একক কবির কথা দাঁড়াইবেই বা কেন? বর্তমান সভ্যতা আমাদের সকলকেই ব্যস্ত করিয়াছে, দীর্ঘ কোনও কিছুর রচনা ও পাঠও তাই অসম্ভব। সেজন্য বাঙলা মহাকাব্যের রচয়িতা মহাকবি বলিতে প্রধানত মধু-হেম-নবীনকেই বুঝায়।

কাব্য আলোচনা প্রসঙ্গে একদা মেকলে এই বলিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, মহাকাব্যের দিন অতীত হইয়াছে। বাস্তবিক, বিশ্বাস ও অবিশ্বাসে মিশ্রিত পৌরাণিক যুগমানস আজ আর থাকা সম্ভব নয়। অতীতের সেই দেবদুর্লভ চরিত্রের ধারণাও আজ আমাদের আর অবশিষ্ট নাই। তাই একদা স্বর্গমর্ত-রসাতলের উদ্দাম এক কল্পনার মধ্যে যে সব মহাকায় চরিত্র ঘুরাফিরা করিত, অশ্বমেধের তুরঙ্গ ছুটাইয়া সমস্ত পৃথিবী বিজয় করিত, স্বর্গমর্তপাতালে নিমেষ মাত্রে প্রলয় ঘটাইতে পারিত, তাঁহারা সেই কল্পনাতীত যুগের সঙ্গে সঙ্গেই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছেন। সেই অযোধ্যা ও স্বর্ণলঙ্কা, ইন্দ্রপ্রস্থ ও কুরুক্ষেত্র চিরকালের জন্যই অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে।

বাঙলা অনুবাদ সাহিত্য

॥ অনুবাদ সাহিত্যের প্রয়োজন ॥ বাঙলা অনুবাদ সাহিত্যের ধারা ॥
॥ প্রাচীন ও আধুনিক ॥ বর্তমান প্রচেষ্টা ॥ সমালোচনা ॥

কোনও ভাষাই তাহার মৌলিক সৃষ্টির মাধ্যমে ষোল আনা পুষ্টিলাভ করিতে পারে না। বিভিন্ন দেশের এবং বিভিন্ন যুগের চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে আজ যদি পরিচিত হওয়া না যায়—তবে সভ্যতার অগ্রগতির দূত হিসাবে পিছাইয়া পড়িতে

হইবে। সেইজন্য বর্তমান যুগে সব দেশেরই সাহিত্যের খবর রাখার প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী রকম উপলব্ধ হইতেছে, আর সেটি সম্ভব একমাত্র অনুবাদকর্মের মধ্য দিয়াই। সাহিত্য জাতির সমাজ এবং জীবনের প্রতিচ্ছবি, তাই একটি জাতির পূর্ণ সাহিত্যিক পরিচয় লাভ করিতে পারিলেই সেই জাতির সম্যক সংস্কৃতির চেহারাখানি জানা যায়। অনুবাদের সাহায্যে এই কাজ সবচেয়ে সহজেই সম্পাদিত হয়; এক কালের সঙ্গে অন্যকালের, একদেশের সঙ্গে অন্যদেশের ভাবিক মেলবন্ধন ঘটে। এইজন্যই মৌলিক রসসাহিত্য সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে অন্য দেশের সাহিত্যের ভাষান্তরের কাজ চলে। যে জাতির অনুবাদ সাহিত্য যত বেশী সমৃদ্ধ—সে জাতি বিশ্বের মধ্যে তত বেশী বরণীয় না হউক, স্মরণীয় ত বটেই। ইংরেজী সাহিত্যে মৌলিক সৃষ্টি যেমন চমকপ্রদ, তেমনি অনুবাদ সাহিত্যও অতুলনীয়। বিশ্বের এমন কোনও সাহিত্য নাই—যাহার অনুবাদ ইংরেজী সাহিত্যে না হইয়াছে। সেইজন্য ইংরেজ জাতি পৃথিবীর সকল জাতির সঙ্গে ভাবিক এবং সাংস্কৃতিক যোগসাধন করিতে সক্ষম হইয়াছে।

বাঙলা অনুবাদ সাহিত্য সম্প্রতি উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে এবং বলা নিষ্প্রয়োজন, আমরাও বিশ্বের অন্যান্য জাতি এবং গোষ্ঠীর সঙ্গে কিছুটা পরিচিতও হইতেছি—এই অনুবাদ সাহিত্যেরই মধ্য দিয়া।

আমাদের অনুবাদ সাহিত্য মধ্য যুগের সাহিত্যকাল হইতেই শুরু হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় রচিত মূল রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থের অনুবাদ হইতেই বাঙলা অনুবাদ সাহিত্য রচনা শুরু হইয়াছে। অবশ্য এগুলির অনুবাদ কাব্যাকারেই হইয়াছিল—কারণ তখনও গদ্য রচনারীতির উদ্ভব হয় নাই। আদি অনুবাদ সাহিত্যে মূল রচনার বর্ণগন্ধ বিশেষ পাওয়া যায় না, কৃত্তিবাসী রামায়ণ বা কাশীরাম দাসের মহাভারতে কবিরা স্বাধীনভাবে সংস্কৃত গ্রন্থের মর্মানুবাদ করিয়াছেন। তাহাও আবার বর্তমানে বহু স্থানে প্রক্ষিপ্ত অবস্থায় আমাদের কাছে আসিয়া হাজির হইয়াছে। রামায়ণ, মহাভারত কি ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থের বহু অনুবাদকের নামই পাওয়া যায় প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যে। কৃত্তিবাস ছাড়া দ্বিজ মধুকণ্ঠ, কবিচন্দ্র ভবানীশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, জগৎরাম, গঙ্গারাম দত্ত প্রভৃতি কবিরাও রামায়ণ অনুবাদ করেন। কাশীরাম দাস ছাড়াও কবি সঞ্জয়, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী প্রভৃতি কবিরা মহাভারতের অনুবাদ করেন। ইহা ছাড়া মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়', আলাওলের 'পদ্মাবতী' প্রভৃতি নামকরা অনুবাদ-গ্রন্থ। শ্রীকৃষ্ণবিজয় ভাগবতের অনুবাদ আর পদ্মাবতী হইল মালিক মুহম্মদ জায়সী রচিত হিন্দী বই 'পদুমাবৎ'-এর অনুবাদ।

বাঙলা গদ্য সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই বাঙলা সাহিত্যে অনুবাদের জোয়ার আসিল বলা চলে। শ্রীরামপুরের মিশনারীরা খৃষ্টধর্ম প্রচারের জন্যে বাইবেলের বাঙলা অনুবাদ প্রকাশ করেন, জেনোথ'ন ডানকানের আইনের বই বাঙলায় প্রকাশ করা হয়, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতেরা ইংরেজী, সংস্কৃত, হিন্দী এবং ফার্সী হইতে নানা পাঠ্য বই-এর অনুবাদ করেন। রামমোহন রায়ের বেদান্তদর্শনের অনুবাদ এবং অক্ষয়কুমার দত্তের Constitution of Man গ্রন্থের অনুবাদ এই যুগের বিশিষ্ট অনুবাদকর্ম।

এই সময় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ বিদ্বজ্জনেরা সংস্কৃত নানা গ্রন্থ হইতে অনুবাদ শুরু করেন। 'সীতার বনবাস', 'শকুন্তলার' নাম উল্লেখযোগ্য। তারাশঙ্কর তর্করত্নের 'কাদম্বরী'ও কম উল্লেখযোগ্য নয়। কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতও একটি শ্রেষ্ঠ অনূদিত সাহিত্য।

সংস্কৃত নাটক ত প্রায় সবগুলিই বাঙলায় অনুবাদ করা হইয়াছে। রামনারায়ণ তর্করত্ন এবিষয়ে ছিলেন সিদ্ধহস্ত।

ইংরেজী নাটকের অনুবাদ দিয়াই শোনা যায় বাঙলা নাটক রচনার সূত্রপাত হয়। The Disguise এবং Love is the best Doctor—এই দুইটি নাটিকার অনুবাদ দিয়াই বাঙলা নাটকের হাতে খড়ি। তারপর হরচন্দ্র ঘোষের ভানুমতী চিত্তবিলাস (The Merchant of Venice-এর অনুবাদ) এবং চারুমুখচিত্তহরা (Romeo and Juliet-এর বাঙলা), সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সুশীলা বীরসিংহ (Cymbaline-এর বাঙলা), গিরিশচন্দ্র ঘোষের ম্যাকবেথ প্রভৃতি গ্রন্থের নাম করা যাইতে পারে।

শুধু নাটক নয়, ইংরেজী কাব্য এবং উপন্যাসেরও রূপান্তর বাঙলা সাহিত্যে শুরু হইয়া গেল। ইংরেজী ভাষার মাধ্যমেই বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাহিত্যের অনুবাদও আমরা লাভ করিলাম। হোমার, ভার্জিল, দান্তে, গ্যেটে প্রভৃতি মহাকবির রচনার বাঙলা অনুবাদ শুরু হইয়া গেল যেমন, তেমনি মূল ইংরেজী সাহিত্যেরও বাঙলা অনুবাদ হইতে লাগিল। Thomas Gray, Goldsmith প্রভৃতি হইতে শুরু করিয়া প্রাচীন শ্রেষ্ঠ ইংরেজ কবি ও গল্পকার—সকলেরই রচনার কিছু না কিছু অনুবাদ বাঙলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিল।

আজিকার দিনে বাঙলা সাহিত্যে অনুবাদের মর্যাদা অনেক বেশী বাড়িয়া গিয়াছে। তাই যাঁহাদের মধ্যে মৌলিক রস সৃষ্টির ক্ষমতা আছে এবং মৌলিক সাহিত্য সৃষ্টিতে যাঁহারা যথার্থই প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন—তাঁহারাও আজ অনুবাদ কর্মে মনোযোগ দিয়াছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত হইতে শুরু

করিয়া পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, প্রবোধেন্দু ঠাকুর, অশোক গুহ, ভবানী মুখোপাধ্যায়, জয়ন্ত ভাদুড়ী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বুভুক্ষা', 'রামধনু' এবং 'নীল পাখি', 'লে মিজারেবল্' নামকরা অনূদিত গ্রন্থ। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের 'মা' এবং রোমাঁ রোলাঁর সংক্ষিপ্ত অনুবাদ, ভবানী মুখোপাধ্যায়ের 'মাদার রাশিয়া' সুখপাঠ্য অনুবাদ গ্রন্থ। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'প্রতিধ্বনি' কাব্যগ্রন্থটি বিভিন্ন কবির কবিতার বলিষ্ঠ অনুবাদ।

বর্তমান বাঙলার অনুবাদ সাহিত্য বেশ অগ্রসর বলা যায়। পৃথিবীর নামকরা প্রায় সব বই-এর অনুবাদ এখন বাঙলায় করা হইয়াছে বা হইতেছে। এ ছাড়া সুবৃহৎ গ্রন্থের সংক্ষেপিত ভাবানুবাদও বহু প্রকাশিত হইয়াছে।

তবে অনুবাদ সাহিত্য সম্পর্কে একটা কথা উপসংহারে বলা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। অনুবাদকেরা অনেক সময় মূল রচনাকে সংক্ষিপ্ত করার জন্যই হউক বা অজ্ঞাত অন্য কোনও কারণেই হোক, নিজেদের স্বকল্পিত চিন্তা-ভাবনা জুড়িয়া দিয়া নিজের কথাকেই অনুবাদ কর্মের মাঝখানে বসাইয়া দেন। তাহাতে অনুবাদ সাহিত্যের মূল উদ্দেশ্য নষ্ট হয়। এদিকে একটু নজর রাখিলে অনুবাদ সাহিত্যের কল্যাণধর্ম কখনও ম্লান হইবে না বলিয়াই বিশ্বাস হয়।

বাঙলা প্রবন্ধ সাহিত্য

।। প্রবন্ধের সংজ্ঞা ।। প্রবন্ধের দুই শ্রেণী ।। রামমোহন ।। বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ ।। বর্তমান ধারা ।। রম্য রচনা ।।

প্রকৃষ্টরূপে বাঁধা যে চিন্তামূলক রচনা—সাধারণত তাহাকেই প্রবন্ধ বলা হইয়া থাকে। তবে কাব্যের মতো প্রবন্ধও বস্তুতন্ময় এবং আত্মতন্ময় রূপ লইয়া রচিত হয়। যে কোনও একটা বিষয়কে লেখক সাহিত্যক কৌশলে বুদ্ধি ও কল্পনার ঔজ্জ্বল্যে যখন রাঙাইয়া তুলেন—তখনই মোটামুটি তাহাকে প্রবন্ধ বলিতে পারা যায়। প্রবন্ধকার যখন বস্তুর প্রাধান্য দেন—তখন তাহা হয় Informative Essay—অর্থাৎ তাহাকে বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ বলিতে পারি। জীবনী রচনার সময় কিংবা বিজ্ঞান সংক্রান্ত আলোচনায় লেখকেরা যে জাতীয় পন্থা অবলম্বন করেন—তাহাকে মোটামুটি বস্তুতন্ময় প্রবন্ধের প্রকরণ বলা চলে। আর এক জাতীয় প্রবন্ধ আছে—যেখানে লেখক বিষয় অপেক্ষা নিজের আত্মচিন্তাকেই বেশী প্রাধান্য দেন, তাঁহার ব্যক্তি-মনটি এবং তাঁহার অন্তরের ভাবমণ্ডলটিই যেন সমগ্র রচনায় সৌরভ ছড়াইতে থাকে—ইংরেজীতে এই জাতীয় রচনাকে Intimate

Essay বলে, বাঙলায় মন্ময় রচনা বলা চলিতে পারে। অনেকে আবার এই জাতীয় রচনাকে ব্যক্তিগত রচনা বলিয়াও অভিহিত করিয়াছেন। বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধে যেমন বিচারবিশ্লেষণ এবং বুদ্ধি ও চিন্তা প্রধান, আত্মনিষ্ঠ প্রবন্ধ তেমনি প্রবন্ধকারের অনুভূতির উজ্জ্বল প্রকাশে দীপ্ত। অধ্যাপক শ্রীশচন্দ্র দাস "সাহিত্য সন্দর্শনে" প্রবন্ধ সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া এক জায়গায় ভারি সুন্দর কথা বলিয়াছেন—'বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধে লেখক আত্মপ্রচার করেন, ব্যক্তিগত প্রবন্ধে আত্মনিবেদন করেন; একজনকে আমরা শ্রদ্ধা করি, আর একজনকে ভালবাসি।'

বাঙলা সাহিত্য প্রবন্ধের দিক হইতে দরিদ্র নয়। কি আত্মনিষ্ঠ রচনা, আর কি বস্তুতন্ময় প্রবন্ধ—উভয় ক্ষেত্রেই বাঙলা সাহিত্য বেশ গৌরবের অধিকারী। ইংরেজ আমলে বাঙলা গদ্যশিল্পের জন্ম ও প্রসার এবং ইংরেজী মিশনারীদের উদ্যোগেই প্রথমে ধর্মীয় প্রবন্ধ রচনার শুরু, আর সেই সব প্রবন্ধের বক্তব্য যে কতদূর ভ্রমাত্মক—তাহা বুঝাইবার জন্য রাজা রামমোহন প্রমুখ পণ্ডিতদের রচনা প্রবন্ধ সাহিত্যের গণ্ডীকে প্রথমেই প্রসারিত করিয়া দেয়। এই যুগের সমস্ত লেখকই জ্ঞানের নানা বিষয় অবলম্বন করিয়া প্রবন্ধ রচনা শুরু করেন। এই সময় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ও প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রকে আরও ব্যাপক ও সুললিত করিয়া তোলেন। অক্ষয়কুমার দত্তের 'চারুপাঠ' বা 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' প্রভৃতি গ্রন্থ ইহার বিশিষ্ট উদাহরণরূপে গণ্য করা যাইতে পারে।

এ পর্যন্ত বাঙলা গদ্যে একটা ঋজুতা ছিল। দুরূহ বৈদান্তিক তত্ত্বের আলোচনায় বা সতীদাহ নিবারণের জন্য লিখিত প্রবন্ধাবলীর মধ্যে রামমোহনের বলিষ্ঠ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, বিদ্যাসাগর সেই শক্তিতে লালিত্য জোগাইলেন—শব্দশিল্পের মাধ্যমে। বাঙলা প্রবন্ধে রচনারীতির সৌকর্য এবং অনলঙ্কার সারল্য প্রথম বিদ্যাসাগরের মারফত দেখা দিল। 'কথামালা' ঠিক প্রবন্ধ গ্রন্থ নয়, কিন্তু এখানে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গদ্য রচনার ঢঙটি যেমন সরল তেমনি অনুপম।

ইহার পরের উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধকার হইতেছেন কালীপ্রসন্ন সিংহ। ইহার গদ্যরীতি অনেক বেশী জীবন্ত, কারণ ইনি 'হুতোমপ্যাচার নক্সা' গ্রন্থে ঘরোয়া শব্দ এবং বাঙলা বাগ্‌ধারা বা ইডিয়ম ব্যবহার করিয়া আধুনিক চলতি ভাষার ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

আদি যুগের প্রবন্ধকারদের মধ্যে ভূদেব মুখোপাধ্যায় একটি বিশিষ্ট আসন অধিকার করিয়া আছেন। তাঁহার 'পারিবারিক প্রবন্ধ' 'সামাজিক প্রবন্ধ', বাঙলা

সাহিত্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ভাষার পরিচ্ছন্নতায়, চিন্তা গৌরবে ও যুক্তিনিষ্ঠ বিশ্লেষণে তাঁহার প্রবন্ধগুলি বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধের উজ্জ্বল উদাহরণ।

তারপর বঙ্কিমচন্দ্র। উপন্যাসশিল্পে তাঁহার কৃতিত্ব যত বেশীই হোক না কেন—প্রবন্ধ সাহিত্যে তিনি কি চিন্তায় এবং কি ভাষাবিন্যাসে, এক নূতন দিগন্ত আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন—একথা অস্বীকার করার উপায় নাই। প্রবন্ধ যে সাহিত্য হইতে পারে এবং প্রবন্ধের মাধ্যমে কি ব্যঙ্গ কি হাস্যরস—সহজে এবং সাবলীলভাবে পরিবেশন করা যায়, তাহা তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধে বাঙালী জীবনের পরাধীনতার জ্বালা যেমন বিবৃত হইয়াছে—তেমন বাঙলার শিক্ষা ও সংস্কৃতি, জীবন ও আদর্শ একটা স্পষ্ট রূপ লইয়া পাঠকের চিন্তাশীল মানসকে ধাক্কা দিয়াছে। প্রবন্ধের মধ্য দিয়া এই জাতীয় সাহিত্য ব্যঞ্জনা বঙ্কিমচন্দ্রের আগে কোনও লেখক কল্পনা করেন নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, রমেশচন্দ্র দত্ত, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতি সকলেই বঙ্কিমী আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন।

এই সময় কিংবা ইহার পর হইতেই বাঙলা প্রবন্ধে নানা রকমের লেখা দেখিতে পাওয়া গেল। ধরা যাউক—কালীপ্রসন্ন ঘোষের 'ঐহিক অমরতা'র কথা। এটি নিছক ভাবাবেগপূর্ণ আত্মতন্ময় জাতের রচনা। কিংবা চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের 'সেই মুখখানি'—ব্যক্তিগত শোকের বেদনার্ত প্রকাশ! সঞ্জীবচন্দ্রের 'পালামৌ' ভ্রমণকাহিনী কিংবা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাস' কিছুটা স্মৃতিকথামূলক প্রবন্ধ। এইগুলি এবং বঙ্কিমচন্দ্রের লোকরহস্যকে কতকটা আত্মতন্ময় রচনা বা রম্যরচনার আদিযুগের দৃষ্টান্ত বলা চলে।

বাঙলা প্রবন্ধের দেহে যৌবনবেগ সঞ্চার করিলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি প্রবন্ধের বিষয়বস্তুতে যেমন নূতন চিন্তার খোরাক জোগাইলেন, তেমনি সেই বিষয় কেমন করিয়া বিন্যস্ত করিতে হইবে—তাহার বিচিত্র কৌশলও মুনশীয়ানার সঙ্গে ব্যক্ত করিলেন। সব জাতের প্রবন্ধ রচনায় তাঁহার অননুকরণীয় প্রতিভার স্পর্শ লাগিয়া বাঙলার প্রবন্ধ সাহিত্য অপরিসীম সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে।

সমালোচনামূলক প্রবন্ধও বাঙলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের হাতে নূতন চেহারায় দেখা দিয়াছে। 'আধুনিক সাহিত্য', 'প্রাচীন সাহিত্য' প্রভৃতি গ্রন্থ এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্র প্রদর্শিত পথে পা দিয়া আজ অবশ্য সমালোচনা সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। শশাঙ্কমোহন সেন, অক্ষয়কুমার দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার

হইতে শুরু করিয়া শ্রীযুক্ত নন্দগোপাল সেনগুপ্ত পর্যন্ত—প্রায় সকলেই সমালোচনার ক্ষেত্রে নিজস্ব চিন্তার স্বকীয়তা দেখাইয়াছেন। আজকাল সাময়িকপত্রে যে সব সাহিত্য সমালোচনা দেখা যায়—তাহাও যথেষ্ট উন্নত ধরনের।

রসসাহিত্যের সমালোচনায়ও রবীন্দ্রনাথ নূতন পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং সেই ধারায় অতুলচন্দ্র গুপ্ত, নলিনীকান্ত গুপ্ত, অজিতকুমার চক্রবর্তী, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লিখিয়া খ্যাত হইয়া আছেন অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নিখিলনাথ রায় প্রভৃতি। বিজ্ঞান বিষয়ক রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন জগদীশচন্দ্র বসু, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি।

প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধ এযুগে স্বাতন্ত্র্যের দাবি রাখে। বিষয়বস্তুর দিক হইতে তিনি বাঙালী জীবনের নানা উপলব্ধিকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু বিন্যাসে তিনি একটা চমক আনিয়াছিলেন—হালকা চালে বাঙলা গদ্যকে চলিবার ক্ষমতা দিয়াছিলেন। তিনি 'বীরবল' এই ছদ্মনামে লিখিতেন—তাই তাঁহার প্রবর্তিত গদ্য বাঙলা রীতিকে 'বীরবলী বাঙলা' বলা হয়। ইঁহার প্রভাবেই বর্তমান যুগে বাঙলায় এত বেশী ব্যক্তিগত রচনা (Personal Essay) প্রকাশিত হইতেছে।

বাঙলা প্রবন্ধ সাহিত্যে ভ্রমণ-কাহিনীর যে চমক—তাহা 'পালামৌ' হইতে শুরু হইলেও রবীন্দ্রনাথ হইতেই তাহার জাঁকজমক বা চমক বেশী খুলিয়াছে। তারপর জলধর সেনের 'হিমালয় ভ্রমণ' হইতে শুরু করিয়া অন্নদাশঙ্করের 'পথে প্রবাসে' কিংবা প্রবোধকুমার সান্যালের 'মহাপ্রস্থানের পথে' প্রভৃতি গ্রন্থ দেখিলেই বুঝা যায় —এই জাতীয় রচনা বাঙলায় কত বেশী জনপ্রিয়।

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বা সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রমুখ লেখকেরা সুপণ্ডিত—তাঁহাদের ভাষা অবশ্য সুললিত নয়, কিন্তু চিন্তায় যথেষ্ট গভীরতা দেখিতে পাওয়া যায়।

আজকালকার নামকরা কথাশিল্পী যাঁহারা—তাঁহারা সকলেই কিছু না কিছু হালকা জাতের হয় রসরচনা, না হয় রম্যরচনা, না হয় ভ্রমণের কথা বেশ সাহিত্যিক কৌশলে বিন্যস্ত করিয়া পরিবেশন করিয়াছেন—এইগুলিকে সাহিত্যিক প্রবন্ধ ঠিক বলা চলে না, অথচ সৌরভ ও মাধুর্যে এইগুলি অনবদ্য। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'বৃষ্টি এল', বুদ্ধদেব বসুর 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি', শিবরাম চক্রবর্তীর 'আজ ও কাল', মুজতুবা আলীর 'দেশে-বিদেশে' প্রভৃতি লেখাগুলিকে প্রবন্ধ সাহিত্যে সম্মানিত না করিলে অনুদারতাই প্রকাশ করা হইবে।

আজকাল অধ্যাপক এবং পণ্ডিতশ্রেণীর অনেকেই সুচিন্তিতভাবে বহু বিষয়ের

উপর বহু বই লিখিতেছেন—তাহাতেও বাঙলা প্রবন্ধের মর্যাদা অনেক উন্নীত হইয়াছে। বিধুশেখর শাস্ত্রী, ক্ষিতিমোহন সেন, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, অর্দ্ধেন্দু কুমার গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশীলকুমার দে, সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, সুকুমার সেন, নীহাররঞ্জন রায়, সুশোভন সরকার, প্রমথনাথ বিশী, শশীভূষণ দাশ-গুপ্ত প্রমুখ পণ্ডিতবৃন্দের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

ইহা ছাড়া গুপ্তনামে হালকা চালে রসসাহিত্য সৃষ্টির অভিপ্রায়ে একদল লেখক রম্যরচনা বা লঘু নিবন্ধ লিখিতেছেন—সেগুলিরও মূল্য একেবারে নগণ্য নয়, যেমন যাযাবর, নীলকণ্ঠ, ইন্দ্রজিৎ, কালপেঁচা, রঞ্জন প্রভৃতি।

আজ পর্যন্ত বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের বিচিত্র বিস্তার ও চিন্তার নানা রূপ দেখিয়া একথা অবশ্যই বলা যায় যে, শিশু অবস্থা পার হইয়া পরিপূর্ণ যৌবনে সে বলিষ্ঠ পদবিক্ষেপে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে।

অতি আধুনিক বাঙলা কবিতায় যুগপ্রবণতা

আধুনিক কবিতার যুগ মধুসূদন হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে ইওরোপীয় ভাব ও চিন্তাজগতের নানা তরঙ্গ আসিয়া লাগিয়াছে আমাদের মধ্যযুগীয় জীবনধারায়। সেই তরঙ্গে তরঙ্গিত হইয়াছে আমাদের কবি-মানস। কবি ঈশ্বর গুপ্তের পূর্ব পর্যন্ত যে মধ্যযুগীয় কাব্যধারা প্রবাহিত হইয়া আসিতেছিল—১৯শ শতাব্দীর নব ভাবতরঙ্গে তাহা নতুন খাতে প্রবাহিত হইল। আমাদের যুগস্রষ্টা কবিকুল সেই বিদেশাগত ভাবতরঙ্গের সঙ্গে দেশীয় তথা জাতীয় ঐতিহ্য ও উপাদানের অপূর্ব মিশ্রণে সৃষ্টি করিয়াছেন নূতন কাব্যকুঞ্জ—নতুন রস-মূর্তি : এই হইল আধুনিক কবিতা। মধুসূদনের কাব্যে যে আধুনিকতার সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহা বিস্ময়কর দ্রুততার সহিত পরিপূর্ণতা পাইল রবীন্দ্রনাথের বিশ্বজয়ী প্রতিভার স্পর্শে। মধুর কমনীয় রস, অপূর্ব লালিত্যপূর্ণ ভাষা, পরিচিত প্রকৃতির চিত্রে শোভিত বিস্ময়কর রূপকল্প—এবং সর্বোপরি একটি নিবিড় মানবীয় প্রীতির মহৎ আদর্শ বা ভাব সুদীর্ঘকাল জুড়িয়া বাঙালী পাঠকের মনপ্রাণ একেবারে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছিল। প্রায় ১৯৩০ সাল পর্যন্ত এই মাধুর্যময় উদ্দীপনাময় কাব্যধারায় বাঙালী পাঠক প্রায় মুগ্ধ ও নিমজ্জিত ছিল।

ইহার পরে বাংলার কাব্যধারা আবার এক নূতন পথে মোড় ফিরিল। এই মোড় ফেরা আমাদের অতি আধুনিক যুগের কবিতায়—যাহার ধারা আজ পর্যন্ত নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। রবীন্দ্র-পরবর্তী নূতন

এই ধারার মূলে কাজ করিয়াছে বাস্তব এক দৃষ্টিভঙ্গী যাহা পূর্ববর্তী রবীন্দ্রযুগের রোমান্টিক আদর্শবাদের বিরোধী। এই বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী যে পুরাপুরি আমাদের সামাজিক জীবনসঞ্জাত হইতে জন্মলাভ করিয়াছে—তাহা নয়। এই দৃষ্টিভঙ্গীর মূলে দুইটি জিনিস লক্ষ্য করা যায়। একটি হইল ধার করা ক্ষয়িষ্ণু ইংরেজী আধুনিক কাব্যধারার প্রভাব—এলিয়ট, অডেন প্রমুখ কবিরা যাহার প্রেরণার স্থল। অন্যটি আমাদেরই বন্দী সমাজ-জীবনের মৌলিক এক মানস প্রতিক্রিয়া—যাহার মধ্যে আছে শ্লেষ, অবিশ্বাস, রবীন্দ্রযুগের রোমান্টিক আদর্শবাদ সম্পর্কে তাচ্ছিল্য ; পুরাতন মদির মাধুর্য সম্পর্কে, প্রেম সম্পর্কে, আদর্শায়িত মূল্যবোধ সম্পর্কে কুণ্ঠাহীন বিদ্রোহ। ভাষায়, চিত্রকলায়, ছন্দহীনতায়, গতানুগতিক কাব্যপ্রসিদ্ধ উপমাবর্জনে এবং সর্বোপরি বাস্তব এক দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা বাঙলার পাঠক মহলে এই অতি আধুনিক কাব্যধারা এমনি একটা অপ্রত্যাশিত তরঙ্গের সৃষ্টি করিল যাহাতে কি পাঠক আর কি সমালোচক, কেহই ইহাকে প্রসন্ন মনে গ্রহণ করিতে পারিল না। রবীন্দ্র কাব্যের মাধুর্য ও লালিত্যে মুগ্ধ বাঙালীর মন ও প্রাণ—সহসা যেন মাধুর্যহীন, লালিত্যহীন রূঢ় আঘাতে তীব্রভাবে আহত হইল। ঝড় উঠিল নানা বিরূপ সমালোচনার, যাহার শেষ আজও একেবারে হয় নাই। তাই অতি আধুনিক বাঙলা কবিতা সম্পর্কে কোন কিছু আলোচনা করিবার আগে এই জিনিসটি যে কি—তাহা অনেকের কাছেই স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার অবকাশ আছে। এক শ্রেণীর পাঠক আছেন—যাঁহারা আধুনিক কবিতার কৌলীন্য স্বীকার করেন না, আর এক শ্রেণীর পাঠক বলেন যে—আধুনিক কবিতা কিছুই নয়। যে কোনও গদ্য রচনার দুই দিকের খানিকটা মুছিয়া দাও—অবশিষ্টাংশকে আধুনিক কবিতা বলিতে পার। অর্থাৎ অতি আধুনিক কবিতা সূত্রহীন—সম্পর্কহীন, হেঁয়ালী বা দুর্বোধ্য। আর একদল আছেন, যাঁহারা বলেন—কাব্যের আবার আধুনিকতা, প্রাচীনতা, নবীনতা, অর্বাচীনতা ইত্যাদি কি? কাব্য ত চিরন্তন।

পদ্যকে ভাবসঞ্চারী, রসসঞ্চারী কবিতা হইতে হইবে এবং তাহা আজিকার যুগ-চিন্তার সাক্ষ্য বহন করিবে। এই দুইটি হইল আধুনিক কাব্যের কুললক্ষণ। আমরা যুগোচিত জীবন-বেদনা যখন কাব্য হিসাবে প্রচার বা প্রকাশ করিতে পারি—তখনই তা আধুনিক কবিতা হয়। পিছনের যুগের যে সমস্যা, যে চিন্তা বা যে ধারণা—তাহা যদি আজও বলা হয়—তবে বক্তব্যের দিক হইতে তাহাকে আধুনিক বলিবার কোন অধিকার আমাদের নাই। আবার যে ধরনে বা কৌশলে কাব্যকলা সৃষ্ট হইয়াছে—তাহারও ছাঁচ বদলাইয়া ফেলিতে হইবে, তবেই আধুনিক কবিতা হিসাবে তাহা দীক্ষিত হইবে।

অর্থাৎ রূপে এবং উপজীব্যতায় একটা কিছু নূতনত্ব থাকা চাই। ছাঁচ যদি পুরাতন হয়—যাহার মাধ্যমে প্রাচীন রূপমূর্তিই শুধু গড়া চলে—তবে রচনাশৈলীর দিক হইতে তাহাকে আধুনিক বলা চলে না,—যাহা আজিকার বর্ষীয়ান কবিতার ক্ষেত্রে হইতেছে। তাঁহাদের বক্তব্য যুগ-চেতনার কথা ঘোষণা করিতেছে সত্য, কিন্তু তাহা করিতেছে প্রাচীন প্রকাশভঙ্গীর মাধ্যমে। ফলে, উপজীব্যতায় আধুনিক হইয়াও রচনারীতির প্রাচীনতার জন্য তাহাকে পরিপূর্ণ আধুনিক কাব্য বলা হইতেছে না; এমন কি উন্নাসিক সমালোচকেরা সেই সকল কাব্যকে একেবারে নস্যাৎ করিয়া দিয়া থাকেন।

বর্তমান যুগের যে সকল ভাবনা, কি রাষ্ট্রীয়, কি সামাজিক, কি ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবনঘটিত—সকল সমস্যার কাব্যিক রূপমূর্তি গড়িতে হইবে, তবেই তা আধুনিক কাব্য হইবে। রাষ্ট্রীয় চেতনার কথা খুব জোর গলায় বলা হইল, কিন্তু তাহাতে সুষমা রহিল না, তাহাকে পোস্টার বলা যায়, কবিতা নয়। প্রথমত রচনাকে কাব্যত্বে দীক্ষিত হইতে হইবে, তাহা না হইলে তাহাকে কবিতাই বলা হইবে না—তাহার আবার আধুনিকতা কি। সুষমায় এবং সৌন্দর্যে, কবি তাঁহার মনের কথা অভাবিতপূর্ব কোনও কল্পনার মাধ্যমে পাঠক-হৃদয়ে সঞ্চার করিবেন—পাঠকের মনেও কবির মনের অনুরূপ ভাবরাজি দ্যোতিত হইবে—তখনই কবিতা হইবে সার্থকনামা। আধুনিক কবিতা যেহেতু প্রাথমিক ও প্রধান ভাবে কবিতা—তাই তাহাকেও কবিতার মূল কাজটুকু করিতে হইবে—তারপরে তাহার আধুনিকতা, অর্থাৎ রূপের দিক হইতে নূতন ফ্যাশনের উদ্ভাবনা এবং বিষয়ের দিক হইতে বর্তমান জীবনের সকল দিকের সমস্ত ভাবনাকে তুলিয়া ধরা।

ভাবের নূতনত্ব আনিতে গিয়া অনেক কবি অত্যধিক মননশীল হইয়া পড়িয়াছেন, আবার প্রকরণে বা বিন্যাসে নূতনত্ব আনিতে গিয়া অনেক কবি ভাষায় দুরূহতা সৃষ্টি করিয়াছেন। বিদেশী রূপকল্প, অপ্রচলিত বিষয়ে ইঙ্গিত, অপরিচিত ব্যঞ্জনা প্রভৃতির মাধ্যমে নূতন কিছু করার চেষ্টায় কবিতা হইয়া পড়িতেছে দুর্বোধ্য। একেই আধুনিকতার মূল পরিবর্তনের ধারাটি সহজে সাধারণ মানুষের ধারণায় আসে না, রূপের বদল এবং ভাবের বদল সাধারণ মন বরদাস্ত করিতেই চায় না, তাহার উপর আবার যদি বুদ্ধির মারপ্যাঁচ থাকে—তাহা হইলে আধুনিক কাব্যের পাঠকসংখ্যা কমিতে বাধ্য। তখন যে কবিতা দুর্বোধ্য নয়, যথার্থ সুন্দর আধুনিক কবিতা, তার ভাগ্যেও সঙ্গদোষ বর্তায়, দুর্বোধ্য বিশেষণ জোটে। জীবনানন্দ দাশের অনেক কবিতার ভাগ্যে এই রকম মিথ্যা পরিবাদ জুটিয়াছে। "পাখির নীড়ের মতো চোখ" বলিতে যে আনন্দ, আরাম এবং প্রশান্তি

ও পরম নিশ্চিন্ততার ব্যঞ্জনা করা হইয়াছে—পাঠক আর সেটুকু ধৈর্য ধরিয়া শুনিতে চান না।

কবির মন অগ্রগামী। কবি কবিতা লেখেন—তাঁহাকে বুঝিয়া, বিশ্লেষণ করিয়া সমালোচক ঘোষণা করেন—কবিতাটি ভালো হইল কি মন্দ হইল। কিন্তু সমালোচনার মান পূর্বনির্ধারিত সূত্র; বর্তমান জীবনের সঙ্গে হয়তো সেই মান খাপ খায় না, তাই সমালোচক আপাত নিন্দা করিলেও কবিতাটি হয়তো সুন্দর হইতেও পারে। তাই নিজের মনপ্রাণ দিয়া কাব্যকে গ্রহণ না করিয়া কখনই নিন্দার কথা বলা ঠিক নয়।

আধুনিক কবিতারও বহু দোষ আছে, কিছু গুণও আছে—তাহা স্বীকার করিতে হইবে। বর্তমানের কবিতা ছন্দহীন, গদ্য ঢঙের, দুর্বোধ্য চেতনার, কায়দা-সর্বস্ব,—ঠিক কথা, কিন্তু আধুনিক কবিতা কি গত যুগের কবিকর্মের তুলনায় ঢের বেশী মানবিক নয়? বর্তমান মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সমস্ত রকমের সুখ-দুঃখের চেতনা কি আধুনিক কাব্যে বড় করিয়া ধ্বনিত না? আধুনিক কবিতা এই বস্তুজগৎ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, মায়ানুসারী নয়। এই কাব্য-ধারার নবীনত্ব, নূতন ভাবে নূতন একটা কথা বলিবার দুঃসাহসকে কোন ক্রমেই অস্বীকার করিবার উপায় নাই। একথা ঠিক, এই ধারায় মধুসূদন বা রবীন্দ্রনাথের মতো প্রতিভাবান আবির্ভূত হইবার মতো সামাজিক বা মানসিক অনুকূল পরিবেশ আজও হয় নাই—তবু, রবীন্দ্রনাথের পরে এধারা তাহার আপন নিয়মেই পূর্ণতার পথে অগ্রসর হইতেছে।

নবীনতম এই যুগের প্রথম বিদ্রোহ ও ব্যঙ্গ বাস্তবিক পক্ষে শুরু হইয়াছে মোহিতলাল মজুমদার, কাজী নজরুল ইসলাম ও যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত হইতে। তবু মনে রাখিতে হইবে—এই তিনজন কবি রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিকতা হইতে একেবারে মুক্ত নন। ইঁহারা রবীন্দ্রসরণী ধরিয়াই অগ্রসর হইয়াছেন—ভাষা, ছন্দ, ব্যঞ্জনা, উপমা-অলঙ্কার, চিত্রকল্পে রবীন্দ্রধারারই অনুবর্তী। দৃষ্টিভঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক আদর্শবাদের বিরোধী হইলেও, তাহা সত্যকারের বাস্তববাদের দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। তাই ইঁহাদের বিদ্রোহী দৃষ্টিভঙ্গী আর এক নূতন রূপের রোমান্টিকতা হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের দেহবর্জিত ভাব-সর্বস্ব প্রেমের বিরুদ্ধে প্রবলভাবে শোনা যায় মোহিতলালের দেহকেন্দ্রিক ভোগের জয় ঘোষণা। নিঃসঙ্কোচে তিনি ঘোষণা করিয়াছেন, "সৃষ্টিমূলে আছে কাম।" কিন্তু দেহসর্বস্ব এই দৃষ্টি তাঁহার বৃহৎ ও মহৎ লক্ষ্যের অভাবে আপনিই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। প্রথম দিকের কাব্য 'বিস্মরণী' ও 'স্বপনপসারী'র দেহজ উদ্দাম

ভোগস্পৃহা শেষ দিকের কাব্য 'স্মরগরল' ও 'হেমন্ত গোধূলি'তে আসিয়া বিষণ্ণ ও আত্মনির্ভরহীন হইয়া পড়িয়াছে।

অত্যন্ত সমাজ-সজাগ নজরুলের কাব্যধার'ও শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্র রোমান্টিকতা ও গীতিময়তা হইতে নিজেকে আলাদা রাখিতে পারে নাই। সাময়িক একটা শব্দ-সর্বস্ব আস্ফালনের মতো গর্জন করিয়া উঠিয়া নীরব হইয়া গিয়াছে।

ইঁহাদের মধ্যে বিস্ময়কর বিরল এক দৃষ্টান্ত যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। তাঁহার নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে অপূর্ব এক সামঞ্জস্য সাধিত হইয়াছে। রবীন্দ্র রোমান্টিকতার গতানুগতিকতার পথ ত্যাগ করিয়া চারিপাশের বাস্তব উপাদানগুলিকে তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন সমিধের মতো। তারপর তাহাকে প্রজ্বলিত করিয়'ছেন রোমান্টিক ভাবাদর্শেরই অগ্নিশিখায়। তাঁর কবিতার বিষয়-নির্বাচন, উপকরণসমূহ বিস্ময়কর ভাবে নূতন; চিরকালের কাব্য প্রসিদ্ধ কমনীয় বিষয়সমূহ বর্জন করার একটা বাস্তবভঙ্গী ও নূতনত্ব লক্ষ্য করার মতো। কিন্তু সেই উপকরণের রসমূর্তি রবীন্দ্র রোমান্টিকতার সঙ্গেই একটা সামঞ্জস্য করিয়া নিয়াছে। তাই, অতি আধুনিক কবিদের পূর্বসূরী হইলেও ইঁহার কবিতায় অতি আধুনিক কালের বিক্ষুব্ধ নেতিবাদ বা নবতর অস্তিত্ববাদী জীবনবিশ্বাস—কোনটাই শেষ পর্যন্ত প্রবল হইয়া টিকিয়া থাকে নাই। কেবল একটা প্রবল প্রতিবাদ জানাইয়াই নীরব হইয়া গিয়াছে।

ইঁহাদের পরে এই যুগের দ্বিতীয় পর্যায়ে উল্লেখ্য হলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অজিত দত্ত, বিষ্ণু দে, জীবনানন্দ দাশ, অমিয় চক্রবর্তী, সমর সেন প্রভৃতি। রবীন্দ্রযুগের জীবনবোধ ও রোমান্টিকতার আপাতবিরোধী ইঁহাদের সকলকেই মনে হয়—কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইঁহাদের প্রায় সকলেই নিজেদের নবীন বিদ্রোহী স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া ফেলিয়াছেন। ইঁহাদের আবির্ভাবকালে যে রোমান্টিকতাবিরোধী সমাজ-সচেতনতা দেখা গিয়াছিল, বাস্তব গ্লানিময় জীবনের তুচ্ছতা সম্পর্কে যে ব্যঙ্গ ও তীক্ষ্ণ শ্লেষ উচ্চকিত হইয়া উঠিয়াছিল—উপরোক্ত অধিকাংশ কবিরই পরিণত বয়সের রচনায় তাহা অন্তর্হিত হইয়াছে। এ যেন যৌবনকালের ক্ষণিক একটা উদ্দামতা—তারপর ধীরে ধীরে তাহা কবির একান্ত ব্যক্তিগত ভালোলাগা মন্দলাগার কল্পলোকে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে। পৃথিবীর চিন্তাধারা, জীবনধারা বিপ্লব ও বিবর্তনের মধ্য দিয়া যে প্রতিনিয়ত অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, তাহার উত্তাল তরঙ্গ যে দেশে-বিদেশে জনচিত্ত সমাজচিত্তকে উন্মোথিত করিয়া তুলিতেছে এবং তাহা যে সভ্যতার পরিণতির পথে, একটা বিশেষ পূর্ণতা ও লক্ষ্যে পৌঁছিতে চায় তাহার কোনও চিহ্ন আর পাওয়া যায় না। যে প্রেমেন্দ্র

একদা ওয়াল্ট হুইটম্যানের প্রেরণায় বলিয়াছিলেন, "আমি কবি যতো কামারের …মুটে মজুরের", বলিয়াছিলেন—তিনি চিরযাত্রী—অগ্রপথিক, পরিণত রচনায় পৃথিবীর বিবর্তনের পথে আর তাঁহাকে দেখা যায় না। আজ প্রেমেন্দ্র থামিয়া গিয়াছেন—কিন্তু বিবর্তিত পৃথিবী আজ অনেক দূর আগাইয়া গিয়াছে। প্রেমেন্দ্র অপেক্ষা ক্ষীণ সমাজ-চেতনার সম্বল লইয়া কাব্যে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বুদ্ধদেব, সুধীন্দ্রনাথ, অজিত দত্ত, জীবনানন্দ, অমিয় চক্রবর্তী ও সমর সেন। একটা বিশেষ কালের যুগপ্রবণতাও ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাব—তথা ইলিয়ট, অডেন প্রভৃতির হতাশামূলক শ্লেষ ও জীবনদৃষ্টি অনুসরণ করিয়া বাঙলা কবিতার ক্ষেত্রে ইঁহারা বাকবৈদগ্ধে, বিদেশী রূপকল্প ও নির্দেশনায় একটা নূতনত্ব আনিয়াছিলেন একথা অনস্বীকার্য। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সচল প্রবল আদর্শায়িত রোমাণ্টিকতার পাশে ইঁহাদের জীবনবিশ্বাস এত প্রবল ও সচল ছিল না—যাহা পালটা একটা বলিষ্ঠ কাব্যধারা গড়িয়া তুলিতে পারে। ইঁহাদের প্রায় সকলেই শেষ পর্যন্ত সেই রবীন্দ্রধারায় আত্মবিসর্জন করিয়াছেন। এই স্তর হইতে একমাত্র আজও সচল হইয়া আগাইয়া চলিয়াছেন বিষ্ণু দে—সভ্যতা ও সমাজচিন্তার বিবর্তনের সঙ্গে তাল রাখিয়া।

এই কালের কবিকুলের সকলের মধ্যেই প্রথম শ্রেণীর কবির এমন এক একটা বিরল গুণ ছিল যা'হা একত্রে নূতন একটা কাব্যধারার সম্ভাবনাকে সুনিশ্চিত করিয়াছিল। প্রথম ধরা যাক নূতন আঙ্গিকের কথা—ভাষা, ছন্দ, রূপকল্প, উপমা-অলঙ্কার ইত্যাদির ক্ষেত্রে ইঁহারা রবীন্দ্রধারা অথবা ইঁহাদের পূর্বসূরী মোহিত-নজরুল-যতীন্দ্রনাথ হইতে একেবারে স্বতন্ত্র। তাহার অভিব্যক্তি ও ব্যঞ্জনা অত্যন্ত উন্নত ধরনের এবং একথা সত্য যে—কাব্যের ক্ষেত্রকে তাঁহারা অনেকখানি বিস্তৃতি দান করিয়াছেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত তাঁহার রোমাণ্টিক আদর্শবাদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াই ইঁহাদের আঙ্গিকের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছেন—'পু-শ্চ' তার উজ্জ্বল প্রমাণ। আঙ্গিকের ঐশ্বর্যে ইঁহারা যেমন বিচিত্র—ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে তেমন একমুখী। কিন্তু সেই এক-মুখিতার দৃষ্টি সুদূরের নয়—পরিণতিপূর্ণ কোনও এক সুদূর লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য নয়, কেবল সাময়িক একটা উত্তেজনার মতো, বিক্ষোভের মতো বিস্ফোরিত হইয়াই যেন শেষ হইয়া গিয়াছে। তাহা না হইলে, প্রেমেন্দ্রের ও বিষ্ণু দের সমাজ-চেতনার বিরলগুণ, বুদ্ধদেবের প্রথম শ্রেণীর অধীর আশান্বিত তীব্র গভীর আবেগ, জীবনানন্দের উন্নত কবিকর্মের আঙ্গিক, অমিয় চক্রবর্তীর বুদ্ধিদীপ্ত অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তি, সুধীন দত্তের ও সমর সেনের বাকবৈদগ্ধ, সীমিত বাক্য ও কবিচিন্তার সংযম—এতগুলি বিরল কাব্যগুণ একত্রিত হইলে

রবীন্দ্রধারার একটা পালটা উন্নত বলিষ্ঠ ধারা সফল ও সার্থক হইয়া উঠিতে অবশ্যই পারিত।

একেবারে সাম্প্রতিক কালে এই যুগের বর্তমান ধারা প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। এখানে বিষ্ণু দে এখনও সচল। এ স্তরে আছেন বিমলচন্দ্র ঘোষ, সুকান্ত ভট্টাচার্য, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, গোলাম কুদ্দুস প্রভৃতি। এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করার মতো এই যে, পূর্ববর্তী স্তরের তীক্ষ্ণতা, বুদ্ধির দীপ্তি, কবিকর্মের উজ্জ্বল উৎকর্ষতা ও আঙ্গিকের নূতনতর প্রতিশ্রুতি বর্তমান ধারায় অনেকখানি ঝিমাইয়া গিয়াছে। ইহারা অবশ্য এখনও অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন—পরিণতি এখনও অপেক্ষমান। শুধু থামিয়া গিয়াছে চিরকালের জন্য একজন—তরুণ সুকান্ত ভট্টাচার্য। এই তরুণ কবির সুগভীর জীবন-স্বীকৃতি, নিঃসংশয় যুগপ্রবণতা, বিস্ময়কর কবিকর্ম ও বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বল আঙ্গিক "ছাড়পত্রে"র কয়েকটি কবিতায় সম্ভাবনাময় নূতন একটি বলিষ্ঠ ধারা ও যুগের দিকে দিক্‌নির্দেশ করিয়াছে। কিন্তু মৃত্যুর গাঢ় আলিঙ্গন সর্বাপেক্ষা প্রতিশ্রুতিপূর্ণ কবিটিকে বাঙালী পাঠকের কাছ হইতে চিরদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে।

আমার প্রিয় গ্রন্থকার—শরৎচন্দ্র

॥ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা ॥ ভালোবাসার কারণ ॥ উপন্যাসের দৃষ্টান্ত ॥ 'মহেশে'র আলোচনা ॥ 'মহেশে'র বক্তব্য ॥ উপসংহার ॥

কয়খানা বই বা জীবনে পড়িলাম? কয়জন গ্রন্থকারের সাধনার সন্ধান লাভ করিতে পারিয়াছি? হেম, নবীন, বঙ্কিম, মধুসূদন, বিহারীলাল আর রবীন্দ্রনাথ—তাঁহাদের ঋদ্ধি আর সিদ্ধির কোন সঞ্চয়ই তো আমার জীবনে আনিতে পারি নাই। 'রৈবতকে'র বন্ধুপ্রীতি, 'সুভদ্রা'র পূর্বরাগ, 'কুরুক্ষেত্রে'র ধর্মযুদ্ধ আর 'প্রভাসে'র মহামিলন কী আমায় দিল? পৌরাণিক কাহিনীর কত কথাই তো হেমচন্দ্র আমাদের শোনাইলেন—তাহার কিছু ভাল লাগে, কিছু লাগে না। বেশিদিন তাহার কথা মনে থাকে না। ভারতচন্দ্র আর গুপ্ত কবির অলঙ্কার আর হাস্যরস প্রাণ স্পর্শ করে না। 'সারদা'কে ভাল লাগিয়াছে। তাহাকে দেখিবার জন্য ইতস্তত আমার দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়াছি। নভোমণ্ডলের মধ্যে বিহারীলালের কবি-মনকে উপভোগ করিতে চাহিয়াছি—কিন্তু আমার সে দৃষ্টি কই? মহাকাব্য মেঘনাদবধের ঐশ্বর্য ভাল লাগে না, এমন কথা কে বলিবে? কিন্তু সে জ্ঞানের জিনিস, প্রাণের নয়। সাহিত্য জগতে বঙ্কিমের তুলনা বিরল। তাঁহার ভাবের

অতলান্ত গভীরতা, ভাষার বিপুল ঐশ্বর্য, সমাজে আদর্শ স্থাপনের অপূর্ব কৌশল লোকের বিস্ময় উদ্রেক করে। সূর্যমুখী আর কুন্দকে সহানুভূতির সঙ্গে স্মরণ করি, তিলোত্তমার সৌভাগ্য দেখিয়া খুশী হই, আয়েষার সমুন্নত চরিত্রের কাছে মাথা নত করি। বঙ্কিমের বিপুল প্রতিভা দেখিয়া চমৎকৃত হই—দূর হইতে তাঁহাকে আমার প্রণাম নিবেদন করি। কিন্তু তাঁহার কথার মধ্যে তো তাঁহাকে আমার আপন ঘরের স্বজন বলিয়া ভাবিতে পারি না। আর রবীন্দ্রনাথ—স্বয়ং মহোদধি! তাঁহার কাব্য চিরনবীন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দর্শনের গভীরে যাইবার শক্তি কোথায় আমার? তাই ভালবাসি শরৎচন্দ্রকে।

শুনি, ষড়ঋতুর মাঝে শরতের চন্দ্রই নাকি সর্বাপেক্ষা সুন্দর। কুয়াশায় ঢাকা শরতের আকাশের চন্দ্র রহস্যে ঘেরা। তাই বুঝি সে এত সুন্দর—আকর্ষণের বস্তু। সাহিত্যের শরৎচন্দ্রও সুন্দর—বহু মনকে আকর্ষণ করেন তিনি। কিন্তু এই চন্দ্র রহস্যে ত ঢাকা নয়। শরৎচন্দ্রের কথা আমাদের অতি সাধারণ জনের ঘরের কথা—আমাদের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনাকে রূপ দিবার জন্যই যেন তাঁহার সাহিত্য। বিধবা রমা—আমাদের ঘরের মেয়ে। বেদনায় তাহার বুক ফাটিয়া যায়, কিন্তু মর্যাদা তাহার মুখ ফুটিতে দেয় না। সিদ্ধেশ্বরী আমাদেরই গৃহলক্ষ্মী—বৃহৎ পরিবার বাঁচিয়া থাকে তাঁহারই কল্যাণ-হস্তের স্পর্শে। সাবিত্রী আমাদের পরিচিতা, রাজলক্ষ্মীকেও চিনি না এমন কথা কি বলিতে পারি! আমাদের মনেরই একান্ত গভীরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন শরৎচন্দ্র। সঙ্কোচে-শঙ্কায়, বিষাদে-নিরাশায় ভীত আমাদের মনটিকে তিনি ডাক দিয়াছেন। বন্ধুপ্রীতি আর মাতৃস্নেহে আমাদের অসংখ্য ক্ষতস্থানে হাত বুলাইয়াছেন শরৎচন্দ্র। তাঁহাকে তাই ভাল না বাসিয়া পারি না। দুঃখের দিনে তাঁহার কাছে সান্ত্বনা খুঁজি—সমস্যায় বন্ধুর মতো তিনিই মন্ত্রণা দেন—পীড়িত অবসন্ন চিত্তকে মাতৃস্নেহে লালন করেন। গুরুর আসন তাঁহার জন্য নয়—উপদেশ আর দীক্ষা দিবার দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেন নাই। শরৎচন্দ্রকে বুঝি, তাই এত ভাল লাগে—তাই তিনি এত আপন, এত প্রিয়।

বহুমনের বিশ্লেষণ করিয়াছেন শরৎচন্দ্র; সমাজলাঞ্ছিতা আর ভাগ্যবিড়ম্বিতা বহু নারীর মনের দিকে সমাজের দৃষ্টি তিনি আকর্ষণ করিয়াছেন। কত বিমূঢ়া নারীর অন্তর্বেদনার ইতিহাস তাঁহার কাছ হইতে আমরা পাইয়াছি। বাঙলা সাহিত্যে তাই শরৎচন্দ্রের গ্রন্থ অনেকখানি স্থান অধিকার করিয়া আছে। শরৎচন্দ্র ঔপন্যাসিক, শরৎচন্দ্র সমালোচক; শুধু তাহাই নয়, শরৎচন্দ্র ছোটগল্পেরও লেখক। 'দেবদাস', 'গৃহদাহ', 'চরিত্রহীন', 'শ্রীকান্ত', 'বড়দিদি', 'নিষ্কৃতি', 'পরিণীতা' সমাজের মধ্যে নূতন চেতনার সঞ্চার করিয়াছে। সমাজের নানা স্তরের নারীর জীবনে যে

সমস্যাসঙ্কুল কত প্রশ্ন আছে, সমাজের সামনে শরৎচন্দ্র আজ তাঁহার এই উপন্যাসের ভিতর দিয়াই সেই সব প্রশ্ন তুলিয়া ধরিয়াছেন। শরৎচন্দ্রের এই সব সাহিত্যই নারীর অমূল্য সম্পদ। বহুবার ইহাদের পড়িয়াছি—কিন্তু যখনই পড়ি, মনে হয় যেন তাহাদের আমি আবার নূতন করিয়া দেখিলাম। কিন্তু তবুও বলি 'দত্তা'র শরৎচন্দ্র, 'চন্দ্রনাথ' আর 'স্বামী'র শরৎচন্দ্র সমাজের বহু সমস্যার মধ্যে, নারীর হৃদয়বেদনার জটিল প্রশ্নের মধ্যে কোথায় যেন হারাইয়া যান। উপন্যাসের বিচিত্র চরিত্রের অন্তরালে শরৎচন্দ্রকে পাই না। দরদী শরৎচন্দ্রের মনের আরও নিবিড় অনুভূতির জন্যই যেন মনে একটা আকাঙ্ক্ষা জাগে। এই আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি হয়, যখন অনুভূতিকাতর দরদভরা শরৎচন্দ্রের মনের নিবিড় স্পর্শ পাই 'অভাগীর স্বর্গে'র রথের মাঝে, 'ছবি'র রেখায় রেখায় আর 'মহেশে'র নিবিড় গভীর কালো চোখ দুইটির বেদনাভরা ক্ষুধায়। ভালবাসি এই মহেশকে আর সেই সঙ্গে তাহার অমর স্রষ্টা শরৎচন্দ্রকে।

কাশীপুর গ্রাম। প্রচণ্ড গ্রীষ্মের অনাবৃষ্টির আকাশ হইতে আগুনের শিখা মাঠের বুকের শেষ রক্তবিন্দুটিকে শুষিয়া লইতেছে। চাষীর শেষ সম্বল বীজের ধান কয়টিও নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। সমস্ত গ্রামের চাষীর ক্ষুধার অন্ন, বুঝিবা পিপাসার জলটুকুও নাই। এমনি এক পটভূমিকায় দাঁড়াইয়া আছে চালভাঙা জীর্ণ এক কুটির—তারই আঙিনায় গফুর জোলা আর আমিনা ; আর কালো চোখের সজল দৃষ্টি লইয়া দাঁড়াইয়া আছে অস্থিসার নর্বাক মহেশ। এইটুকুই 'মহেশে'র ছবি। ইহার মধ্যে কোন প্রশ্ন নাই, মানবমনের কোন জটিলতা, নীতিবোধের কোন তর্ক এখানে নাই। সমস্ত পরিবেশ হইতে 'মহেশ'কে তুলিয়া আনিয়া শরৎচন্দ্র যখন তাহাকে আমাদের সামনে ধরিলেন তখন শুধু তাহার দরদী মনের আলোসম্পাতে 'মহেশে'র ভিতর দিয়া সংসারের বিচিত্র রূপ আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিলাম জমিদারদের ; ধানের তো কথাই নাই, 'বেবাক খড়' সরকারে গাদা হইয়া যায়, চাষীর জন্য কুটোটিও থাকে না। এই ধান এই খড় চাষীর সারা বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল। আমাদের দেশের সকল ব্রাহ্মণই তর্করত্ন। মুখের এই তর্ক আর গলার অর্থহীন উপবীত এই ত তাহাদের সম্বল। এই দুইয়ের সমবেত শক্তির জোরেই তাঁহারা সমাজের মাথায় আসন পাতিয়া বসিয়া আছেন। কাশীপুর—হিন্দুর গাঁ, জমিদার ব্রাহ্মণ, এহেন শুদ্ধ পবিত্র গাঁয়ে গফুরের মহেশ না খাইয়া মরিতে বসিয়াছে। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ তর্করত্ন ইহা সহ্য করেন কি করিয়া। ঝাঁঝালো শাসন বাহির হইয়া আসে তাঁহার মুখ দিয়া। জ্বরে পুড়িতে পুড়িতেও তাঁহার উপদেশের বাণী দাঁড়াইয়া শুনিতে হয় হতভাগ্য নিঃসম্বল গফুর মিঞাকে। কিন্তু তাহার 'চার

চারটে গাদা' হইতে মৃত্যু-পথযাত্রী মহেশের জন্য 'কাহন দুই' খড়ও বাহির হইয়া আসে না। হাতে তাহার ছাঁদায় বাঁধা চাল-কলা, তার গন্ধ পাইয়া ক্ষুধার্ত মহেশ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। হায় মহেশ! সে জানে না যে সে 'বলদ', তাহাও আবার চাষীর বলদ। তর্করত্নকে পথ দেখিতে হয়; কিন্তু যাইবার সময় তাহার মুখের সেই পৈশাচিক মুচকি হাসি শরৎচন্দ্রের ব্যথাভরা সজল দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই।

আবার পৃথিবীর এই রক্তশোষী নির্দয়তার পাশেই আছে স্নেহ আর দয়ার পবিত্র নির্ঝরধারা। আটটি 'সন' ধরিয়া মহেশ গফুরের ঘরে সোনার ধান তুলিয়া দিয়াছে। সেই মহেশকে আজ সে খাইতে দিতে পারে না। দুঃখে গফুরের গলা বুজিয়া আসে, চোখ দিয়া টপ টপ করিয়া জল গড়াইয়া পড়ে। মুসলমান গফুর গো-হাটার কথা শুনিলে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে। মহেশকে খাইতে দিতে পারে না, কিন্তু সে তাহার আদরের মহেশকে তাহার উজাড় করা প্রাণটিকে ঢালিয়া দিতে পারে। গফুর তাই শুধু বলে—"কিন্তু তুইতো জানিস তোকে আমি কত ভালবাসি।" মহেশ তাহা জানে, জানে বলিয়াই ত এই আদরে চোখ বুজিয়া আরামে প্রভুর দিকে সে গলাটা বাড়াইয়া দেয়।

বাঙলার বুকের মাতৃস্নেহ রূপ নিয়াছে আমিনার বুকে। সংসারের বড় তিক্ত অভিজ্ঞতায় মাতৃহীন সংসারে দশ বছরের মেয়ে আমিনা আজ মাতৃরূপে অবতীর্ণ। তাহার অভিজ্ঞতার কাছে পিতার ছলনাটুকু ধরা পড়ে। কিন্তু সে তাহাকে ব্যথা দিতে পারে না। পিতার সব ভাতটুকুই তাহাকে মহেশের সামনে ধরিয়া দিতে হয়। "রাতের বেলা আমাকে আর একমুঠো ফুটিয়ে দিতে পারবি না আমিনা?" প্রত্যুত্তরে সে ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকে, তারপর ধীরে ধীরে বলে— "পারবো।' কিন্তু যখন দেখে মহেশের খাবার সংস্থান করিতে গিয়া পিতার মাথা গুঁজিবার চালটুকুও সব চলিয়া যাইতেছে—তখন গফুরকে সতর্ক না করিয়া ত সে পারে না—"দেওয়ালটা পড়ে যাবে যে বাবা।" গফুরের চেয়ে একথা আর বেশী জানে কে, অথচ উপায়ই বা কি।

কিন্তু পৃথিবীতে ন্যায় কোথায়? বিচার এখানে কে করিবে! শক্তিমদগর্বিত পৃথিবীর মাঝে ধর্মের জয় আর আছে কি? জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে সভ্যতার বহু দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া আজ আমরা ত্রিভুবন বিজয়ের জয়তিলক ললাটে পরিয়াছি—। আর তাহারই অন্তরালে গফুরের ছোঁয়ার শঙ্কায় তর্করত্ন চীৎকার করিয়া উঠেন; আমিনার ঘরের শূন্য কলসী পিপাসাকাতর গোফুরের মুখে এক ফোঁটা জল দিতে পারে না। এই বিজয়ের মূল্য দিতে গিয়াই তৃষ্ণাকাতর ক্ষুধার্ত মহেশকে প্রভুর হাতেই প্রাণ দিতে হয়, ঘুমন্ত মেয়ের হাত ধরিয়া অন্ধকারের

অন্তরালে গফুর পা বাড়ায় ফুলবেড়ের চটকলের উদ্দেশে—যেখানে ধর্ম থাকে না, মেয়েদের ইজ্জত আর আব্রু থাকে না। পিছনে পড়িয়া থাকে তাহার সংসারের সম্বল—জল খাবার ঘটি আর পিতলের থালা। ঐ দিয়া তাহার মহেশের প্রায়শ্চিত্ত হইবে। শুধু এই একটি মহেশের সজল চোখের দৃষ্টিতে ধরা দিয়াছে অতীত আর বর্তমান; অনাগত সব ভবিষ্যৎ; সবলের শোষণ আর দুর্বলের নীরব ধৈর্য; প্রেম আর ত্যাগের মাধুর্য। আর সেই সঙ্গে দেখিতে পাইলাম আমাদের ধর্ম, আমাদের শিক্ষা আর সভ্যতা।

'মহেশে' উপন্যাসের বিস্তার নাই, চরিত্রের জটিলতা এখানে পাই না—নীতি-বোধের কোন তর্ক সমাজপতিদের সামনে আনার প্রয়োজন হয় নাই। শুধু একটি মাত্র চিরন্তন সত্যকেই শরৎচন্দ্র এখানে রূপ দিয়াছেন—যে সত্যের আলোকে সভ্যতার মুখোশকে অতিক্রম করিয়া মানুষ মানুষের আদিম পশুপ্রবৃত্তিকে দেখিতে পায়। আর সেই রক্তপিয়াসী পশুর হিংসার পাশে যদি আমিনার স্নেহ আর গফুরের প্রেম না থাকিত তাহা হইলে সেই হিংসার আগুনে সমস্ত পৃথিবীই ফাটিয়া চৌচির হইয়া যাইত। সংসার বাঁচিয়া আছে গফুরের বুকে—সংসার আগাইয়া চলিয়াছে আমিনার হাত ধরিয়া। এই নিরলঙ্কার, অনাড়ম্বর সহজ সরল সত্যকেই ভালবাসি, 'মহেশ' তাই আমার এত প্রিয়।

সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা

।। সংবাদপত্র চতুর্থ অঙ্গ ।। সংবাদপত্রের অপরিহার্যতা ।। জীবনের সকল দিকই প্রতিফলিত ।। বিশ্বের ব্যবধান কমিল ।। ইতিহাস ।। ।। সংবাদ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠান ।। জনশিক্ষা ও সংবাদপত্র ।। সাংবাদিক জগতে প্রয়োগ বিস্তার উন্নতি ।। অমঙ্গল ক্ষমতা ।। সাংবাদিকতার গুণাবলী ।।

ইওরোপে একটি চলতি কথা আছে যে, সংবাদপত্র রাষ্ট্রের চতুর্থ অঙ্গ। রাষ্ট্রীয় কর্মচারী, ধনিক গোষ্ঠী ও উৎপাদক শ্রমিক শ্রেণীর মতই রাষ্ট্রের ধারক ও বাহক হইতেছে সংবাদপত্র ও তাহার সঙ্গে জড়িত সাংবাদিক জগৎ।

আধুনিক সমাজ-জীবনে সংবাদপত্রের প্রভাব ও প্রচলনের ব্যাপকতা সম্বন্ধে ইহা অপেক্ষা বড় স্বীকৃতি আর কিছু নাই। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে বিবর্তনের স্বাভাবিক নিয়মে বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ দেশ ও কালের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। আর দেশ ও কালের দূরত্ব জয় করিয়াছে সংবাদপত্রের মাধ্যমে।

ভোরে উঠিয়া সংবাদপত্র হাতে লইলেই যেন ধরাকে সরা-সম জ্ঞান হয়। কোথায় কলিকাতা আর কোথায় নিউইয়র্ক-ওয়াশিংটন! সংবাদপত্রের কল্যাণে ওয়াশিংটনের হোয়াইট হলে পৃথিবীজয়ী মার্কিন শাসকগোষ্ঠী কি করিতেছে তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা আমি ঘরে বসিয়া কাগজ খুলিয়াই হয়তো জানিতে পারিতেছি। চমকিয়া উঠিলাম—সুয়েজখাল লইয়া যুদ্ধের দামামা বুঝি বাজিল! না, পরদিনই সংবাদ আসিল—রাশিয়ার চরমপত্রে আপাতত বিপদ কাটিয়া গেল! সশঙ্কিত দুরুদুরু বুক শান্ত হয়! পৃথিবীর এক প্রান্তে চীনের কৃষক নবপ্রেরণায় কি করিয়া কৃষির ফলন বাড়াইতেছে—সে সংবাদ বহন করিয়া আনে আমার সংবাদপত্র। বিজ্ঞানের আবিষ্কার, সাহিত্যিকের অবদান, রাষ্ট্রনেতাদের উপদেশ, আন্তর্জাতিক সমস্যাবলীর অবস্থা এই সব জটিল জিনিস যেমন সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় থাকে তেমনি থাকে হাসি-কৌতুকের খোরাকও। কোথায় আণবিক প্রতিক্রিয়ায় একটা সাধারণ মানুষ দৈত্যের ন্যায় লম্বা হইয়া গেল, কোথায় বাঘের ঘরে কোন মানুষ লালিত পালিত হইল, কে জল স্পর্শ না করিয়াও কতকাল বাঁচিয়া আছে এই সব খবরও সংবাদপত্র পাঠেই আমরা জানি।

জীবনের অন্য অঙ্গ আমোদপ্রমোদও বাদ নাই। অবকাশ বিনোদনের রীতি মানুষ ভেদে বিভিন্ন প্রকারের। কেউ ক্রীড়ামোদী—তার চাই দেশের ও বিদেশের খেলার খবর। বিশ্ব কাপের ফুটবল খেলায় আর্জেণ্টাইন জিতিল না রুশ, কি হাঙ্গারী জিতিল, তাহা লইয়া যাহারা গবেষণা করে সংবাদপত্র তাহাদের হাতে হাতে ঘুরিতে থাকে। মুষ্টিযুদ্ধের খবর যে চায় সে দেখে রকি মার্সিয়ানো কত পয়েণ্টে রবিনসনকে পরাজিত করিল। ক্রিকেটের তো কথাই নাই। টেস্ট খেলার যে কোন খবরই সংবাদপত্রলোভীদের আগ্রহের বিষয়। ওনীল সেঞ্চুরী করিল কিনা, স্ট্যাথাম বডিলাইন দিয়া বল করিয়া কি ত্রাস সৃষ্টি করিল—সংবাদপত্র হাতে লইয়া চলে এসবের আলোচনা। সিনেমাজগতের বার্তাও বহন করিয়া আনে সংবাদপত্র। কোন বিশ্ববরেণ্য অভিনেতাকে আগামী কোন্ ছবিতে দেখা যাইবে সেই দুশ্চিন্তার সমাধান করে প্রাত্যহিক সংবাদপত্র।

আমোদপ্রমোদ ছাড়া ঘরোয়া জীবনেরও বহু সংবাদই আজ সংবাদপত্রের বুক হইতেই সংগ্রহ করিতে হয়। বাড়িভাড়া, পাত্রপাত্রী, বিদ্যালয়ে ভরতি, ব্যবসায়-বাণিজ্য সর্ব বিষয়ের প্রয়োজনীয় বহু সংবাদ সংগৃহীত হয় সংবাদপত্র হইতেই।

দেশের আর্থিক বনিয়াদের পরিচয়ও মেলে সংবাদপত্র পাঠে। বড় বড় কোম্পানীর শেয়ারের দর, সরকারী ঋণপত্রে সুদের হারের তারতম্য, বাজারে প্রচলিত নোটের পরিমাণ প্রভৃতি দেখিয়া অর্থনীতিবিদগণ দেশের আর্থিক অবস্থা

বুঝিতে পারেন। কোন্ জাহাজ কোথা হইতে আসিতেছে, কোথায় যাইবে—তাহাতে কি পণ্য আছে—এইসব সাধারণ লোকের কাজে না লাগিলেও ব্যবসায়ী মহলের একান্ত প্রয়োজনীয় সংবাদ।

ইহা ছাড়াও আছে আবহাওয়ার সংবাদ। সংবাদপত্রের একটি কোণ এইজন্য প্রত্যহই সংরক্ষিত থাকে। ঐ সংবাদটুকু রাষ্ট্রের জীবনে মহা গুরুত্বপূর্ণ। আবহাওয়ার রিপোর্টের উপর নির্ভর করে বিমান চলাচল, কৃষিকাজ এবং আরও কত কি। সকলের শেষে নাম করিতে হয় বিজ্ঞাপিত পণ্য দ্রব্যাদির। সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়া বিক্রেতা তাঁহার উৎপন্ন দ্রব্য ক্রেতার নজরে আনেন। অতি সহজেই ক্রেতাবিক্রেতার মিলন ঘটাইয়া সংবাদপত্র ব্যবসায় জগতের এক অতি মূল্যবান কর্তব্য সম্পাদন করিয়া থাকে।

এক কথায় সংবাদপত্র পাঠে বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে আমাদের নিবিড় পরিচয় ঘটে, তাহাদের বিভিন্ন কার্যপ্রকরণ ও চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হইয়া আমরা ধন্য হই। প্রতিদিনের সংবাদপত্র যেন বিগত দিনের বিশ্বের কর্মচঞ্চল রূপটিকে ধরিয়া দেয় আমাদের চোখে। কাজেই বিশাল বিশ্বের সঙ্গে নিভৃতমনের সংযোগ সাধন করিতে হইলে সংবাদপত্র আজ অপরিহার্য।

আজ আমরা সংবাদপত্রহীন অবস্থার কথা মনেও আনিতে পারি না। সংবাদপত্র পাঠের এতই সহজ-অভ্যাস হইয়াছে যে, ভাবিতেও পারি না পৃথিবীতে সত্যই একদিন সংবাদপত্র বলিয়া কিছু ছিল না। অতি নিকটের সংবাদও কেহ রাখিত না। দূরের তো কথাই নাই। মার্কো পোলোর মতো কেহ দূরদেশ ভ্রমণ করিয়া ফিরিলে আত্মীয় পরিজন পরিবৃত হইয়া যে সংবাদ আলোচনা করিত তাহা হয়তো বহু বৎসরের পুরাতন।

কিন্তু মানুষের আগ্রহ ও কৌতূহলের প্রশমন তাহাতে হইত না। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে তাহারা আরও উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল দূরের সংবাদ জানিবার জন্য।

একদা এই তাগিদেই সংবাদপত্রের আবির্ভাব ঘটে। রাজদপ্তরের জন্য সাম্রাজ্যের বিভিন্ন দূরতম প্রদেশের সংবাদসংগ্রহ করাকে যদি সংবাদপত্রের আদি জনক বলিতে পারি তো বলা যায় চীনেই সংবাদপত্রের প্রথম প্রতিষ্ঠা। চীনের সেই সংবাদপত্র প্রকাশিত হইয়াছিল আজ হইতে ৯০০ বছর আগে। ভারতেও মোগলদরবারে ইহার প্রচলন ছিল। ইওরোপের মধ্যে ইতালীতে প্রথম সংবাদ-পত্রের প্রচার হয়। ইংলণ্ডে ইহার প্রচার হইয়াছিল রানী এলিজাবেথের যুগে।

ভারতে আধুনিক সংবাদপত্র প্রচারের গৌরব ইওরোপীয় মিশনারী সম্প্রদায়ের। 'সমাচার দর্পণ' ভারতের প্রথম সংবাদপত্র বলিয়া আজ অবধি স্বীকৃত।

সংবাদপত্রের সংবাদ সংগ্রহের জন্য নিজস্ব সংবাদদাতাদের গোষ্ঠী থাকে। কোন কোন প্রতিষ্ঠান সে দায়িত্ব বহন করার উদ্দেশ্যে সংবাদ সরবরাহের ব্যবস্থা করে। রয়টার, রাশিয়ার টাস, চীনের সিনহুয়া, আমেরিকার অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস প্রভৃতি সেই জাতীয় প্রতিষ্ঠান।

তবে আধুনিক সংবাদপত্রের প্রথম প্রচারের গৌরব অর্জন করেন জার্মান সংবাদসেবী রয়টার। তিনি ব্যবসা সংক্রান্ত সংবাদাদি জার্মানী আর ইংলণ্ডের মধ্যে ফেরি করিবার জন্য সংবাদদাতা নিয়োগ করিয়া প্রথম সংবাদপত্রের ভিত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই যুগের সভ্যতা ব্যবসা-বাণিজ্যকে অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে, তাই সংবাদপত্রের উদ্ভব ব্যবসার তাগিদে। ক্রমে ক্রমে সেই ব্যবসার বুলেটিন রূপান্তরিত হইল আধুনিক সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানে।

বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে তাল রাখিয়া সংবাদপত্রও বিস্ময়কর ভাবে উন্নত হইয়াছে অল্প কিছুদিনের মধ্যে।

মুদ্রাযন্ত্রের উন্নতি ঘটায় লাইনোটাইপে অতিদ্রুত সংবাদ কম্পোজ করা হইতেছে, সংবাদ পরিবহণের উন্নতির ফলে টেলিপ্রিণ্টারে সরাসরি খবর আসিতেছে, বিজ্ঞানের সার্থক প্রয়োগের ফলে ফটোও আসে রেডিওযোগে এবং সব ব্যবস্থার শেষে মুদ্রাযন্ত্রের অপূর্ব উন্নত সংস্করণ রোটারী মেশিনে মিনিটে হাজারে হাজারে সংবাদপত্র মুদ্রিত হইতেছে।

সংবাদপত্র আজ সাংস্কৃতিক জীবনের এক অপরিহার্য অঙ্গ বিশেষে পরিণত। দেশে শিক্ষার প্রসারের সহিত সংবাদপত্র পাঠকের সংখ্যাও দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। শিক্ষিতের সংখ্যা বেশী বলিয়া জাপানের সংবাদপত্র পাঠকের সংখ্যা ধনতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে সর্বোচ্চ। সমাজতন্ত্রীদেশে আজ সংবাদপত্রের প্রয়োজনীয়তা খাদ্য ও পরিধানের মতই প্রয়োজনীয়।

সংবাদপত্রে যে কেবল দেশবিদেশের সংবাদই থাকে তাহা নয়। নানাবিধ মননশীল রচনাতেও সংবাদপত্র সমৃদ্ধ থাকে। সমাজনীতি, রাজনীতি, দর্শন, সাহিত্য—সর্ববিষয়ে অভিজ্ঞব্যক্তির লেখা থাকে সংবাদপত্রে ; সেইজন্য লোকশিক্ষার পক্ষে সংবাদপত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। পুস্তকপাঠের জ্ঞান স্থিতিধর্মী। কিন্তু সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় লব্ধজ্ঞানের পরিধি ক্রমবর্ধমান। পুস্তকের জ্ঞান সংবাদপত্র পাঠের অনুপূরক হইলে তবেই মানুষের ব্যবহারিক জীবনের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি সম্ভব। এদিক দিয়া সংবাদপত্রকে ক্ষুদ্র 'বিশ্বকোষে'র সংস্করণরূপে দেখা চলে। সেইজন্য সংবাদপত্র পাঠ না করিলে জ্ঞান সম্পূর্ণ বিকশিত ও ফলপ্রসূ হইতে পারে না।

সংবাদজগতের সমন্বয়-সাধন ও বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে সংবাদপত্র সর্বাধুনিকতম ফটো, চিত্রকলায় ও নকশায় নানা রঙের সমারোহে আত্মপ্রকাশ করায় ক্রমেই ইহার জনপ্রিয়তা বাড়িতেছে। সমাজের সকল স্তরের লোকই আজ সংবাদপত্র পাঠে স্বীয় আগ্রহ চরিতার্থ করিতে পারে।

দৈনিক সংবাদপত্র এত বিভিন্ন সংবাদ বহন করিলেও ইহার স্থায়িত্ব স্বল্পকাল ব্যাপ্ত। সেইজন্য ক্রমে সাপ্তাহিক, অর্ধসাপ্তাহিক, মাসিক—সাময়িক পত্র-পত্রিকা প্রচারিত হইয়া পাঠকদের স্থায়ী সংবাদ ও প্রবন্ধাদির চাহিদা মেটায়।

সংবাদপত্রে শুধু সংবাদ পরিবেশিত হয় না। তাহাতে সংবাদের ভাষ্য ও ব্যাখ্যাও থাকে । ঐ সব ভাষ্য ও ব্যাখ্যার মধ্য দিয়া জাতীয় জীবনের বিভিন্ন স্তরের পাঠকদের মনের গতি নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা চলে। ইহাকেই বলে জনমত গঠন। জনমতের প্রকাশের ব্যবস্থাও থাকে সংবাদপত্রে। সেই কাজ সম্পাদকের এবং চিঠিপত্র বিভাগের।

গণতন্ত্র কার্যকরী করিতে হইলে সুস্থ সংবাদপত্র প্রচারের প্রয়োজন সকলের আগে। রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির ভাষ্য ও ব্যাখ্যা দ্বারা দেশবাসীর রাজনীতি চর্চার সুযোগ করিয়া দেয় সংবাদপত্র। প্রকৃতপক্ষে রাজনীতিবিদ, রাজনীতিক দল ও গোষ্ঠী সংবাদপত্রের মাধ্যমেই স্বীয় মতামত জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করে। সমাজের দুর্নীতি ও কুসংস্কার দূর করিতে হইলে কিংবা সরকারী অনাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামিতে হইলে সকলে সংবাদপত্রেরই দ্বারস্থ হয়। এইসব ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের ক্ষমতা অসীম এবং দায়িত্ব ততোধিক।

এত ক্ষমতাশালী বলিয়াই ইহার ক্ষমতার অপব্যবহারের আশঙ্কা থাকে প্রতিপদে। সংবাদপত্রের উপর ধনতন্ত্রীদেশে ব্যক্তিগত মালিকানা বজায় থাকায় প্রায়ই ব্যক্তি ও শ্রেণীর স্বার্থে সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রিত হয়। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী আপন স্বার্থ প্রচারের হাতিয়াররূপে সংবাদপত্রকে ব্যবহার করায় সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গী গড়িয়া উঠিতে পারে না। তাহা দেশের পক্ষে অকল্যাণকর।

ধনতন্ত্রীদেশসমূহে বিভিন্ন রাজনীতিক দল আপন আপন আদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে সংবাদপত্র প্রকাশ করে। তাহার ফলে সত্য প্রায় ক্ষেত্রেই রাজনীতিক স্বার্থের নিকট উপেক্ষিত হইয়া থাকে। তুচ্ছ স্বার্থের বশবর্তী হইয়া সাংবাদিক বিবেকবুদ্ধি বিসর্জন দিয়া সংবাদপত্র জনগণের পক্ষে অভিশাপ স্বরূপ হইয়া উঠে।

জনগণের সেবার এত সুযোগ থাকে বলিয়া সাংবাদিকতার পেশা পৃথিবীতে মহত্তম বলিয়া স্বীকৃত। ইহার জন্য চাই বিশেষ শিক্ষা ও মানসিক প্রস্তুতি,

সত্যকার দেশপ্রীতি, মানবপ্রীতি ও ঔদার্য। কোন্ সংবাদটির কি তাৎপর্য তাহা বুঝিতে হইবে সাংবাদিককে।

সাংবাদিকগণই সংবাদপত্রের প্রধান অবলম্বন। বিপদের মধ্যে দাঁড়াইয়াও তাঁহাদের সংবাদ সংগ্রহ করিতে হয়। যুদ্ধক্ষেত্রের সংবাদদাতাদের কাজ সেজন্য রোমহর্ষক। আবার সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের রিপোর্ট প্রকাশ করাও তেমনি মহান প্রচেষ্টারই আর এক দিক।

বর্তমান জটিল জাগতিক পরিবেশের পটভূমিকায় সংবাদাদি যাচাই করা প্রভূত বিদ্যাবুদ্ধির অপেক্ষা রাখে। যেমন বিদ্যাবুদ্ধি, তেমনি দূরদৃষ্টি ও রাজনীতি জ্ঞান আবশ্যক। সকলের উপরে চাই সত্যনিষ্ঠা ও নির্ভীকতা।

আদর্শ সাংবাদিককে জনস্বার্থের বৃহত্তর কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া জাতিকে রাজনীতিক ও সামাজিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে। জনশিক্ষার বাহনরূপে সাংবাদিকতা বৃত্তি অবলম্বন করিতে হইবে। একটা মুহূর্তের জন্য ভুলিলে চলিবে না যে, তাঁহার লেখনী যেমন শান্তিবারি সেচন করিতে পারে তেমনি কুউদ্দেশ্যে পরিচালিত হইলে তাহার অনিষ্টকর শক্তির তুলনা পাওয়া যাইবে না।

বাঙলা সাহিত্যে ছোট গল্প

ছোট গল্পের সংজ্ঞা ॥ বাঙলায় ছোট গল্পের বিবর্তনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ॥ ছোট গল্পের উপজীব্য ॥ মোপাসাঁর অভিমত ॥ ফরাসী লেখকগণ ও গোগোল ॥ ছোট গল্পের জন্মদাতা ॥ চতুর্থ দশকের ছোট গল্পের ধারা ॥ কল্লোল গোষ্ঠী ॥ প্রগতি দৃষ্টি ॥ জীবন বিমুখ গোষ্ঠী ॥ প্রগতিশীলের বিপত্তি ॥

ইংরেজ কবি রসেটি চতুর্দশ পদাবলীর কবিতাকে **moment's monument** বলিয়াছিলেন। সে কথা বোধ হয় ছোট গল্পের ক্ষেত্রেও খাটে।

জীবনের একটি খণ্ড-মুহূর্তকে বিচিত্র গৌরবে ও বর্ণাঢ্য সমারোহে অমর স্মৃতি-বাসরে রূপান্তরণ নিশ্চয়ই ছোট গল্পের চরম ও পরম সার্থকতা। সংযত প্রকাশ-ভঙ্গীর মাধ্যমে অতি সূক্ষ্ম জীবনবোধ ছোট গল্পকে মহৎ সৃষ্টির পর্যায়ে লইয়া যায়। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ছোট গল্পগুলি অমরত্ব লাভ করিয়াছে এই সব গুণের ফলেই।

মানব জীবনের এই খণ্ডিত আস্বাদটুকুর পরিচয় লাভ বেশী দিনের কথা নয়। কর্মহীন অফুরন্ত অবকাশে সামন্ততান্ত্রিক অভিজাত সম্প্রদায়ের উদ্দাম জীবনের

অলস মুহূর্তগুলি ভরাইয়া দিবার জন্যও মনোরঞ্জনপ্রয়াসী কাহিনী সৃষ্টি হইত। সে ছিল পেঁয়াজের খোসা বা দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের মতো—যতই বলা হইত ততই তাহার সমাপ্তির ছেদ যাইত দূরে সরিয়া। গল্পের ভিতর থাকিত গল্প, আখ্যানের ভিতর উপখ্যান,—কাহিনীর মধ্যে উপকাহিনী। এমনি করিয়াই গল্পের আদিযুগে 'কথা সরিৎসাগর' পাঠক-শ্রোতাদের অভাব মিটাইয়াছে। আরবীয় সংস্কৃতিতে জারিত হইয়া তাহাই পরবর্তীকালে আরব্যোপন্যাস ও পারস্যোপন্যাসরূপে খ্যাতি লাভ করিয়াছিল।

অথচ ইহাব পাশাপাশি ছিল অতি সংক্ষিপ্ত, রাজকুমার-পাঠ্য কথামালা। সে এদেশের পঞ্চতন্ত্র আর হিতোপদেশই হোক, নয়ত গ্রীস দেশের ঈশপের আখ্যান মঞ্জুরীই হোক তাহাতে ক্ষতি নাই।

হয়ত এই ধারা অনুসরণ করিয়া ধনতান্ত্রিক উদ্বর্তনের যুগে কথাশিল্পিগণ নূতন রসের সৃষ্টি করিলেন। ফরাসী দেশের মানস-বিপ্লবের ফলে সৃজনশীল প্রতিভা উদীয়মান ধনিক বা বুর্জোয়া শ্রেণীর জীবনের খণ্ডাংশ লইয়াও মহৎ রসের অবতারণার সুযোগ পাইয়াছিলেন। ধীরে ধীরে তাঁহাদের হাতে ছোট গল্প এক নিপুণ, নিটোল ও নিরাভরণ গাম্ভীর্য লাভ করিল। অতি অল্প আয়তনের মধ্যে নিম্নতম আয়োজনে পরিবেশিত হইল মহত্তম রসসম্পদ। স্বল্পতম আয়োজনে মহত্তম রসসম্পদ পরিবেশনকেই ছোট গল্পের উৎকর্ষের মান নির্ধারক বলিয়া ধরা যায়। ছোট গল্পের লেখনী যেন টর্চ লাইটের শিখা; বিশেষ কোন বস্তুর উপরেই নিবদ্ধ থাকিবে তাহার আলোকরশ্মি। সে লেখনীতে অনাবশ্যক সমস্ত কিছুই বর্জিত হইবে। আকারে প্রকারে তাহাকে ছোটও হইতে হইবে এবং গল্পও হইতে হইবে।

ছোট গল্পের একটি বিশেষ ধর্ম হইল—বিন্দুর মাঝে সিন্ধু দর্শন। জগতের কীর্তিমান লেখকেরা তাঁহাদের প্রতিভা নৈপুণ্যে ইহার স্বল্পায়তনকে সম্ভাবনার বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত করিয়া দিয়াছেন—ওই অল্প একটু সীমার মধ্যে জগৎ ও জীবনের বৈচিত্র্যকে ব্যঞ্জনার সাহায্যে রূপায়িত করিয়াছেন। যুগমানসের পরিবর্তমান সমস্ত ঝোঁকগুলি ইহার মধ্যে খুঁজিয়া পাইতে কষ্ট হয় না। বস্তুত ছোট গল্প জীবনধর্মী ও বিষয়াশ্রিত। সেজন্য মানুষ যেমন ভাবে, যখন যতটুকু জীবনকে বিশ্লেষণ করিয়া তাহার গতিপথের উপব আপন প্রাধান্য বিস্তার করে, ছোট গল্পের সীমিত রেখার টানে তাহাই জীবন্ত হইয়া রহিয়াছে। যন্ত্রযুগ প্রবর্তনের ফলে মানুষের মনে যে আঘাত-সঙ্ঘাত ও বেদনার দোলা লাগিল কেহ তাহার প্রকাশ করিলেন ছোট গল্পে। ফ্রয়েড, স্টেকেল, ইয়ং, য্যাডলার প্রভৃতি

মনোবিকলনের পণ্ডিতগণ যখন মানুষের মনের অবচেতন স্তরে প্রবেশ করিয়া এক অগাধ, বিশাল দিগন্ত আবিষ্কার করিলেন তখন তাহাও বিধৃত হইয়া রহিল ছোট গল্পে। অনেক আপাত অসামঞ্জস্যপূর্ণ ঘটনার ব্যাখ্যা লাভ করায় লেখকের লেখনীও সচল হইল। জীবনের যত বিচিত্র দিক আছে ততই বিচিত্র পথে লেখকের লেখনীর যাত্রারম্ভ হইল।

লেখকের সমস্যা শুধু রচনার উপজীব্য নয়, পাঠকের মনোরঞ্জনও তাহার একটা উদ্দেশ্য। মোপাসাঁর মতো বলিতে হয়, "জনগণ বা পাঠকগোষ্ঠীও বিভিন্ন প্রকারের। তাঁহারা আমাদের ডাকিয়া ফরমায়েশ করেন, আমাকে সান্ত্বনা দাও, আমাকে আনন্দ দাও, আমাকে বিষণ্ণতায় ডুবাইয়া রাখ, আমাকে স্বপ্নে ভাসাইয়া লইয়া চল, জানাও, শিহরণ জাগাও আমার দেহে, কাঁদাও, ভাবনা জাগাও আমার মনে।

"অতি সামান্য কয়েকজন মাত্র বলেন আমাকে এমন কিছু দাও যাহা তোমার শিল্পীমানসের দান ; তোমার যে রূপটি ভাল লাগে সেই রূপ দিয়াই তুমি তাহাকে সুন্দর করিয়া আমার হাতে সঁপিয়া দাও।"

কিন্তু পাঠকের দিকে শুধুমাত্র দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিলেই হইল না। কারণ সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ মনোরঞ্জন নয়। যে লেখক জীবনের সার্থক চিত্রটি ধরিয়া দিতে চাহিবেন, তিনি কখনও একক ঘটনা খুঁজিয়া বেড়াইবেন না, কারণ গল্প বলাই তাঁহার উদ্দেশ্য নয়। আমাদের আনন্দ দেওয়া বা অনুভূতিকে নাড়া দেওয়াও নহে। আমাদের ঘটনাগুলির গভীরে কি অর্থ আছে তাহা বুঝানোই তাঁহার উদ্দেশ্য। তাঁহার দেখার চক্ষু আছে, আর আছে ভাবিবার ক্ষমতা। এই দুই-এ মিশাইয়া তিনি এক অলৌকিক দৃষ্টিতে পৃথিবীকে দেখিয়াছেন, দেখিয়াছেন পৃথিবী ও তাহার মানুষকে। পৃথিবীর সম্পর্কে এই ব্যক্তিগত ধারণাটাই তিনি ছোট গল্পের মাধ্যমে আমাদের নিকট পৌঁছাইয়া দিতে চাহেন। তাঁহার নিকট জীবনের বিশেষ দৃশ্যটি ঠিক যেমন ধরা পড়িয়াছিল অবিকল তেমনটি তুলিয়া ধরিতে পারিলে তবেই তিনি সার্থক হইবেন। এই সার্থকতার জন্য চাই অনন্য কারু-কৌশল, চাই প্রতিভা।

ফরাসী লেখকগণ যেমন ছোট গল্পকে নিপুণ সৃজনশীল নৈপুণ্যে সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন, তেমনি মানবতাবোধ ও সমবেদনশীলতায় তাহাতে মহনীয়তার ছোঁয়াচ দিয়াছিলেন রুশ কথাশিল্পিগণ। জারতন্ত্রের অত্যাচারে ব্যথিত রাশিয়ার আত্মার প্রকাশ পাই প্রথমে গোগোলের 'ওভারকোট' গল্পে। এইজন্য কোন কোন ছোট গল্প সমালোচক একথাও বলেন যে, ছোট গল্পের আবির্ভাব ঘটিয়াছে গোগোলের ওভারকোট হইতে।

পৃথিবীর সব দেশেই ছোট গল্পের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছে। ভাষার বাধা অতিক্রম করিতে না পারায় আমরা ইংরেজীর মাধ্যমে পরিচয় লাভ করিয়াছি শুধুমাত্র ফরাসী, রুশ, ইংরেজী, জার্মান, নারইজীয় ইত্যাদি কয়েকটি দেশের ছোট গল্পের। তাহাদের মধ্যে দ্বিগ্বিজয়ীর গৌরবলাভে ধন্য হইয়াছেন মোপাসাঁ, বালজাক, আলফাঁস দোদে, শেখভ, গর্কী, লুস্থন প্রভৃতি কয়েকজন মাত্র।

বাঙলা সাহিত্যে ছোট গল্পের আর্বির্ভাব ঘটিয়াছে প্রায় ইওরোপের সমকালেই। বাঙলায় সার্থক ছোট গল্প রচনার গৌরব রবীন্দ্রনাথেরই প্রাপ্য। তাঁহার উত্তরাধিকার বহন করেন প্রভাতকুমার মুখোপধ্যায়, শরৎচন্দ্র। ইহাদের বলা চলে ক্লাশিকাল বাঙলা ছোট গল্প লেখক। প্রায় ঐ সময়েই কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতিকে বলিতে হয় ক্লাশিকাল ও রোম্যান্সধর্মী লেখক।

সাহিত্যে বাস্তবতার বিচার বহুযুগের। রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পে যেমন আছে বৈচিত্র্য, তেমনি আছে মাটির কাছাকাছি অতি দরদী জীবনের প্রকাশ। শরৎচন্দ্রও মানব-মনের দ্বিধাদ্বন্দ্বের বিচিত্রলোকে পদচারণা করিয়াছেন। তাঁহার গল্পে মানবতার সঙ্গে সঙ্গে রোমান্সের সৌরভের ছোঁয়াচ লক্ষণীয়।

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে বাঙলা ছোট গল্পে নূতন এক প্রবাহ সঞ্চারিত হইল। পৃথিবীর বুকে সোভিয়েট সমাজতন্ত্রী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় মানব-মন নূতন এক মুক্তির পথ খুঁজিয়া পাওয়ায় দিকে দিকে তাহার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল। সমাজতন্ত্রী জগতের শ্রেষ্ঠ লেখক গর্কী পৃথিবীর তরুণ লেখকগোষ্ঠীকে সম্মোহিত করিলেন। চীনের লুস্থনও তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বাঙলাতেও সোভিয়েট ও রুশ সাহিত্যের প্রভাব গভীরভাবে আসিয়া পড়িল। অন্যদিকে ফ্রয়েড তাঁহার নূতন মতাদর্শে সযত্নে লালিত সনাতন সংস্কারগুলির উপর প্রচণ্ড আঘাত হানিলেন। তাহার তরঙ্গও এদেশে পৌছিতে বিলম্ব হইল না।

তাহার ফলে জন্ম হইল কল্লোলগোষ্ঠীর। 'কল্লোল' পত্রিকা ছিল এই যুগের সাহিত্যিকদের বিচরণ-ক্ষেত্র বলিয়া তাহাদের সাধারণ পরিচিতি হয় 'কল্লোল-গোষ্ঠী' নামে। তবে গোষ্ঠী বলিলে যাহা বুঝায় তত মতৈক্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত প্রচেষ্টা তাঁহাদের ছিল না। বহু বিভিন্ন ভাবাদর্শের পূজারীই কল্লোল-গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন।

বর্তমান বাঙলা কথা-সাহিত্য জগতের বর্ষীয়ান লেখকগণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কল্লোলগোষ্ঠীর সহিত জড়িত ছিলেন।

এই গোষ্ঠীর একদিকে ছিলেন বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রবোধ সান্ন্যাল প্রভৃতি। ইঁহাদের ছোট গল্পে মানসিকতার ও কারুকৃতির নৈপুণ্য

যতটা ছিল ততটা জীবনবোধের স্পর্শ ছিল না। গল্পের আঙ্গিক ও ছক লইয়া বিষয়বস্তুর গুরুত্ব বাদ দিয়াই ইঁহারা এক নূতন রোমান্টিক গল্পরীতির প্রবর্তন করেন। এই গল্পরীতিকে তাঁহারা বাস্তবধর্মী বলিয়া প্রচার করেন। কিন্তু পরবর্তী কালের সুস্থ সাহিত্য নিরীখে সেগুলিকে বাস্তবধর্মী বলা চলে না। সেগুলি বস্তুত বাস্তবধর্মী ভঙ্গীতে রোমান্টিক রচনা মাত্র। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কেও এই গোষ্ঠীরই অন্তর্ভুক্ত করা চলে। এই গোষ্ঠীর পূর্ণ রোমান্টিক ধারাকে পুষ্ট করেন গোকুল নাগ ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই যুগের বাস্তবধর্মী কথাশিল্পীর গৌরব মুকুট আরোপ করিতে হয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়কে। বলা যায়, এই দুই জনের রচনাতেই বর্তমান এই শূদ্রযুগের প্রথম যবনিকা উত্তোলিত হয় এবং প্রধানত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাস্তব রীতিই পরবর্তী যুদ্ধোত্তর তরুণ লেখকগোষ্ঠীকে প্রভাবিত করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রবল সঙ্ঘাতে অকস্মাৎ বাঙলা ছোট গল্প নূতন এক মোড় লইল,—বাঙলা ছোট গল্পে প্রবল এক জোয়ারের সংবর্ত সৃষ্টি হইল। বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে আন্তর্জাতিক চিন্তাধারা, জনমানস ও তাহার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াগুলি বাঙালী লেখকদের চোখের সম্মুখে স্পষ্ট হইয়া উঠিল। দেশের অভ্যন্তরে মনুষ্য সৃষ্ট কুখ্যাত দুর্ভিক্ষে সমাজের ভিতরের চেহারাটা সহসা উদ্‌ঘাটিত হইল—শ্রেণী পরিচয় স্পষ্ট হইয়া গেল। ইহারই মধ্যে নবীন একদল লেখক, সাহিত্যে যাঁহারা নিপীড়িত মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণার সমাধানের পথ খুঁজিতেছিলেন, জাতীয় ও মানবীয় ধারার একটি সামঞ্জস্য খুঁজিতেছিলেন—সমাজতন্ত্রের জীবনরূপ তাঁহাদের কাছে স্পষ্ট হইয়া গেল। এতকালের কল্পলোকের সোভিয়েট স্বমূর্তিতে ভাস্বর হইয়া দেখা দিল সেই নবীন বাঙালী লেখকদের সম্মুখে। সেই প্রবল প্রকাশে কাহারও চোখ ধাঁধিয়া গেল, কাহারও স্বপ্ন-ভঙ্গ ঘটিল। নিকট পরিচয়ে দূরের রোম্যান্স ব্যাহত হইল। তাই কল্লোলগোষ্ঠীর মানসিক বিলাসে যাঁহারা একদা গোর্কীর ভক্ত হইয়াছিলেন অথচ চরিত্রগত ধর্মই ছিল রোমান্টিক, তাঁহারা সমাজতন্ত্রের পথ হইতে সরিয়া আসিলেন।

তাঁহারা সরিলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরের যুগের তরুণ লেখকগোষ্ঠী তাঁহাদের সারির প্রথমেই পাইলেন কল্লোলের বাস্তববাদী সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। শ্রেণীবিভক্ত সমাজের পরিচ্ছন্ন দৃষ্টি লইয়া, জাতির অন্তর্বেদনার মূল আবেগগুলিকে মূলধন করিয়া এবং সর্বোপরি বৃহৎবিশ্বের প্রগতিশীল চিন্তাধারার সঙ্গে সমান তালে পা ফেলিয়া এই নূতন সারিতে আসিয়া দাঁড়াইলেন—মনোরঞ্জন হাজরা, সুশীল জানা, নারায়ণ গাঙ্গোপাধ্যায়, নবেন্দু ঘোষ প্রমুখ কয়েকজন।

ইঁহাদের অনুগামী হইলেন ননী ভৌমিক, সমরেশ বসু, বরেন বসু, সাবিত্রী রায়, মৃণাল চৌধুরী প্রভৃতি।

এই সব বাস্তবধর্মী লেখকগণ স্বাভাবিকভাবেই প্রগতিশীল রাজনীতিক ধারার সহিত জীবনাদর্শের মিল ঘটাইয়া জীবনে সামঞ্জস্য আনিলেন। জীবন ও পরিবেশের ভিতরকার সঙ্ঘাতকে তাঁহারা আদর্শের প্রেরণায় জয় করিলেন।

কিন্তু আর এক দল শক্তিশালী লেখক এই সারির সহিত কিছুকাল সম্পর্ক স্থাপনের পরে বিচ্ছিন্ন হইয়া আপন আপন কক্ষে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা হইলেন সুবোধ ঘোষ, বিমল মিত্র, সন্তোষ ঘোষ প্রভৃতি। ইঁহারা বাস্তবধর্মী সাহিত্য সৃষ্টির নামে সত্যের মায়াজাল সৃষ্টি করিয়া এক নূতন রোমান্টিক শৈলীর প্রবর্তন করিলেন—যাহা পূর্ববর্তী কল্লোলগোষ্ঠীর অনুবর্তন ছাড়া আর কিছু নয়। তাঁহাদের 'সত্য' হইল সত্যের এক সম্পূর্ণ মায়াসৃষ্টি।

ব্যক্তিগত জীবনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, হৃদয়ধর্মের আবেগ ও আগ্রহ, অথবা বিকার ও বাতিক হইল ইঁহাদের বক্তব্য। ব্যক্তির ঊর্ধ্বে একটা গোষ্ঠী-জীবন আছে, জাতি আছে—আছে তাহার শ্রেণীরূপ—এ বিষয়ে তাঁহাদের চেতনা একাগ্র নয়। বাস্তবের একটা প্রক্ষেপ মাত্র দিয়া শিল্প-সৃষ্টির একটা চমক দেওয়াই হইল মুখ্য উদ্দেশ্য।

প্রগতিশীল তরুণতম লেখকবৃন্দ এই পথ বর্জন করিলেন। তাঁহাদের বাস্তবধর্ম যুগ ও জীবন এবং বিশ্বের প্রগতিশীল ধারার সহিত সামঞ্জস্য করিয়া চলিল। ইঁহাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সমাজের সর্বস্তরে গিয়া সেই মানুষকেই খুঁজিয়া বাহির করিল—যে পচনশীল পুরাতন সমাজব্যবস্থার মধ্যে নূতন করিয়া গড়িয়া উঠিতেছে, অথবা জীবনকে গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করিতেছে। তথাকথিত যে বাস্তবতা ফটোগ্রাফের ছবির মতো সমাজে যাহা আছে তাহারই হুবহু প্রতিলিপি সম্মুখে তুলিয়া ধরে—তাহার মধ্যে সত্যকার বাস্তবতা নাই, উহা জীবনহীন গতিহীন একটা বস্তুরূপ মাত্র। এই শক্তিশালী লেখকগোষ্ঠীর রচনা হইতে ক্রমে আবর্তিত ও বিবর্তিত একটা সচল জীবনবোধের প্রকাশ স্পষ্ট হইয়া উঠিল। সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণী, উৎখাত হওয়া হৃতসর্বস্ব শ্রেণী, শ্রেণী-সচেতন মধ্যবিত্ত, কলকারখানা ও মাঠের মানুষ—ইহারাই বিশেষ করিয়া ইঁহাদের গল্পের অবলম্বন হইল। ইহাদের ঘিরিয়া সমাজে জীবনধারা যেমন চলিয়াছে অথবা চলিতেছে—সেইটুকুকে তুলিয়া ধরাই ইঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হইল না।—বরং সেই প্রবাহের মধ্যে কোথায় প্রতিবাদ, কোথায় প্রতিক্রিয়া, কোথায় নিপীড়িত মানুষ নিজের ও গোষ্ঠীর বা শ্রেণীর ভাগ্যকে, জীবনকে নূতন আশায় ও স্বপ্নে গড়িয়া তুলিতে চাহিতেছে এবং তাহার জন্য জীবন

পর্যন্ত দান করিতেছে—সমাজ-সচেতন, সমাজতন্ত্রের আদর্শে বিশ্বাসী এই নূতন ধারার লেখকগোষ্ঠী তাহাকেই ছোট গল্পের মধ্যে রূপ দিতে লাগিলেন।

সমাজ-সচেতন ও সমাজতন্ত্র-সচেতন এই যুগপ্রবণতা ছাড়াও, আর একটা জিনিস ইঁহাদের রচনায় লক্ষণীয়। সেইটি হইল সাহিত্য-জগতের ব্যাপ্তি। এই গোষ্ঠীর অগ্রজ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার 'পদ্মানদীর মাঝি'তে বাঙলা সাহিত্যে প্রথম এক বিস্ময়কর ব্যাপ্তি আনয়ন করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় উত্তর ও পূর্ব বঙ্গ, এবং সুশীল জানা দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গ ও তাহার সীমান্তবর্তী বিচিত্র জীবনের রূপরেখা অঙ্কন করিয়া আধুনিক ছোট গল্পের ভৌগোলিক সীমাকে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত করিয়া দিয়াছেন। অজ্ঞাতপূর্ব এই ভূখণ্ডের কৃষক-কারিগর, মাঝি-মাল্লা, কামার-কুমার—এককথায় গ্রামের মানুষের বিচিত্র জীবনখণ্ড। তাহাদের সুখ-দুঃখ হাসি-কান্নার মধ্য দিয়া একটা গড়িয়া উঠার ইতিহাস, একটা বাঁচিয়া থাকার ইতিহাস বিধৃত হইয়া আছে।

নবীন এই ধারার জীবনবোধ সমন্বিত বাস্তবানুগত্য বাঙলা সাহিত্যে নূতন একটা প্রেরণার সঞ্চার করিয়াছে ইহা অনস্বীকার্য। তবে এই ধারায় কোথাও কোথাও আত্যন্তিক বাস্তবানুগত্যের ফল হিসাবে একটা নীরসতাও লক্ষণীয়। অনেকক্ষেত্রে ছোট গল্পের নিটোল মুক্তার সুন্দর রূপটি নষ্ট হইয়া যায়। সমাজের শ্রেণীরূপ, তাহার ক্রিয়া আর প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্বের চিত্র অত্যধিক রাজনীতি ঘেঁষা হইয়া পড়ে, অথবা অত্যধিক তথ্য সমাবেশের ফলে তাহা একান্তভাবে নীরস হইয়া পড়িতে পারে। এই ধারার কোনও কোনও নবীনতম লেখকের মধ্যে এই জাতীয় ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। এই বিষয়ে লেখকদের সচেতন থাকিতে হইবে। মনে রাখা দরকার—

জীবন বহু অসংলগ্নতা লইয়া গঠিত; কত উলটাপালটা, কত বেখাপ্পা জিনিস এখানে আছে, আবার আছে আকস্মিকতার ভীড়। তাই শিল্পীকে ঘটনা বাছাই সম্পর্কে সাবধান হইতে হয়।

এই নবীনধারা এখনও গড়িয়া উঠিতেছে—তাই ইহার ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধিত হইবার সুযোগও আছে। নবীন শিল্পীরাও নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়া তাঁহাদের জীবন-সত্যকে যাচাই করিয়া দেখিতেছেন। পাঠকের স্বল্পতায় কেহ বা ক্ষুণ্ন হইতেছেন—কখনও বা বিরোধী সমালোচনায় পাঠককুলের দ্বারা নিন্দিত হইতেছেন। তবু মনে রাখিতে হইবে—বাঙলা সাহিত্যের এ এক নূতন ধারা, এবং সমাজ-সচেতন ধারা। অল্পদিনেই ইহার সুপরিণত ফলটি আশা করা অন্যায়।

গুস্তাভ ফ্লবেয়ার তাঁহার শিষ্য মোপাসাঁকে একদা উপদেশ দিয়াছিলেন—"বলতে পারি না তোমার শক্তি আছে কিনা। তবে তুমি যেগুলি দেখাইয়াছ ইহার ভিতর কিছুটা বুদ্ধির পরিচয় আছে। কিন্তু যুবক, ভুলিয়া যাইও না—শক্তি হইতেছে দীর্ঘকালব্যাপী ধৈর্য ধরিয়া থাকা। কাজ করিয়া যাও।"

বাঙলার সমাজ-সচেতন ধারার তরুণতম লোকদেরও উপলব্ধি করিতে হইবে যে সৃষ্টির শক্তি দীর্ঘকালের সাধনা বই কিছুই নয়।

॥ ২ ॥

বাঙলা সাহিত্য

[গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা]

বিহারীলাল ও 'সারদামঙ্গলে'র ভূমিকা

বাঙলা সাহিত্যের প্রথম বিস্ময় মহাকবি শ্রীমধুসূদন। উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজী শিক্ষা-দীক্ষা লইয়া সংগঠিত হইয়াছিল তাঁহার কবিজীবনের ভিত্তি। ভারতীয় ক্লাশিক সাহিত্যের যে ধারা আমাদের শিক্ষিত বাঙালীর মনে বিশেষ একটি শ্রদ্ধার আসন অধিকার করিয়াছিল এবং সংস্কৃত ক্লাশিক কাব্যধারার ভাবানুবাদ বাঙলা রামায়ণ-মহাভারতের মধ্যে আমাদের যে জাতীয় আগ্রহ নিমজ্জিত হইয়াছিল—সেই মিশ্রিত ধারার সহিত আর একটি ধারা আসিয়া মিশিল। এই নূতন ধারা পাশ্চাত্য কাব্যের ধারা। এই মিশ্রণের অভিনব সমৃদ্ধ রূপ মধুসূদনের কাব্য। কবি মধুসূদন পাশ্চাত্যের রোমাণ্টিকধর্মী গীতিকবিতার সহিত যে পরিচিত ছিলেন তাহার প্রমাণ তাঁহার পেত্রার্কার সনেট প্রীতি হইতেই বুঝা যায়। নিজেও তিনি সনেট রচনা করিয়া গিয়াছেন—তাহা ছাড়া খণ্ড কবিতা এবং তাঁহার 'ব্রজাঙ্গনা', 'বীরাঙ্গনা' কাব্যে গীতিময়তা এবং রোমাণ্টিক ধর্মের লক্ষণ বিরল নহে। তবু এইটাই বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, তাঁহার আবাল্য ব্যক্তিগত আশা মহাকবি হইবার—এবং মহাকাব্যোচিত কাব্যাদর্শের প্রতিই তাঁহার আগ্রহ ছিল সমধিক। ইহারই পরিণতি হিসাবে দেখা যায়—তাঁহার অভিনব সৃষ্টি 'মেঘনাদবধ কাব্য'। রোমাণ্টিক ধর্ম, গীতি কবিতার ধর্ম তাঁহার কাব্যদেহে অতিরিক্ত ভূষণরূপেই সজ্জিত আছে—কাব্যের দেহ বা আত্মাটি কিন্তু মহাকাব্যের ধর্মে দীক্ষিত—তাঁহার প্রধান পরিচয়, তিনি মহাকাব্য প্রণেতা।

এই কাব্যধর্ম তাঁহার পরবর্তী কবিকুল এবং কাব্যধারাকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। এই ধারার অনুসরণে আমরা পাইয়াছি আরও দুইজন দিকপাল কবিকে—একজন হেমচন্দ্র, অন্যজন নবীনচন্দ্র। মহাকাব্যের নূতন এই ধারা যেমন বাঙলার কবিকুলকে প্রভাবিত করিয়াছে তেমনি পাঠকচিত্তেও এই ধারা একটা সবল সংস্কাররূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ইহার মধ্যে নূতন সুরে গান ধরিলেন বিহারীলাল চক্রবর্তী। বাস্তবিক পক্ষে আমাদের উনবিংশ শতাব্দী যে কত নব নব বিস্ময়ের যবনিকা উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে, কত নব ভাব ও নব জাগরণের তরঙ্গভঙ্গে আমাদের সাহিত্যকে সৃষ্টি করিয়াছে, সমৃদ্ধশালী করিয়াছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। মধুসূদনের অভিনব মহাকাব্য, বঙ্কিমের অনাস্বাদিত রোমান্স—তাহার পর বিহারীলালের আত্মতন্ময় রোমাণ্টিক ধর্ম! ইহা যেন তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিয়া বাঙালী চিত্তের বেলাভূমিতে মহা আবেগ ও কলোচ্ছ্বাসে ভাঙিয়া পড়িতে লাগিল।

মহাকাব্যের দরবারী সুরবিস্তার শেষ হইতে না হইতেই কবির ভাবতন্ময়, আত্মতন্ময় সুরসভায় আমাদের আমন্ত্রণ আসিয়া উপস্থিত হইল। বাঙালী পাঠক এই প্রথম একান্ত করিয়া কবির আত্মতন্ময় হৃদয়ের সঙ্গীত শ্রবণের সুযোগ পাইল। এতদিন আমরা রামচন্দ্রের জীবনজোড়া দুঃখ-সংগ্রাম, বিরহ-মিলন কথা শুনিয়াছি, কুরুকুলের সুখ-দুঃখ, উত্থান-পতন ও মহাসর্বনাশের সহিত একাত্ম হইয়া নিজেদের জীবনতৃষ্ণা ও ভাবতৃষ্ণা চরিতার্থ করিয়াছি, পাঁচালি-মঙ্গলকাব্য প্রণেতাদের কাব্যেও দেবতা ও দেবমহিমা দেখিয়া অভ্যস্ত হইয়াছি। আমাদের কবিরা এই দেবতা, দেবকল্প মহিমা, অলৌকিক অতিমানবীয় আদর্শ স্থাপন করিয়া আমাদের মনের সংস্কার সৃষ্টি করিয়াছেন। সেখানে কবির আপন ভাবতন্ময় হৃদয়ের সুখ-দুঃখের আনন্দ-বেদনার কথা শুনি নাই—তাঁহারা এতদিন শুনাইয়াছেন দেবমহিমার কথা অথবা মানুষের দেবত্বলাভের কথা। আর বিহারীলালের কাছে প্রথম এবং একান্ত করিয়া আমরা শুনিলাম—দেবতা নয়, অতিমানব নয়, —রক্তমাংসের সামান্য এই মানুষের অন্তর্বেদনার কথা। এই মানুষ যে সামান্য নয়, তাহার ক্ষুদ্র এই আনন্দ-বেদনা যে সাহিত্য রসের অলৌকিক স্পর্শে অসামান্য বিশ্বজনীনতা লাভ করে, কবি-ব্যক্তির সুখ-দুঃখের অনুভূতিও যে সকলের হৃদয়গ্রাহ্য, অনুভূতিগ্রাহ্য বিষয় হইয়া উঠিতে পারে বিহারীলালের মধ্যেই তাঁহার প্রথম পরিচয় পাওয়া গেল। এই ক্ষেত্রে সে যুগে বিহারীলাল এক এবং অদ্বিতীয়। এমন একান্ত করিয়া, প্রধান করিয়া আপন হৃদয়ের ভাব-তরঙ্গের সঙ্গীত তখন আর কেহই শোনান নাই। অবশ্য, এখানে তাঁহারই এক অন্তরঙ্গ বন্ধু, ভাবসঙ্গী ও দার্শনিক, তাঁহার উল্লেখ এখানে করা প্রয়োজন—তিনি হইলেন শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ। এই দ্বিজেন্দ্রনাথের বৈঠকেই ছিল বিহারীলালের সর্বাধিক আনাগোনা। দ্বিজেন্দ্রনাথের 'স্বপ্ন প্রয়াণ' কাব্যখানিও বাঙলার সেই প্রথম যুগের রোমান্টিক লক্ষণের দ্বারা চিহ্নিত।

বিহারীলালের সর্বাধিক পরিচিত গ্রন্থ 'সারদামঙ্গল'। এই গ্রন্থখানি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলেই তাঁহার রোমান্টিক ধর্মের অভিনবত্বটি স্পষ্ট বুঝা যাইবে। বুঝা যাইবে কি ভাবে বাঙলা কাব্যে এক নূতন ধারা আসিয়া আমাদের এতদিনের সশ্রদ্ধ-লালিত দৈব সংস্কারকে ভাঙিয়া, নূতন পথে, নূতন সৌন্দর্যের দিকে চালিত করিয়া দিল।

সারদার অর্থ সরস্বতী। কবি বিহারীলালের 'সারদামঙ্গল' কিন্তু মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্য-ধারার কাব্য নহে, যদিও কাব্যের নামকরণ সেই ধারার। তাহা ছাড়া সামান্য অর্থে "সারদামঙ্গল" কেবলমাত্র দেবী সরস্বতীর বন্দনা গান নহে।

পুরাণের বাগ্দেবী সরস্বতী কবি বিহারীলালের নিকটে নূতন একরূপে প্রতিভাত হইয়াছেন—এই রূপ বাঙলা সাহিত্যে আর কখনও দেখা যায় নাই। ইহা সারদা কবির কাব্যলক্ষ্মী, মানসলক্ষ্মী—হৃদয়বিহারিণী প্রণয়িনীর মতো। শুধু তাহাই নহে—কবির একান্ত মানস-বিহারিণী এই সারদা বিশ্বলক্ষ্মী স্বরূপা এবং কখনও কখনও এই কাব্যে অদ্বৈত ধ্রুব এক সত্যের মতো প্রতিভাত হইয়াছেন। কবি সেই অদ্বৈত সত্তার পাদমূলে সাধকের মতো, মরমীর মতো আপনার বিশ্বাসের অর্ঘ্য প্রদান করিয়াছেন। আপন হৃদয়ে, বিশ্বপ্রকৃতিতে এবং অবাঙ্‌মানসগোচর অনুভূতিলোকে এই যে এক বিচিত্ররূপিণী, করুণারূপিণীর সৃষ্টি—ইহা একান্ত ভাবে বাঙলা সাহিত্যে প্রথম বিহারীলালেরই সৃষ্টি। তাঁহার পূর্বে বাঙলার কাব্যলোকে বাঙালী কবিকুলের এই আত্মমুখীনতা দেখা যায় নাই।

কবির এই আত্মমুখিনতা, আপনার মনের মাধুরী মিশাইয়া জগৎ ও জীবনকে দেখার প্রচেষ্টা বিহারীলালের পূর্বে মধুসূদনের মধ্যে দেখা গিয়াছিল মাত্র—উহার পরিণত রূপ তাঁহার কাব্যে দেখা যায় নাই। কারণ তাঁহার কবিধর্মই ছিল ক্লাশিকধর্মিতা। বিহারীলালই এই আত্মমুখী সুরের প্রধান ও আদি সাধক। তাঁহার এই প্রারম্ভিক সুরই পরবর্তীকালের কাব্য-সাহিত্যকে নানা সম্ভাবনার পথে অগ্রসর করিয়া দিয়াছে। এই জন্যই, কবির এই আত্মতন্ময়, ভাবতন্ময় প্রথম আবির্ভাবকে রবীন্দ্রনাথ "ভোরের পাখি" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। রোমান্টিক কাব্যধারার এই প্রথম জাগরণ। এবং কবি বিহারীলাল সেই রোমান্টিক আত্মভাবধারার প্রথম ও প্রধান কবি।

কবির এই আত্মভাবের অর্থ হইল—বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কে একটা গভীর রহস্যবোধ। এই রহস্যকেই বিহারীলাল বিশ্বের অন্তর্নিহিত সত্য বলিয়া জানিয়াছেন: এই রহস্যের মূর্ত কল্পনা সারদা—রহস্যময়ী এক সুন্দরী। ইহারই কান্তিরূপিণী মায়া অন্তরে বাহিরে বহু বিচিত্ররূপে প্রতিভাত হইয়াছে। একদিকে, যেমন বিশ্বছাড়া এই কান্তি নাই—

"বিশ্ব গেছে, কান্তি আছে,—অনুভবে আসে না," অন্য দিকে আবার এই রহস্যময়ী—এই কান্তিময়ী ছাড়া এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অর্থহীন—

তেমনি, এ বিশ্ব থেকে
কান্তিখানি দূরে রেখে,
চাও, বিশ্বপানে চাও—কিছু কি দেখিতে পাও?

এই কান্তিময়ী ছাড়া বিশ্ব যে কতখানি অর্থহীন—তাহা "সারদামঙ্গল" কাব্যের ৪র্থ সর্গে প্রকাশ পাইয়াছে। গিরি হিমালয়ের সমগ্র সৌন্দর্য বর্ণনা করিয়াও কবি

বলিয়াছেন—সারদা ছাড়া সে সৌন্দর্য যেন অর্থহীন—শূন্য। বিহারীলালের এই কান্তিময়ী, সৌন্দর্যময়ী প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ আলোচনা করিতে গিয়া কবি শেলীর Hymn to Intellectual Beauty-র কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ভাবে ভোর হৃদয়ের, মানস-কল্পনা-জাত সৌন্দর্যের মূর্ত এই প্রতীকটিকে কবি বিহারীলাল 'সারদা'র ভাবের মধ্যে নিহিত করিয়াছেন। বলিয়াছেন—

এ নিসর্গ রঙ্গভূমি
মনোরমা নটী তুমি ;
শোভার সাগরে এক শোভা নিরুপমা !

কবির ভাববিভোর হৃদয়, আত্মগত এই কল্পনার সহিত পাঠক একাত্ম না হইতে পারিলে "সারদামঙ্গলে"র কাব্য-রস যথাযথ উপলব্ধ হইবে না। "সারদা-মঙ্গল বুঝিবার জন্য বিস্তৃত প্রাণ চাই"—এইজন্যই সমালোচক এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন।

'সারদা' সম্পর্কে মূল এই ভাবটিতে আসিবার পূর্বে কবি বিহারীলাল কাব্যের প্রথম সর্গে সরস্বতীর মূর্তি কল্পনায় তাঁহার পূর্ববর্তী কবি ও পৌরাণিক বিশ্বাসকে কিছুটা অনুসরণ করিয়াছেন। এই অংশে সারদা বা সরস্বতীর দেবী-ভাবটি তিনি ক্ষুণ্ণ করেন নাই। আদিতে বাগ্দেবী পিতামহ ব্রহ্মার মানসলোকবাসিনী। অবাঙ্মানসগোচর এক সত্তারূপে তিনি নিখিল বিশ্বের মধ্যে অপ্রকাশিত আ ছন। দ্বিতীয় স্তরে এই অপ্রকাশের প্রকাশ ঘটিল—যখন আদি কাব্যের সূত্রপাত হইল। এবং ইহার সূত্রপাত হইল "সহৃদয়-হৃদয়ের" সকাতর জাগরণে। ক্রৌঞ্চীর বিরহ-ব্যাকুল আর্তনাদে কাতরহৃদয় মুনি বাল্মীকি—তাঁহার ব্যাকুল হৃদয়ের জাগরণের তরঙ্গ লাগিল মন-লোকে—সৃষ্টি হইল আদি কবিতার—"মা নিষাদ"···। মর্তলোকে কাব্যলক্ষ্মীর এই আদি প্রকাশ। প্রথম সর্গে বিহারীলাল এই প্রসঙ্গটিকে অবলম্বন করিয়া আপনার কল্পনার রঙে ইহাকে কিছুটা রাঙাইয়া তুলিয়া অপূর্ব কবিত্বের সহিত ইহাকে পরিবেশন করিয়াছেন।

তৃতীয় যুগ—কালিদাস ও তৎপরবর্তী কাল। কাব্যলক্ষ্মীর প্রকাশ তখন নানা কাব্যকলায়—নানা ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ। এই স্তরে দেবীর মূর্তি-কল্পনায় বিহারীলাল ৭ম শতাব্দীর বিখ্যাত সংস্কৃত কবি দণ্ডীর সরস্বতী-ধ্যানকেই অনুসরণ করিয়াছেন। তিনি সর্বশুক্লা দেবী সরস্বতী। দণ্ডী যেমন দেবীকে মরালরূপে তাঁহার মানসে অধিষ্ঠিত হইতে আহ্বান জানাইয়াছেন—তেমনি বিহারীলালও বলিয়াছেন :

"মানস-মরালী মম আনন্দরূপিণী !"

তিন যুগের এই কাব্যলক্ষ্মী তারপর মিশ্রিত ও একাকার হইয়া কবির হৃদয়ে অধিষ্ঠান করিয়াছে 'সারদা'র এক মৌলিক ভাবে—সে সারদা কেবল মাত্র আর দেবী নহেন—তিনি কবির অন্তরের অন্তরতম, আত্মার আত্মীয়, প্রেয়সী, বিশ্বের সৌন্দর্যলক্ষ্মী। দেবী সরস্বতীর সর্ববাদী সম্মত পৌরাণিক দেবিত্ব অবশ্যই ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে—কিন্তু সেই সঙ্গে বাঙলা কাব্যধারার এক নূতন দুয়ারও খুলিয়া গিয়াছে। এই ধারায় বিহারীলাল প্রথম ও স্বতন্ত্র।

"সারদামঙ্গলে"র ৪র্থ সর্গের মূল সুর—বিরহ। যে সারদা কবির মানসলোকের গহনবাসিনী, বিশ্বের সৌন্দর্যলক্ষ্মী—সেই সারদার সন্ধানে কবি বাহির হইয়া উপস্থিত হইয়াছেন হিমগিরির নৈসর্গিক লীলাভূমিতে। কবি দেখিলেন—চারিদিকে নিসর্গ লীলার সমারোহ। রূপ, বর্ণ, গন্ধ, গানের কোনও অভাব নাই—বস্তুবিশ্ব তাহার সব ঐশ্বর্য লইয়া সজ্জিত হইয়া আছে। কিন্তু যে 'সারদা' বিশ্বের সৌন্দর্যলক্ষ্মী, যাহাকে বাদ দিয়া কোনও সৌন্দর্যই পূর্ণতা লাভ করে না, সেই কান্তিময়ীর কান্তির সন্ধান যখন কবি পাইলেন না—তখন এই রূপ-বর্ণ-গন্ধময় সজ্জিত নৈসর্গিক মাধুর্যও কবির নিকট অর্থহীন মনে হইল—মনে হইল :

"অন্ধ তামসী নিশি।"

সেই কান্তিময়ীর কান্তির স্পর্শ ছাড়া এই বস্তু-বিশ্বের সব রূপই যে কবির নিকট অসার—এই ভাবটি ৪র্থ সর্গের মূল প্রতিপাদ্য।

এই মূল ভাবটির উপর গড়িয়া উঠিয়াছে কবির হিমালয় বর্ণনার সমারোহ। এই সমারোহে কিন্তু রোমান্টিক কবির স্বভাবধর্ম যে প্রকৃতি-প্রীতি, গভীর অনুভূতি, বাস্তব-অবাস্তবে মিশ্রিত এক স্বপ্নলোক রচনা—এইগুলির কোনটিরই অভাব দেখা যায় না। একজন বিশিষ্ট রোমান্টিক-ধর্মী কবির সমস্ত বৈশিষ্ট্য লইয়াই তিনি উপস্থিত হইয়াছেন এবং তাঁহার হিমালয় বর্ণনা সার্থক হইয়া উঠিয়াছে।

রোমান্টিক-ধর্মী কবিগণের প্রকৃতি-প্রীতি একটি বিশেষ লক্ষণ। প্রকৃতির মধ্যে শুধু একটি সত্তার সন্ধানই তাঁহারা করিয়া ক্ষান্ত হন নাই—বরং জীবনের শ্রেষ্ঠ আনন্দ, সুগভীর শান্তি ও অনির্বচনীয় সুখের আশ্রয় রূপেও এই প্রকৃতির নিকট ছুটিয়া আসিয়াছেন বারে বারে। কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ বা শেলী বা কীট্সের ন্যায় বিহারীলালও তাঁহার সারদাকে খুঁজিবার জন্য ছুটিয়া আসিয়াছেন গিরি হিমালয়ের কোলে—এইখানেই যেন তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ সান্ত্বনা লুকাইয়া আছে। এখানে তাঁহার সারদাকে পাওয়া না গেলেও, প্রকৃতির বিস্ময়কর রূপে তিনি কম বিস্মিত হন নাই। গগনচুম্বী বিরাটত্বের বিস্ময়, ধ্যানগম্ভীর গিরিশিখরের মহিমার বিস্ময়, কালজয়ী অক্ষয় অব্যয়ের বিস্ময়, এবং ক্ষুদ্র খণ্ড কোমল কান্ত মাধুর্যের বিস্ময়

—সবে মিলিয়া প্রকৃতি-প্রীতির একটি নিখুঁত দৃষ্টান্ত ইহার মধ্যে খুঁজিয়া পাইতে কষ্ট হয় না।

কবির প্রথম বিস্ময়—হিমগিরির গগনচুম্বী শিখরমালা দেখিয়া। কবে কোন্ উন্মথিত আদিম সমুদ্রের মহাতরঙ্গগুলি যেন পাথর হইয়া গিয়াছে। আকাশচুম্বী উন্নত এই মহিমার পদপ্রান্তে পড়িয়া আছে সাগরাম্বরা ধরণী। বিরাটত্বের এই মহিমার কাছে সৌরলোক ও পৃথিবীর আর সব কিছু যেন ক্ষুদ্র হইয়া গিয়াছে।

তারপর ইহার ধ্যানগম্ভীর মহিমা। বিরাটত্বের সহিত এই ধ্যান গাম্ভীর্য মিশিয়া গগনচুম্বী হিমালয়ের রূপটিকে যেন আরও স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। বিরাটত্বের রূপের সহিত ধ্যানের ভাবটি মিশ্রিত হইয়া কাব্যের এই অংশে যে কবিত্বের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা খুবই উন্নত শ্রেণীর। "ঝটিকা দুরন্ত মেয়ে" কত তুষার ঝড় তুলিয়া ছুটিয়া যায়, কত জগৎপ্লাবী মহাপ্লাবন ছুটিয়া আসে, জগতের কত উদয়-বিলয় ঘটে—ইহার মাঝখানে পাতা শাশ্বত কালের এক ধ্যানাসন—

"কে যোগেন্দ্র ব্যোমকেশ যোগে নিমগন !"

এখানে কবি বিরাট, ধ্যান গাম্ভীর্যের সহিত ত্রিকালজয়ী ভাবটি সংযুক্ত করিয়া মহাপ্রকৃতির রূপটিকে অনির্বচনীয় ও মহান করিয়া তুলিয়াছেন।

মহাপ্রকৃতির এই বিরাট মহিমার পাশে সংযোগ করিয়াছেন কোমল কান্ত মাধুর্যের। হিমগিরির জমাট বরফে আলোকের সপ্ত বর্ণের লীলা রচনা করিয়াছে কল্পনার অমরাবতী। কোথাও জলকেলি মত্ত হস্তীযূথের মতো খেলা করিতেছে নবীন মেঘের দল। গিরি সানুদেশে কোথাও চলিয়াছে শ্যাম অরণ্যের সারি। সেই অরণ্যের ফাঁকে ফাঁকে অপূর্ব এক লীলায়িত ভঙ্গীতে উচ্ছ্বাসের কলরব তুলিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে গিরিনদী—ঝরনার ধারা। তার কুলে কুলে, শ্যামল অরণ্যের ছায়া তলে তলে কত রঙের ফুলের সমারোহ। শুধু প্রকৃতি নয়—প্রকৃতির জীবজন্তু পক্ষীকুলও এখানে চিত্রিত হইয়া আছে। একটি জীবন্ত মুহূর্তের ছবির মতো দেখা যায়—চমরীর দল প্রকৃতির আপন চারণভূমিতে উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। কোমল কান্ত মাধুর্যখণ্ডের যেন অবধি নাই—কুসুম স্তবকের মতো একের পর এক ফুটিয়া আছে। এখানে বিরোধ নাই, বিক্ষোভ নাই—কেবল অগাধ শান্তি ও অনন্ত মাধুর্যের মধ্যে কবির সমস্ত মন ও প্রাণ নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে। যে সিংহযুগলের চিত্র কবি এখানে উপস্থিত করিয়াছেন—তাহাও যেন হিংসা ভুলিয়া তাহাদের কেশররূপ জটাকলাপ বিস্তার করিয়া মহাযোগীর মতো ধ্যানে মগ্ন হইয়া আছে।

কঠোরে, কোমলে, গাম্ভীর্যে, আনন্দে হিমালয় বর্ণনা সার্থক এক প্রকৃতিচিত্র। বাস্তবের বিরাটত্ব, স্তব্ধতা ও আরণ্যক গাম্ভীর্যের সহিত মিশিয়াছে কল্পনার রঙিন

ঐশ্বর্য। ভৃগুভূমি, গোমুখী ও গোমুখী নিসৃত গঙ্গার পবিত্র ধারার সহিত মিশিয়াছে কবির মনের গভীর অনুভূতি। সবে মিলিয়া—কি রূপে আর কি ভাবে—হিমালয় বর্ণনার প্রসঙ্গ বিহারীলালের উন্নত কবিত্ব শক্তির দৃষ্টান্ত বহন

'সেঁজুতি' কাব্যের ভূমিকা

সেঁজুতি কথাটির মানে হল সন্ধ্যার দীপ। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও এই অর্থে গ্রন্থটির নামকরণ করেছেন। কবির জীবন মৃত্যুর অন্ধকারে অস্তমিত হতে চলেছে বলে কবি মনে করেছেন; ভেতরে ভেতরে তিনি এই জগৎ ও জীবন থেকে বিদায় নিয়েছেন, মৃত্যুর আলোকে জীবনের সন্ধ্যাকে স্বীকার করে নিয়েছেন।

'সেঁজুতি' গ্রন্থের কবিতাগুলি রচনার কোন বিশেষ ইতিহাস বা পটভূমি না থাকলেও সামগ্রিকভাবে এই বইটির পিছনে কিছু কথা আছে।

বাঙলা ১৩৪৪ সালের ভাদ্রমাসে—২১শে ভাদ্র (১০।৯।১৯৩৭) হঠাৎ কবি অজ্ঞান হয়ে যান। তখন তিনি শান্তিনিকেতনে ছিলেন। সন্ধ্যের পর সকলের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন—এমন সময় হঠাৎ তিনি হতচৈতন্য হয়ে যান।

দুদিন কবি অজ্ঞান হয়েই ছিলেন, তারপর তাঁর জ্ঞান ফিরে আসে। কিন্তু সম্পূর্ণ সুস্থ হতে তাঁর এক সপ্তাহ লাগে। দিন দশবারো পর থেকে কবি আবার নিয়মিত কাজে যোগ দিলেন।

এই অসুস্থতা কবির মনে এক গভীর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করলে। হঠাৎ যে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন—এবং দুদিন পরে চৈতন্য ফিরে পেলেন—এই ঘটনাকে তিনি বিশেষ তাৎপর্যপুর্ণ বলে মনে করলেন। তিনি মনে করলেন যে তিনি যেন মৃত্যুর দেশ থেকে ঘুরে এলেন। হতচৈতন্যলোক থেকে এই প্রত্যাবর্তনকে তিনি নব জীবন লাভের সঙ্গে তুলনা করলেন—মনে হচ্ছে অধ্যাত্মলোকের নবতম রহস্য উদ্ঘাটিত হচ্ছে। জীবনের রূপ এবং তাৎপর্য কবির কাছে নতুন করে ধরা পড়লো।

'প্রান্তিক' কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্র-জীবনের এই চেতনা বিশেষভাবে রূপায়িত হয়েছে। কবি জীবনের ঐশ্বর্যকে, ছেড়ে যাওয়ার বেদনাকে স্বীকার করে নিয়েছেন, মৃত্যুকে বরণ করে নিতে কোন কুণ্ঠা নেই, ব্যাধির যন্ত্রণাকেও তিনি হাসিমুখে সহ্য করেছেন।

তিনি 'নৈবেদ্য' থেকে 'গীতাঞ্জলি' পর্যন্ত কাব্যগ্রন্থে ঐশ্বরিক চিন্তায় মগ্ন ছিলেন; এই জগৎ, জীবন এবং ঈশ্বর—এই নিয়েই তাঁর কাব্য লীলাবাদী চিন্তায় বিভোর

ছিল। ঈশ্বরের প্রভু বা পিতারূপ, সখা বা বন্ধুরূপ এবং লীলাময় বা প্রেমিকরূপ —এই নিয়েই তিনি বৈষ্ণবীয় চেতনায় মরমী কবির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ মূলত উপনিষদের চিন্তায় দীক্ষিত—কখনই তাঁর চিন্তা উপনিষদের সত্যকে ত্যাগ করেনি। বাল্যকালে তিনি ঠাকুরবাড়িতে প্রত্যহ পঠিত উপনিষদ নিয়মিত শুনতেন—এবং সেই থেকেই রবীন্দ্রমানসে পরমাত্মা সম্পর্কে একটি বিশিষ্ট ধারণার জন্ম হয়। পরমাত্মার এক অংশ প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে বিরাজমান— দেহের চৌহদ্দির মধ্যে তার বাস হলেও সে এই সীমায় বদ্ধ নয়। মানুষ প্রত্যহের কাজ, স্বার্থপরতার কাজ, দেহের কল্যাণের বা সুখ-সুবিধার জন্য কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকে, চিরন্তন পরমাত্মার বাণী তাই সে শুনতে পায় না। আত্মা অপেক্ষা দেহের পরিচর্যাই তাই তাঁর কাছে বড় হয়ে দেখা দেয়। কিন্তু মৃত্যু দেহের গর্ব বা গৌরবকে চূর্ণ করে, তাই মৃত্যুর মধ্যেই সত্যোপলব্ধি হয়। মৃত্যু মানুষকে বুঝিয়ে দেয় যে সেও এই বিশ্বজগতের মতো অনন্ত ঈশ্বরের অংশ বিশেষ। সে-ও এই বিশ্বজগৎ ও জ্যোতিষ্কমণ্ডলীয় প্রাণস্বরূপ মহাজ্যোতির্ময় সত্তার অংশ। এই আত্মস্বরূপের বোধই রবীন্দ্রনাথের শেষের দিকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি নূতন করে আবার জগৎ, জীবন এবং জ্যোতিষ্কমণ্ডলী সম্পর্কে ভাবতে বসেছেন।

সন্ধ্যাকালের দীপ যেমন দিনাবসানের ঘোষণা জানায়, অন্ধকারের ইঙ্গিত আনে, তেমনি কবির জীবনাবসানের চেতনা তাঁর মর্মলোকে মৃত্যু-দেশের রহস্যের ইঙ্গিত এনেছে। তাই 'সেঁজুতি'র একদিকে কবি অতীত জীবনের একটা হিসাবনিকাশ করার স্বল্প চেষ্টা যেমন করেছেন, তেমনই জীবনের প্রান্তে উপনীত হয়ে আধ্যাত্মিক সত্য সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন—এই দুই সুরের প্রকাশ আছে সেঁজুতিতে।

সেঁজুতির মর্মকথা প্রসঙ্গে রবীন্দ্র সমালোচকেরাও এই কথাই বলেন। এই আলো-আঁধারের ফাঁকে ফাঁকে অজানা তীরের বাসার ইঙ্গিত, এই জগৎ ও জীবনে অভিব্যক্তি, অসীম ও অরূপের হাতছানি কবির অন্তরকে উতলা করছে। সে-অন্তর যেন বহুদূরের পথিক—সৃষ্টির আদিম জ্যোতির কণা, ধরণীর এক কোণে আলো-আঁধারের মরীচিকার মধ্যে তো আবদ্ধ হয়ে থাকতে পারে না। এই জগৎ ও জীবন কবির আকাঙ্ক্ষা মেটাতে পারে না। এই চিরচঞ্চল ও ধ্বংসশীল জগৎ ও জীবনকে ছাড়তেই হবে—তবুও এদের কাছে কবি চিরকৃতজ্ঞ, তাঁর জীবনে এদের সার্থকতা আছে। এদের মধ্যে দিয়ে তাঁর আত্মস্বরূপ তিনি বুঝতে পেরেছেন—ব্যক্তিগত জীবন-পর্যালোচনার পটভূমিকায় এই সত্যের উপলব্ধিই সেঁজুতির মর্মকথা।

সেঁজুতির প্রথমেই দেখা যাবে যে, কবিগুরু ডাক্তার স্যার নীলরতন সরকারকে এই গ্রন্থ উৎসর্গ করেছেন। মৃত্যুর অন্ধতামস গহ্বর থেকে তিনিই কবিকে আবার জীবনের সূর্যালোকে ফিরিয়েছেন, এবং কবি অজানিতের দেশে এক নতুন রহস্যের অনুভূতিতে লীন ছিলেন, সেখান থেকে স্যার নীলরতন কবিকে আবার জীবনের পথে ফিরিয়ে আনলেন। বোধহয় তাই রোগমুক্তির পরেই এই বই তিনি চিকিৎসক বন্ধুকে উপহার দিয়েছেন। তাঁরই দৌলতে কবি মৃত্যুর দেশ থেকে জীবনের প্রান্তে ফিরে এসেছেন,—তাঁরই জন্যে কবি নিজের সঙ্গে নিজের নূতন করে পরিচয় করে নিয়েছেন। অজ্ঞাত অবিদিত দেশ থেকে কবির এই প্রত্যাবর্তন—যাঁর জন্যে সম্ভব হয়েছে, গ্রন্থটি তাঁকেই উৎসর্গ করেছেন।

অন্ধতামসগহ্বর হতে
ফিরিনু সূর্যালোকে।
বিস্মিত হয়ে আপনার পানে
হেরিনু নূতন চোখে।

কবি উপলব্ধি করেছেন—মৃত্যু তাকে অজানা রাজ্যে নিয়ে যেতে চায়, পরপারের ডাক এসেছে। তিনি মৃত্যুর মুখোমুখি গিয়ে হাজিরও হয়েছিলেন, সেখান থেকে উদয় সীমার পরপার দেখতে পেয়েছেন। যে প্রাণ-চেতনা সারাজীবন দুঃখ-সুখের নাট্যলীলায় বাতি জ্বেলে রেখেছিল—আজ কোথায় নিয়ে যেতে চাইছে কবিকে—কোন্ অচিহ্নিতের পারে—কোন্ নব প্রভাতের উদয় সীমার অরূপলোকের দ্বারে। কবির দৃষ্টি আজ সুদূর প্রসারিত, জগৎ জীবনকে হয়তো ছেড়ে যেতে হবে তাঁর—এখনই তিনি তৈরীও হয়ে আছেন—কিন্তু তবু মৃত্যুর সংকেতধ্বনির স্পষ্ট ও পরিষ্কার অর্থ তিনি বুঝতে পারছেন না; পরপারের ডাক এসেছে ঠিকই;—আর সেই ডাক শুনে তিনি নিজের জীবন ও জগতের সম্পর্কে আবার নতুন করে একটা পরিচয় করে নিচ্ছেন, একটা নতুন ধারণার আকুলতা তাঁকে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছে;—সেই আকুল আর্তির প্রকাশ দিয়ে তিনি সেঁজুতি রচনা করেছেন,—তিনি উৎসর্গের শেষ দু পঙক্তিতে লিখলেন—

সে-ভাষার আমি চরম অর্থ
জানি কিবা নাহি জানি
ছন্দের ডালি সাজানু তা দিয়ে,
তোমারে দিলাম আনি।

সেঁজুতির উৎসর্গে এ রকম কথা লিখলেও কবি কিন্তু এই সময়ে লেখা নানাবিষয়ের ও চিন্তার কবিতা একত্রে গেঁথেই সেঁজুতির ডালা সাজিয়েছেন।

রবীন্দ্র জীবনীকার শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন—খুচরা কবিতা অনেকগুলি জমেছে, সেগুলি একত্র করে 'সেঁজুতি' নামে কাব্যখণ্ড প্রকাশিত হল।

'জন্মদিন'—সেঁজুতির একটি বিখ্যাত কবিতা। কবিতাটি সেঁজুতি বইতে গোড়ার দিকে থাকলেও ওটি লেখা কিন্তু ২৫শে বৈশাখ ১৩৪৫। ১৩৪৪ সালের ভাদ্র মাসে কবি গুরুতর পীড়িত হন, এবং স্যার নীলরতন সরকারের চিকিৎসায় তিনি দ্রুত সেরেও ওঠেন। তখন থেকেই তাঁর মনে স্থির প্রত্যয় এসেছে—অধ্যাত্মলোকের নতুন রহস্য তাঁর কাছে বুঝি উদ্ঘাটিত হয়েছে, মৃত্যু-যবনিকার তোরণ-দ্বার থেকে অজানার কিছু ইঙ্গিত বোধহয় তাঁর কাছে সহজ ও তুচ্ছ হয়ে ধরা দিচ্ছে। 'জন্মদিন' কবিতাটি লেখার কয়েকদিন আগে ১৩৪৫ সালের নববর্ষ উপলক্ষে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন—কিছুকাল পূর্বে আমি মৃত্যুগুহা থেকে জীবনলোকে ফিরে এসেছি। যে-মূলধন নিয়ে সংসারে এসেছিলাম, কর্ম পরিচালনার জন্য শরীর-মনের যে শক্তির আবশ্যক তা যেন আজ পূর্ণ পরিমাণে নেই, অনেকটা তার লুপ্ত হয়েছে অতলস্পর্শে। আমার নিজের কাছে আমার প্রশ্ন এই, জীবনে এই যে রিক্ততার পর্ব নিয়ে এসেছি এ কি একটা নূতন পূর্ণতার ভূমিকা?

এই ভাষণ দানের কয়েকদিন পরে কবি বিশ্রাম নেবার জন্য কালিম্পঙ যান। লোকজনের খুব বেশী হইচই নেই, হিমালয়ের ছোট্ট শহরে কবির আরামেই দিন কাটবে—এইজন্যই সেখানে যাওয়া। ১৩৪৫ সালের বৈশাখ মাসেই কবি সেখানে যান। ভাবা গিয়েছিল যে, কালিম্পঙের মতো ছোট জায়গায় কবির জন্মদিনে বিশেষ হইচই হবে না। শান্তভাবে কবির জন্মদিন পালিত হবে।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, আর হয়ে যায় আর এক রকম। অল ইণ্ডিয়া রেডিওর কলকাতা শাখার কর্তা শ্রীনিরঞ্জন মজুমদার কালিম্পঙ গিয়ে হাজির। পঁচিশে বৈশাখ কবির জন্মদিনে তাঁকে রেডিওতে কবিতা আবৃত্তি করতেই হবে। বাধ্য হয়ে কবি ২৫শে বৈশাখ ১৩৪৫ তারিখে 'জন্মদিন' কবিতাটি লিখলেন। এবং টেলিফোন-মারফত প্রথমে কলকাতা বেতার কেন্দ্রে—এবং সেখান থেকে সর্বত্র তাঁর আবৃত্তি প্রচারিত হয়েছিল।

'জন্মদিন' কবিতাটিতে কবির আত্মজীবনের একটি অন্তর্নিহিত বা তত্ত্বগূঢ় বিশ্লেষণ আছে। মৃত্যুর অন্ধ তামসময় দেশের তোরণ পর্যন্ত তিনি গিয়েছিলেন মাস আট নয় আগে, মৃত্যুদূতের ইঙ্গিতে তাঁর প্রাণে যে সাড়া এসেছে—সেই সাড়া থেকে এই কবিতার জন্ম। একদিকে এই কবিতায় নিজের জীবনে উপলব্ধ আধ্যাত্মিক সত্যের প্রকাশ, অন্য দিকে বিশ্বমানবতার দুঃখে কবির সংবেদনশীলতা।

মানুষের অন্তরতম আত্মা গতিশীল, সে যেন বন্ধনহীন, স্থিতিহীন, সে যেন চিরপথিকবেশী। তাকে কেউ আটকে রাখতে পারে না। জীবন-মৃত্যুর পারে, সংসার সীমার দূরে, প্রাত্যহিক প্রয়োজনের অনেক ঊর্ধ্বে কবির অভিযাত্রা—এমন এক জায়গায় তাঁর যাত্রা—যেখানে অনন্তের স্পর্শ পাবে তাঁর আত্মা। সেই যাত্রা তখনই সম্ভব—যখন মৃত্যু তাঁকে ছাড়পত্র দেবে।

আজ কবি স্পষ্টই বুঝতে পেরেছেন—তাঁর জন্মদিন মৃত্যুদিন যেন এক হয়ে গিয়েছে। জীবনকে জানবার জন্য তাঁর জন্ম, অনন্তের আলোয় অসীমকে জানবার জন্য তাঁর মৃত্যু। জন্মদিন বাস্তব জীবনকে প্রকট করেছে, মৃত্যুদিন অনন্তের ইঙ্গিত এনেছে।

কবি মৃত্যুর দেশ থেকে সম্প্রতি ঘুরে এসেছেন—পরপারের রহস্য তাঁকে কৌতূহলী করছে, তাই তিনি প্রাচীন অতীতের বোঝা নিজের মন থেকে নামিয়ে দিতে চান। একদা তিনি এই পৃথিবীর দান—মর্তলোকের সম্পদ কাঙালের মতো গ্রহণ করেছিলেন—আজ মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াবার পর—এই পার্থিব সঞ্চয়কে অসার মনে করছেন, তাই তিনি সঞ্চয়পাত্র খালি করেই দিতে চাইছেন। তিনি যাত্রাতরী বেয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন—পিছনে ফিরে ব্যাকুল দৃষ্টিতে জীবন-ভোজের শেষ উচ্ছিষ্টের দিকে যেন তাকাতে চান না।

জীবনের এই অপরাহ্নকালে, ছুটির গোধূলিবেলার তন্দ্রার আলিঙ্গনে তিনি বুঝতে পেরেছেন যে, এই পৃথিবীর হাজার হাজার বন্ধন, জীবনের আসক্তির সুধাভরা উপহার—সব কিছুই তাঁকে ফেলে চলে যেতে হবে। তাই জীবনের শক্তি নিস্তেজ হচ্ছে, পৃথিবীও যেন ললাট-পটে বর্জনের ছাপ অঙ্কিত করে দিচ্ছে। কিন্তু দেহের শক্তি কেড়ে নেওয়া যায়, দেহটিকে পঙ্গু করা সহজ, কিন্তু মানুষের অন্তরতম সত্তা সাংসারিক প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে বলতেই অনেক বড়; জরামরণশীল দেহে আবদ্ধ থাকলেও তার ঔজ্জ্বল্য এবং শক্তি কখনও নিষ্প্রভ হয় না, নিঃশক্তির প্রদোষচ্ছায়ায় বার্ধক্যের জালে বাঁধা পড়ে না, দেহের ভাঙা মন্দির-বেদীতে সেই প্রাণ-প্রতিমা অক্ষুণ্ণ গৌরবে বসে থাকে,—তার ধ্বংস নেই।

পৃথিবীর বা সংসারের অপ্রয়োজনের অন্তরালে আনন্দের উৎস রয়েছে। কবি উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, যদিও তিনি এই সংসারলোক ছেড়ে, পৃথিবীর শ্যাম সমারোহ পিছনে ফেলে চলে যাবেন—তবু মাটির কাছে তাঁর ঋণের শেষ নেই। এই মাটির মায়া প্রতিদিন তাঁকে আনন্দ দিয়েছে,—এই পৃথিবী তাঁকে চারিদিক থেকে রসপূর্ণ আকাশের বাণী জুগিয়েছে। মর্তের এই মায়ার বাঁধন ক্ষণিক—সেইজন্যই তিনি সহজে আত্মার চিরন্তন যাত্রাকে

উপলব্ধি করতে পারলেন। পৃথিবীর মায়া, সংসারের মমতা অনিত্য, সেখানে নিত্য আত্মা বাঁধা পড়ল বলেই এত সহজে আত্মার চিরন্তনতা বুঝতে পারা গেল। পার্থিব ভালবাসা তাঁর কাছে স্বর্গের আশীর্বাদ-স্বরূপ হয়েছে, আম্র-মঞ্জরীর রেণু, শিশির-ভেজা শিউলি ফুল, দোয়েলের গীতময় সকালের শিল্পকারুখচিত রৌদ্রময় উত্তরীয়, মানবমানবীর প্রেম—সব কিছু কবিকে মুগ্ধ করেছে। যেখানে এই সংসার-লোকের মায়ার কর্মশালা—সেখানেও 'অমৃতরূপ' মৃত্যুর পরপার থেকে উঠে এসে উঁকি দিত, সেখানেও বাতায়ন পথে কে যেন কবিকে সহসা অচিহ্নিতের দেশের আভাস জানিয়ে যেত, অসীমের আত্মীয়তার ইঙ্গিত দিয়ে কোন অধরা অদেখা দূত অপ্রয়োজনের মানুষ-কবিকে ভাষাতীত কথা বলে যেত।

কবি উপলব্ধি করেছেন—আজ পৃথিবী থেকে চলে যাবার ডাক এসেছে তাঁর। তাই তাঁকে ফেলে যেতে হবে তাঁর সাজ, ধরণীর আশ্রয় ছেড়ে—এই নাটমঞ্চ ছেড়ে যেতে হচ্ছে। কর্মীর সাজ খুলে ফেলতে হচ্ছে তাঁকে, পথের পাথেয়—অর্থাৎ পৃথিবীর সৌন্দর্য মাধুর্যের দান রেখে যেতে হচ্ছে। কিন্তু কবি তবু মাটির দান অস্বীকার করেন নি, তিনি রূপের পদ্মে অরূপ-মধু পান করেছেন। তিনি মাটির বেড়ার প্রান্ত থেকে অমূর্তের সন্ধান পেয়েছেন।

কিন্তু যারা পৃথিবীর এই সম্পদকেই অক্ষয় বলে মনে করে, যারা এই দানের জন্যে লালায়িত, হিংস্রভাবে ভোগীর দৃষ্টি নিয়ে লুব্ধ দস্যুর মতো সাধারণের এই আশীর্বাদকে নিজের কুক্ষিগত করে—নির্লজ্জ হিংসায় যারা মারামারি করছে—তারা পৃথিবীর সুধা পায় না। নিরাসক্ত মনে শান্তভাবে ধরণীর নিমন্ত্রণে যোগ না দিলে পার্থিব অমরাবতীর প্রসন্ন দ্বার মুক্ত হয় না। সেই ঐশ্বর্য তো দীন ভিক্ষু বা দস্যু লালায়িত লোলুপের জন্যে নয়।

ফাসিস্ট বর্বরতায় কবিচিত্ত পীড়িত হয়েছে, জাপানীদের পৈশাচিক অত্যাচারের কথা কবির কর্ণগোচর হয়েছে। তিনি যেন ধ্যান-দৃষ্টিতে আসন্ন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের রূপ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন, তাই পৃথিবীর দস্যুদের সম্পর্কে অকম্পিতভাবে নির্ভীক চিত্তে তিনি বলে গেলেন—

মানুষের দেবতারে
ব্যঙ্গ করে যে-অপদেবতা বর্বর মুখবিকারে
তারে হাস্য হেনে যাব, বলে যাব, 'এ প্রহসনের
মধ্য-অঙ্কে অকস্মাৎ হবে লোপ দুষ্ট স্বপনের,
নাট্যের কবররূপে বাকি শুধু রবে ভস্মরাশি
দগ্ধশেষ মশালের, আর অদৃষ্টের অট্টহাসি।'

বলে যাব, 'দ্যূতচ্ছলে দানবের মূঢ় অপব্যয়
গ্রন্থিতে পারে না কভু ইতিবৃত্তে শাশ্বত অধ্যায়।'

কবি উপলব্ধি করেছেন—তাঁর জীবনাবসানের আসন্ন গোধূলি। তাঁর ক্লান্ত চেতনার শেষ প্রহরের ঘণ্টাধ্বনি শোনা যাচ্ছে। সূর্যাস্তের রঙে রাঙা পূরবীর সুরে বিদায়ের দ্বার খোলবার আওয়াজ ধ্বনিত হচ্ছে। কবি মর্ত থেকে অমর্ত্যলোকে যাবেন—নিয়ে যাবেন এ পারের ভালবাসা, জন্মদিনের সঞ্চয়, পৃথিবীর ও সংসারের মায়ার বন্ধন।

'জন্মদিন' কবিতাটি তত্ত্বকথা পূর্ণ হলেও কবিমনের স্বচ্ছ প্রকাশে এই তত্ত্ব সম্পূর্ণ কবিতা হয়ে উঠেছে। পৃথিবীপ্রীতি এই কবিতায় অত্যন্ত সুন্দর হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। বহির্ভারতে—পৃথিবীর সর্বত্র মানুষ-দস্যুর যে অত্যাচার—তার প্রতি ঘৃণাও কাব্যধর্মে দীক্ষিত হয়ে উঠেছে। বলিষ্ঠ ছন্দে, মাধুর্যমণ্ডিত কাব্যশক্তিতে 'জন্মদিন' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের এক অক্ষয় অভিব্যক্তির নিদর্শন হয়ে আছে এই কারণে।

ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য

অতিশৈশবে বাঙলা গদ্য সাহিত্য যখন সংস্কৃত সাহিত্যের কোলে লালিত হইতেছিল, যখন বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত সাহিত্যের ভাণ্ডার হইতে ভাব, শব্দ-সম্ভার আর রীতি লইয়া 'শকুন্তলা', 'সীতার বনবাস' রচনা করিতেছিলেন, আর অন্যদিকে টেকচাঁদ ঠাকুরের আলালী ভাষায় সাহিত্যের আসরে তরল রসের পরিবেশন চলিতেছিল, সেই সময়ে ভাষা ও সাহিত্যের যুগসন্ধিক্ষণে প্রতিভার সমস্ত শক্তি লইয়া আসরে অবতীর্ণ হইলেন বঙ্কিমচন্দ্র।

বাঙলা সাহিত্যের প্রথম ঔপন্যাসিক বঙ্কিম। বঙ্কিমের পূর্বেও যে উপন্যাস বাঙলা সাহিত্যে ছিল না তাহা নয়। বস্তুত প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' আর প্রমথ শর্মার 'নববাবুবিলাস'ই বাঙলা উপন্যাসের প্রথম রূপ বলা যায়। কিন্তু জীবনের যে সমস্যা ও রহস্য, মানবমনের যে দ্বন্দ্ব-সঙ্ঘাত, মনস্তত্ত্বের যে বিশ্লেষণ, এবং সর্বোপরি যে রচনাশৈলী ও গঠনকুশলতা উপন্যাসকে সার্থকতা দান করে, এই দুই উপন্যাসে তাহাদের সম্ভাব লক্ষিত হয় না। উপন্যাসের ইতিহাসে তাহাদের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে সত্য, কিন্তু প্রকৃত উপন্যাস ইহাদের বলা যাইতে পারে না। উপন্যাসের ইহারা সূচনা মাত্র।

বঙ্কিমচন্দ্রই বাঙলা উপন্যাসের প্রথম রূপকার। 'দুর্গেশনন্দিনী' তাঁহার প্রথম উপন্যাস। তারপর আমাদের গৃহস্থের পরিবার, সমাজ ও স্বদেশ আর অতীত ইতিহাসকে কেন্দ্র করিয়া দেখা দিল 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'বিষবৃক্ষ', 'চন্দ্রশেখর', 'রাজসিংহ', 'আনন্দমঠ', এবং আরও কত কি।

সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াই বঙ্কিম প্রথমেই দৃষ্টি দিলেন ভাষার দিকে। বিদ্যাসাগরী ভাষাকেও তিনি সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিলেন না, আলালী ভাষাকে বর্জন করিলেন না। উভয় ভাষাকে পরিশুদ্ধ করিয়া বঙ্কিম যে এক শক্তিশালী ভাষার সৃষ্টি করিলেন, উচ্চতর উপন্যাসেরই তাহা উপযুক্ত ভাষা। সে ভাষা মনোবিশ্লেষণের ক্ষমতা রাখে, ঘটনাবাহুল্যের প্রবাহকে অবিচ্ছিন্নভাবে বহিয়া লইয়া চলে, প্রাকৃতিক দৃশ্যপটকে তুলিয়া ধরে পাঠকের সম্মুখে আর এই ভাষার ভিতর দিয়াই আমরা যুদ্ধক্ষেত্রের অস্ত্রের ঝনঝনা আর অশ্বের হ্রেষারব শুনিতে পাই। বঙ্কিমের সৃষ্ট ভাষার শক্তি অপরিসীম আর এই ভাষাই তাঁহার উপন্যাসকে একটি বিশিষ্টতা দান করিয়াছে। তবে উপন্যাসের প্রতি ক্ষেত্রেই ভাষার এই শ্রেষ্ঠতা যে রক্ষা করা হইয়াছে এমন কথা হয়তো বলা চলে না। দুর্গেশনন্দিনীর ভাষা অপেক্ষাকৃত দুর্বল। দুর্গেশনন্দিনী বঙ্কিমের প্রথম রচনা। ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাধিধারী নব্য যুবক বঙ্কিম এই উপন্যাসে অনেক জায়গায় বাঙলা ভাষার বিশুদ্ধিতাও রক্ষা করিতে পারেন নাই। শিথিল আর অশুদ্ধ বাক্যযোজনার ইহাতে অভাব নাই। তবুও ভাষার এই শৈথিল্যের মধ্যে নিপুণহস্তে বঙ্কিম অপূর্ব রস সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছেন। এই রসসৌন্দর্যেই তৎকালীন পাঠকের মন 'দুর্গেশনন্দিনী' সেই মুহূর্তে লুট করিয়া লইয়াছিল।

রসসৃষ্টির এই অভিনবত্বই উপন্যাসজগতে বঙ্কিমকে রাজবেশে অভিষিক্ত করিল। বঙ্কিমের পূর্বেও উপন্যাস ছিল। 'হাতেমতাই', 'গোলেবকাওলি', 'কামিনীকুমার', 'বিজয়বসন্ত' ছিল—তাহাতে কামিনী ছিল, ভাঁড়ামি ছিল, কিন্তু সেইসব লেখকের হাতে মধুচক্র নির্মাণের কৌশলটি ছিল না। বাঙলা উপন্যাসে তাই প্রথম রসস্রষ্টা বঙ্কিম। জীবন-রসশিল্পী বঙ্কিম অবিচ্ছিন্ন ধারায় সবই বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন চরিত্র সৃষ্টিতে বিচিত্র রস পরিবেশন করিয়াছেন।

গল্পরচনার অসাধারণ শক্তি ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের। অপূর্ব রচনাভঙ্গীর সঙ্গে শিল্প-কলার চমৎকারিত্ব আর গঠন কৌশলের অভিনবত্বকে সমন্বিত করিয়া উপন্যাস সৃষ্টিতে বঙ্কিম আপন বিশিষ্টতা অর্জন করিয়াছেন। উপন্যাসের মধ্যে নাটকীয় ভাবের সম্ভাব্যতা, নাটকীয় গূঢ় ইঙ্গিত, ঘটনার সংস্থান, নায়ক-নায়িকার মনের দ্বন্দ্ব-

সঙ্ঘাত, ইহা আমরা বঙ্কিমের উপন্যাসেই প্রথম পাই। তাঁহার এই সুনিপুণ কৌশল 'দুর্গেশনন্দিনী' হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। উপন্যাস আর নাটক মিলনে আর বিচ্ছেদে পরিসমাপ্তি লাভ করে। কিন্তু যে মিলনে শুধু সুখ, সে মিলন পাঠককে ভাবিতে অবসর দেয় না, সঙ্গীতের সুতীক্ষ্ণ রেশ পাঠকের মনকে বার বার স্পন্দিত করিয়া তোলে না। পাঠকসমাজের মনকে উন্মুখ আর উন্মনা করিবার জন্যই বিষাদখিন্ন মিলনের ভিতর দিয়া বঙ্কিম উপন্যাসের উপসংহার রচনা করিয়াছেন। তাই সূর্যমুখী আর নগেন্দ্রনাথের শয্যায় কুন্দ মধ্যবর্তিনী হইয়াছে, আর জগৎসিংহ-তিলোত্তমার মিলনের মধ্যে জাগিয়া রহিয়াছে প্রেমের প্রতিমূর্তি আয়েষা।

রোমান্সধর্মিতা বঙ্কিমের উপন্যাসে একটি লক্ষণীয় বিশিষ্টতা। বঙ্কিমের কল্পনা সুদূরপ্রসারী। তাঁহার ভাবতান্ত্রিকতা স্থানে স্থানে উপন্যাসকে স্বপ্নমধুর করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু এই ভাবতান্ত্রিকতা কল্পনার বিলাসে পর্যবসিত হয় নাই। প্রতি ক্ষেত্রেই বাস্তবতার সহিত কল্পনার সুসামঞ্জস্য তিনি স্থাপন করিয়াছেন। আর এই বাস্তব রূপদান করিবার জন্য গঠনকৌশলের অভিনবত্ব তাঁহার আয়ত্তে ছিল। সুমতি কুমতির দ্বন্দ্ব, প্রবৃত্তির সঙ্ঘাত প্রভৃতির অবতারণা করিয়া তাঁহার কল্পনাজালকে বাস্তবতার ভিত্তির উপরেই তিনি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

বঙ্কিমের এই কল্পনা সুন্দর পরিণতি লাভ করিয়াছে তাঁহার নবম উপন্যাস 'রজনী'তে। কল্পলোকে বিহার করিয়াও বাস্তবধর্মিতা রক্ষার জন্য বঙ্কিম এখানে রচনা কৌশলের এক অভিনব পদ্ধতির আশ্রয় লইয়াছেন। ঔপন্যাসিক এখানে একেবারেই অন্তরালে—নায়ক, নায়িকা আর পার্শ্বচরিত্রগুলিই পাঠকের সম্মুখে আপন আপন পরিচয় দিয়া তাহাদের বক্তব্য বলিয়া যাইতেছে। এই রূপকল্প ও গঠনপ্রণালী বঙ্কিমের আবিষ্কার নয়। পাশ্চাত্য সাহিত্য হইতে এই নতুন পদ্ধতি তাঁহাকে অনুকরণ করিতে হইয়াছে। কিন্তু এই অনুকরণকেই আপন প্রতিভা আর শিল্পচাতুর্যে মণ্ডিত করিয়া 'রজনী' আর 'ইন্দিরা'কে বঙ্কিম সৌন্দর্যময়ী ও গৌরবশালিনীই করিয়াছেন। বাঙলা সাহিত্যে বঙ্কিমের এই বিশিষ্ট পদ্ধতি উত্তরকালে রবীন্দ্রনাথও অনুসরণ করিয়াছেন।

বঙ্কিমের দৃষ্টি শুধু অতিপ্রাকৃতের সন্ধানেই ঘুরিয়া বেড়ায় নাই, প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্যও সে দৃষ্টিকে বার বার আকৃষ্ট করিয়াছে। ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের প্রকৃতিপ্রেমের নিদর্শন সর্বত্রই সুস্পষ্ট। উপন্যাসের ঘটনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এমন বিচিত্র চিত্র ইতিপূর্বে আর কেহ অঙ্কিত করেন নাই। প্রকৃতির সৌন্দর্য চিত্রণের ভিতর দিয়াই

'দুর্গেশনন্দিনী'র প্রথম যবনিকার উন্মোচন হইয়াছে। বঙ্কিমের এই প্রকৃতির বর্ণনাকুশলতার জন্যই তাঁহার উপন্যাসের ঘটনাবিন্যাসের বাস্তবতা অধিকতর পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। তাই জনবিরল সমুদ্রসৈকতে ঘন অরণ্যানীর মধ্যে নির্বাসিত নবকুমারের শঙ্কিত বিমূঢ় মনকে বুঝিতে আমাদের বিলম্ব হয় না—বসন্তের কোকিলের ঐ পঞ্চমস্বরের আশ্রয় না লইলে বোধহয় রোহিণীর যৌবনোচ্ছ্বাস এমনভাবে ব্যক্ত হইত না।

চরিত্রসৃষ্টির নৈপুণ্যই উপন্যাসকে সাফল্যমণ্ডিত করে। বঙ্কিমের মধ্যে এই কুশলতার অভাব ছিল না। তাঁহার হাতে চরিত্রগুলি সর্বত্রই জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। প্রেম আর প্রেমের দ্বন্দ্বই উপন্যাসের ভিত্তি। বঙ্কিমের উপন্যাসের নায়ক-নায়িকাকেও প্রেমের ফাঁদে পড়িতে হইয়াছে কিন্তু কোথাও তাহারা একই 'টাইপ' হইয়া উঠে নাই। তাহাদের প্রকৃতি ভিন্ন, সকলেই আপন সমস্যায় আর আপন ব্যক্তিত্বে প্রোজ্জ্বল। কুন্দ, রোহিণী, আয়েষা, শৈবলিনী সকলেই প্রেমের জালে ধরা দিয়াছে। কুন্দের চরিত্র নিন্দনীয় বটে, কিন্তু জঘন্য নয়, রোহিণী মানবরূপী পিশাচিনী, আয়েষা দেবী, শৈবলিনী বাল্যপ্রেমে বিজয়িনী কিন্তু অভিশপ্তা। সৃষ্টির চাবিকাঠিটি ছিল বঙ্কিমের হাতে, তাই অবলীলায় রসসম্পৃক্ত এত বিভিন্ন চরিত্রের সৃষ্টি করিয়া তিনি উপন্যাসের মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছেন।

বঙ্কিমের উপন্যাসের আরও একটি বিশিষ্টতা তাঁহার আদর্শবাদ। সর্বত্রই বিশেষ একটি আদর্শকে সম্মুখে ধরিয়া তিনি উপন্যাস রচনায় অগ্রসর হইয়াছেন। সমাজে পবিত্র দাম্পত্য প্রেমের আদর্শ স্থাপনের জন্যই অনেক স্থলে তিনি লেখনী ধারণ করিয়াছেন। আবার কোথাও বা স্বদেশ ও স্বজাতিপ্রেমের আদর্শ তাঁহাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। পবিত্র প্রেমের প্রতিষ্ঠা ও আদর্শ স্থাপন করিতে গিয়াই বঙ্কিম কুন্দের হাতে বিষের কৌটা তুলিয়া দিয়াছেন, রোহিণীকে হত্যা করাইয়া গোবিন্দলালকে দেশত্যাগী সন্ন্যাসী করিয়াছেন। আয়েষার প্রেম নিষ্কলুষ বটে, কিন্তু স্বজাতিবিরুদ্ধ ; তাই নীরবে তাহাকেও সরিয়া দাঁড়াইতে হইয়াছে আর শৈবলিনী নরকাগ্নিতে পুড়িয়া আপনার কলঙ্কিত জীবনের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে। বঙ্কিমের নর-নারীর প্রত্যেকের জীবনেই নূতন সমস্যা, প্রত্যেক চরিত্রেরই নূতন রূপ। তবে এই আদর্শবাদ বা নীতিপ্রচার কিন্তু উপন্যাসের কোথাও রসসৃষ্টির পরিপন্থী হয় নাই।

অনেকে মনে করেন বঙ্কিম পশ্চিমের অনুকারী। পাশ্চাত্য সাহিত্যের ভাব ও রীতিকে আশ্রয় করিয়াই বঙ্কিম তাঁহার উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। পাশ্চাত্য

সাহিত্যের কাছে তাঁহার ঋণের স্বীকৃতি বঙ্কিম নিজেই অনেক স্থলে করিয়াছেন। পূর্ববর্তী সাহিত্যই পরবর্তী সাহিত্যের জন্ম দেয়। এক দেশের সাহিত্য অন্য দেশের কাছে আদর্শের জন্য হাত পাতে। ইংরেজী সাহিত্যের আদর্শ রোমান সাহিত্য। কালিদাসের ভাবের বাহন রবীন্দ্রনাথ। বঙ্কিমও পশ্চিমের কাছে সাহিত্যেব অনেক শিক্ষাই পাইয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার প্রতিভার স্পর্শে পাশ্চাত্য সাহিত্যের সেই আদর্শ আমাদের বাঙলা সাহিত্যের নিজস্ব সম্পদরূপেই গড়িয়া উঠিয়াছে। এবং বলা যাইতে পারে যে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য সাহিত্যের এই মিলনের জন্যই প্রাক্-বঙ্কিমযুগের সাহিত্য হইতে বঙ্কিমের উপন্যাস এতখানি বিশিষ্ট গৌরব অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছে।

বঙ্কিমের গৌরব তাঁহার ঐতিহাসিক উপন্যাস। অতীতের রূপ প্রত্যক্ষ করার একটি সহজ শক্তি ছিল বঙ্কিমের। প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাসের জন্মদাতা বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমের প্রতিভার পাশেই আমরা দেখিতে পাই 'জীবনসন্ধ্যা' আর 'জীবনপ্রভাতে'র রমেশচন্দ্রকে। ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় রমেশচন্দ্রও সুদক্ষ ছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমের অতীতচারী দৃষ্টি ইতিহাসের ঘটনাবাহুল্যকে প্রত্যক্ষ সত্যের ভূমিতে দাঁড় করাইয়া তাহার সঙ্গে ক্ষুদ্র পারিবারিক জীবনের তুচ্ছতম উত্থান ও পতনের যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছে, যুদ্ধক্ষেত্র আর বাদশার সিংহাসনের সঙ্গে আমাদের আঙিনার যে যোগসেতু নির্মাণ করিযাছে, রমেশচন্দ্রের উপন্যাসে তাহা বিরল। বঙ্কিমের 'রাজসিংহ' তাই অপূর্ব। 'রাজসিংহ' একদিকে ইতিহাসের বাহন, আর একদিকে আমাদের গৃহের প্রতিচ্ছবি।

উপন্যাস শিল্পে বঙ্কিমের প্রতিভা অপ্রতিদ্বন্দ্বী, তুলনাহীন। বঙ্কিমের ভাষা, তাঁহার রচনা ও গঠনশৈলী, চরিত্রবিশ্লেষণের অপূর্ব ক্ষমতা বঙ্কিমকে মহিমময় করিয়া রাখিয়াছে। বঙ্কিম বাঙলা উপন্যাসের শুধু স্রষ্টা নন, উপন্যাস জগতের তিনিই একচ্ছত্র সম্রাট।

বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাস

ঐতিহাসিক উপন্যাসের জন্মকাল অনিশ্চিত। কবে কাহার দ্বারা প্রথমে বাঙলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচিত হইয়াছিল, তাহা এখনও সঠিক নির্ধারিত হয় নাই। তবে অনুমান হয় ঐতিহাসিক উপন্যাসই সামাজিক উপন্যাসের পূর্ববর্তী। উপন্যাসের বিষয়বস্তুর জন্য যখন আমরা ইতস্তত দৃষ্টিপাত করিতেছিলাম, তখন বর্তমান সমাজ ও পরিবারের ঘটনাকে অতিক্রম করিয়া

অতীতের ঐতিহাসিক ঘটনাই আমাদের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিয়াছিল বেশী। ইহারই ফলে উপন্যাস-জগতে ঐতিহাসিক উপন্যাসেরই আবির্ভাব হয় সর্বপ্রথমে।

কিন্তু প্রথম যুগের এই ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি কল্পনাকেই আশ্রয় করিয়াছিল বেশী, সত্যকে কম। প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাসের যে উচ্চ আদর্শ, ইহাদের মধ্যে সে আদর্শের সন্ধান মেলে না। ইতিহাসের বিশাল সঙ্ঘটনকে আশ্রয় করিয়া আমাদের ক্ষুদ্র পারিবারিক জীবনকে অঙ্কন করিতে হইবে। ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সহিত যোগসূত্র অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আমাদের সমাজ ও জীবনের দৈনন্দিন হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, প্রেম-বিরহের বিচিত্র চিত্র অঙ্কন করাই ঐতিহাসিক উপন্যাসের কাজ। বাস্তব জীবনের বিচিত্র ঘটনার উপরে কল্পনার রঙ বুলাইয়া ইতিহাসের সত্যনিষ্ঠার সহিত তাহার সমন্বয় সাধন করাই সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাসের আদর্শ।

আমাদের প্রথম যুগের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি কিন্তু এই আদর্শকে সম্পূর্ণ ভাবে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। উনবিংশ শতাব্দীর কয়েকখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস আলোচনা করিলেই আমরা ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিব। কেদারনাথ চক্রবর্তীর 'চন্দ্রকেতু', হেমচন্দ্র বসুর 'মিলন কানন', ললিতমোহন ঘোষের 'অচলবাসিনী' প্রভৃতি উপন্যাসগুলি আলোচনা করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, ইহাদের অনেকগুলিই কেবলমাত্র ইতিহাসের উপাখ্যানের উপরই প্রতিষ্ঠিত। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের যে সব ঘটনা তাহাতে বর্ণিত হইয়াছে—ইতিহাসের ঘটনার সহিত তাহাদের যোগসূত্র খুবই কম। ইতিহাসের ঘটনার প্রভাবে সাধারণ মানুষের জীবন সেখানে নিয়ন্ত্রিত হয় নাই। ইতিহাসের যুদ্ধ-বিগ্রহ, রাজ্যের উত্থান ও পতন, রাজনীতির প্রবল প্রকোপ যে আমাদের সাধারণ লোকের জীবনের উপরে কতখানি প্রভাব বিস্তার করে, আমাদের ক্ষুদ্র পারিবারিক জীবনে কতখানি বিক্ষোভ ও জটিল সমস্যার সৃষ্টি করে—তাহার কোন পরিচয়ই এই সব উপন্যাসে বর্ণিত হয় নাই। সুতরাং প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাসের যাহা প্রধান গুণ ও উচ্চ আদর্শ, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের কতকগুলি উপন্যাসে তাহার কোন নিদর্শনই আমরা পাই না।

আবার অনেক গ্রন্থে ইতিহাসের উপাখ্যানেও সর্বত্র সত্যনিষ্ঠা রক্ষিত হয় নাই। কাশ্মীরের রাজপুত্রের সঙ্গে উদাসিনী রাজকন্যার বিবাহকে অবলম্বন করিয়াই 'পূর্ণশশী' রচনা। শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে—"এই সমস্ত গল্প যেন রূপকথার অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। ইতিহাসের কঠোর দিবালোক অপেক্ষা কল্পলোকের রঙিন আলোই যেন ইহাদের প্রকৃতির অধিক অনুগামী।"

কিন্তু এই সময়েই সাহিত্য-জগতে আমরা আরও দুই জন ঔপন্যাসিককে দেখিতে পাই—বঙ্কিমচন্দ্র এবং রমেশচন্দ্র। অতীতের ইতিহাস ও অপেক্ষাকৃত প্রাচীন কালের সাধারণ জনগণের জীবনযাত্রা প্রণালী সম্বন্ধে যে অজ্ঞতা, তাহাদের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ সম্বন্ধে অপটুত্ব এবং ইতিহাসের ঘটনার প্রভাবে জনগণের জীবনের সমস্যা ও তাহার সমাধান করার যে অক্ষমতা অন্যান্য ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকের প্রতিষ্ঠার পথে অন্তরায় হইয়াছিল, রমেশ ও বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যিক জীবনে কিন্তু তাহারা কোন বাধা সৃষ্টি করিতে পারে নাই। তাঁহাদের কালজয়ী প্রতিভা অতীতের ইতিহাসকে আয়ত্ত করিয়াছে, প্রাচীন যুগের জনসাধারণের চিন্তাধারা, আচার-ব্যবহার, তাহাদের সুখ-দুঃখ বিরহ-বেদনার প্রতি সহানুভূতির সহিত দৃষ্টিপাত করিয়াছে, এবং রাজ্য ও রাজার ইতিহাসের সহিত ক্ষুদ্র পরিবারের তুচ্ছতম জীবনকে যথাযোগ্যভাবে বিজড়িত করিয়া ঐতিহাসিক উপন্যাসে এক নতুন আলোকপাত করিয়াছে।

'দুর্গেশনন্দিনী'ই বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বপ্রথম উপন্যাস—এবং প্রথম উচ্চাঙ্গের ঐতিহাসিক উপন্যাস এই 'দুর্গেশনন্দিনী'ই। বঙ্কিম আদর্শবাদী—পারিবারিক জীবনের আদর্শ, সমাজ ও সামাজিক জীবনের সুরুচি ও নীতিবোধ, আদর্শ দেশপ্রেম ও দেশভক্তিই বঙ্কিমচন্দ্রকে তাঁহার সমস্ত সাহিত্য-জীবনে পথপ্রদর্শন করিয়া চলিয়াছে। সেইজন্য আদর্শবাদী বঙ্কিম তাঁহার উপন্যাসের সর্বত্র ঐতিহাসিক উপন্যাসের কঠোর সত্যনিষ্ঠা রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন নাই। অনেকস্থলে অতীতের ইতিহাস তাঁহার হাতে ম্লান হইয়া পড়িয়াছে, আর ভবিষ্যতের কল্পিত সুন্দর সম্ভাবনাই উজ্জ্বল হইয়া ইতিহাসের সত্যবস্তুকে আবৃত করিয়াছে। বঙ্কিমের 'মৃণালিনী' ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়। শ্রীশ্রীকুমারের মতে এই উপন্যাসে "বঙ্কিমের প্রধান শক্তি ঐতিহাসিক আবেষ্টন-সংগঠনের বা ইতিহাসের শুষ্ক অস্থির মধ্যে প্রাণসঞ্চারের কার্যে নিয়োজিত হয় নাই, পরন্তু মনোরমার প্রহেলিকাময় চরিত্রের বিশ্লেষণেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।" 'সীতারাম'ও চরিত্র বিশ্লেষণের ইতিহাস। ইতিহাসের অংশও ইহার মধ্যে আছে, কিন্তু তাহা ক্ষীণ। তবে অন্যান্য উপন্যাসের মতো এখানে বঙ্কিমের আদর্শ হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার কল্পনা ও উদ্দীপনা ঐতিহাসিক সত্যকে আবৃত করিয়া ম্লান করে নাই। 'দেবী চৌধুরাণী' পারিবারিক উপন্যাস, ঐতিহাসিক নহে। আখ্যায়িকার মূলবস্তুর সঙ্গে ইতিহাসের যে অংশটুকু ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা বাদ দিলেও 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসের ক্রমপরিণতি বা সৌন্দর্য সৃষ্টির পথে কোন ব্যাঘাত আসে না। 'চন্দ্রশেখর'কে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যাইতে পারে; ইতিহাস সম্পূর্ণভাবে ইহার পটভূমিকায় না থাকিলেও

বাঙলা দেশে ইংরেজের আগমন ও তাহাদের প্রতিপত্তি বিস্তার শৈবলিনী ও চন্দ্রশেখরের জীবনে ছায়াপাত করিয়াছে। ঐতিহাসিক ঘটনাবলীই দলনীর ও প্রতাপের পাশে শৈবলিনীকে আনিয়া দাঁড় করাইয়াছে।

বঙ্কিমের মতে 'রাজসিংহ'ই তাঁহার একমাত্র প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাস। বঙ্কিমের অন্যান্য উপন্যাস হইতে 'রাজসিংহ' একটু ভিন্ন প্রকৃতির। 'সীতারাম', 'দুর্গেশনন্দিনী', 'চন্দ্রশেখর' প্রভৃতি সমস্ত উপন্যাসেই ইতিহাসের ঘটনা ও বর্ণনা আছে সত্য, কিন্তু তাহা শুধু উপন্যাসের প্রতিবেশ রচনাতেই সাহায্য করিয়াছে। উপন্যাসের সমস্ত পটভূমিকাতে আমরা ঐতিহাসিক সত্যকে দেখিতে পাই না। ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যার সমালোচনা, বিভিন্ন চরিত্রের নানারূপ বিশ্লেষণ, সমাজে ও পারিবারিক জীবনে আদর্শ স্থাপন, ইহাই ছিল সেই সকল উপন্যাসের কাজ। "নায়ক নায়িকার ব্যক্তিগত জীবন ইতিহাসের ঘূর্ণাবর্তে পড়িয়া বিশেষ ভাবে বিক্ষুব্ধ ও আলোড়িত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তথাপি ইহার প্রধান ব্যাপার ব্যক্তিগত জীবনের বাধাবিঘ্ন-খণ্ডিত প্রণয় লইয়া।"

কিন্তু 'রাজসিংহে' ঐতিহাসিক অংশেরই প্রাধান্য। 'রাজসিংহ' শুধু চরিত্র ও মনোবিশ্লেষণের উপন্যাস নয়। 'রাজসিংহ' উপন্যাসের সমস্ত গতিপথে ইতিহাসের পদচিহ্ন সুস্পষ্ট রহিয়াছে—আর এই পদক্ষেপের অনুসরণ করিয়াই 'বহ্নিমুখং পতঙ্গবং' প্রত্যেকটি চরিত্র আপনাপন ভাগ্য রচনা করিতে চলিয়াছে। এখানে প্রত্যেকটি চরিত্রের সুখ দুঃখ, বিরহ-বেদনা, হাসি-কান্নাকে ইতিহাস গ্রাস করিয়া সমস্ত পারিবারিক জীবনে এক দারুণ ঘূর্ণাবর্তের আলোড়ন তুলিয়াছে। রাজসিংহের প্রতি চঞ্চলকুমারীর প্রেম এখানে সাধারণ নায়িকার প্রেম নয়। এ প্রেমের মূল স্বদেশের প্রতি ভক্তি, এ প্রেমের কারণ বিধর্মীর প্রতি বিদ্বেষ আর রাজপুত বীরের প্রতি রাজপুত রমণীর শ্রদ্ধাঞ্জলি। মোগল বাদশাহের দম্ভ আর রাজপুতানার কুলগৌরব ও বীরত্বের মর্যাদার সঙ্ঘর্ষই 'রাজসিংহে'র সমস্তখানি পটভূমিকা রচনা করিয়াছে। এই সঙ্ঘর্ষের আবর্তে পড়িয়াই রাজকুমারী চঞ্চল গৃহত্যাগ করিয়া পর্বতের সানুদেশে যুদ্ধক্ষেত্রে 'চিতোরাধিষ্ঠাত্রী রাজপুতকুলরক্ষিণী ভগবতী'র মতো মহারাজের সম্মুখীন হইয়াছে। নির্মলকুমারী মাণিকলালের ঘরণী হইয়া মোগলের অন্তঃপুরে বাক্‌পটুত্বে বাদশাহকে হতবাক করিয়াছে। ইতিহাসের ঘটনার যে আবর্তে পড়িয়া মাণিকলাল নির্মলার পাণিগ্রহণ করিল, সেখানে প্রেম নিবেদন, আর প্রেমের আদান-প্রদানের কোনও অবসর ছিল না। যুদ্ধযাত্রার পথে একদিকে ছিল অবলা বিপন্না নারীর প্রতি বীরের করুণামিশ্রিত সহায়তা, আর একদিকে ছিল বিপন্না সখীর প্রতি দরদী সখীর চিত্তচাঞ্চল্য।

বঙ্কিমের ঐতিহাসিক উপন্যাসের আলোচনা করিতে গেলে তাই 'রাজসিংহ'কেই একমাত্র ঐতিহাসিক উপন্যাস বলিতে হয়। রাজসিংহ আর ঔরংজেবের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ যুদ্ধই ইহার আখ্যায়িকার মূল বিষয়—অন্যান্য সব কিছুই সঞ্চারী রসের ন্যায় যুদ্ধের ঘটনাবলীকেই পরিপুষ্টি দান করিয়াছে। যুদ্ধের তালে তালে নায়ক-নায়িকা আর পার্শ্বচরিত্রগুলি পা ফেলিয়া চলিয়াছে। রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে পড়িয়া কোথাও তাহারা উঠিয়াছে, কোথাও নামিয়াছে। ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখ, ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যা ইতিহাসকে অনুসরণ করিয়াই রূপ গ্রহণ করিয়াছে। এইভাবে বঙ্কিমের উপন্যাসগুলি আলোচনা করিলে এই সত্যেই আসিয়া পৌছিতে হয় যে, 'রাজসিংহ'ই বঙ্কিমের প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাস। উপন্যাসের গুণ আর লক্ষণ যেমন ইহাতে রহিয়াছে, তেমনি আবার পটভূমিতে থাকিয়া সমস্ত উপন্যাসখানিকে ইতিহাস আপন 'দুন্দুভিধ্বনিতে' পরিচালিত করিয়াছে। 'রাজসিংহে'র মধ্যেই উপন্যাস আর ইতিহাসের মিলন সার্থক হইয়াছে।

বাঙলা সনেট ও মধুসূদন

চৌদ্দ লাইনের পরিসরে রচিত কবির মানসলোকের একটি অনুভূতিকণা যখন উজ্জ্বল হয়ে গাঢ়বদ্ধ রূপ শিল্পের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়—তখনই তাকে সনেট বলে। 'সনেট' কথাটি ইংরেজী—কিন্তু ইটালিয়ান 'সনেত্তো' শব্দ থেকে ইংরেজীতে সনেট শব্দটা এসেছে। বাঙলায় একে চতুর্দশপদী কবিতা বলার রেওয়াজ ছিল। কিন্তু সনেট আর চতুর্দশপদী কবিতা ঠিক এক জাতের নয়—তাই চৌদ্দ লাইনে লেখা কবিতামাত্রকে সনেট বলা যায় না। মধুসূদন দত্ত বাঙলায় প্রথম সনেট লেখেন আর তিনিই সনেটকে প্রথমে চতুর্দশপদী কবিতা বলে অভিহিত করেছেন। তিনি সনেট সম্পর্কে বিশেষ রকম ওয়াকিবহাল ছিলেন বলেই বোধহয় তাঁর সমস্ত কবিতাকে (চৌদ্দ লাইনের পরিমিত বিস্তারে যা লেখা—হয় তো যথার্থ সনেট হয় নি,) সনেট না বলে চতুর্দশপদী বলেছেন।

চৌদ্দ লাইনে লেখা সনেটের গঠনে একটি বিশেষ—এমন কি প্রধান ব্যাপার, কিন্তু তবু যা চৌদ্দ লাইনে লেখা তাই সনেট নয়।

সনেটের একটা বিশেষ গঠন-রীতি আছে, চৌদ্দটা লাইন অবশ্যই তাতে থাকবে—কিন্তু তা থাকবে দুটি বিভাগে। প্রথম বিভাগে আট পঙক্তি থাকে—

এই আট পঙক্তিকে বলা হয় অষ্টক, ইংরেজীতে এর নাম Octave. আর শেষের ছ'লাইনের নাম ষড়ক বা sestet কিংবা sestette. এই অষ্টক বা ষড়কের মিল সম্পর্কে কবিকে খুব বেশী অবহিত হতে হবে, কেননা মিল দেবারও একটা নিয়ম আছে। প্রথম লাইনের সাথে চতুর্থ, পঞ্চম, এবং অষ্টম পঙক্তির মিল থাকবে—আর দ্বিতীয় লাইন মিলবে তৃতীয়, ষষ্ঠ ও সপ্তমের সঙ্গে। অর্থাৎ মিল হবে কগখক, কখখক। নীচে একটি সনেটের আট লাইন তুলে দেওয়া হল—

ক আমরা দিয়েছি প্রাণ, অনেক অনেক প্রাণ, তবে—
খ শান্ত নদীটির স্নিগ্ধ তীরে তীরে গড়েছি কুটীর,
খ ডেকেছি প্রিয়াকে কাছে ইশারায় সোহাগ-মদির ;
ক একটি অমরগান ঠোঁটে তুলে অশেষ বৈভবে
ক বলেছি মানুষ সত্য, হৃদয়ের এক অনুভবে
খ একে ও অন্যকে ডেকে নির্বিশেষে বিশ্বাস সুস্থির
খ দিয়ে এঁকেছি আলপনা প্রাণে, তবে—শান্তির তিতির
ক সকলের গালে চুমা রেখে গেছে আনন্দে উৎসবে !

ষড়কের মিল সম্পর্কে কঠিন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। গঘঙ, গঘঙ হতে পারে, কিংবা, গঘ গঘ ঙঙ, গঘঘগ ঙঙ, গঘঙচছজ, অথবা অন্য যে কোন রকম।

অষ্টকে কবিকে মূল ভাব-কল্পনার স্পষ্ট পরিচয়টি উদ্ঘাটিত করতে হয়—ফলে কবির একটি মাত্র মানসপরিচয়ই ঘনপিনদ্ধ রূপ লাভ করে, মিল দেবার জন্যে তাই এত সযত্ন প্রয়াস বা কঠিন অনুশাসন। কিন্তু ষড়কে কবি ঐ মূল ভাবকল্পনার উপসংহার করেন—অথবা আরও বিস্তৃত বা ব্যাপক করেন ; ভাবের দিক থেকে এই রকম একটা কড়া শাসন থাকে বলেই মিলের দিকে ষড়কের তাই এত স্বাধীনতা।

মধুসূদনই বাঙলা সাহিত্যে প্রথম সনেট রচনা করেন। তিনি তাঁর বন্ধু রাজনারায়ণকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন—I want to introduce the Sonnet into our language. ইওরোপে থাকার সময় তিনি প্রায় শতাধিক সনেট লিখেছিলেন। মধুকবির আশ্চর্য বাক্‌সংযম এবং ভাবের সংহতি দেখে সহজেই বুঝা যায় যে তাঁর মানস সনেট রচনার বিশেষ উপযোগী। আবেগের উচ্ছ্বাসময়তা এবং সংযমের বন্ধনই সনেটের প্রাণ বলা যেতে পারে। মধুসূদন সাহিত্যক্ষেত্রে দুর্বার একটা প্রাণস্পন্দন—কিন্তু সাধনার দ্বারা একটা বড় কিছু সৃষ্টি করা তাঁর ধাতে ছিল না—স্বাভাবিকভাবে যা অনবদ্য হয়েছে, তাতেই তিনি তুষ্ট হয়েছেন।

চতুর্দশপদী কবিতার মধ্যেও মধুসূদন আঙ্গিক সম্পর্কে বহু ক্ষেত্রে অনবধান দেখিয়েছেন। তাঁর সনেট পড়লেই বুঝা যায় যে, সনেটের শিল্পাত্মার নিগূঢ় রহস্যস্পন্দনটি তিনি ঠিক ধরেছিলেন—কিন্তু গঠনের ব্যাপারে তিনি কিছুটা নিয়মহীন হয়ে পড়েছিলেন—অর্থাৎ Irregular সনেটও লিখেছেন। বহুক্ষেত্রেই তিনি পেত্রার্কীয় রীতির অদলবদল করেছিলেন।

কিন্তু সনেটে যে কাব্যাবেগ—যেখানে কবি নিজের মনের গভীর বিষয়কে প্রকাশ করছেন, যেখানে মনের আবেগ সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে দেখা দিয়েছে, সেখানে সনেট কবিতার দিক থেকে যে সার্থকতা লাভ করেছে, তা বলাই বাহুল্য। যেমন—'বঙ্গভাষা', 'কবি', 'বটবৃক্ষ', 'কাশীরাম দাস', 'কপোতাক্ষ নদ', 'নূতন বৎসর', 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর', 'সমাপ্তে' প্রভৃতি অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের সনেট।

যেখানে সনেটের বিষয়বস্তু একটু গদ্যধর্মী, সেখানে কবি উপমা অথবা রূপক বা ঐ জাতীয় কোনও অলঙ্কারের মাধ্যমে কাজ সেরেছেন—অর্থাৎ বাক্‌চাতুর্যের দ্বারা পাঠককে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করেছেন। বিদেশে নানা দুঃখদুর্দশার মধ্যে পড়ে তাঁর মানসিক চিন্তার ঐক্য নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তা ছাড়া—এ সময় তাঁর কবি প্রতিভাও প্রায় অস্তমিত। তাঁর প্রতিভা সর্বক্ষেত্রেই অসম্পূর্ণ এবং ক্ষণস্থায়ী। তিনি নিজে যে অদ্বিতীয় সনেট লিখে যান নি—এ সম্পর্কে তাঁরও কোন সংশয় নেই। ১৮৬৫ সালে বন্ধু গৌরদাস বসাককে একটা চিঠিতে লিখেছিলেন—I have been lately reading Petrarch—the Italian poet, and scribbling some sonnets after his manner. তাঁর এই "scribbling some sonnets" বাঙলা কাব্যের নতুন পথের সন্ধান করে দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথ সেন, প্রমথ চৌধুরী, মোহিতলাল মজুমদার, প্রমথনাথ বিশী, অজিত দত্ত, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত প্রমুখ বহু কবিই সনেটের ক্ষেত্রে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

মধুসূদনের সনেটে মধুকবির হৃদয়ের পরিচয় ইতস্তত ছড়ানো আছে। চতুর্দশপদীতেই মধুসূদনের হৃদয় যেন অনেকটা নিজেকে মেলে ধরেছে। সমালোচকেরাও বলেছেন—"মধুসূদনকে ভালো করিয়া জানিতে হইলে, তাঁহাকে বিশেষরূপে বুঝিতে হইলে এই চতুর্দশপদী কবিতাগুলির আলোচনা অপরিহার্য।" তাই মধুসূদনের কবি-মন বুঝার দিক থেকে চতুর্দশপদী কবিতার একটি ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

বাঙলা রোমান্টিক কবিতা

বাস্তবকে কল্পনার সাহায্যে বাস্তবাতীত করে পাঠকের সামনে হাজির করার নামই রোমান্টিক পদ্ধতি। কবি অধীরভাবে অনির্দেশ্য কোন কল্যাণবোধকে আদর্শ ধরে নিয়ে সেখানে পৌঁছতে চেষ্টা করেন; সে লক্ষ্যপথ হয়তো সঠিকভাবে তাঁর জানাও নেই, তবু সুন্দর করে কল্পিত মনোহারিত্ব আরোপ করে তাঁকে যেতে হয়, তিনি কিছুটা বুঝতে পারেন, কিছু বা তাঁর কাছে অধরা থাকে, তিনি সংশয়ে চালিত হয়ে প্রশ্ন করেন—

বলো দেখি মোরে, শুধাই তোমায় অপরিচিতা—
ওই যেথা জ্বলে সন্ধ্যার কূলে দিনের চিতা,
ঝলিতেছে জল তরল অনল,
গলিয়া পড়িছে অম্বরতল,
দিক্‌বধূ যেন ছলছল-আঁখি অশ্রুজলে,
হোথায় কি আছে আলয় তোমার
ঊর্মিমুখর সাগরের পার
মেঘচুম্বিত অস্তগিরির চরণতলে?
তুমি হাস শুধু মুখপানে চেয়ে কথা না বলে।

রবীন্দ্রনাথের এই সৌন্দর্যসাধনা নিশ্চয়ই রোমান্টিক পদ্ধতির প্রকাশ।

বাঙলা কাব্যে রোমান্টিকতা সম্পর্কে নতুন করে কিছু বলবার নেই, কোন কাব্যেরই তা থাকে না, কারণ কবিকে রোমান্টিক না হলে তো চলে না। বস্তু ছাড়া কোনও শিল্প বা সাহিত্য গড়ে ওঠে না। এই বস্তুকে কেন্দ্রে রেখে শিল্পী ও স্রষ্টাকে বস্তুর অতীত এক সৌন্দর্যলোক রচনা করতে হবে। গ্যেটের বিখ্যাত উক্তি এ প্রসঙ্গে মনে পড়ছে—Art is art, because it is not nature. রবীন্দ্রনাথের কথাও মনে পড়ছে—

সেই সত্য যা রচিবে তুমি—
ঘটে যা তা সব সত্য নহে। কবি তব মনোভূমি
রামের জনমস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।

সুতরাং কবিকে নিজের মনের কল্পনা এবং সৌন্দর্য-সৃষ্টির অনুপম ক্ষমতার সিঞ্চনে বিষয়কে জারিয়ে নিতে হয়। শুধু নিছক রূঢ় বাস্তব, প্রোপাগ্যাণ্ডা ছাড়া আর কিছুই নয়। কর্মকঠোর ক্লান্ত জীবনকে কাব্যের বিষয়ীভূত করার জন্যে কবিকে বলতে হয়েছে—

আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,
আমারে দুদণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন।

কিংবা, কথার অতীত এক স্বপ্ন সুষমা ফুটিয়ে তুলে, তা ব্যক্ত করার জন্যে কবি বলেন—

তার পরও কথা থাকে, ভিজে ভিজে মেঘ মেঘ কথা।

চাঁদের সুষমা কবিকে শান্তি দেয় না, তাই কবি চাঁদকে একখানি কাস্তে বলেছেন, কোন কবি বা বলেছেন পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি। উভয় ক্ষেত্রেই বাস্তবরূঢ় চেতনায় কবির মন আহত, কিন্তু কাব্যের বিষয়ীভূত করে নেবার জন্যে কবিকে কল্পনাশ্রয়ী হয়ে বাস্তবকে বাস্তবাতীত করে বলতে হয়েছে, আর বলা বাহুল্য তা অমনিই রোমাণ্টিক হয়ে দেখা দিয়েছে।

কাব্যকে বাইরের জগৎ থেকে সরে এসে কবি ও পাঠকের মনোলোকে সেতু রচনার কাজ করতে হয়। তাই কবি যা কিছু অপরূপ, তাঁর মনে যা কিছু অপূর্ব ভাব-সম্পদ, তাকে রূপের মাধ্যমে প্রকাশ করার চেষ্টা করেন, ভাষার মধ্যে দিয়ে ভাষাতীতকে প্রকাশ করতে হয়, ফলে কি ছন্দে কি শব্দচয়নে একটি অনির্বচনীয় সুর সংযোজন করেন, তখনই কাব্য রোমাণ্টিক হয়।

কবি যখন বলেন—মন দিয়ে মন হাতড়াই, তবু কারে কতটুকু পাই? তখন তিনি একান্ত আপনজনকে পাবার জন্যে যে কী রকম ব্যাকুল, তাই ব্যক্ত করতে কবিকে উপমাত্মক চিন্তার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছে।

রোমাণ্টিক ব্যঞ্জনা কবির মনোজাত, সুতরাং বাইরেকার যে জিনিসই সে গ্রহণ করুক না কেন, মনোলোকের অমেয় রসের ঔজ্জ্বল্যে তা রোমাণ্টিক চেহারা ধরতে বাধ্য। নির্জন নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে প্রখর সূর্যালোকে বর্ষার পরে নির্মেঘ নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে আকাশ বর্ণনা করতে গেলে কবিকে বলতেই হবে—আজ আকাশের স্বাস্থ্য চমৎকার। কিংবা পাহাড়ী নদী বেলে মাটির উপর দিয়ে বয়ে গেছে, তা দেখে কবি বলেন—বালির বালিশে রোগা নদী শুয়ে আছে। দুপুরে একান্ত নির্জন রুক্ষ গাছের ডালে বসে কাক ডাকছে—এই কর্কশ ক্রেংকার আমাদের কানে রোজই বিরক্তির সৃষ্টি করে, চিরপরিচিত এই ডাক। তবু কবি যখন এই কাকের ডাক বর্ণনা করেন—তখন তিনি বলেন—

কোথায় কাদের ছাদে সমস্ত দুপুর
কাক ডাকে, শুনি।
বোঝা আর বোঝাবার
প্রাণান্ত ক্লান্তির শেষে
অকস্মাৎ খুলে যায় আশ্চর্য কবাট।

কাক ডাকে, আর,
সে শব্দের ধু ধু করা অপার বিস্তার
হৃদয়ে ছড়ায় সব শব্দের অতীত
ধ্যান-গাঢ় প্রশান্তির মতো।

'বর্ষার পর একদিন হঠাৎ সকালে আকাশের দিকে হয়তো চোখ পড়লো। ঘন নীল নির্মেঘ আকাশ। নতুন রোদের আলোয় খলখল করে হাসছে যেন। আশে পাশের গাছগুলো সেই আলোর অভিবন্দনা শুরু করেছে। সদ্য বর্ষার জলে স্নাত গাছের পাতার রঙও কি টকটকে সবুজ! আকাশ বাতাস—সব কিছুকেই যেন আমরা বিস্ময়মণ্ডিত করে দেখে ফেলি। শারদ সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে নিতান্ত পরিচিত প্রত্যহকে অন্তত কয়েকটি মুহূর্তের জন্যেও বিস্মৃত হই। এই যে বাস্তব ভুলে থাকা এবং পরিপার্শ্বকে বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টি দিয়ে দেখা—এই হল রোমান্টিসিজ্‌ম। রোজকার যা চেনা জানা, এ যে তার চেয়ে ভিন্ন, যা প্রাপ্তির দ্বারা অধিগত, এ যেন তার চেয়ে অন্য কোন সম্পদ। এই দৃষ্টিভঙ্গীই রোমান্টিসিজ্‌ম। রোজকার যা চেনা জানা বস্তু, সেগুলির মধ্যেই যেন হঠাৎ কোন অপরিচিতের আবির্ভাব উপলব্ধি করা, যা বাস্তব, যা প্রত্যহের জীবনের অভিষঙ্গ—তাকে যেন বাস্তবাতীত কোন লোকে উন্নীত করে দেখা, এরই নাম রোমান্টিসিজ্‌ম।' তাই—

নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা, সোনার আঁচল-খসা,
হাতে দীপশিখা—
দিনের কল্লোল'পর টানি দিল ঝিল্লিস্বর
ঘন যবনিকা।—

কিংবা,

এসেছে বরষা, এসেছে নবীন বরষা,
গগন ভরিয়া এসেছে ভুবন ভরসা—
দুলিছে পবনে সন সন বনবীথিকা,
গীতময় তরুলতিকা।
শতেক যুগের কবি দলে মিলি আকাশে
ধ্বনিয়া তুলিছে মত্তমদির বাতাসে
শতেক যুগের গীতিকা।
শত শত গীত-মুখরিত বনবীথিকা।

এই হল রোমান্টিক কবিতার চমৎকার দৃষ্টান্ত।

বিস্ময় এবং রহস্যময়তায় কবির চেতনা অনেক সময় আচ্ছন্ন থাকে, কবি দূরের জিনিসকে চান, অপ্রাপণীয়কে কামনা করেন, অতীতলোকের সৌন্দর্যবনে ঘুরে মরেন, তাই চুল বিদিশার নিশার সঙ্গে উপমিত হয়, মুখ শ্রাবস্তীর কারুকার্যের মতো প্রতিভাত দেখেন। তাই কবি দূরে বহুদূরে উজ্জয়িনীপুরে শিপ্রানদীপারে পূর্বজন্মের প্রথম প্রিয়াকে খুঁজতে বের হন।

মুখে তার লোধ্রেণু, লীলাপদ্ম হাতে,
কর্ণমূলে কুন্দকলি, কুরুবক মাথে,
তনুদেহে রক্তাম্বর নীবীবন্ধে বাঁধা,
চরণে নূপুরখানি বাজে আধা-আধা।
বসন্তের দিনে
ফিরেছিনু বহুদূরে পথ চিনে চিনে।

রোমান্টিক কবিরা অন্তরাশ্রয়ী অভিজ্ঞতা এবং অনুভূতি নিয়ে কারবার করেন। তাই বস্তুজগতের যে অংশে তাঁদের মানস-পরিভ্রমণ, তাকেও তাঁরা রোমান্টিক পদ্ধতিতে প্রকাশ করতে পারেন। চাকরির অনুসন্ধান বেকার যুবকের কাছে—প্রেমিকের প্রিয়ানুসন্ধানের মতো করে বলা হয় যদি—তবে তাকে রোমান্টিক না বলার কোন হেতু নেই।

তোমাকে খুঁজেছি হাওয়ায় আকাশে স্বর্গে?
না গো সখি নয়,
তোমাকে খুঁজিনি বাস্তবতার ঊর্ধ্বে
ধূলিমাখা এই ধরণীর কোনো প্রান্তে
তোমাকে খুঁজেছি সওদাগরের মর্ত্যে।

আসল কথা, রোমান্টিকতার পথ ছাড়া অন্য সড়কে চলবার ক্ষমতা কোন কাব্যেরই নাই। কবিতা হতে গেলেই—কি বস্তুধর্মী কি আদর্শধর্মী—তাকে রোমান্টিক হতেই হবে।

কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কালধর্মের দিক দিয়ে যদিও রবীন্দ্র-যুগের সন বা তিথিতেই আবদ্ধ হন, তবু কাব্যধর্মের দিক থেকে এঁকে রবীন্দ্র প্রভাববর্জিত স্বতন্ত্র একজন স্পষ্ট বাস্তববাদী কবি হিসাবে সহজেই অ'খ্যাত করতে হয়। কালগত ইতিহাসের দিক থেকে বিচার করলেও এঁকে রবীন্দ্রোত্তর কবি বলাই বোধ হয়

বেশী সঙ্গত হবে—কেননা এঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মরীচিকা'র কবিতাগুলি রচনার সময় হচ্ছে ১৩১৭ সাল থেকে ১৩২৯ সাল। আর ভাবধর্মের দিক থেকে তো বটেই। ইনি পুরোপুরি এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী। রবীন্দ্রনাথ তুরীয় রোমান্টিক কল্পনাবিলাসের দ্বারা কাব্যের জগৎকে এমন সীমিত ও আত্মসমাহিত করে তুললেন—যাতে তৎকালীন যুগের সমস্ত কাব্যপ্রয়াসই অত্যুচ্চ কল্পনাগ্রামে বাঁধা হয়ে পড়লো। এই কল্পনা-বিলসিত রীতি ও আইডিয়ালিস্টিক ধারণার বিরুদ্ধে কবি যতীন্দ্রনাথ বলিষ্ঠ কণ্ঠে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন, যদিও তিনি বাস্তব বিষয় অবলম্বন করে রোমান্টিক কল্পনাভঙ্গীর মাধ্যমেই কাব্যচর্চা করতে লাগলেন। অর্থাৎ তিনি বিদ্রোহ করলেন—পূর্ব প্রচলিত কল্পনাগ্রামের উচ্চস্তরকে নিখাদে নামিয়ে এনে, ভাবকে বস্তুকেন্দ্রিক করে, মানুষের দুঃখকে প্রাধান্য দিয়ে তাকে কাব্যের বিষয়ীভূত করে এবং সৃষ্টিরহস্যের অসামঞ্জস্যকে শ্লেষ করে। এই বিদ্রোহই যতীন্দ্রনাথের কাব্য-বৈশিষ্ট্য; সুতরাং সময়, বিষয়-বিন্যাস, কাব্যধ্যান—প্রভৃতি কবি-পরিচয়ের সমস্ত নিরীখের দিক থেকেই বলা যেতে পারে যে, যতীন্দ্রনাথ এক নতুন পথের পথিক, বিশেষ করে তাঁর সমকালীন সাহিত্যের গতি ও লক্ষ্য বিচার করেই তাঁকে এই আখ্যা দিতে হয়।

প্রশ্ন হতে পারে—এই পথ কি এবং কি তার বৈশিষ্ট্য, আর নতুন এই পথ-সন্ধানের স্থায়ী ফলশ্রুতি ও ভবিতব্যতা কোথায়। এগুলির উত্তরই হচ্ছে যতীন্দ্রনাথের কাব্য-বিশ্লেষণ, অথচ যতীন্দ্রনাথের কাব্য-বৈশিষ্ট্য, কবির বাস্তব দৃষ্টির স্বরূপ নির্ণয় এবং বাঙলা সাহিত্যে পরবর্তীকালের উপর সেই বাস্তবমুখী কাব্যের প্রভাব—এগুলির আলোচনার কথাই এসে পড়ে।

যতীন্দ্রনাথ যে যুগের কবি—সেই যুগে বর্তমান কালের চিন্তাধারা এমনই সহজ করে মানুষকে ভাবাতে পারে নি, তাই কবিকুল কাব্যসৃষ্টির সহজ আবেগগুলিকেই প্রাধান্য দিয়ে এসেছেন। চাঁদ, ফুল, পাখি, নীলাকাশ, সমুদ্র-কল্লোল—এদের সৌন্দর্য ও রহস্য মানুষকে মুগ্ধ করেছে, আর মোহলীন মানুষও এদের মধ্যে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে কুণ্ঠা বোধ করে নি। ঠিক এই যুগে যতীন্দ্রনাথ প্রচলিত ভাব-কল্পনার বায়বীয় মার্গ পরিত্যাগ করে জীবন যে শুধু স্বপ্ন-রঙিন মৌতাতে মশগুল হয়েই থাকে না, এই পৃথিবী যে শুধু মায়ালুব্ধ দৃষ্টি-মনোহর বস্তু-বিশেষ নয়—এ কথা স্পষ্টভাবে গভীর ও স্থির আত্মপ্রত্যয়ের দ্বারা ঘোষণা করলেন। তিনি বললেন—

সৌন্দর্যের পূজারী হইয়া জীবন কাটায় যারা,
সত্যের শাঁস কালো বলে খাসা বুঝি খোসা চোষে তারা।

এবং

যে কথা তোমার হল নাকো বলা, নেই সেই কথাটাই,
অসীমেরে তুমি বাঁধিবে সীমায় অচেনারে লবে চিনে;
নূতন নূতন কথার ছলনে মরণে লইবে জিনে!
দুঃখেরে তুমি দেবে না আমল, ভাবি দেবতার দান;
জীবনের এই কোলাহলে তুমি শুনিবে গভীর গান!
—এ সবই রঙীন কথার বিম্ব, মিথ্যা আশায় ফাঁপা,
গভীর নিঠুর সত্যের পুর দিনে দিনে পড়ে চাপা!
কে গাবে নূতন গীতা—
কে ঘুচাবে এই সুখ-সন্ন্যাস—গেরুয়ার বিলাসিতা?
কোথা সে অগ্নিবাণী—
জ্বালিয়া সত্য, দেখাবে দুখের নগ্ন মূর্তিখানি?

যেখানে ব্যথা, বেদনা, প্রবঞ্চনা, অসঙ্গতি, যতীন্দ্রনাথের কল্পনা-মানস সেখান থেকেই কাব্যের উপকরণ আহরণ করেছে। তিনি এই বাস্তব জগতের দিকে দরদীর দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়েছেন—তাই প্রথমেই তাঁর চোখে জগতের অসংখ্য ত্রুটি-বিচ্যুতি, হাজার হাজার অসঙ্গতি ধরা পড়েছে এবং বলা বোধ করি বাহুল্য, সেইগুলিই তাঁর কাব্যের বিষয়ীভূত হয়েছে, অর্থাৎ বাস্তব জগতের যে দোষ, যে অসামঞ্জস্য কবি দেখতে পেয়েছেন—তাকে কেন্দ্র করেই তাঁর কল্পনালোক গড়ে উঠেছে। যে কল্পনার মাধ্যম দিয়ে সৃষ্টির একটি দিক মাত্র ধরা পড়েছে, স্বল্প সংখ্যক পঙ্কজকে নিয়ে অভিরাম সৌন্দর্যলোকই সৃষ্ট হয়েছে, সে কল্পনা আজ অন্তঃসারশূন্য, তার কাজ শেষ হয়েছে—তাকে আজ বিশ্রাম দিয়ে কবি কল্পনা-লক্ষ্মীকে নূতন ফরমাশ দিচ্ছেন—

কল্পনা, তুমি শ্রান্ত হয়েছ ঘন বহে দেখি শ্বাস
বারোমাস খেটে লক্ষ কবির একঘেয়ে ফরমাস!
সেই উপবন, মলয় পবন, সেই ফুলে ফুলে অলি,
প্রণয়ের বাঁশি, বিরহের ফাঁসি, হাসা কাঁদা গলাগলি!
নব ফরমাস দেই তোমা, সাজো কল্‌কের পর কল্‌কে,
বুকের রক্ত ছলকে উঠুক, হাড়গুলো যাক পল্‌কে!
ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ওই ছুটে যায়—লক্ষ মরণ ঘোড়া,
প্রেমের বল্‌গা বৃথাই কষিছে সোয়ার সে জোড়া জোড়া।
ঢেলে সাজো, সেজে ঢালো,
সকল দুঃখ সূক্ষ্ম হউক, যত সাদা সব কালো!

এই কল্পনাকে নিয়েই কবি তাঁর পথ-পরিক্রমা শুরু ও সারা করেছেন, তাই ফল দেখে কবি ঝরাফুলের দুঃখে কাতর হয়ে পড়েন, দিগন্ত পারে তরঙ্গের আঘাতে যারা মৃতপ্রায়, তাদের বেদনা তিনি উর্মিল সুষমায় ঢাকতে চান নি।

তিনি বুঝেছেন যে প্রবল পরাক্রান্ত ব্যক্তি ছলে বলে কৌশলে দুর্বলকে হস্তগত করে তার উপর অত্যাচার চালাচ্ছে—এবং এই অত্যাচারের পেছনে সহজ ও সুন্দর যে কোন একটি ব্যাখ্যাও উপস্থাপিত করা হচ্ছে। সমস্ত পীড়িত মানুষ একজোট হয়ে তাদের উপর যে অত্যাচার চলছে—তার প্রতিবিধান করতে পারে—সেই সঙ্ঘ বা সংগঠন শক্তির আশ্চর্য যাদুর আবিষ্কার তখনও হয় নি—তাই কবি বেদনার ঘা কোথায় আঙুল দিয়ে শুধু তাই দেখিয়ে দিয়ে গেছেন।

ছলে বলে কলে দুর্বলে হেথা প্রবল অত্যাচার ;
এ যদি বন্ধু হয় তব ছায়া কায়া তো চমৎকার !
শুনহ মানুষ ভাই !
সবার উপরে মানুষ শ্রেষ্ঠ, স্রষ্টা আছে বা নাই

আজকের জীবনবাদী কবির পক্ষে একথা বলা সহজ হয়ে দাঁড়িয়েছে যে—ধর্মের আসরে আমাদের চিত্তকে ডুবিয়ে রেখে বশীভূত করা হয়েছে—এবং ধর্মের সেই আরকে বুঁদ হয়েই আমরা কর্মফল ও জন্মান্তরবাদের দ্বারস্থ হচ্ছি আর সুবিধাবাদী ও ভণ্ডের দল নির্মমভাবে আমাদের শোষণ করছে। কিন্তু যতীন্দ্রনাথ যখন এই একই কথা উচ্চারণ করে ধর্মধ্বজীর কাছে প্রশ্ন করেছিলেন—তখনই তাঁর বিদ্রোহী সত্তাটি পাঠকবর্গ স্পষ্ট করে চিনে নিয়েছে। ধর্মের নামে যে ধাপ্পা চলছে, মনুষ্যত্বের বাইরে যে আর বড় ও ব্যাপকতর কোন ধর্ম নেই—সে কথা প্রবল ব্যঙ্গের সঙ্গে 'ভক্তির ভারে' কবিতায় যতীন্দ্রনাথ স্পষ্টভাবেই আমাদের জানিয়েছেন—

সিঁদুর-মাখানো পাথর দেখিলে তখনই নোয়াই ঘাড়,
পায়ে ধরে সাধি শীতলার গাধী বিরূপাক্ষের ষাঁড়।
... ...
আজি দুর্বল অক্ষম আমি ভয়-সংশয় যুত,
প্রেমের পন্থা এই কি বন্ধু? হ'ল কি মনঃপূত ?
কণ্ঠ চাপিয়া ক্ষুদ্রের 'পরে হানিছ রুদ্র রোষ,
ঘাড়ে ধরে মোরে প্রেমিক করিছ, এত বড় আক্রোশ !

ধর্মের নামে সাধারণ অজ্ঞ মানুষকে আমরা কতদূর দুর্বল ও অসহায় করে তার কাছ থেকে সুবিধা আদায় করছি—কবি শুধু সে কথা বলেই ক্ষান্ত হন নি।

সহজ, দীর্ঘাকৃতি উন্নতমন মানুষকে ছোট্ট স্বল্পায়তন দেবমন্দিরে প্রবিষ্ট করিয়ে তার শরীরের বাড়কে খর্ব ও মনের জোয়ারকে রুদ্ধ করা কেন—সে প্রশ্নও তিনি করেছেন, প্রেমের মন্দিরে সোজা দাঁড়ালে যে বিপদ ঘটবে—সে তত্ত্বও তাঁর অজানা নয়, মানুষের সহজ হৃদয়াবেগকে অপহরণ করে ধর্মের মদে মাতাল করে দেওয়ার ধরনকে ব্যঙ্গ করে কবি বলছেন—

সাষ্টাঙ্গের প্রণামে প্রণামে হইব অষ্টাবক্র,
বুকের দুগ্ধপিয়াসা মিটাবে তোমার চরণতক্র।

'পাঁকাল বন্দনা' কবিতাতেও তিনি ব্যঙ্গ করে বলেছেন, পাঁকাল আর পঙ্কিল একই কথা—এবং ধর্মধ্বজী মাত্রই এক-একটা ভণ্ড পাঁকাল মৎস্য বিশেষ।

সেদিন হ'তে পঙ্কস্রোতে
কত পাঁকাল পন্থী রে
বাঁধল বাসা মাঠে মাঠে
আশ্রমে ও মন্দিরে।

সৃষ্টি-রহস্যের সৌন্দর্য কবিকে যতটা মুগ্ধ না করেছে—তার চেয়ে সৃষ্টির অসঙ্গতি ও অপূর্ণতা কবিকে ঢের বেশী ব্যথিত করে তুলেছে। তিনি তাই মনে স্থির করেছেন যে; সৃষ্টি-বিচারে স্রষ্টার মহিমা দেশকালপাত্র বিচার না করে ত্রিভুবনে প্রচার করে বেড়াবেন। নামকীর্তনের মাহাত্ম্য কবি বলেছেন—দু-আনা সত্য, কিন্তু বদনাম সংকীর্তনে শরীরের বহিরঙ্গে স্বেদ পুলক জাগে না বটে, কিন্তু হাড়ে বাতাস লাগে। এমন অপূর্ব ক্ষমতাধর স্রষ্টা, কী বিচিত্র ও শোভন সুন্দর সৃষ্টি, কী সুচারু ও সূক্ষ্ম কৌশল—কিন্তু তবু কেন প্রায়ই 'এযুগে ওযুগে এবেলা ওবেলা' সৃষ্টির কল বিগড়ে যায়? কবি প্রশ্ন করেন—

বন্ধু এ কার পাপ?
এত দোষ, ক্রটি, এত অন্যায়, এত যে দুঃখ তাপ!
গগনে গগনে, জীবনে জীবনে জলিতেছে যত জ্বালা,
গাঁথা হয় কোন্ দিগ্‌বিজয়ীর নিষ্ঠুর জয়মালা।
দো'ষী নহ যদি কহ গো বন্ধু, দেখাও না কেন মুখ?
নির্দোষ চির লুকায়ে বেড়ায় এ তো বড় কৌতুক।

এই জগতে তাই ভালোর চেয়ে মন্দরই আধিক্য, এবং কবিও তাই পীড়িত বোধ করেন বেশী। ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যে ভুলের জট আছে, সেই দিকে আঙুল দিয়ে ঈশ্বর-মহিমা কীর্তনকে তিনি তাই মিথ্যা নাম জপ করা বলে অভিহিত করতে কুণ্ঠিত হন নি। যে ঈশ্বর পৃথিবীকে সুষ্ঠু ও সুন্দর করে গড়ে তুলতে

পারেন নি, সেই ঈশ্বরকে সর্বকল্যাণরূপে কল্পনা করা বা স্তব করাকে কবি মিথ্যা নাম জপ করা বলেছেন; সুতরাং ঈশ্বর মহিমার পূর্ণ স্বরূপ উদ্ঘাটন করা যদিও প্রচলিত রীতির বিরুদ্ধাচরণ এবং সাধারণভাবে একে 'বদনামকীর্তন' বলে লোকে আখ্যাত করবে—কিন্তু তবু এই বদনাম ঘোষণাই একান্তভাবে সত্য।

কবির দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে সর্বত্র একটা বাস্তব-বুদ্ধি কাজ করছে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে তিনি মানুষে-গড়া সমাজের দোষত্রুটির বেশির ভাগ যে মানুষেরই বুদ্ধিজাত রচনা, সে বিশ্লেষণ যদিও তাঁর চেতনায় ধাক্কা দেয় নি—একথা সত্য, এবং কবির কালবিচারে আমরা সেই চিন্তা তাঁর কাছ থেকে আশাও করতে পারি নি, তবুও সর্বত্র কবি নিজের চারপাশের মানুষকে, সমাজকে, সমাজের বিধি-ব্যবস্থাকে দেখেছেন—এবং স্পষ্ট করে এই সবের দোষ, ত্রুটি, পতন, স্খলন, তালভঙ্গ ও বিশৃঙ্খলা যেখানেই দেখেছেন, সেখানেই শানিতভাবে তীব্র শ্লেষ হেনেছেন।

দেশপ্রেমিক দেশোদ্ধারের ভূয়ো বাণীবিন্যাসে নিজের সুখসুবিধার প্রতি নজর দিয়ে থাকেন—কবি তাঁর প্রতিও বিদ্রূপ বাক্য বর্ষণ করতে ক্ষান্ত হন নি। কবির কথায়—আমরা চাষীর দুঃখে বিগলিত বোধ করি, আর বেদনায় মন ভারাক্রান্ত হয়, অন্তত সেই অভিব্যক্তি দ্বারা অভিনয় করি, সেই মর্মে বক্তৃতা করি, কিন্তু চাষীর সঙ্গে একজোট হয়ে দেশসেবার কাজে নিজেকে উৎসর্গীকৃত করতে পারি না, তখনই দেশপ্রেমিকরূপী আমাদের আসল স্বরূপটি বের হয়ে পড়ে।—

সেই দুর্যোগ উৎসব যবে ঘনাইবে চারিধার,
মেঘে ঝড়ে জলে বজ্রে বাদলে রচিয়া অন্ধকার,—
স'রে পড়ি যদি ক্ষমা করো দাদা!
খাঁটি চাষা ছাড়া কে মাখিবে কাদা?
মনে করো ভাই মোরা চাষা নই,—চাষার ব্যারিস্টার!

কবিকে কার্যব্যপদেশে নানা জায়গায় ঘুরতে হয়েছে, বাঙলা দেশের নানা পল্লীর সঙ্গেই তাঁহার পরিচয় নিবিড় ও আন্তরিক ছিল। তাই তিনি পল্লীজীবনের বিশৃঙ্খলা, শোষণ ও দুর্নীতি সম্পর্কে অভিমানভরা অভিযোগ রেখেছেন, কিন্তু সবকিছুর মধ্যে দিয়েই একটি রুক্ষ, ধূসর, শোষিত ও দৈন্যপীড়িত জীবনের পরিচয় বড় হয়ে উঠেছে।

দুর্ভিক্ষ-পীড়িত রিক্ত বাঙলার অস্থিচর্মাবশেষ পল্লীবাসীকে বাঁচাবার পথ হিসেবে রিলিফের নামে শ্রমিকদের কাজে নিযুক্ত করার মধ্যেও যে নিষ্ঠুরতা এবং অকরুণ পরিহাস চলে—সেদিকেও কবির দৃষ্টি প্রখর হয়ে জেগে থাকে। শুধু তাই

নয়—সেই রুগ্ন মুমূর্ষু অসহায় মানুষগুলির প্রতি সংবেদনশীল আন্তরিকতায় কবি কাতর হয়ে ওঠেন। কবি বলেছেন—

দারুণ আকালে হায়, বিধাতার করুণায়—
রিলিফ্ নেমেছে ভাই, গ্রামের সীমায় রে!
বেঁধে নে, বেঁধে নে শিরে
পাক দেওয়া ছেঁড়া বিড়ে,
কাঁধে তুলে নে রে ভাই কোদাল ও চুবড়ি;
দেখো দেখো মতি মিঞা, পোড়ো নাকো থুবড়ি।

ক্ষুধা-দুর্বল বেদনাশীর্ণ এই মানুষগুলির যদি অল্পাহারে কাজ না পোষায়—তবে তারা চলে যাক। ঘরে বসে মড়কে নরকে যারা চলেছিল—তাদের আজ কোদাল-হাতে এই সড়কে না হয় মরতে বলা হচ্ছে—এর বেশী আর কি! মানুষ শ্রমিকদের প্রতি কবির যে কী দরদ—তা এই কবিতায় প্রতি ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে—তাঁর ভাষাচিত্র যথাযথ পুনরঙ্কিত না করলে বুঝানো যাবে না,—

পিল্ পিল্ পায়ে পায়ে
পিঁপড়ের সার যায়—
দীর্ঘ দীঘির গায়,
হায় হায় হায় রে!
মেটে কুলি যায় রে,—
পেটের কি দায় রে!
তবু তো পেটের ঋণ
জমে যায় দিন দিন,—
বে-নুন রেঙ্গুন্ খুদে
সুদ শুধু যাই শুধে
প্রাণটাকে যত কষি, ধড় করে ঝিন ঝিন।

মাটি কুপিয়ে এই কঠিন মাটির বুক থেকে জলের যে স্রোত অমৃতের আশীর্বাদের মতো একদা নামবে—তখন যে শ্রমিক থাকবে না—তারই অদৃষ্ট মন্দ বলতে হবে, তবু—

খেটে সারা দিনটে,
রোজগার দু'আনার, খেতে পেট তিনটে।

এই মলো ছুঁড়িটা—
ছুঁড়িটা না বুড়িটা?
নাহক হুঁচুটে পড়ে ভাঙে নয়া ঝুড়িটা!

সবশেষে সেই শ্রমশিল্পী গৃহস্থ মানুষ ক্লান্ত শ্রান্ত দেহটাকে টানতে টানতে ঘরে ফিরে আসে স্নেহ-প্রেমের আশ্রয়টিতে—যেখানে ক্ষুধার জ্বালায় খোকা কাঁদে, বৌ উদাস হয়ে ভাবে—

কাঁদিস্‌নে খোকাধন, ভাবিস্‌নে বৌগো।
আজতো কেটেছি মাটি পুরো এক চৌকো,
বুকে পিঠে মাটি চাপে! এ মাটি কে মারে?
হক্‌ মাটি মাপ দিতে প্রাণ কেন কাঁপেরে।

এই রকম বঞ্চিত, লাঞ্ছিত, শোষিত মানুষ তাঁর কাব্যে ভিড় করে আছে। রূপকে রূপের মর্যাদা দিয়ে যাচাই করে তাকে হীন করেছে যে বারনারী, কবি তাকে সম্বোধন করে বলতে ভোলেন নি—'যৌবনখানি বসনের মতো, তুলে রাখো, খুলে পরো'। পাঁচনি-হাতে গরুর পাল নিয়ে ছিন্ন বসনে যে মানুষ দূরের মাঠে চলেছে, ঘন শ্রাবণ ধারায় ছত্রবিহীন যে লোক পথে বের হয়েছে কাজের চাপে, ক্ষুধার অন্ন, পরনের কাপড়, বাসের গৃহ, যাদের মেলে নি—তাদের প্রতিই কবির স্নেহ, কেননা কবি বলেছেন—'তারা মানুষেরি ছেলে'। জ্যৈষ্ঠ দুপুরে গলদঘর্ম হয়ে যে সব কৃষক মাঠে চাষ করছে, 'তারা মানুষেরি ভাই,' আপন লজ্জাটুকু নিবারণ করবে—এমন বস্ত্রখণ্ডও যে নারীর নেই,—অথচ সেই স্বল্প-পরিসর বসনের একটি খুঁটে পিঠে ছেলে বেঁধে পেটের তাড়নায় যে নারী রাশি রাশি মাটি তুলছে—কবি বলছেন—তাদের নমস্কার কর, কেননা, 'তারা মানুষেরি স্ত্রী', কবি খোলাখুলি বললেন—

নির্বোধ যারা, দুর্বোধ যারা পল্লীপারে,
অশ্লীল যার ভাষা,
আশী শতাব্দী ধরিয়া যাদের দৈন্য বাড়ে—
চির নাবালক চাষা!
হলের ফলকে লক্ষ্মী উঠিলে, করিয়া দান
লক্ষ্মীমানের ঘরে,
দুর্ভিক্ষের ভিক্ষার ঝুলি ভরিয়া, প্রাণ
দেয় যারা নিজ করে;

বেতসের মত সভ্যশিক্ষা শেখে নি যারা
হাওয়ার নেশায় মাতি—
বটের মতন খোলা মাঠে আজও রয়েছে খাড়া,
তারা মানুষেরি জাতি।

জীবনে যারা পতিত, যারা সমাজের বহিরঙ্গকে মেজে ঘষে উজ্জ্বল করে রেখেছে, সভ্যতাকে পালিশ করে রঙদা'র করে তুলেছে, যারা দিয়েই গেল শুধু, পরিবর্তে কিছু পেলে না—কবি তাদেরই দেখেছেন অন্তরঙ্গতার সঙ্গে, দরদ দিয়ে। মোড়লের ঝি ভাবছে তার দুটি ছেলে অভাব-রাক্ষসীর হাত থেকে কি করে বাঁচবে, অবিশ্রান্ত খেটে খেটে আজ আর মানুষের দু-বেলা দু-মুঠো অন্নও জুটছে না, কে কোথায় ধন-জন-স্বাস্থ্য চেয়েছে, কিন্তু পরিবর্তে পেয়েছে রুগ্না স্ত্রী, মূর্খ পুত্র, গোঁয়ার ভাই—সবই তাঁর কাছে আদৃত হয়েছে। জমিদারের নবগৃহ-নির্মাণের পাশেই সনাতন সা'র ভিটেয় একজোড়া ঘুঘু চরছে—তিনি দেখতে পান, শীতের রাত্রে ছেঁড়া কাঁথা খোঁজেন।

কবির কাছে এই জগৎ সংসারের সমস্ত কিছুই ধরা পড়েছে বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে। তাঁর কল্পনা বিলসিত দৃষ্টি যে ছিল না—তা নয়, কিন্তু সেই কল্পনা-মানসও বাস্তবতাকে অতিক্রম করে নয়, সে কথাও আমরা পরে আলোচনা করবো। সর্বক্ষেত্রেই দেখা যা'বে যে তাঁর কাছে এই জগতের অতি বাস্তব রূপটি একান্ত নগ্নভাবেই ধরা পড়েছিল।

জগৎ সংসারে অতি বাস্তব রূপটি এমন প্রত্যক্ষভাবে তাঁর চোখে ধরা পড়েছে বলেই তিনি মানব-জীবনের হাজার হাজার দুঃখ-দুর্দশা, বেদনা ও বিষাদকে কৃত্রিম সুখের মৌতাতে রঞ্জন করে তুলতে পারেন নি।

কবির বাস্তব অনুভূতির স্পষ্ট রূপটি আশা করি এতক্ষণে স্পষ্ট করতে পারা গেছে, আর উদ্ধৃত কবিতাংশ থেকে এটা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করা গেছে যে কবির বাস্তববোধের সঙ্গে কোথায় যেন একটা দুঃখানুভূতি জড়িয়ে আছে। সব সময়েই যে বাস্তব পটভূমির উপর কবি কাব্যবিষয় ন্যস্ত করেছেন সেই বাস্তবতার মধ্যেই যেন একটি বিষণ্ণতার সুর গ্রথিত করে দিয়েছেন। এই দুঃখানুভূতি তাঁর কাব্যে স্বাভাবিক, কেননা তিনি সাধারণ মানুষের দুঃখ-বেদনাকেই প্রধানত রূপ দিয়েছেন। যেখানে রুক্ষতা, রিক্ততা, ধূসরতা; যেখানে ধ্বংস, নশ্বরতা, মৃত্যুর হাতছানি—সেখানেই কবির দৃষ্টি সর্বাগ্রে পতিত হয়েছে, তাই তাঁর বক্তব্য দুঃখের আরকে রসায়ন হয়ে উঠেছে।

তিনি জগৎ ব্যাপারের সব কিছুকেই অসঙ্গতিপূর্ণ হেঁয়ালিপনা বলে

ভেবেছেন—এখানে যত বা নিয়ম তত অনিয়ম, গোঁজামিল, খামখেয়ালী। মানুষ না চায় আর না পায়। তার মধ্যে থাকে আকাশ পাতাল ব্যবধান। ফলে মানুষের অতৃপ্তি ঘটে, সে ব্যথিত হয়, এই বেদনাই কবিকে সজাগ করে তোলে।

কবি মানুষের দুঃখকে একান্ত সত্য করেই গণ্য ও গ্রহণ করেছেন। দুঃখকে নিয়ে তিনি কোথাও বিলাস করেন নি, গভীর এক সত্যরূপেই মর্মে গ্রহণ করেছেন। এই সৃষ্টি অসম্পূর্ণ, বিশৃঙ্খলতায় পরিপূর্ণ—সেইজন্যেই মানুষের এই দুঃখ; আর যেটাকে সুখ বলি তা এই দুঃখের অনুপস্থিতি, এবং প্রায়শ আমরা তা মানস ধ্যানের দ্বারা লাভ করে থাকি, ফলে তার সত্যরূপ আমাদের কাছে ততটা প্রকট নয়। আমরা সুখ-লালসায় মত্ত থাকতে চাই কিন্তু সুখ আপাত জ্ঞানের দ্বারা অধিগম্য নয়—সেটি মানসলোকের সামগ্রী, তাই সুখ-মরীচিকার পেছনে ছুটতে গিয়ে দুঃখ-দুর্দশার গর্তেই পড়ে যাই, তখন নিজেদেরকে ঘুমের ঘোরে ন্যস্ত করে সুখস্বপ্নের প্রত্যাশার জন্য লালায়িত হই। কবি 'ঘুমের ঘোরে' নামক কবিতায় তাঁর দুঃখবাদের মূলতত্ত্বটাই স্পষ্ট কথায় বুঝিয়ে দিয়েছেন। তারই এক জায়গা থেকে একটুখানি উল্লেখ করা বোধ হয় অসঙ্গত হবে না—

ওগো অক্ষয় বট!
যত বেড়ে যাও আপনি ছড়াও শত দুঃখের জট।
তাই কাঁদাকাটি মাথা কোটাকুটি সকল জগৎময়,
দুঃখ হইতে জনম এদের দুঃখেই পরিচয়!
সকল দুখের খনি!
শিহরিয়া ওঠে পরান, তোমার ব্যথার অঙ্ক গনি।
সারা বিশ্বের বেদনা বহিয়া কেমনে জীবন চলে!
বুঝেছি প্রাণটা ঠাণ্ডা রেখেছ 'ঘুমিওপ্যাথি'র বলে।

দুঃখবাদী কবি হলেও যতীন্দ্রনাথকে আমরা কিন্তু নৈরাশ্যবাদী কবি বলতে পারি না। যদিও হতাশা তাঁকে মাঝে মাঝে যে ব্যাকুল ও কাতর করে তোলে নি—তা নয়, কিন্তু সে স্বল্পক্ষণস্থায়ী, এবং তাঁর অন্তরের প্রত্যয়কে খর্ব করতেও পারে নি। যতীন্দ্রনাথের এই বিশ্বাস ছিল যে দুঃখের কাঁটা গাছেই আনন্দ ফল ধরায়। দুঃখের সাগর সাঁতরে পার হয়ে যখন আমরা সুখের ঠিকানা পাব তখনই যথার্থ পরিতৃপ্তির সুধাপান ঘটবে।

যতীন্দ্রনাথ ঈশ্বরবিশ্বাসী কবি, তাঁর সময়ে ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ অনাস্থা জ্ঞাপন করা সম্ভব ছিল না—আর তিনি যে সুরে তাঁর কাব্য-বীণা বেঁধেছিলেন তাতে ঈশ্বরে একেবারে অবিশ্বাস আনবার দরকারও ছিল না; কেননা ঈশ্বরকে

তিনি প্রচলিত বিশ্বাসের দর্পণে প্রতিফলিত করে দেখেন নি। শিবস্তোত্র, গঙ্গাস্তোত্র প্রভৃতি কবিতাগুলি পড়লে দেখা যায় যে, চিরাচরিত স্তব গানের মধ্যে দিয়ে দেবতাদের বন্দনা করা কবির ধাতে সয় না। এই সব দেবতাদের তিনি কিছুটা আধুনিক দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন, মানুষের দুঃখ-দুর্দশা, বিষাদ-বিষণ্ণতারই দেবতা হিসাবে এঁদের দেখেছেন, তিনি শিবস্তোত্রের মন্ত্র উল্লেখ করে বলেছেন—

এ সব মন্ত্রে জাগে না হৃদয়, লাগে যেন পরিহাস ;
ব্যথার দেবতা, কহ গো গোপন বেদনার ইতিহাস।

... ...

সুখের দেবতা মরে যুগে যুগে, তুমি চির দুখময়,
সুখ বাঁচে মরে, দুঃখ অমর,—তুমি মৃত্যুঞ্জয়।

গঙ্গাস্তোত্রেও আমরা এই বেদনার রূপই প্রকট দেখতে পাই। সৃষ্টির শুরু থেকেই মানুষ দুঃখ বেদনায় অশ্রুপাত করে আসছে ; মানুষের এই অশ্রুই সঞ্চিত হয়ে গঙ্গার ধারা পুষ্ট করেছে, নারায়ণের বিগলিত পাদপদ্মে গঙ্গার জন্ম নয়। কবির ভাব-দৃষ্টিতে গঙ্গা 'অনন্ত জীব ব্যথা-প্রবাহ'। 'সিন্ধুতীরে' কবিতার মধ্যেও দেখা যায় যে সমুদ্রমন্থন প্রসঙ্গে এক গণ্ডূষে মহা কালকূট যিনি পান করেছেন, সেই শঙ্কর সকল দুঃখীকে ডাক দিচ্ছেন—

হাঁকে ধূর্জটী—'কে কোথায় চির-দুখনিশা বঞ্চিস ?
আয় আয় যত চির-বঞ্চিত, এক সাথে করি পান
অমৃত-সিন্ধু মন্থনোত্থ দুর্ভাগ্যের দান !'

যতীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতাগুলির একটি বৈশিষ্ট্য আছে, ইন্দ্রিয় তৃপ্তিকর ও লালসাদীর্ণ প্রেম অবশ্যই তাঁর কাব্যের বিষয় নয়, বরং সাধারণ প্রেমের কথাকেই তিনি বাচ্যাতিরিক্ত কারুকর্মের দ্বারা অতিরিক্ত রকম শোভন ও সুন্দর করে তুলেছেন। প্রেম ব্যাপারে সর্বত্রই একটি বলিষ্ঠ কল্পনাবিলাস তাঁর বক্তব্যকে চারুত্ব দান করেছে। রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত রোমান্টিক আত্মকেন্দ্রিকতা ও অতীন্দ্রিয়তার আমেজ সেখানে অনুপস্থিত,—নিতান্ত ঘরোয়া সংসারী মানুষের মনে প্রীতি-ভালবাসার একটি মিষ্টি সুর ও সুষমার যাওয়া আসা আছে। মাঝে মাঝে কবি প্রেয়সীকে নিয়ে কল্পনা করেছেন—কিন্তু সেই কল্পনার প্রেম লীলাও কখনও সম্ভাব্যতা ও সম্ভোগের গণ্ডি ছাড়ায় নি।

সবশেষে যতীন্দ্রনাথের কল্পনা বিলসিত রীতি-বিন্যাস, ভাষা, ছন্দ ও মিলের উল্লেখ না করলে এ প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। কিন্তু তার আগে তাঁর কবি-কর্মের আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক রয়েছে—সে সম্পর্কে স্বল্প আলোচনারও

প্রয়োজন। সেটি তাঁর রূপক এবং ব্যঙ্গ-অনুকৃতি-কাব্য (parody) রচনা। সহজ সাধারণ চিত্র সৃষ্টির মধ্যে গভীরতর এক চিন্তাকে কবি সহজেই পাঠক চিত্তে অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে দেন রূপক রচনার সাহায্যে। ছেলেদের লাট্টু খেলার দৃশ্য রচনা করে কবি জীবনের ঘূর্ণায়মান আবর্তনের ইঙ্গিত করেন—

লাট্টু বলিছে—"হায় হায় হায়! ঘুরে ঘুরে কারে খোঁজা!
জীবন যে আসে ফুরায়ে।"

কিংবা হাটের দৃশ্য দেখে, হাটের কেনা-বেচার উত্তপ্ত গোলমালের মধ্যে দাঁড়িয়ে কবির মনে পড়ে যায়—

নূতন করিয়া বসা আর ভাঙা
পুরানো হাটের মেলা;
দিবসরাত্রি নূতন যাত্রী,
নিত্য নাটের খেলা।
খোলা আছে হাট মুক্ত বাতাসে,
বাধা নাই ওগো—যে যায় যে আসে,
কেহ কাঁদে, কেহ গাঁ'টে কড়ি বাঁধে
ঘরে ফিরিবার বেলা।
উদার আকাশে মুক্ত বাতাসে
চিরকাল একই খেলা॥

ব্যঙ্গ অনুকৃতি কাব্য যতীন্দ্রনাথের হাতে অসম্ভব রকম সার্থক হয়ে উঠতো। প্যারডির সাধারণ কাজও হল তাই যে, যে কবিতার অনুকরণে প্যারডি লেখা হয় সেই কবিতার রস, বাচ্যার্থ ও সৌন্দর্যাস্বাদনের চেয়ে যেন অনুকৃতিকাব্যের রস-নিষ্পত্তি ও ফলশ্রুতি আরও বেশী চিত্তবিমোহন হয়, নচেৎ প্যারডির ঝাঁজ নষ্ট হয়ে যায়। যতীন্দ্রনাথের প্রত্যেকটি প্যারডিতে এই গুণ বর্তমান। প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যে, বিশেষ করে মঙ্গলকাব্যে নায়িকার বারো মাসের সুখ-দুঃখ নিয়ে কবিতা বা গাথা রচনা করা হত—এগুলিকে এক কথায় 'বারোমাস্যা' বলা হয়। প্রাচীন ঢঙের এই বারোমাস্যার অনুকরণে কবি 'পথের চাকরি' নামক কবিতায় ভবঘুরে বাইসাইকেলবাহী এক বেকার-কল্প যুবকের বারোমাসের দুঃখ-দুর্দশা বর্ণনা করেছেন,—আর সেই বর্ণনা যেমন আন্তরিকতায় ও কারুণ্যে বেদনাপূর্ণ হয়েছে, তেমনিই কাব্যোৎকর্ষে এবং বর্ণনা চাতুর্যে সত্যকার শিল্পত্বের মর্যাদা লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথের কোন কোন অতি বিখ্যাত কবিতারও প্যারডি করে যতীন্দ্রনাথ ধন্যবাদ ভাজন হয়েছেন। 'আজি কি তোমার মধুর মুরতি হেরিনু শারদ প্রভাতে—' অর্থাৎ 'বঙ্গে শরৎ' কবিতাটির কী এক অপূর্ব শ্লেষাত্মক অনুকৃতি-কাব্য

যে তিনি রচনা করেছেন তার উল্লেখ না করলে তাঁর প্যারডি রচনার ক্ষমতা সম্যক বুঝা যাবে না। এক হিসেবে প্যারডি লেখা শক্ত, কেননা বিখ্যাত কবিতাটি সকলের মনে গাঁথা থাকে। প্যারডির কোথায় অপকর্ষ ঘটছে, মূলের সৌন্দর্যকে ছাপিয়ে উঠতে পারছে না—তার পরীক্ষা ও পরিচয় সঙ্গে সঙ্গেই নির্ধারিত হতে থাকে—ফলে সামগ্রিক বিচারের পূর্বেই প্যারডি সম্পর্কে পাঠকের মনে রায়দান শেষ হয়ে যায়। তাই প্যারডি রচনা সাধারণ কবিতা সৃষ্টির চেয়ে এক হিসেবে শক্ত কাজ। এই শক্ত কাজ অস্বাভাবিক ও অভাবনীয় শক্তির দ্বারা যতীন্দ্রনাথ অনায়াসেই গৌরবের সঙ্গে রচনা করতে সক্ষম হয়েছেন। 'শরতে বঙ্গভূমি-'তে তিনি লিখলেন—

আজি কি তোমার বিধুর মূরতি
হেরিনু শারদ প্রভাতে!
হে মাত বঙ্গ, মলিন অঙ্গ
ভ'রে গেছে খানা ডোবাতে।
পারে না বহিতে লোকে জ্বর-ভার,
পেটে পেটে পিলে ধরেনাকো আর ;
দিবসে শেয়াল গাহিছে খেয়াল
বিজন পল্লী-সভাতে ;
এক পাশে তুমি কাঁদিছ জননী
শরৎ কালের প্রভাতে!

এই কবিতাটির প্রত্যেকটি পঙক্তির অনুকৃতিই অপূর্বতা দাবি করে। স্থানাভাব বশত সমগ্র কবিতাটি উদ্ধৃত করা সম্ভব হ'ল না।

উদাহৃত সমস্ত কবিতাগুলি থেকে কবির ভাষা সম্পর্কে অন্তত একটি মাত্র জিনিস পরিষ্কার হয়েছে, তা হচ্ছে এই যে—ভাষা ব্যবহারে কবি কোন অনুশাসন, কোন নিয়মকানুন মানেন নি। ভাষার একটি চিরাচরিত রীতি বা নিয়ম থাকে। সেই রীতিকেও কবি অত্যন্ত সাহস এবং নৈপুণ্যের সঙ্গে পরিহার করেছেন। কখনও গদ্যকেই তিনি পদ্য করে তুলেছেন, কখনও বা সাধু ভাষার সঙ্গে নিতান্ত ঘরোয়া বা অপ্রচলিত কিংবা গ্রাম্য অশুদ্ধ পদের মিশেল করেছেন, আবার কখনও বা সংস্কৃত তৎসম শব্দের সঙ্গে একেবারে বিদেশী-শব্দের মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। ডাক হরকরার বর্ণনায় তিনি ব্যবহার করেছেন তৎসম শব্দ—

বৃদ্ধ ক্লান্ত দিবা যেথা লক্ষ-রক্তকর-বিদ্ধ হয়ে
শরশয্যা চুমে!

আবার অন্যত্র—

উপর্ঝরণ দারুণ বাদলে
ভাসছে জলে জীর্ণ কুঁড়েখান—

বলতে দ্বিধা করেন নি। তিনি তৎসম শব্দ 'বেদবেদাঙ্গের' পাশে বিদেশী শব্দ 'দাঙ্গাফ্যাসাদের' স্থান সহজেই করে দিয়েছেন। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, যতীন্দ্রনাথ যখন যে অনুভবটি নিজে উপলব্ধি করেছেন, তখনই সেটি অবিকৃত অবস্থায় যথাযথ পাঠক চিত্তে সংস্থাপনের প্রয়াসী হয়েছেন—ফলে তাঁকে অনুভূতি অবিকৃত রাখবার জন্যে উপযোগী ভাষা ব্যবহার করতে হয়েছে।

ছন্দ বৈচিত্র্যের দিক থেকেও যতীন্দ্রনাথ অত্যন্ত সচেতন কবি। তিনি জানতেন যে, যে-কথাই বলা হোক না কেন, তা যদি পাঠকের চিত্তে আগে ধ্বনিত না হয়—তবে তার বাচ্যার্থ ত দূরের কথা, ব্যঙ্গ্যার্থই পাঠকের কাছে গ্রাহ্য হবে না। সেইজন্য তিনি কাব্যে ছন্দ লালিত্যের গুণকে অত্যন্ত স্পষ্ট ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে তুলেছেন—যাতে তাঁর কবিতা পাঠ করলে সহজেই তা কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করে। তাঁর ছন্দোবিশ্লেষণ করলে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। তিনি বিভিন্ন ছন্দেরই পক্ষপাতী ছিলেন এবং এ বিষয়ে তাঁর দক্ষতাও সাধারণ ক্ষমতার বাইরে ছিল বলতে হবে। তাঁর প্রত্যেকটি কবিতাই প্রায় নূতন ছন্দের মাধ্যমে লিখিত। ভাষা সম্পর্কে যেমন তিনি কোন রীতির বশ্যতা স্বীকার করেন নি, মিল সম্পর্কে কিন্তু তিনি সর্বদাই সচেতন ছিলেন। মিল দেওয়ার অনুশাসনের প্রতি, যে শব্দের সঙ্গে যে শব্দের উত্তম ও মধুরতম মিল হতে পারে—কবির সজাগ কান ও চেতনা সে সম্পর্কে সব সময়ে সজাগ ছিল।

যতীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে বাস্তববাদী কবি—এ সম্পর্কে কোন সংশয়ের অবকাশ নেই। কিন্তু তাই বলে তাঁর রোমান্টিক কল্পনাবিলাস ছিল না—একথা বলা অন্যায় হবে। যুগধর্মের প্রভাবে রোমান্টিক ভঙ্গীকে বাচ্যের অবলম্বন হিসাবে তিনি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি জগৎকে, জীবনকে, তাঁর পরিপার্শ্বকে দেখেছেন ও বিচার করেছেন বাস্তব বুদ্ধির আলোকে, সেই বাস্তবতার প্রখর আলো তাঁর চোখকে ধাঁধিয়ে ফেলে নি। ফলে তিনি তাঁর কাব্যের বাচনভঙ্গীতে স্বপ্ননীল লাবণ্যের এক রোমান্টিক প্রলেপ লাগাতে পেরেছেন, কল্পনার অভিরাম বিলাসে কবি নিজেকে অনায়াসেই ছেড়ে দিয়েছেন কোন কোন কবিতায়।

অসংখ্য টুকরা কল্পনার কারুকর্ম যতীন্দ্রনাথের বাচ্যকে রূপ-মধুর করে তুলেছে —সেইজন্য তাঁর কবিতা শুধু মাত্র মনোলোকের বা ভাবজগতের প্রজ্ঞালোকেই অর্থগ্রাহ্য—তা নয়। সেগুলি শারীর সৌন্দর্যের দিক থেকে নয়নমনোহর রূপের

অধিকারী, অর্থাৎ তাঁর কবিতা পাঠে মন প্রাণ চোখ কান—প্রায় সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই পরিতৃপ্তি ঘটে।

এই কবি কিন্তু বাঙলা দেশে যথার্থ কদর পান নি, রবীন্দ্রনাথের সময়ে বা তাঁর পরে কবি-খ্যাতি মেলা দুষ্কর—এ সত্য মেনে নিয়েও দুঃখের সঙ্গে বলা চলে যে, যতীন্দ্রনাথের জীবিতকালে তাঁর আশানুরূপ ও যোগ্য খ্যাতি ও খাতির হয় নি। তিনি বাঙলা ১৩১৭ সন থেকে মৃত্যুর অব্যবহিত আগে পর্যন্ত কাব্যচর্চা করেছেন, এবং বাঙলার জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা বেদনা-বিষণ্ণতা নিয়ে কবিতা লিখলেও সাধারণ্যে কবির আসনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন নি। এ সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ সচেতনও ছিলেন। তাই কাব্য-জীবনের শেষ প্রান্তে এসে যখন নিজের সম্পর্কে চিন্তা করলেন, বাঙলা সাহিত্যের বেসাতিতে দেনাপাওনার হিসেব-নিকেশ করলেন—তখন স্বতঃই তিনি অভিমানাহত হয়ে উঠলেন। তিনি বাঙলার মাঠ-প্রান্তর, নদী-গ্রাম—এবং একান্তভাবে এই বাঙালী মানুষদের নিয়েই কাব্য রচনা করেছেন, বহির্বিশ্বের দোহাই পাড়েন নি, বহির্জগতের ও বহির্জীবনের আদর্শকে সামনে রাখার চেষ্টা করেন নি,—সেই কারণেই বোধ হয় তাঁর খ্যাতি হল না। এইরকম একটি অভিমানক্ষুব্ধ সুর তাঁর শেষতম স্বল্পখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'নিশান্তিকা'য় দেখতে পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন—

চারিদিকে মোর শ্যামল গন্ধ গীতি,
কত হাসিমুখ, কত স্নেহ কত প্রীতি,
আলো-ছায়া সুখদুখ;
সে-সবে আমার নেশা ধরিল না চোখে,
মন বসিল না প্রেমের অলকা-লোকে,
ভরিল না খালি বুক।
কবি নহি আমি, কবি নহি তথাকথিত,
যে-ব্যথা জীবনে সব ছন্দের অতীত,
আমি সে ব্যথায় চির-ব্যথিত।
... ...
জানি না সে ব্যথা কবে হবে কোথা শেষ,
শুধু জানি আমি ধরেছি নিরুদ্দেশ
অনন্ত ছায়াপথ,
বধির বিধাতা যেথা অনলাক্ষরে
লিখিয়া চলেছে তিমির-ললাট 'পরে
মানুষের দাসখত।

কবি নহি আমি, করি নি ছন্দে গ্রথিত
যে বিধি-বিধান প্রতিবিধানের অতীত।
আমি মহাবন্ধনে ব্যথিত॥

রবীন্দ্রনাথের পর বাঙলা কাব্যক্ষেত্রে ক্লাশিক্যাল সম্মানের রাজটীকা আর কোন কবির কপালেই সহসা উঠবে না, সুতরাং কবির এই অভিমান মিথ্যা। তিনি বাঙলা দেশের কাব্যরসপিপাসুদের অন্তর্জ্যোতিলোকে উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসাবেই বিরাজিত আছেন এবং থাকবেনও। আজকের কবি বা পাঠক নিশ্চয় নিছক ভাববিলাসের দ্বারা মনের খোরাক সংগ্রহ করেন না। তাঁদের চিন্তনে এমন কিছু থাকে—যার উপস্থিতি বাঁচার সংগ্রামকে সাহায্য করবে, কিংবা এই সংগ্রামে লড়বার উৎসাহ বা প্রেরণা দেবে। আজ জীবনের সামনে নানা দুর্যোগ, এই ঝড়-ঝঞ্ঝা উত্তরণের বাণীই অসহায় মানুষ সাহিত্য ও শিল্প থেকে আহরণের প্রত্যাশায় উন্মুখ থাকে, এবং আজকের সাহিত্যে জীবনের সুস্থতার ও শান্তির স্থায়িত্বের কথাই বড় হয়ে দেখাও দিয়েছে। এই সব বিচার করলে আমরা নিশ্চয় করে বলিতে পারি, কবি যতীন্দ্রনাথ মানুষের এই সুস্থতার পথের সন্ধান দেওয়ার দিক থেকে পথিকৃৎ। তিনি পতনের ও ধ্বংসের সমস্ত দিকগুলির প্রতি অঙুলি নির্দেশ করেছেন, সমস্যার সমাধান নিয়ে মাথা ঘামান নি। আজ যে কবি, সাহিত্যিক, পাঠক—সকলেই জীবনের ক্ষয়ক্ষতিকে, ভয়-ভাবনাকে, জাড্য নিশ্চলতাকে, ভাঙন-পচনকে সতর্কতার সঙ্গে দেখতে বা দেখাতে শিখেছেন—এই অধ্যায়ের অন্যতম পাঠ কি আমরা কবি যতীন্দ্রনাথের কাছ থেকে পাই নি? সুতরাং কবির অভিমান সম্পূর্ণ অকারণ ও অলীক, তিনি মানব-সত্যের, মানব-কল্যাণের এক নূতন পথের স্রষ্টা—আজ যেখান দিয়ে আমরা সবাই পথ হাঁটছি।

কবি নজরুল

রবীন্দ্রযুগে যে ক'জন কবি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য না হারিয়ে বাঙলা সাহিত্যে নিজের একটি স্বতন্ত্র আসন আদায় করে সগৌরবে অধিষ্ঠিত হতে পেরেছেন—বিদ্রোহী কবি নজরুল তাঁদেরই একজন। তিনি যেন একটি প্রকাণ্ড বিদ্রোহ, যেন দুর্ধর্ষ জীবনের একটি মূর্তিমান প্রকাশ! জ্বলন্ত উল্কার মতো তিনি বাঙলার কাব্যাকাশে এসে উদিত হয়েছেন, যা কিছু ভীরুতা, দুর্বলতা, যা কিছু ভয়-সংশয়, যা কিছু দ্বিধা-বিহ্বলতা—সকলকেই তিনি পুড়িয়ে দিয়েছেন, ঝলসে দিয়েছেন তাঁর যৌবন-বহ্নির অগ্নিমশালে। কালবৈশাখী ঝড় যেমন করে তার প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে নিজেকে

আদিগন্ত ব্যাপ্ত করে দেয়, কবি নজরুল ইসলামও বাঙলা কাব্যে ঠিক সেইভাবে নিজের শক্তির উন্মাদনা নিয়ে বাঙালী পাঠককে অভিভূত করে ফেললেন।

নজরুল প্রতিভার সংক্ষিপ্ত নামকরণ হল তিনি বিদ্রোহী কবি। 'বিদ্রোহী' নামের একটি কবিতায় তিনি তারুণ্যশক্তির বিজয় পতাকা উড়িয়েছেন, তীব্র একটা উন্মাদনায় পরাধীন বাঙালীর প্রাণমন কেঁপে উঠলো। যে সময় বাঙলা দেশে রাষ্ট্রিক ও সামাজিক মুক্তির আন্দোলন জোর কদমে এগিয়ে চলছে, ঠিক সেই সময়েই নজরুল এসে উন্নতশীর্ষ হয়ে চলার গান ধরলেন, তাই সহজেই তাঁকে 'বিদ্রোহী কবি' বলে আখ্যাত করা হল। বলার ভঙ্গীতে বীর্যসমন্বিত নবীনত্ব এবং বক্তব্যে উন্মাদনাপূর্ণ শক্তি বাঙালীকে একেবারে সচকিত করে তুলেছিল বলেই বাঙলা দেশ নজরুলকে কোনও দিন ভুলতে পারবে না। জাতি যখন মুমূর্ষু এক জাড্যে আড়ষ্ট, তখন তাকে চাবুক মেরে জাগিয়েছেন তিনি। বন্ধনমুক্তির আত্মপ্রকাশে বাঙালী যেন নূতন একটা পথের সন্ধান পেল, তাঁর বিদ্রোহী প্রাণের ছুটার দুর্ধর্ষ গতিবেগের উন্মত্ততায় বাঙালীও যেন নিজেদের মোহ এবং তন্দ্রা কাটিয়ে বলে উঠতে পারলো—

আমি বসুধা-বক্ষে আগ্নেয়াদ্রি, বাড়ব-বহ্নি, কালানল,
আমি পাতালে মাতাল অগ্নি-পাথার-কলরোল-কল-কোলাহল!
আমি তড়িতে চড়িয়া উড়ে চলি জোর তুড়ি দিয়া,
দিয়া লম্ফ,
আমি ত্রাস সঞ্চারি ভুবনে সহসা সঞ্চরি' ভূমি-কম্প।
ধরি বাসুকির ফণা জাপটি,'
ধরি স্বর্গীয় দূত জিব্রাইলের আগুনের পাখা সাপটি'!
আমি দেব-শিশু, আমি চঞ্চল,
আমি ধৃষ্ট, আমি দাঁত দিয়া ছিঁড়ি বিশ্ব-মায়ের অঞ্চল!

'রবীন্দ্রযুগে কাব্যের মধ্যে যে বিরাট ও গভীর সংবেদনশীলতাকে কুলীন কবিতার পরিচায়ক বলে চিহ্নিত করা হয়েছে—কবি নজরুল ইসলামের মধ্যে সেই সংবেদনশীলতা বিপুল শক্তিমত্তা এবং প্রচণ্ড আবেগের সঙ্গে ধরা পড়েছে—এবং এইখানেই তিনি রবীন্দ্রকাব্যধারা থেকে একটু স্বাতন্ত্র্য তৈরি করে নিজস্ব ভূমি রচনা করে দাঁড়িয়েছেন। পরাধীনতার জ্বালার অসহনীয়তা, রাজনীতিক মুক্তির সুতীব্র পিপাসা, হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক ঐক্য, দারিদ্র্যের দুর্বিষহ দুঃখ ইত্যাদিকেই নজরুল আবেগময়ী ভাষায় বাণীবদ্ধ করেছেন'। নজরুল সম্বন্ধে সমালোচকদের এই হচ্ছে মোদ্দা কথা।

একথা ঠিক যে নজরুল একটা যুগের বিশেষ এক সময়কার কবি। কাল যেন এই রকম একজন কবিকে চাইছিল। প্রত্যেক জাতির জীবনে এক একটি সময়ে এক এক রকম সমস্যা এসে দেখা দেয়; জাতি যখন পরাধীনতার নাগপাশে বাঁধা, উদ্দাম প্রাণশক্তি যখন সেই বন্ধনকে ঘোচাবার জন্যে তৈরী, সেই সময়ে সেই সমস্যাকে বিন্যস্ত করে এবং তখনকার জীবনের বিশেষ আদর্শটি আমাদের সামনে তুলে ধরেই নজরুল আবির্ভূত হলেন। সে কাব্যে কবিত্বের ফুল যতটা না ফুটুক, আগুনের ফুলকি ছিল যথেষ্ট, যার ফলে ইংরেজ সরকার সেই কাব্যগুলিকে ('অগ্নিবীণা', 'বিষের বাঁশী', 'সর্বহারা' প্রভৃতি) সাধারণ্যে আইনত নিষিদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধ তখন সবে শেষ হয়েছে, রুশ বিপ্লবে নব যুবশক্তি পৃথিবীতে এক আশ্চর্য দেশের পত্তন করতে চলেছে; ভারতবর্ষের পরাধীন যুবশক্তির অন্তরে তখন বিদ্রোহের সুপ্ত শক্তি সদ্যঃজাগ্রত,—এমন সময় বিদ্রোহী কবি গাইলেন—

বল বীর—
বল উন্নত মম শির

কিংবা,
কারার ঐ লৌহ কপাট
ভেঙে ফেল কর্‌রে লোপাট,
রক্তজমাট শিকলপূজার পাষাণ বেদী।

নজরুলের কাব্যে উত্তেজনা যত বেশী, কাব্যের রূপায়ণে কারুকার্য তত বেশী নয়। রবীন্দ্র-সমসাময়িক কবি হয়ে তিনি যদি রবীন্দ্রনাথের কারুশিল্পে এবং শব্দ-সৌকর্যে নিবিষ্ট হতেন—তবে তাঁর কাছ থেকে আমরা নির্যাতিত বেদনার মুখের ভাষাটি পেতাম না, পীড়িত মানবাত্মার উচ্চকণ্ঠে বিদ্রোহ ঘোষণার বাণীটি শুনতে পেতাম না, এমন তেজোদৃপ্ত পৌরুষময় কণ্ঠে অসত্য এবং অন্যায়ের প্রতিবিধানের জন্যে অগ্নিময় ঘোষণা পেতাম না। গভীর ভাবের বা মানব মহত্ত্বের বিশিষ্ট বেদনার কবি তিনি নন—কিন্তু একটি যুগের বিশেষ ক্ষণের এক বলিষ্ঠ কবি তিনি। তিনি মুক্তকণ্ঠে বলতে দ্বিধা করেন নি—

জনগণে যারা জোঁক সম শোষে তারে মহাজন কয়,
সন্তান সম পালে যারা জমি তারা জমি-দার নয়।
মাটিতে যাদের ঠেকে না চরণ
মাটির মালিক তাঁহারাই হন—
যে যত ভণ্ড ধড়িবাজ আজ সেই তত বলবান।
নিতি নব ছোরা গড়িয়া কসাই বলে জ্ঞান বিজ্ঞান।

নজরুলের কবিতা নির্যাতিতদের মুখে বাণী জুগিয়েছে, পীড়িতের বুকে আশার ও বিশ্বাসের আলো জ্বেলেছে, কিন্তু কোথাও কোনও দলীয় রাজনীতির মতবাদকে তিনি প্রচার করেন নি। মতের আড়ালে মনকে ঢেকে শুকনো রাজনৈতিক চেতনাকে পল্লবিত করে কাব্য করার অপচেষ্টা তাঁর ছিল না,—তাই ফরিয়াদের মতো শক্ত কথার কবিতাতেও তিনি বামপন্থীর চিন্তাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে মুড়ে দেন নি। তিনি লিখেছেন—

চির অবনত তুলিয়াছে আজ গগনে উচ্চ শির।
বান্দা আজিকে বন্ধন ছেদি' ভেঙেছে কারা প্রাচীর।
এতদিনে তার লাগিয়াছে ভালো—
আকাশ বাতাস বাহিরের আলো,
এবার বন্দী বুঝেছে, মধুর প্রাণের চাইতে ত্রাণ।
মুক্ত-কণ্ঠে স্বাধীন বিশ্বে উঠিতেছে একতান—
জয় নিপীড়িত প্রাণ!
জয় নব অভিযান
জয় নব উত্থান!

তাই নজরুল সম্পর্কে যেটি সবচেয়ে বড় কথা—তা হল এই যে, এঁর কাব্য মানবীয় শ্রদ্ধায় উদ্দীপ্ত। এঁর মানবতাবোধে এঁর প্রাণের স্পর্শ। অন্তরের সমস্ত স্নেহ-সুষমা উজাড় করে দিয়ে ইনি নিজস্ব মহিমায় অম্লান হয়ে উঠেছেন। তিনি প্রচারধর্মী কবি বলে অনেকের কাছে আখ্যাত হয়েছেন—তা হোন, কিন্তু তাঁর কাব্য মানব মহত্ত্বের কথায় পরিপূর্ণ। তাঁর বক্তব্য প্রায় ক্ষেত্রেই মূর্ত হয়ে ধরা দিয়েছে, কোথাও তিনি বিমূর্ত চিন্তাকে সূক্ষ্মতার সঙ্গে বর্ণনা করেন নি, সর্বদাই Abstract-কে Concrete করেছেন—কিন্তু তা তিনি রাজনৈতিক দাসত্বের জন্যে করেন নি, মানুষকে ভালোবেসে—তার কথা স্পষ্ট করে বলতে গিয়েই তিনি কাব্যলক্ষ্মীর সৌকর্যের দিকে তাকান নি, নিজের প্রাণধর্ম ও অন্তররসের আনুগত্যকেই বড় মন্ত্র বলে মেনে নিয়েছেন। 'সর্বহারা' গ্রন্থের একটি বিশিষ্ট কবিতায় তিনি বলছেন—

ক্ষুধাতুর শিশু চায় না স্বরাজ, চায় দুটো ভাত একটু নুন।
বেলা বয়ে যায়, খায়নি ক' বাছা, কচি পেটে তার জ্বলে আগুন।
কেঁদে ছুটে আসি পাগলের প্রায়,
স্বরাজের নেশা কোথা ছুটে যায়!
কেঁদে বলি, ওগো ভগবান তুমি আজিও আছ কি? কালি ও চুণ
কেন ওঠে না'ক তাহাদের গালে, যারা খায় এই শিশুর খুন?

এখানে তাঁর বক্তব্যকে রূপের আড়ালে ভাবের বিমূর্ত সাধনায় কাব্যোচিত সুচারু করার চিন্তা তাঁর লেখায় ততটা নেই—যতটা তাঁর প্রাণ কেঁদেছে ক্ষুধাতুর কচি শিশুর পেটের জ্বালায়। তাঁর কাব্য আবেগে যত চঞ্চল, পাঠক-হৃদয়ে কবির অনুভূতি সঞ্চারণে তার চেয়ে কম কার্যকরী নয়।

নজরুল ঈশ্বর-বিশ্বাসী কবি। তাঁর 'বিদ্রোহী' কবিতাই তার স্পষ্ট প্রমাণ। তিনি বলছেন যে, তিনি—'জগদীশ্বর-ঈশ্বর আমি পুরুষোত্তম সত্য'। 'আমার সুন্দর' নামক একটি গদ্য রচনায়ও তিনি ঐশ্বরিক সত্তার উপলব্ধি করেছেন নিজের কবি-জীবনে। পীড়িত, সর্বহারা, নির্যাতিত মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দূর করার ব্যাপারেও তিনি সর্বত্র ঈশ্বরকে ডেকেছেন। বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদী দৃষ্টি অনুসরণে জনগণকে একীভূত করে অত্যাচার দমনের কাজে তাদের ডাকেন নি। হিন্দু এবং মুসলমান শাস্ত্র এবং পুরাণ সম্পর্কেও তাঁর শ্রদ্ধা ছিল অসীম, এবং তাঁর নানা কবিতার মধ্যে আমরা তা দেখতে পাই।

নজরুলের সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনি সাম্যবাদের কবি। রাজনীতিক দৃষ্টি-কোণ থেকে সাম্যবাদের যে ব্যাখ্যা আজ আমরা পাই—তিনি সেই জাতীয় রাষ্ট্রনৈতিক চেতনায় উদ্দীপ্ত ছিলেন না। তিনি মানুষে মানুষে কোনও তফাত দেখেন নি—এখানেই তাঁর সাম্যবাদ। 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' কবিতাটি এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণ করতে হবে। কবি বলছেন—

> অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া জানে না সন্তরণ,
> কাণ্ডারী! আজ দেখিব তোমার মাতৃ-মুক্তি-পণ!
> "হিন্দু না ওরা মুস্লিম?" এই জিজ্ঞাসে কোন্ জন?
> কাণ্ডারী! বল, ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র!"

কিংবা, তাঁর 'সাম্যবাদী' কবিতায় তিনি বলেছেন—

> গাহি সাম্যের গান—
> যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান,
> যেখানে মিশিছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-ক্রীশ্চান।

এই পর্যায়ের 'ঈশ্বর', 'মানুষ', 'পাপ', 'বারাঙ্গনা', 'নারী,' 'কুলিমজুর' কবিতা-গুলিই সাক্ষ্য দেবে নজরুল মানুষকে কত আপন করে ভালোবেসেছেন। তাঁর অন্তরে মানুষের সঙ্গে মানুষের কোনও তফাত নেই—তা এই কবিতাগুলিতে সত্যও প্রকট হয়ে ফুটে উঠেছে।

তিনি বিভিন্ন সুরেরও কবি। 'ঝিঙে ফুলে' ছোটদের উপযোগী যে সুর ও ছন্দ তিনি রচনা করেছেন—তার বড় একটা তুলনা হয় না। 'প্রভাতী' কবিতা তো প্রায় সকলেরই মুখস্থ ঃ

ভোর হোলো
দোর খোলো
　　খুকুমণি ওঠ রে!
ঐ ডাকে
যুঁই শাখে
　　ফুল-খুকী ছোট রে!
　　খুকুমণি ওঠ রে!
রবি মামা
দেয় হামা
　　গায়ে রাঙা জামা ঐ,
দারোয়ান
গায় গান
　　শোনো ঐ "রামা হৈ"!

তাঁর প্রেমের কবিতাগুলির মধ্যেও একটা অনির্বচনীয় অলৌকিকত্ব ধরা পড়ে। রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিশ্বব্যাপী দীপ্তির পাশে এগুলির স্বাতন্ত্র্য খুঁজে পাওয়া মুশকিল, কিন্তু কবির প্রাণ যে কত প্রেমময় ছিল—তা তাঁর 'দোলন চাঁপা' কি 'ছায়ানট' বই পড়লে বুঝা যায়।

বাঙলা কাব্যে তিনি নতুন ধরনের ব্যঙ্গরসের কবিতার সংযোজন করেন ; তাঁর 'দে গরুর গা ধুইয়ে'র কথা বাঙলা দেশ কখনই ভুলতে পারবে না।

নজরুলের কাব্যসৃষ্টির আর এক বৈশিষ্ট্য হল তাঁর গজল গান রচনা। কোন দিন যদি এমন দুর্ভাগ্য বা দুর্দিন আসে—আমরা নজরুলকে সতত স্মরণীয় সোনার পালঙ্কে বসিয়ে নীরব হই—তথাপি তাঁর গজল গান বাঙালীর কণ্ঠ থেকে মুহূর্ত কালের জন্যে থেমে যাবে না। গজল গানের মধ্যে যেমন তিনি সুরারোপ করেছেন—তেমনি কাব্যকেও ধরেছেন অপূর্ব ভাবে। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের যেমন একটা ধারা আছে—তেমনি নজরুলগীতিরও এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য কবিকে চিরস্মরণীয় করে রাখবে। এদিক থেকে 'চোখের চাতক' বইটি বাঙলা সাহিত্যের এক অমর সম্পদ।

শাক্ততত্ত্ব ও রামপ্রসাদের কাব্যমূল্য

রামপ্রসাদ ও বাঙলায় অষ্টাদশ শতাব্দী

বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—'অবনতাবস্থায়ও বঙ্গভূমি রত্নপ্রসবিনী'। বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তি যে সত্য, বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাহার প্রমাণ আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাষ্ট্রনৈতিক বিপর্যয় ও অর্থনৈতিক দুর্গতির ফলে যখন বাঙালীর জীবন নৈরাশ্যে মুহ্যমান, যখন সমগ্র জাতি মহৎ আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট ও আত্মপ্রত্যয়হীন, যখন সমাজের এক স্তরে বিলাস-ব্যসন ও ভোগ-বাসনার প্রমত্ততা ও অপর স্তরে অর্থাৎ বৃহত্তর সমাজ-জীবনে সীমাহীন দুর্গতি, সেই সময়ে এই বঙ্গভূমিতে ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। বিদগ্ধ কবি ভারতচন্দ্র ও সাধক কবি রামপ্রসাদের কবি-প্রকৃতিতে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তাঁহারা কেহই যুগের প্রভাবকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। ভারতচন্দ্র ছিলেন অসাধারণ শব্দ-শিল্পী ও বিচিত্র ছন্দের প্রয়োগে দক্ষ,—কাব্যের প্রসাধন-কলা তিনি অধিগত করিয়াছিলেন, এই জন্য 'অন্নদামঙ্গল' ও 'বিদ্যাসুন্দর' রচনায় তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যে রামপ্রসাদ কৃষ্ণরাম ও ভারতচন্দ্রের অনুসরণ করিয়াছেন, কিন্তু এ ক্ষেত্রে ভারতচন্দ্রের সঙ্গে তুলনায় তাঁহার কবি-প্রতিভা নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে। তবে রামপ্রসাদের 'বিদ্যাসুন্দরে' যুগোচিত কুরুচির পরিচয় থাকিলেও উহাকে তন্ত্রসম্মত সাধনার আদর্শ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা যায় না। রামপ্রসাদের 'কালীকীর্তনে' সংস্কৃত ও বাঙলার মিশ্রণে স্থানে স্থানে অপূর্ব ধ্বনিঝঙ্কারের সৃষ্টি হইয়াছে। দেবীর গোষ্ঠলীলা প্রভৃতির বর্ণনায় বৈষ্ণব মহাজনগণের প্রভাব সুস্পষ্ট, কিন্তু 'কালীকীর্তনে'ও রামপ্রসাদের প্রতিভার সর্বোত্তম বিকাশ ঘটে নাই। রামপ্রসাদের হৃদয়-কন্দর হইতে যে সঙ্গীতের ধারা স্বতঃ-উৎসারিত হইয়া আমাদের চিত্তভূমিকে ভক্তিরসে আর্দ্র ও বাৎসল্য রসে স্নিগ্ধ করিয়া তুলিতেছে,—যে গীতি-ধারা গঙ্গার পাবনী ধারার মতো আমাদের কলুষ-কালিমা নাশ করিয়া অন্তরে শান্তির স্রোত প্রবাহিত করিতেছে, সেই প্রসাদী সঙ্গীতেই চিরদিন রামপ্রসাদকে অমর করিয়া রাখিবে।

রামপ্রসাদ ও তান্ত্রিক সাধনার ধারা

বাঙলা দেশে অধ্যাত্ম সাধনার দুইটি প্রধান ধারা—তান্ত্রিক সাধনার ধারা ও বৈষ্ণব সাধনার ধারা—গঙ্গাযমুনা-সঙ্গমের ন্যায় মিলিত হইয়াছে। অবশ্য, ব্যাপক অর্থে বলিতে গেলে বৈষ্ণবী সাধনাও তান্ত্রিক সাধনারই প্রকারভেদ মাত্র, কেননা,

শৈব ও শাক্ত তন্ত্রের ন্যায় বৈষ্ণবীয় তন্ত্রও রহিয়াছে। পরব্রহ্মের মধ্যে যে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারিণী শক্তি রহিয়াছে, সেই মহাশক্তিই তান্ত্রিক সাধকের আরাধ্যা। তিনিই যুগপৎ সৌম্যা ও রৌদ্রা, তিনিই সাধকের দৃষ্টিতে 'করালবদনী ঘোরা মুক্তকেশী চতুর্ভুজা', তিনিই কালীরূপে মহাকালের বক্ষে নৃত্য করেন। কিন্তু রামপ্রসাদের ধ্যানদৃষ্টিতে তিনি স্নেহময়ী, করুণাময়ী জননী। মঙ্গলকাব্যের দেবী চণ্ডিকা এখানে তাঁহার চণ্ডরূপ সংহরণ করিয়াছেন। রামপ্রসাদ তাঁহার আরাধ্যা দেবীকে বাঙালীর ঘরের মমতাময়ী জননী ও স্নেহময়ী কন্যায় পরিণত করিয়াছেন। এইখানেই রামপ্রসাদের স্বকীয়তা। রামপ্রসাদ তাঁহার আরাধ্যা দেবীর নিকট পার্থিব সম্পদের কামনা জানান নাই, মঙ্গলকাব্যের রচয়িতার মতো তিনি মানব-মহিমাকেও ক্ষুণ্ণ করেন নাই, সুতরাং রামপ্রসাদের রচিত পদাবলীতে মঙ্গল-কাব্যের প্রভাব অতি গৌণ।

উপনিষদে যাঁহাকে বাক্য ও মনের অগোচর বলা হইয়াছে, তাঁহাকেই আবার বলা হইয়াছে, 'রসস্বরূপ'—'রসো বৈ সঃ'। এই রসস্বরূপ শ্রীভগবানই গৌড়ীয় বৈষ্ণবের উপাস্য। দাক্ষিণাত্যের আড়বারগণের উপাস্যও তিনি, গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা তাঁহাকে বলিয়াছেন 'অখিলরসামৃত সিন্ধু'। 'রতিভেদে ভক্তিভেদ পঞ্চ পরকার'—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। ভক্তগণ কেহবা প্রভুরূপে, কেহবা সখারূপে, কেহবা অপত্যরূপে, কেহবা দয়িতরূপে তাঁহার ভজনা করেন। বৈষ্ণব সাধকগণের ন্যায় বাঙলার শক্তিসাধকগণও পার্থিব সম্পর্কের মধ্য দিয়াই ভক্তিরস-পিপাসা চরিতার্থ করিয়াছেন, তাঁহাদের আরাধ্যা নিখিল বিশ্বের জননী। এই মাতৃভাবাসক্তির মধ্য দিয়াই শক্তিসাধক চরম শান্তি ও পরমা গতি লাভ করিয়াছেন।

বিদ্রোহী রামপ্রসাদ

শ্রীরামপ্রসাদ যে জগন্মাতার চরণ আশ্রয় করিয়া সংসারের সর্ববিধ ভয়-ভাবনা হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন, এমন কি, মৃত্যুভয় পর্যন্ত অতিক্রম করিয়াছিলেন, তিনি বিশ্বব্যাপিনী মহাশক্তি, তিনি মৃন্ময়ী নহেন, ঘটে ঘটে চৈতন্যরূপে বিরাজ-মানা; আমরা অজ্ঞানবশত সেই বিশ্বব্যাপিনীর মূর্তি গড়িয়া পূজা করি এবং নানা আভরণে তাঁহাকে সজ্জিত করি। যিনি নিখিল বিশ্বকে পালন করিতেছেন, আমরা তাঁহারই সম্মুখে ছাগ-মহিষ বলি দিয়া মনে করি, জগন্মাতার তৃপ্তি সাধন করিলাম। আমাদের সাধনায় যদি নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা থাকে, আমাদের অন্তরে যদি ভক্তির পূত মন্দাকিনী ধারা সর্বদা প্রবাহিত হইতে থাকে, তাহা হইলে মূর্তিপূজাকে

অবলম্বন করিয়াও যে আমরা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারি, রামপ্রসাদ ও রামকৃষ্ণ তাহার দৃষ্টান্তস্থল। ইঁহারা কেহই তত্ত্বজ্ঞান চাহেন নাই, রামপ্রসাদ চিনি হইতে চাহেন নাই, চিনি খাইতেই ভালবাসিয়াছেন, তথাপি বিশ্ব-জননীর অনুগ্রহে তাঁহার অন্তরে ব্রহ্মজ্ঞান স্ফুরিত হইয়াছে। এদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ লৌকিক বিচারে নিরক্ষর হইলেও অধ্যাত্মজগতের নিগূঢ় সত্যসকল তাঁহার মনে দিবালোকের মতো উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। আবার ইঁহারা উভয়েই বিদ্রোহী, কেননা শাস্ত্রীয় অনুশাসন বা লৌকিক আচারকে ইঁহারা অবনত মস্তকে মানিয়া লন নাই। রামপ্রসাদের দৃষ্টিতে ভেদবুদ্ধি মিথ্যা, তাঁহার 'তারা' শুধু সাকারা নহেন, নিরাকারাও ঘটেন। তাঁহার মতে তীর্থযাত্রার প্রয়াস নিষ্ফল পরিশ্রম মাত্র, মাতৃচরণেই সর্বতীর্থ বিরাজিত। রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন—

কেন গঙ্গাবাসী হব।
ঘরে বসে মায়ের নাম গাইব।
আপন রাজ্য ছেড়ে কেন
পরের রাজ্যে বাস করিব।
কালীর চরণতলে কত শত
গয়া গঙ্গা দেখতে পাব।
শ্রীরামপ্রসাদ বলে
কালীর পদে শরণ লব।
আমি এমন মায়ের ছেলে নই যে
বিমাতাকে মা বলিব।

আবার, দুই একটি গানে বিদ্রোহী রামপ্রসাদের পরিচয়টি সুস্পষ্ট। যথা—

মন তোমার এই ভ্রম গেল না।
কালী কেমন তাই চেয়ে দেখলে না॥
ওরে ত্রিভুবন সে মায়ের মূর্তি
জেনেও কি তাই জান না।
কোন্ প্রাণে তাঁর মাটির মূর্তি
গড়িয়ে করিস্ উপাসনা॥
জগৎকে সাজাচ্ছেন যে মা
দিয়ে কত রত্ন সোনা।
ওরে কোন্ লাজে সাজাতে চাস্ তাঁয়
দিয়ে ছার ডাকের গহনা।

জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা, সুমধুর খাদ্য নানা।
ওরে কোন্ লাজে খাওয়াতে চাস তাঁয়
আলো চাল আর বুট ভিজানা॥
জগৎকে পালিছেন যে মা
সাদরে কি তাই জান না।
ওরে কেমনে দিতে চাস বলি,
মেষ মহিষ আর ছাগল-ছানা॥

সমন্বয়-সাধনায় রামপ্রসাদ

সমন্বয়ের সাধনা ভারতীয় মনীষার একটি বৈশিষ্ট্য। ভারত যুগে যুগে বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায় ও সাধক সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ দূর করিতে প্রয়াস পাইয়াছে। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন ভারতের ঋষি। শিবভক্ত কবি মহিম্নস্তবে বলিয়াছেন,—'সংসারে রুচির বৈচিত্র্য আছে বলিয়াই নানা জনে নানা পথ অবলম্বন করেন, কিন্তু যিনি যে পথ আশ্রয় করুন না কেন, সকলেরই গম্যস্থল তুমি। কোন নদী ঋজুগামিনী, আবার কোন নদী বা কুটিলগামিনী, কিন্তু সকলেরই গম্যস্থল সাগর।' ভারতের বহু সাধক যুগে যুগে এই সমন্বয়ী দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন। মৈথিল কবি বিদ্যাপতি শ্রদ্ধানত চিত্তে সকল দেবতারই বন্দনা গাহিয়াছেন, ইহাতে বুঝা যায়, কোন বিশেষ দেবতার প্রতি তাঁহার পক্ষপাত ছিল না। রামপ্রসাদ তান্ত্রিক সাধনার ধারা অবলম্বন করিয়াই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন কিন্তু বৈষ্ণবধর্মের প্রতি তাঁহার সুগভীর শ্রদ্ধাবোধ ছিল এবং তিনি 'শ্যাম' ও 'শ্যামার' অভিন্নতার কথা প্রচার করিয়াছিলেন; এই অভিন্নতার কথা রামপ্রসাদের ন্যায় এমন উদাত্ত গম্ভীর কণ্ঠে আর কেহ ঘোষণা করেন নাই। অবশ্য, সে যুগে বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে যে বিকৃতি ও অনাচার প্রবেশ করিয়াছিল, রামপ্রসাদ উহাকে ব্যঙ্গ করিতে ছাড়েন নাই। তথাপি রামপ্রসাদ ধ্যান দৃষ্টিতে যে চরম সত্য উপলব্ধি করিয়াছেন, উহা তাঁহার কণ্ঠ হইতে সঙ্গীতরূপে উৎসারিত হইয়াছে—

কালী হলি মা রাসবিহারী
নটবর-বেশে বৃন্দাবনে—
পৃথক প্রণব নানা লীলা তব,
কে বুঝে একথা বিষম ভারী।
নিজ তনু আধা, গুণবতী রাধা;
আপনি পুরুষ আপনি নারী।
ছিল বিবসন কটি, এবে পীত ধটী
এলো চুল চূড়া বংশীধারী।

রামপ্রসাদ ও অভয়ের সাধনা

কেহ কেহ রামপ্রসাদের সঙ্গীতে দুঃখবাদের কথা বলিয়াছেন কিন্তু যথার্থ দুঃখবাদ বলিতে যাহা বুঝায়, রামপ্রসাদের গানে তাহা নাই। জীবনের দুঃখ দৈন্য সম্পর্কে রামপ্রসাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল, দুঃখকে তিনি 'স্বপ্ন' বা 'মায়া' বলিয়া উপেক্ষা করেন নাই কিংবা সংসারের সুখ-দুঃখ সকলই সমান অনিত্য জানিয়া বৈরাগ্যের মধ্যে চরম শান্তির সন্ধান করেন নাই। এইজন্য বাউল গানের মতে প্রসাদী সঙ্গীতে বৈরাগ্যের সুর ধ্বনিত হয় নাই। তাই আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলিয়াছেন, বাউলের দুঃখবাদে ও রামপ্রসাদের দুঃখবাদে পার্থক্য আছে। কথাটি প্রণিধানযোগ্য, তথাপি যথার্থ দুঃখবাদ বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা শুধু রামপ্রসাদের গানে নহে, সমগ্র মধ্যযুগীয় বাঙলা সাহিত্যেই অনুপস্থিত। জীবন-সমুদ্র মন্থনে যে হলাহল উত্থিত হইয়াছে, রামপ্রসাদ তাহা আকণ্ঠ পান করিয়াছেন, তিনি নীলকণ্ঠ হইতে পারেন নাই, কিন্তু বিষের জ্বালায় জর্জর হইয়াও তিনি মাতৃনাম ত্যাগ করেন নাই। তিনি মায়ের কাছে অভিযোগ করিয়াছেন, অভিমান-ভরা কণ্ঠে গাহিয়াছেন—'মা মা বলে, আর ডাকব না', কিন্তু তিনি যে 'একাক্ষর মহামন্ত্রে' দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার সাধ্য কি যে তিনি সেই মন্ত্র বিস্মৃত হইবেন? কখনও বা রামপ্রসাদ নিজেকে ব্রহ্মময়ী-সুত বলিয়া ধারণা করিয়া কালের ভয়কে অতিক্রম করিয়াছেন, কখনও যেন মাতার সঙ্গে শক্তির পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইয়া বলিতেছেন, 'দুঃখকে আমি ভয় করি না, দেখি, তুমি আমায় কত দুঃখ দিতে পার, আমি গর্বের সহিত সে দুঃখের ভার বহন করিব।'

'আমি কি দুঃখেরে ডরাই?
ওমা দাও কত দুঃখ মা আমি দেখতে চাই।
আগে পাছে দুঃখ চলে মা যদি কোনখানেতে যাই।
তখন দুঃখের বোঝা মাথায় নিয়ে দুঃখ দিয়ে মা বাজার বসাই।
* *
প্রসাদ বলে, ব্রহ্মময়ি, বোঝা নাবাও ক্ষণেক জিরাই।
দেখ, সুখ পেয়ে লোক গর্ব করে, আমি করি দুঃখের বড়াই ॥'

আগমনী ও বিজয়া

'আগমনী' ও 'বিজয়া'র গানের প্রবর্তক হিসাবেও রামপ্রসাদ বাঙলা সাহিত্যে চিরস্মরণীয়। অন্য কোন প্রদেশের সাহিত্যে বোধ হয় এই গানগুলির তুলনা মিলে না। সকল দেশের সাধকগণই কান্তভাবে ভগবানের আরাধনা করিয়াছেন, দক্ষিণ দেশের আড়বারগণের কথা ছাড়িয়া দিলেও আমরা ভারতের বাহিরে বহু

সুফী সাধক ও খ্রীষ্টীয় অলোকপন্থী বা মিষ্টিকবাদের কথা উল্লেখ করিতে পারি কিন্তু একমাত্র বাঙালী ভিন্ন আর কোন দেশের সাধকই জগদম্বাকে স্নেহময়ী কন্যারূপে আরাধনা করেন নাই। যে সাধক গাহিয়াছেন,—'বের হোয়ে দেখ কন্যারূপে রামপ্রসাদের বাঁধছে বেড়া', তাঁহার কণ্ঠ হইতেই তো আগমনী ও বিজয়ার গান প্রথম উৎসারিত হইয়াছে। এই গানগুলি আমাদের অন্তরের তারগুলিকে এমন গভীরভাবে স্পর্শ করে যে পরবর্তী কালে শুধু বাঙলা দেশের সাধকগণ নন, বহু কবিও এই জাতীয় গান রচনার প্রেরণা লাভ করিয়াছেন। পৌরাণিক কাহিনী এই গানের উৎস হইলেও এগুলি রামপ্রসাদের মৌলিক সৃষ্টি। যে দেশের সমাজে গৌরীদানে পুণ্যার্জনের ব্যবস্থা ছিল অথচ বিবাহ-বন্ধন যেখানে অবিচ্ছেদ্য, যেখানে কন্যা অযোগ্য পাত্রে অর্পিত হইলেও তাহার উপর মাতাপিতার কোন প্রভুত্ব ছিল না, সে দেশের মানুষের মনকে যে এই গীতগুলি সহজেই স্নেহ ও করুণ রসে সিক্ত করিবে, আর তাহা বিচিত্র কি ? কিন্তু এই বাৎসল্যরস-সিক্ত পদগুলির একটি সর্বকালিক মানবিক আবেদনও আছে, তাই এই পদগুলি আজও এমন করুণ, এমন মর্মস্পর্শী। আগমনীর গানে মিলনের ক্ষণস্থায়ী আনন্দের মধ্যে আসন্ন বিরহের ছায়া ঘনীভূত হইয়া উঠে, আবার বিজয়ার গানে বিচ্ছেদের অশ্রুজলের মধ্যে পুনর্মিলনের আশ্বাস ক্ষীণ রৌদ্রচ্ছটার মতো ঝিকমিক করিয়া উঠে। বলরাম দাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণও বাৎসল্য রসের গান গাহিয়াছেন কিন্তু বলরাম ও সখাগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকে গোষ্ঠে পাঠাইয়া মাতা যশোমতীর অন্তর যে বেদনায় কাতর হয়, সে বেদনার সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কোন যোগ নাই। কিন্তু কন্যার সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য মাতা মেনকার মনে যে উৎকণ্ঠা, কন্যার দুঃখে যে উদ্বেগ ও কন্যার বিচ্ছেদে তাঁহার যে কাতরতা, তাহা আমাদের হৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করে। তথাপি, আগমনী ও বিজয়ার গানে আমরা যে রস আস্বাদন করি, উহা গৃহকেন্দ্রিক হইলেও উহার আধ্যাত্মিক তাৎপর্যকেও আমরা অস্বীকার করিতে পারি না।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কবি-দৃষ্টিতে শরৎ ঋতুর মধ্যে গৌরী শারদাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। 'শরৎ' প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—

'মাটির কন্যার আগমনীর গান এই তো সেদিন বাজিল। মেঘের নন্দী-ভৃঙ্গী শিঙ্গা বাজাইতে বাজাইতে গৌরী শারদাকে এই কিছু দিন হইল ধরা-জননীর কোলে রাখিয়া গিয়াছে। কিন্তু বিজয়ার গান বাজিতে আর তো দেরি নাই ; শ্মশানবাসী পাগলটা এল বলিয়া ; তাকে তো ফিরাইয়া দিবার জো নাই ; হাসির চন্দ্রকলা তার ললাটে লাগিয়া আছে, কিন্তু তার জটায় জটায় কান্নার মন্দাকিনী'।

রামপ্রসাদের ভাষা অলঙ্কার-প্রয়োগ

রামপ্রসাদের ভাষা ও ছন্দে তাঁহার স্বকীয়তার পরিচয় সুস্পষ্ট। মর্তের ধূলিমাটিকে রামপ্রসাদ উপেক্ষা করেন নাই, এই ধূলিমাটিকে আশ্রয় করিয়াই তিনি আমাদের মনকে দিব্যধামের দিকে আকর্ষণ করিয়াছেন। আবার যে ভাষায় রামপ্রসাদ গান গাহিয়াছেন, সে ভাষাও আমাদের চির-পরিচিত। দ্বিজ চণ্ডীদাসের মতো রামপ্রসাদ-সম্পর্কেও বলা চলে, 'হৃদে ভাব ওঠে, মুখে ভাষা ফোটে'। এইজন্যই রামপ্রসাদের গান সকল স্তরের বাঙালীর অন্তরকে এমন নিবিড়ভাবে স্পর্শ করিয়াছে। যে সুরে রামপ্রসাদ অধিকাংশ গান গাহিয়াছেন, উহা 'প্রসাদী সুর' নামে পরিচিত। রামপ্রসাদের পরেও বাঙলা দেশে বহু সাধক ও সিদ্ধ পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে উৎকৃষ্ট সঙ্গীতও রচনা করিয়াছেন তথাপি শাক্ত পদাবলীর রচয়িতা হিসাবে রামপ্রসাদ বাঙলা সাহিত্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

উপমা প্রভৃতি অলঙ্কারের প্রয়োগেও রামপ্রসাদের একটি বৈশিষ্ট্য আমরা লক্ষ্য করি। রামপ্রসাদ এ বিষয়ে কোন পূর্বগামী কবির পদাঙ্ক অনুসরণ করেন নাই, আপন অভিজ্ঞতার উপরেই নির্ভর করিয়াছেন। মহাকবি কালিদাসের ন্যায় বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস প্রভৃতি পদকর্তাগণ উপমা-প্রয়োগে অসাধারণ নিপুণতা প্রদর্শন করিয়াছেন কিন্তু তাঁহারা সকলেই প্রাক্তন সুরিগণের নিকট ঋণী। রামপ্রসাদও উপমা, রূপক প্রভৃতি নানা অলঙ্কারের প্রয়োগ করিয়াছেন কিন্তু নিজ জীবনের বিপুল অভিজ্ঞতাই এ বিষয়ে তাঁহার সহায় হইয়াছে। রামপ্রসাদ একটি সুপ্রসিদ্ধ গানে কেমন চমৎকার উপমা ও রূপকের সাহায্যে মনের ভাবটি প্রকাশ করিয়াছেন—

> 'মা আমায় ঘুরাবি কত,
> কলুর চোখঢাকা বলদের মতো,
> ভবের গাছে বেঁধে রেখে মা পাক দিতেছ অবিরত,
> এবার খুলে দাও মা চোখের ঠুলি হেরি মা তোর অভয় পদ।'
> ইত্যাদি।

রামপ্রসাদ সম্পর্কে অধ্যাপক শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমাদের প্রণিধানযোগ্য।

'রামপ্রসাদের সংসার-চিত্রের মধ্যে ... অবাস্তবতা ও দৃষ্টিবিভ্রমের মরীচিকা নাই। ... তিনি হিসাবের বইয়ে কালীনাম লেখেন; জগদীশ্বরী কন্যারূপে তাঁহার বাড়ীর বেড়া বাঁধিতে সাহায্য করেন। ... আদালতের পিয়াদা যখন তাঁহার উপর ডিক্রিজারী করিতে আসে, তখন তাহার তকমার উপর কালীনামের

শীলমোহর অঙ্কিত থাকে। সংসারের শত তুচ্ছ অভাব-অভিযোগ, পীড়ন-অপমানের রন্ধ্রপথ দিয়া তিনি কালীর কল্যাণহস্তের স্পর্শ অনুভব করেন। জীবনের খেলাধূলা, ক্রীড়াকৌতুক সবই তাঁহার কাছে অধ্যাত্মলোকের দ্বার উন্মুক্ত করে। পাশাখেলায় এক অদৃশ্য হস্ত তাঁহার দান উলটাইয়া দেয় ও পাকা ঘুঁটিকে কাঁচা করে ও কাঁচাকে পাকাইয়া দেয়। মন-ঘুড়ি কালীপদ-আকাশের ঊর্ধ্বলোকে উড়িতে উড়িতে হঠাৎ কু-বাতাসের ঝাপটায় পৃথিবীর কাছাকাছি নামিয়া আসে ও আবিল বায়ুস্তরে মাথা লুটাইয়া পড়ে। কৃষিকর্মরত কৃষককে দেখিয়া অকস্মাৎ তাঁহার মনে জাগে যে, স্বর্ণপ্রসূ মানব-জীবন অকর্ষিত রহিয়া গেল এবং চাষের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার রূপকে সাধনার সমস্ত ক্রমগুলি তাঁহার মনে পুনরাবৃত্ত হয়। চোখে-ঠুলি-আঁটা কলুর বলদ তাঁহাকে অনিবার্য ভাবে মোহান্ধ, প্রবৃত্তি-তাড়িত মানব-জীবনের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। জেলের জাল ফেলায় মৎস্য-কুলের আকুলতা মহাকালের পাশবদ্ধ হইবার জন্য অসহায়ভাবে প্রতীক্ষমান মানবের করুণ চিত্রটি তাঁহার মনে ফুটাইয়া তোলে। সুতরাং রামপ্রসাদের ভক্তিসাধনার পদগুলিতে বাঙলা গ্রামীণ চিত্রের সমগ্রতা প্রতিবিম্বিত হইয়াছে।' (অধ্যাপক শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য রচিত 'ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ' গ্রন্থ-পরিচিতি দ্রষ্টব্য।

বাস্তবিক, রামপ্রসাদ চোখ মেলিয়া বাহিরের জগৎকে দেখিয়াছেন এবং ভাগবত-বর্ণিত অবধূতের ন্যায় সর্বত্রই শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতেই গানের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। বাঙলা কাব্যে অলঙ্কারের প্রয়োগে যে গতানুগতিকতা দেখা দিয়াছিল, তিনি উহার বন্ধন হইতে সঙ্গীতকে মুক্তি দান করিয়া উহার মধ্যে এক নূতন প্রাণবেগের সঞ্চার করিয়াছেন। রূপকালঙ্কারের প্রয়োগেও রামপ্রসাদের বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়, যথা—

ডুব দে রে মন কালী বলে,
হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে,
রত্নাকর নয় শূন্য কখন দু'চার ডুবে ধন না পেলে,
তুমি দম-সামর্থ্যে এক ডুবে যাও কুলকুণ্ডলিনীর কূলে,
কামাদি ছয় কুম্ভীর আছে আহার লোভে সদাই চলে,
তুমি বিবেক-হল্‌দি গায় মেখে যাও ছোবে না তার গন্ধ পেলে।

ইত্যাদি।

শুধু ভাবের গভীরতার জন্যই নয়, ভাষা ও অলঙ্কারের এই বৈশিষ্ট্যের জন্যও রামপ্রসাদ আমাদের প্রাণের কবি, 'আত্মার আত্মীয়'। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা

সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র যাহা বলিয়াছেন, তাহা রামপ্রসাদের গানের সম্পর্কে অধিকতর প্রয়োজ্য, বাস্তবিকই এই গানগুলি 'মায়ের প্রসাদ'। আজ বাঙলা সাহিত্যের যজ্ঞশালায় যতই মহাভোজের আয়োজন হউক না কেন, এই 'মায়ের প্রসাদে'র মর্যাদা এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয় নাই, কোন দিন ক্ষুণ্ণ হইবারও নহে। বাস্তবিক রামপ্রসাদ বাঙলা দেশে শাক্ত পদাবলীর যে পাবনী ধারা প্রবাহিত করিয়াছেন, সে ধারায় অবগাহন করিয়া বাঙালী ধন্য হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের গদ্য কবিতা ও 'পুনশ্চ'

রবীন্দ্রনাথই যে বাঙলা সাহিত্যে গদ্য কবিতার প্রথম স্রষ্টা—সে সম্পর্কে আজ আর কোনরকম মতবিরোধ নেই। কেননা, তাঁর আগে কাব্য-রচনার এই মাধ্যমটি ঠিক অনাবিষ্কৃত না থাকলেও—চলতি ছিল না। কবির মনোভাবের উপযোগী বাহন কবি নিজেই বের করে নেবেন—এবং তাঁর জন্যে স্বৈরাচার ও সেই স্বেচ্ছাচারিতার নিন্দা বা প্রশংসাকে সমানভাবে উপেক্ষা করে নিজের সৃষ্টির প্রতি একনিষ্ঠ হবেন—এ রকম চেতনা নিয়ে গদ্য কবিতা রচনা দেখা যায় নি। মিলহীন পয়ারের ঢঙকেই প্রাক্-রবীন্দ্রযুগে গদ্য কবিতা বলার রেওয়াজ ছিল। কিন্তু আজকাল গদ্য কবিতার একটা নির্দিষ্ট সংজ্ঞা সঠিকভাবে নির্ধারিত না হলেও গদ্যরীতির কবিতা সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা পাঠক মহলে চলিত হয়েছে, তাই 'গদ্য কবিতা' বললে ব্যঙ্গ করে 'গবিতা'—(যা কিছুদিন আগেও সংরক্ষণশীল পাঠক মহলের বিরক্তি ও ঘৃণার বস্তু ছিল)—এই নামটি শোনা যায় না। এমন কি পাঠক আজ সহজেই মিলহীন পয়ার এবং গদ্য কবিতার পার্থক্য পর্যন্ত ধরে নিতে সক্ষম হয়েছে।

আজকাল সকলেই স্বীকার করে নিয়েছেন যে কাব্যের লালিত্য যখন গদ্যের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, অথচ কাব্যিক সুষমা ও দীপ্তির এতটুকু অপচয় ঘটে না—তখন তাকে গদ্যকাব্য বলা যেতে পারে। গদ্য কবিতায় ছন্দের সুরঝঙ্কার—যা অভাবিতপূর্ব মিলের আস্বাদনে মাধুর্যের সৃষ্টি করে—তা অনুপস্থিত থাকে, কিন্তু গদ্যের রুক্ষতা বা পৌরুষদীপ্ত গাম্ভীর্য এবং অসংযম অনুপস্থিত থাকে, বরং শব্দ সংস্থাপন এমনই সুষমাযুক্ত হয়—যাতে গদ্যেরও একটা ছন্দের ছাঁচ পাঠকমনকে তৃপ্ত করে রাখে।

যে বক্তব্য সহজ সুরে ও ললিত ছন্দে বলা চলে না, যার জন্যে পরিমিত অথচ স্বচ্ছন্দ প্রকাশনার মাধ্যম দরকার—এমন কবিতা প্রকাশের জন্যেই গদ্যকাব্যের

ভাষার প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ নিজেও বলেছেন—"গদ্য কথাবার্তার ভাষা, কবিতার বক্তব্য তাতে বলবার জো নেই; ভাষার যে একটুখানি আড়াল কাব্যে মাধুর্য জোগায়, গদ্যে তার অভাব; গদ্য হচ্ছে কথার ভাষা, খবর দেবার ভাষা। যে ভাষা সর্বদা প্রচলিত নয়—তার মধ্যে যে একটা দূরত্ব আছে—তার প্রয়োগে কাব্যের রস জমে উঠে। অধুনা 'শেষ সপ্তক' প্রভৃতি গ্রন্থে আমি যে ভাষা, ছন্দ প্রয়োগ করেছি—তাকে গদ্য বিশেষণে অভিহিত করা হয়েছে। গদ্যের সঙ্গে তার সাদৃশ্য আছে বলে কেউ কেউ তাকে বলেছেন গদ্যকাব্য, সোনার পাথরবাটি। আমি বলি, যাকে সচরাচর আমরা গদ্য বলে থাকি সেটা আর আমার আধুনিক কাব্যের ভাষা এক নয়, তার একটা বিশেষত্ব আছে, যাকে আমার মন কাব্যের ভাষা বলে স্বীকার করে নিয়েছে। এই ভঙ্গীতে আমি যা লিখেছি আমি জানি। তা অন্য কোনও ছন্দে বলতে পারতুম না।"

কবিগুরুর 'শেষসপ্তক' গ্রন্থখানিই উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক। কবি প্রায় পঁচাত্তর বছর বয়সের সময়—কি তার কিছু আগে এই গ্রন্থটি রচনা করেন। এখনও তাঁর সৃষ্টিশক্তি অম্লান। এই গ্রন্থে তিনি অধ্যাত্মজিজ্ঞাসায় চঞ্চল হয়ে উঠেছেন—মহাবিশ্বজীবনের পটভূমিতে আত্মানুসন্ধান এবং আত্মদর্শনই 'শেষসপ্তকে'র মোদ্দা কথা। মৃত্যু যতই নিকটে আসছে, কবি ততই আপন সত্যপরিচয়টুকু জানার জন্যে ব্যগ্র হয়ে উঠেছেন। এই ব্যগ্রতা যদি পূর্বপরীক্ষিত বা প্রচারিত ছন্দের মাধ্যমে তিনি ঘোষণা করতেন—তবে তাঁর বক্তব্য কিছুটা তরল হয়ে পড়তো। বিশ্বজীবনের চিরপ্রবহমান স্রোতোবেগের সঙ্গে নিজের জীবনচেতনাকে একীভূত করে কবি বিশ্বের পটভূমিতে নিজের আত্মার স্বরূপ জানতে চান, সেই ব্যাকুলতা—যা শান্ত অথচ গম্ভীর—তার প্রকাশের মাধ্যম কখনই চটুল হবে না। কবি সন্ন্যাসীরূপী মহাকালের কাছে নিরাসক্তির মন্ত্রে দীক্ষিত হবার জন্যে প্রার্থনা জানাচ্ছেন—একে তো উচ্ছলভাবে ছন্দান্বিত সুরে ব্যক্ত করা যায় না।

শুধু এই গ্রন্থ প্রসঙ্গে নয়—রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সাহিত্য আলোচনা করলে একটা জিনিস সহজেই চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠে; সে হচ্ছে এই যে, তিনি যখন যে কথা বলতে চেয়েছেন—তা উপযুক্ত মাধ্যমেই বলেছেন, ফলে বর্ণনা ও রূপকল্পের দিক থেকে তা অনবদ্য হয়েছে।

কবিতায় রবীন্দ্রনাথ গদ্যচ্ছন্দের প্রথম ব্যবহার করেন 'পরিশেষ' কাব্যগ্রন্থে। কিন্তু 'পুনশ্চে' আছে 'শিশুতীর্থ' নামে যে কবিতাটি—এক হিসেবে সেটিই রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্য কবিতা। 'The Child' নামে একটা কবিতার ভাবানুবাদ

করেন কবি—'পরিশেষ' গ্রন্থ লেখার আগে, এবং শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বিচিত্রা' কাগজের ১৩৩৮ সালে ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিতও হয়। এরপর কবিতাটির কিছু মাজাঘষা চলে এবং অভিনয় ও নৃত্যাভিনয়ের মধ্যে দর্শক-সমাজে ঐ কবিতাটি যাতে পরিবেশিত করা যায়—তার চেষ্টা হল; বলা বাহুল্য 'শিশুতীর্থে'র কয়েকটি অভিনয়ও হয়। এ সবের পর ঐটি কিছু রূপান্তরিত হয়ে 'পুনশ্চে' স্থান পায়। কিন্তু 'পরিশেষে'র কবিতার আগেই ওটি লিখিত।

এরও আগে তো 'লিপিকা'র কাব্যধর্মী গদ্য। 'লিপিকা'র গদ্যে লিরিক রস আমদানি করে কাব্যসুষমায় তিনি তা মণ্ডিত করতে চেয়েছিলেন; ছন্দের ঝঙ্কারে না গেঁথে বাঙলা গদ্যকে কবিতার রসে জারিয়ে তোলা যায় কিনা সেই পরীক্ষার উদ্দেশ্যেই কবি 'লিপিকা'র কয়েকটি কাব্যধর্মী গদ্য রচনা করেন। আর সেগুলিকে গদ্যের রূপে রাখার যুক্তি হিসেবে কবি ঈষৎ রসিকতা করে বলেছেন যে, ভীরুতাবশত তিনি ওগুলিকে পদ্যের ছাঁচে বসাতে পারেন নি। কিন্তু পরে তিনি 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় স্বীকার করেছেন যে, গদ্যকাব্যে অতি-নিরূপিত ছন্দের বাঁধন ভেঙে দেওয়াই যথেষ্ট নয়, পদ্যকাব্যে ভাষায় ও প্রকাশ-রীতিতে যে একটা সলজ্জ সসজ্জ অবগুণ্ঠনপ্রথা আছে তাও দূর করলে তবেই গদ্যের স্বাধীনক্ষেত্রে তার সঞ্চরণ স্বাভাবিক হতে পারে। অসঙ্কুচিত গদ্যরীতিতে কাব্যের অধিকারকে অনেক দূর বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব। ছন্দকে রবীন্দ্রনাথ কখনই কাব্য বলেন নি, রসের পরিচয়েই কাব্যের কৌলীন্য। 'পরিশেষ' গ্রন্থ-পরিচয়ে তিনি গদ্যকাব্যের হয়ে বেশ খানিকটা ওকালতি করে বলেছেন যে, গদ্যের মাধ্যমে কাব্যের সঞ্চরণ অসম্ভব নয়। গদ্যকাব্যের মধ্যে একটা সহজ প্রাত্যহিক ভাব আছে; হয়তো সজ্জা নেই, কিন্তু রূপ আছে এবং সেইজন্যেই তাদেরকে সত্যকার কাব্যগোত্রীয় বলে মনে করি।

'পরিশেষে'ই আমরা যথার্থ গদ্য কবিতা পেলাম কবির কাছ থেকে। ইতিমধ্যে নানা পত্রে বা ছোটখাটো দু-একটি প্রবন্ধে এবং 'বাঙলাকাব্য-পরিচয়' গ্রন্থের ভূমিকায় কবি গদ্যকবিতা সম্পর্কে তাঁর মনোভাব স্পষ্ট করে প্রকাশ করেছেন। তাই 'পরিশেষে'র 'খ্যাতি', 'বাঁশি', 'উন্নতি', 'পত্রলেখা', 'আগন্তুক', 'আঘাত', 'বোবার বাণী' ইত্যাদি কবিতাগুলি গদ্য কবিতার প্রাথমিক কিন্তু সার্থক নিদর্শন। 'বাঁশি' কবিতার আর নিদর্শন দেওয়ার প্রয়োজন নেই। 'পত্রলেখা' কবিতা থেকে একটু উদাহরণ দেওয়া গেল—

বলে গিয়েছিলে তুমি, চিঠি লেখা চাই
একদিন পরে পরে ॥

লিখতে বসেছি চিঠি,
সকালেই স্নান হয়ে গেছে।
লিখি যে কী কথা নিয়ে কিছুতেই ভেবে পাই নে তো।
একটি খবর আছে শুধু—
তুমি চলে গেছ।
সে খবর তোমারো তো জানা।
তবু মনে হয়,
ভালো করে তুমি সে জান না।
তাই ভাবি, এ কথাটি জানাই তোমাকে
তুমি চলে গেছ।
যতবার লেখা শুরু করি
ততবার ধরা পড়ে, এ খবর সহজ তো নয়।

প্রোষিতভর্তৃকার এই গভীর বেদনা সামান্য একটি খবর আবিষ্কারের মধ্যে কি নিবিড়ভাবে না ধরা পড়েছে এই গদ্যকাব্যে। ছন্দের চটুল ঝঙ্কারে কি এই বেদনাটুকু আরও বেশী করে সঞ্চারিত করতে পারা যেত? সুপুরুষের সৌন্দর্য অনাড়ম্বর পোশাকেও অম্লান থাকে।

'পুনশ্চে'র ভাব নতুন; তাঁর কাব্যজীবন একটি নতুন দিকে মোড় নিয়েছে—তাই তিনি তৎক্ষণাৎ তাকে নতুন বিন্যাসে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। তিনি ছন্দের রাজা—তবু তাঁর মনের বর্তমান ভাবকে ব্যক্ত করার উপযোগী মাধ্যম হিসেবে পদ্যের সসজ্জ সলজ্জ অবগুণ্ঠনকে তিনি খসিয়ে ফেললেন—কাব্যের অধিকারকে প্রসারিত করে দিলেন। 'পুনশ্চে' কবি উচ্চ থেকে তুচ্ছে এসেছেন; পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ এবং লোকপ্রিয় সুন্দরতম ঐশ্চর্য থেকে ক্ষুদ্র এবং দরিদ্র বাস্তব পরিবেশে কবির মানসভ্রমণ ঘটেছে—আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভাষার বিলসিত অলঙ্করণ সজ্জা ছেড়েছেন—ছন্দোবন্ধের ললিত মধুর নৃত্য পরিহার করেছেন—বিষয়ের উপযোগী করে ভাষাকে বিচরণ করার জন্যে তিনি পদ্যরীতির রাজ্য থেকে সরিয়ে এনে গদ্যরীতির এক নূতন জনপদ বানিয়ে দিয়েছেন। এই ছন্দ গদ্যও নয়, পদ্যও নয়। বাক্যের অন্বয় গদ্যধর্মী নয়, কর্তা, কর্ম, ক্রিয়া বা বিধেয়াংশের যোজনা গদ্যানুসারী নয়, আবার পদ্যের যে যতিস্থাপনা—তাও অনুপস্থিত, অথচ ছন্দের প্রচ্ছন্ন মসৃণ ও ললিত একটা বেগ আছে। এই গদ্য-কাব্যে ধ্বনি কিন্তু বেশ স্পষ্ট হয়েই অভিব্যক্ত হয়। 'পুনশ্চে'র কবিতাগুলির ছন্দ প্রসঙ্গে ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মশায় এক জায়গায় বলেছেন, "পর্বে পর্বে

সাজানো কথাগুলির মধ্যে অনতিস্ফুট ছন্দ-সৌন্দর্যের একটা মৃদু-মধুর আলোক উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। অথচ পদ্যের নিরূপিত ও পরিমিত ছন্দের দৃঢ় বন্ধন না থাকায় গদ্যের স্বাধীন ও অবাধ গতির ধারা অব্যাহত আছে। মনে হয়, এই প্রকার গদ্য-পদ্যের সমন্বয়ে কাব্য-রচনা কবির উদ্দেশ্য। তাঁহার নিজের কথায় 'পদ্য-ছন্দের সুস্পষ্ট ঝঙ্কার না রেখে, গদ্যে কবিতার রস দেওয়া'ই তাঁহার ইচ্ছা।"

বিষয়বস্তু অনুযায়ী যে কবি নিজের ভাব প্রকাশের ছন্দকে তৈরি করে নেন— তার একটি জলন্ত প্রমাণ 'পুনশ্চে'র 'কোপাই' পদ্য কবিতাটি।

শান্তিনিকেতনের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া পাহাড়ী কোপাই নদীর সঙ্গে কবি তাঁর নবোদ্ভাবিত গদ্য কবিতার সাদৃশ্য দেখেছেন—

কোপাই আজ কবির ছন্দকে আপন সাথী করে নিলে,
সেই ছন্দের আপস হয়ে গেল ভাষার স্থলে জলে,
যেখানে ভাষার গান আর যেখানে ভাষার গৃহস্থালি।

'পুনশ্চে'র আর একটা কবিতার উল্লেখ করা যাক। সেটি হচ্ছে 'নাটক' কবিতা। গদ্যছন্দের একটা স্পষ্ট কৈফিয়ত কবি এই কবিতায় গদ্যছন্দের মাধ্যমেই দিয়েছেন,—এই কথাটা কবি বছর কয়েক আগে 'তপতী' নাটক রচনা করবার পর শ্রীমতী রানী মহলানবিশকে জানিয়েছিলেন; 'নাটক' কবিতায় সেই কথাটাই বললেন—

বিষয়টা হচ্ছে আমার নাটক।
বন্ধুদের ফরমাস, ভাষা হওয়া চাই অমিত্রাক্ষর।
আমি লিখেছি গদ্যে।

পদ্য হল সমুদ্র,
সাহিত্যের আদিযুগের সৃষ্টি।
তার বৈচিত্র্য ছন্দতরঙ্গে
কলকল্লোলে।

গদ্য এল অনেক পরে।
বাঁধা ছন্দের বাইরে জমালো আসর।

... ...

সেই গদ্যে লিখেছি আমার নাটক,
এতে চিরকালের স্তব্ধতা আছে
আর চলতি কালের চাঞ্চল্য।

গদ্য কবিতা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা ধারণা প্রচলিত আছে যে গদ্য কবিতার মাধ্যমে রচনা সহজ। কিন্তু ব্যাপারটি ঠিক তা নয়, সত্যকার কবির পক্ষে ছন্দে কিছু সৃষ্টি করাই বরং সহজসাধ্য ব্যাপার, কারণ ভাব যখনই মনকে ভর করে, তখন তা ছন্দ নিয়েই আসে; কিন্তু গদ্যকাব্যে ছন্দের বন্ধন অনুপস্থিত থাকে, অথচ ভাবমূর্তিগুলি স্পষ্ট রূপ নিয়ে উচ্চকিত প্রকাশের বলিষ্ঠতায় নিজেদের উপস্থিতি ঘোষণা করে। সুতরাং কবি সুদক্ষ না হলে গদ্য কবিতা রচনা করতে পারবেন না, ভাঙা মিলহীন পয়ারের প্যানপ্যানানিকেই গদ্য কবিতা জ্ঞানে দুধের স্বাদ ঘোলেও নয়, জলে মেটাবেন।

গদ্য কবিতা যে মিলহীন পয়ার নয় এবং অলঙ্কৃত গদ্যও নয়—তা রবীন্দ্রনাথের যে কোন একটি গদ্য কবিতা পাঠ করলেই বুঝা যায়। 'পত্রপুটে'র 'দুই নারী' কবিতার একটুখানি অংশ মনে পড়ছে—

সেই ভালোবাসার একটা ধারা
ঘিরেছে তাকে স্নিগ্ধ বেষ্টনে
গ্রামের চিরপরিচিত অগভীর নদীটুকুর মতো।

আর একটি কবিতা স্মরণ করা যাক—

দাও আমাকে ছুটি—
জীবনের কালো সাদা সূত্রে গাঁথা
সকল পরিচয়ের অন্তরালে,
নির্জন নামহীন নিভৃতে;
নানা সুরের নানা তারের যন্ত্রে
সুর মিলিয়ে নিতে দাও
এক চরম সঙ্গীতের গভীরতায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠিকই জানতেন যে কাব্যের আসল দেহবস্তু রস—তা অনির্বচনীয় উপভোগ মাত্র, তার উপরই কাব্যের দোষগুণ বিচার্য। কবি নিজেও একটা চিঠিতে বলেছেন—গদ্যকাব্য জোরে পা ফেলে চলতে পারে, সেটা সযত্নে নেচে চলার চেয়ে সব সময় নিন্দনীয়—তা নয়। নাচের আসরের বাইরে আছে এই উঁচু নিচু বিচিত্র বৃহৎ জগৎ রূঢ় অথচ মনোহর, সেখানে জোর চলাটাই মানায় ভালো—কখনও ঘাসের উপর, কখনও কাঁকরের উপর দিয়ে।

রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি বলে কি না জানি না—তিনি গদ্য কবিতার হয়ে সর্বত্র আন্তরিক ওকালতি করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও একটা কথা এক-আধবার যে আমাদের মনে আসে না—এমন নয়; সে কথাটি হল এই যে গদ্য কবিতার মধ্যে

কবির অন্তরের সহজ বা স্বচ্ছ প্রকাশ যতই অনাড়ম্বর হোক, কিন্তু তাতে অপরূপ চারুত্ব নেই। ছন্দোবিন্যাসের বা অভাবিত মিলের যে অনির্বচনীয়ত্ব—তার যেন একটু ঘাটতি থেকে যায় বলে মনে হয়। কেউ কেউ বলেছেন—রবীন্দ্রনাথের গদ্য কবিতায় 'গভীর কল্পনার বিস্ময়কর লীলা নাই। ইহারা Inspired moment-এর অনবদ্য দান নয়।'

'পরিশেষে'র কিছু কবিতা থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ 'পুনশ্চ', 'শেষ সপ্তক', 'পত্রপুট' এবং 'শ্যামলী'তেই গদ্যচ্ছন্দের কবিতা লিখেছেন। অর্থাৎ শেষ জীবনের যে সব উপলব্ধি এবং অনুভূতি, তাই এখানে লিপিবদ্ধ আছে। রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তায় তখন দার্শনিকতার ঘোর লেগেছে। বিশ্বসৃষ্টিরহস্য, মানবসত্তার রহস্য, ভগবদ্রহস্য—সব কিছুই তিনি দার্শনিক মননের আবেগে প্রকাশ করেছেন। এর সঙ্গে মিশেছে তাঁর আত্মজিজ্ঞাসা এবং আত্মবিশ্লেষণ। সমুন্নত কল্পনার প্রলেপে সংহত ভাবের প্রকাশনায় এই গ্রন্থগুলির একটা স্বতন্ত্র মর্যাদা; তাই এখানকার চিন্তাতে কবি দীর্ঘায়ত চরণে ছোট ছোট ছন্দতরঙ্গের উদ্ঘাত সৃষ্টি করেছেন—গদ্য কবিতার মাধ্যমে। উপযুক্ততার দিক থেকে এই ছন্দ অনবদ্য, কিন্তু কাব্যের চমৎকৃতির দিক থেকে এগুলিকে ভাবের উপরে রূপলোকে স্থান দেওয়া চলে না।

গদ্য কবিতার মধ্যে যেন কবি রবীন্দ্রনাথের চেয়ে দার্শমিক রবীন্দ্রনাথের পরিচয় বেশী করে পাওয়া যায়।

গদ্য কবিতার বইগুলির মধ্যে 'শেষ সপ্তক'ই শ্রেষ্ঠ—সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। 'পুনশ্চে'র অনেক কবিতায় যেমন কবি ভাবকে পরিস্ফুট করতে গিয়ে উপমা উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারের ঋণ স্বীকার করেছেন—তারা যেন সহজে কবির কাছে আসে নি, কবি যেন চেষ্টা করে উপমা সাজিয়েছেন মনে হয়, 'শেষ সপ্তকে' তেমন কাণ্ড ঘটে নি। দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ কবি রবীন্দ্রনাথেরই ক্রমপরিণত ফসল—তা বুঝতে এতটুকু কষ্ট হয় না। 'শেষ সপ্তকে' কবি যখন বলেন—

কবে প্রকাশ হবে পূর্ণ,
আপনি প্রত্যক্ষ হব আপনার আলোতে,
বধূ যেমন সত্য ক'রে জানে আপনাকে,
সত্য করে জানায়,
যখন প্রাণে জাগে তার প্রেম,
যখন দুঃখকে পারে সে গলার হার করতে,
যখন দৈন্যকে দেয় সে মহিমা,
যখন মৃত্যুতে ঘটে না তার অসমাপ্তি।

তখন কবি নিজের পরিচয়কে সহজ করে উন্মুক্ত করতে পারেন—এবং গদ্য ঢঙে এইভাবে বলার জন্যে কবির দার্শনিক মননটুকুও সহজে উপলব্ধ হয় পাঠকচিত্তে।

'পত্রপুটে'র কবিতাগুলির প্রত্যেকটি চরণ খুব বেশী দীর্ঘ হয়ে পড়েছে; ফলে গতি একটু ধীর ও শ্লথ হয়েছে; অথচ বিষয়বস্তু গভীর চিন্তার জরিতে মোড়া, দেহশিল্পের কারুকার্য তৈরী হয়েছে সংস্কৃত তৎসম শব্দের প্রাচুর্যে। যেমন—

যুগে যুগে যে মানুষের সৃষ্টি প্রলয়ের ক্ষেত্রে
সেই শ্মশানচারী ভৈরবের পরিচয়জ্যোতি
ম্লান হয়ে রইল আমার সত্তায়;
শুধু রেখে গেলেম নতমস্তকের প্রণাম
মানবের হৃদয়াসীন সেই বীরের উদ্দেশে—
মর্তের অমরাবতী যাঁর সৃষ্টি
মৃত্যুর মূল্যে, দুঃখের দীপ্তিতে।

যে গভীর চিন্তার কথা এখানে বিধৃত—তা কিন্তু ছন্দের আঘাতের অভাবের জন্যে একটু মন্থর ঠেকে—অন্তত গতির দিক থেকে।

'শ্যামলী'তে ভাব আর ভাষার মেলবন্ধন নিখুঁত নয়—কেননা ভাষা কোথাও কোথাও বেশী রকম গদ্যের দাসত্ব করেছে বলে মনে হয়। আর ভাবও খুব গাঢ়ভাবে বিন্যস্ত হতে পারে নি। কিন্তু 'শেষ সপ্তকে' এমন কাণ্ড কোথাও ঘটে নি। ভাবের উপযোগী ভাষা আপনা থেকেই কবির কলমে এসেছে। 'শেষ সপ্তকে'র এক গদ্য কবিতার একটুখানি অংশের উল্লেখ করে আমি এ প্রবন্ধের উপসংহার করি, যেখানে মৃত্যু সম্পর্কে কবি তাঁর এই পলব্ধি ব্যক্ত করছেন যে, মৃত্যু জীর্ণ পুরাতনকে ধ্বংস করে নতুন জ বনের ধারাকে প্রবর্তন করে—

আমি মৃত্যু-রাখাল
সৃষ্টিকে চরিয়ে চরিয়ে নিয়ে চলেছি
যুগ হতে যুগান্তরে
নব নব চারণ-ক্ষেত্রে।
যখন বইল জীবনের ধারা
আমি এসেছি তার পিছনে পিছনে,
দিই নি তাকে কোনো গর্তে আটক থাকতে।
তীরের বাঁধন কাটিয়ে কাটিয়ে
ডাক দিয়ে নিয়ে গেছি মহাসমুদ্রে,
সে সমুদ্র আমিই।

ছোটগল্প ও রবীন্দ্রনাথ

ছোটগল্প কি—তার সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা দেওয়া একটু মুশকিল। আয়তনের দিক থেকে মোটামুটি বলা হয় যে, এক অধিবেশনে পড়া যায় এমন আকৃতির গল্পকে ছোটগল্প বলা হয়। এমন ছোটগল্প আছে পৃথিবীতে যা মাত্র দুটি অক্ষরের ব্যঞ্জনায় ফুটে উঠেছে, আবার একাধিক ফর্মায় বিস্তৃত হয়েও ছোটগল্প রূপ লাভ করেছে। তাই আয়তনিক বিস্তৃতি ছোটগল্পের চরিত্রধর্মকে নির্দিষ্ট করতে পারে না।

ছোটগল্পের মূল বৈশিষ্ট্য বা চরিত্র হল এর আঙ্গিক এবং মূল বক্তব্য উপস্থাপনার কৌশলের উপর তা নির্ভরশীল। একটি মাত্র বিষয় বা চরিত্র বা উপলব্ধির একমুখী গাঢ়বন্ধ বিন্যাস বা রূপায়ণের নামই হল ছোট গল্প। যেটি লেখকের বক্তব্য, তিনি তা থেকে সরে যাবেন না—প্রয়োজনমত উপকাহিনী বা উপচরিত্রের ভিড় থাকবে, কিন্তু প্রধান উপজীব্য বিষয়কেই শুধু উজ্জ্বল করবে।

বিজ্ঞানসম্মত ছোটগল্প রচনার ক্ষেত্রে প্রথম সার্থক শিল্পী হলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর আগে রসসমন্বিত ছোটগল্প দেখা যায় না। জীবনের একটি খণ্ডাংশকে সাহিত্যিয় ব্যঞ্জনায় অপূর্বতা দান করে যে রস-পরিবেশন—এবং নতুন করে জীবনের সামাজিক মূল্যায়ন—তা রবীন্দ্রনাথের আগে ছোটগল্পের ছোট আয়তনের মধ্যে দেখা যায় নি। এখানে প্রসঙ্গক্রমে বললে বোধ হয় অন্যায় হবে না যে, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সীমানায় বিধৃত ছোটখাটো অনুভূতি উপলব্ধি নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য সৃষ্টি করেন নি। তাঁর সাহিত্য বৃহত্তর জাতিগত চেতনায় উজ্জ্বল এবং উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্পে সামাজিক এবং দৈনিক জীবনের ভগ্নাংশকে উজ্জ্বলতা দান করেছেন। ছোট্ট জীবনের পরিধিতে মানুষের যে সব বিক্ষোভ ও বেদনা—রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্পে সেগুলির রূপদান করেছেন। বিচিত্র দুঃখ-বেদনায় পীড়িত যে জীবন সামাজিক পটভূমিতে আবর্তিত, রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্পে সেই জীবনকে মহিমান্বিত করেছেন।

আমাদের সামাজিক জীবনের তলদেশে যে নিভৃত ফল্গুধারাটি প্রবাহিত—রবীন্দ্রনাথ সেই নিস্তরঙ্গ স্রোতোরেখাটি ছোটগল্পে তুলে ধরেছেন। ঘরের কোণে, নদীর ঘাটে, সহস্র তুচ্ছ পরিচিত স্থানে ও আবেষ্টনে কত সহস্র তুচ্ছ ঘটনা খুঁটিনাটিকে উপলক্ষ করে আমাদের জীবনে বিচিত্র আশা-আকাঙ্ক্ষা অবিরত স্পন্দিত হচ্ছে, অসংখ্য ক্ষুদ্র বিক্ষোভে আন্দোলিত হচ্ছে। আমাদের বৈচিত্র্যহীন বহির্জীবন সেখানে বৈচিত্রে ভরপুর, আবেগে চঞ্চল—সেখানে তার কোন দৈন্য

নেই। রবীন্দ্রনাথ সুগভীর কবিদৃষ্টি দিয়ে আমাদের জীবনের এই নিভৃত গোপন প্রবাহটি আবিষ্কার করেছেন ছোটগল্পে। পল্লীজীবনের নানা বেদনা এবং আনন্দও কবির মনকে অধিকার করে বসেছে।

সামাজিক সমস্যাকে শুধু রূপদান করে তার প্রতিবিধানের প্রতি মনোযোগ দেবার জন্যেই আজকের অনেক গল্পকার কলম ধরেছেন, রবীন্দ্রনাথ এ জাতীয় কিছু রচনা করেন নি। বৃহত্তর মানব-সমাজের দৈনন্দিন জীবনের চিন্তা নিয়েও তিনি ছোটগল্পে মাথা ঘামান নি। কিন্তু সমগ্র মানব-সমাজের চিরন্তন মানবতা নিয়ে, বিশ্বমানুষের স্থায়ী অনুভূতি নিয়ে তিনি কারবার করেছেন, তাই তাঁর ছোটগল্পগুলি এক একটি হীরকখণ্ডের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। ছোটখাটো বেদনা, বিচিত্র ভাবাবেগের মধ্যে এক সৌন্দর্য ও রসের আনন্দলোক সৃষ্টি হয়েছে। বড় কথা নেই, কিন্তু ছোট বেদনাকে চিরন্তন করার কৌশল আছে। সহজ ও সাধারণ জীবনের অতি ছোট্ট অনুভূতিগুলি কবি বিমুগ্ধ বিস্ময়ে বিপুল শ্রদ্ধায় ও অসীম বিশ্বাসে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছেন। ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়ও বলেছেন—"রবীন্দ্রনাথের জন্ম যদিও অভিজাত পরিবারে, কৈশোর ও যৌবন কাটিয়াছে আভিজাত্য ও সম্পদের আবেষ্টনের মধ্যে, তাহা হইলেও তাঁহার মনন-কল্পনা আশ্রয় করিয়াছে বাঙলা দেশের মধ্যবিত্ত সমাজকে। সুতরাং আশ্চর্য হইবার কারণ নাই যে ছোটগল্পগুলিতে যাহাদের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনার ইতিহাস রূপায়িত হইয়াছে, তাহারা কেহই আভিজাত্য ও অর্থসমৃদ্ধির দিক হইতে তাঁহার নিজের শ্রেণীভুক্ত নয়। অথচ রবীন্দ্রনাথ কোনদিনই সজ্ঞানে কিছু শ্রেণীবোধমুক্ত ছিলেন না; তাঁর প্রয়োজনও হয়তো তিনি বোধ করেন নাই। কারণ শ্রেণী, সমাজ, ধর্ম, বর্ণ প্রভৃতি মানবরচিত সীমার বাহিরে নিজেকে রাখিয়া মানুষকে দেখিবার মতন স্বচ্ছ অন্তর্দৃষ্টি তাঁহার বরাবরই ছিল। যখন যাহাদের কথা তিনি বলিয়াছেন—সে নয়ানজোড়ের জমিদার কৈলাসচন্দ্রই হউক, অথবা দুখিরামই হউক, অথবা উলাপুরের পোষ্টমাষ্টারই হউক—তখন নিছক মানুষ হিসাবেই তাহাকে দেখিয়াছেন তাহার বিশিষ্ট স্বাভাবিক আবেষ্টনের মধ্যে রাখিয়া, নিজের শ্রেণী, বর্ণ, ধর্ম কোন কিছুর চেতনাই তাঁহার দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে নাই। এই স্বচ্ছ মুক্ত দৃষ্টিই রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলিকে এমন গভীর কাব্যময় অথচ বাস্তবরূপ দান করিয়াছে।"

রবীন্দ্রনাথের গল্প রচনার স্বর্ণযুগ এসেছিল ১৮৯১ সালে—যখম তিনি পতিসর সাজাদপুর শিলাইদহে নিজের জমিদারি দেখতে পল্লীর নিবিড় সান্নিধ্যে ছিলেন; এবং এই সময়কার লেখা 'ছিন্ন পত্রে'র মধ্যে বহু গল্পের উৎস সম্পর্কে

কিছুটা হদিসও পাওয়া যায়। এই সময়ে সাপ্তাহিক 'হিতবাদী' কাগজ বের হচ্ছিল, এই কাগজ-পরিচালকদের একান্ত অনুরোধে রবীন্দ্রনাথকে প্রত্যেক সপ্তাহে একটা গল্প লিখে দিতে হয়েছিল।

এই সময়ে কবি প্রকৃতির সঙ্গে সম্পূর্ণ একাত্ম হয়েছিলেন; জীবনের অতি তুচ্ছ ব্যাপারগুলিকেও পরম রমণীয় এবং অপূর্ব রহস্যময় বলে বোধ হচ্ছিল। সুতরাং তাঁর কবি-হৃদয়ে মানুষের "ছোট দুঃখ ছোট সুখকে" আশ্রয় করে ছোট ছোট মুক্তোর মতো এই গল্পগুলি জন্ম নিয়েছিল।

গল্প রচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ নানারকম আঙ্গিক ব্যবহার করেছেন। কখনও তিনি গীতিধর্মী লিরিক রসে নিজের কবিমনকে উদ্‌ঘাটিত করেছেন, কখনও বা ব্যক্তিগত চিন্তার ভারে কাব্যকেই যেন গল্পধর্মে মুড়ে দিয়েছেন বলে মনে হবে। কোনও কোনও গল্পে তিনি বাস্তব এবং অবাস্তব বা অতিবাস্তবকে খুব সুন্দর করে মিশিয়ে দিয়েছেন। 'কঙ্কাল', 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'মণিহারা', 'সম্পত্তি সমর্পণ' এবং 'গুপ্তধন' প্রভৃতি গল্পে আমরা অতি প্রাকৃত রাজ্যে কখন যে চলে যাই বাস্তবজীবনের সীমারেখা লঙ্ঘন করে—তা বুঝতেও পারি না। শুধু গল্প বলার উদ্দেশ্য নিয়েই গল্প ফেঁদে বসেছেন তিনি, কিন্তু কখন যে তিনি পরিচিত জীবন ও জগতের সীমা ছাড়িয়ে অতিপ্রাকৃত রাজ্যের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়েছেন —তা বুঝা যায় না। লেখার সহজ প্রবণতার গুণেই তিনি সেখানে উন্নীত হয়েছেন।

তাঁর গল্পে কখনও কখনও ঔপন্যাসিক রীতি দেখতে পাই। উদাহরণ হিসেবে 'নষ্টনীড়' প্রমুখ গল্পের নাম করা যেতে পারে। একটি মনস্তত্ত্বমূলক সমস্যাকেই কেন্দ্রীভূত করা হয়েছে বলেই 'নষ্টনীড়'কে উপন্যাস বলা চলে না। ছোটগল্পের রসাবেদনের পরিপ্রেক্ষিতেই একে বিচার করতে হবে। 'স্ত্রীর পত্র' গল্পে আমরা দেখি যে তিনিই প্রথম চিঠির আকারে ছোটগল্প রচনার একটি সার্থক আঙ্গিক আবিষ্কার করেছেন।

অবশ্য—তাঁর সব গল্পেই কবির সংবেদনশীলতা ছড়িয়ে আছে। তাই 'পোস্টমাস্টার', 'সমাপ্তি', 'শুভা'—সমস্ত গল্পেই দেখি মানুষের হৃদয়ের নিবিড় বেদনাবোধের সঙ্গে কবিমনের একটি মেলবন্ধন ঘটেছে।

রবীন্দ্রনাথের আদিপর্বের গল্প যেমন ব্যক্তিগত জীবনের অনুভূতি নিয়ে লেখা, এবং সেই উপলব্ধি দিয়ে তাঁর পরিপার্শ্বকে দেখে তাকে সর্বজনীনতা দান করে রচনা, তাঁর শেষ জীবনের গল্পগুলি কিন্তু সেরকম নয়। তা রীতিমত মননপ্রধান। বাগ্‌ভঙ্গীর বৈদ্যুতিক চমকে যেন ভরা—'তিনসঙ্গী' গল্পের

আগাগোড়াই এই উজ্জ্বল দীপ্তি আমাদের মনকে ধাঁধিয়ে দিয়েছে। পল্লী বাঙলার সহজ সরল গ্রাম্য জীবন ছেড়ে উচ্চ-মধ্যবিত্ত শহুরে জীবনের জটিল সৌখীন জীবনকে রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত তাঁর গল্পের উপজীব্য করেছেন। শাণিত, বিদ্যুদ্দীপ্ত, উজ্জ্বল বাগ্‌ভঙ্গীর মাধ্যমে গল্পের কথাবস্তুকে রাঙিয়েছেন। 'ল্যাবরেটরী', 'রবিবার', 'শেষকথা' গল্প পড়লেই তা বুঝা যায়।

রবীন্দ্রনাথের গল্পসাহিত্য বিরাট ও মহৎ। সামান্য একটি প্রবন্ধে তা আলোচনার বাইরে। যে কোন একটি গল্পের সম্যক বিশ্লেষণও এই জাতীয় সঙ্কীর্ণ প্রবন্ধের পরিসরের চেয়ে বিস্তৃততর হতে বাধ্য।

রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্র'

'ছিন্নপত্র' গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথের একটি বিশেষ সময়ের মধ্যে লেখা (১৮৮৫ থেকে ১৮৯৫ সালের মধ্যে) চিঠির সঙ্কলন। চিঠি সাধারণত ব্যক্তি-জীবনের বাস্তব দিকের প্রকাশ বহন করে। পত্র তাই ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং পত্র সাহিত্যের রসও তাই ব্যক্তি-মানসাভিমুখী। সেই কারণে চিঠিপত্র যদি ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে সকলের পাঠ্যরূপে প্রতীয়মান হয়, যদি সর্বসাধারণের শুধু পাঠযোগ্য নয়, পাঠভোগ্যও হয়—তবে তার চরিত্রধর্ম নষ্ট হয় বলে স্বীকার করতেই হবে। চিঠির মধ্যে যদি লেখক তাঁর দৈনন্দিন জীবনকে, ঘরোয়া আটপৌরে মনকে প্রকাশ না করেন, যদি তার ব্যক্তিক সত্তাকে আন্তরিকভাবে খুলে না ধরেন, যদি সাধারণ খেলা বা খেয়ালের বেড়াজালে ধরা মানুষকে না খুঁজে পাওয়া যায়—তবে চিঠির মাধুর্য অনেকটা নষ্ট হয়ে যায়, একথা মানতে আমাদের বাধা নেই। রবীন্দ্রসমালোচক অজিত চক্রবর্তী মশাইও বলেছেন যে, সকলের চেয়ে নিবিড়ভাবে মনের কথা বলা যায় চিঠিতে—তার কারণ চিঠিতে একটি মাত্র মনের মানুষকে বলা হয়, বাইরের পাঠক সহজে সেখানে প্রবেশ করতে পারে না।

পত্র একান্তভাবে কাছের জিনিস, অন্তরের সম্পদ—ইংরেজীতে যাকে বলা যেতে পারে Intimate. প্রবন্ধে যেমন লেখকের পাঠককে সব সময় মনে করে রাখতে হয়, তার দিকে নজর দিতে হয়, পত্রে তেমন কোনও মনোযোগের দরকার হয় না পত্রলেখকের। কাছের লোককে ডেকে একান্ত মনোরম ভঙ্গীতে যেন আলাপ করা হয় চিঠিতে—অকপট স্বগতোক্তির ভঙ্গীতে।

রবীন্দ্রনাথ নিজেও 'ছিন্নপত্রে'র এক জায়গায় বলেছেন—আমরা মানুষকে দেখে যতটা লাভ করি, তার সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে যতটা লাভ করি, চিঠিপত্র দ্বারা তার

চেয়ে আরও বেশী পেয়ে থাকি। চিঠিপত্রে যে আমরা কেবল প্রত্যক্ষ আলাপের অভাব দূর করি তা নয়, ওর মধ্যে আরও একটু রস আছে যা প্রত্যক্ষ দেখাশোনায় নেই।

কিন্তু পত্রের এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ওয়াকিফহাল হওয়া সত্ত্বেও তাঁর প্রায় সমস্ত চিঠিগুলির মধ্যে এমন একটি সর্বজনীন সাহিত্যিক মাধুর্য আছে, যা পত্রের রসকে সরিয়ে নির্ভেজাল পরিচ্ছন্ন সাহিত্যবস্তু পাঠের আস্বাদ এনে দেয়। এক কথায় প্রতিপাদ্য বিষয়ের এই রকম একটা রূপ হয় যাতে রবীন্দ্রনাথের পত্র বিষয়গতভাবে সর্বজনীন এবং রচনাগতভাবে সর্বাঙ্গীণ।

'ছিন্নপত্রে'র চিঠিগুলি কবিবন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদার এবং কবির নিজের ভাইঝি ইন্দিরা দেবীকে লিখিত। এই চিঠিগুলি লেখার প্রায় পঁচিশ বছর পরে যখন গ্রন্থাকারে সঙ্কলনের ব্যবস্থা হল—তখন কবি এই সব চিঠির বেশ কিছু অংশ ছিন্ন করলেন, ব্যক্তি-জীবনের একান্ত ঘরোয়া যে সব কথাবার্তা এই সব পত্রে ছিল, সেগুলি কবি নিজে ইচ্ছে করেই কেটে ছেঁটে বাদ দিয়ে এই পত্রসঙ্কলনের নাম দিলেন—'ছিন্নপত্র'।

নামকরণের দিক থেকে সার্থকতা যতই থাক না কেন—পত্ররসের চারিত্রিক ধর্মের দিক থেকে একটু যে ঘাটতি পড়ে নি—এমন কথার প্রতিবাদ করা বোধ হয় সমীচীন হবে না। পত্রের দিক থেকে তিনি এই বইতে ব্যক্তিক রস সবটা পরিবেশন করতে পারেন নি। ভারহীন সহজের রসই হচ্ছে চিঠির রস—একথা তাঁরই, তবু ছিন্নপত্রের কয়েক জায়গায় যেমন তিনি ডায়েরীকল্প লিরিক রসের আমদানি করেছেন, তেমনি স্থানে স্থানে তিনি দার্শনিক চিন্তায়ও মগ্ন হয়ে পড়েছেন।

শ্রীযুক্ত অজিত চক্রবর্তী মশাই বলেছেন—"কবির জীবিতকালে এই পত্রগুলি প্রকাশিত হইতেছে বলিয়া ইহাদিগকে তিনি ছিন্ন আকারে উড়াইয়া দিয়াছেন। অর্থাৎ সবটা দিতে পারেন নাই। সম্ভবত সঙ্কোচ তাহার কারণ। এইজন্য এই চিঠির টুকরাগুলির মধ্যে সেই ব্যক্তিগত রসটি নাই, চিঠিমাত্রেরই যেটি বিশেষ রস। একটি পূর্ণ প্রস্ফুটিত কমল শতদলে বিদীর্ণ হইয়া বিক্ষিপ্তভাবে ইতস্তত ভাসিয়া বেড়াইলে তাহার যেমন অবস্থা হয়, এই ছিন্নপত্রগুলিরও সেইরূপ অবস্থা হইয়াছে। ইহার প্রত্যেকটি পত্র সেই নন্দনগন্ধটুকু বহন করিতেছে বটে, কিন্তু ছিন্ন হইবার বেদনার রক্তলেখা ইহাদের গায়ে লাগিয়া আছে।"

তবু রবীন্দ্রনাথ নিজেই এইসব চিঠিগুলির উপর কাঁচি চালিয়েছেন, নিজেই সম্পাদনা-কাজ শেষ করে 'ছিন্নপত্র' নামে এই পত্রগ্রন্থটি প্রকাশ করেন তাঁর

কবিমনের একটি স্পষ্ট প্রকাশ এই সব পত্রে উচ্চকিত হয়ে ধরা পড়েছে। সেদিক থেকে রবীন্দ্র-সাহিত্য-পাঠ-বুভুক্ষুদের এ-গ্রন্থ অবশ্য আস্বাদ্য। কিন্তু তবু 'ছিন্নপত্র' গ্রন্থটি খাঁটি পত্রসাহিত্যের এক অনবদ্য গ্রন্থ বলতে আমার কোথাও বাধে না। এই গ্রন্থের কয়েকটি পত্রাংশে কবির ব্যক্তিক পরিচয় একেবারে মুছে যায় নি, ব্যক্তিসীমার গণ্ডিতে তাঁর প্রাত্যহিক আটপৌরে জীবন-পরিচয়ের আলাপচারিতা—যা নাকি পত্রের প্রধান চরিত্রগুণ ও ধর্ম বলে গ্রাহ্য হয়ে থাকে—কিছু পরিমাণে আছে। সুতরাং 'ছিন্নপত্র' যে একেবারেই ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের পরিচয় বহন না করে তাঁর কবিসত্তার বীজিত অঙ্কুরোদ্গমের পরিচয় আভাসিত করে, এরকম বলা একেবারে ষোল আনা ঠিক হবে না।

শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লেখা পাঁচ নম্বরের চিঠিখানির মধ্যে কিন্তু ব্যক্তিক সত্তার প্রকাশ আছে; ভারহীন সহজের রসই সেখানে প্রধান উপজীব্য। এই রকম আরও কয়েকটি পত্রের কয়েক জায়গার উল্লেখ করতে পারা যায়।

"...আমি প্রায় একমাস কাল দার্জিলিঙে কাটিয়ে এলুম। আপনার পত্র কলকাতায় আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। আমি ফিরে এসে পেলুম। আপনাকে অনেক দিন থেকে লিখি-লিখি করছি, কিন্তু দৈববিপাকে হয়ে ওঠে নি। এবার আমার ততটা দোষ ছিল না। আমার কোমরে বাত হয়ে কিছুকাল শয্যাগত হয়ে পড়েছিলুম, এখনো ভালো করে সারি নি। তবে এখন বিছানা থেকে উঠে বসেছি। কিন্তু বেশীক্ষণ চৌকিতে বসে থাকতে পারি নে। আমার কোমর ছাড়া পৃথিবীতে আর আর সমস্ত মঙ্গল। আমার স্ত্রী কন্যা দার্জিলিঙে, আমি কলকাতায় ঘরে বসে বিরহ ভোগ করছি—কিন্তু বিরহের চেয়ে কোমরের বাতটা বেশী গুরুতর বোধ হচ্ছে। কবিরা যাই বলুন আমি এবার টের পেয়েছি বাতের কাছে বিরহ লাগে না। কোমরে বাত হলে চন্দন পঙ্ক লেপন করলে দ্বিগুণ বেড়ে ওঠে, চন্দ্রমাশালিনী পূর্ণিমা যামিনী সান্ত্বনার কারণ না হয়ে যন্ত্রণার কারণ হয়, আর স্নিগ্ধ সমীরণকে বিভীষিকা বলে জ্ঞান হয়—অথচ কালিদাস থেকে রাজকৃষ্ণ রায় পর্যন্ত কেউই বাতের ওপর একছত্র কবিতা লেখেন নি, বোধ হয় কারো বাত হয় নি। আমি লিখব।"—৭নং চিঠি

চল্লিশ নম্বরের চিঠিখানাও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এখানেও ভারহীন সহজ রসে চিঠিখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এই রকম আরও দু' চারটে পত্র আছে।

রবীন্দ্রনাথের পত্র সম্পর্কে নানা মুনির নানা মত আছে। সকলেই তাঁর পত্রকে প্রশংসার চোখে দেখেছেন ঠিকই—কিন্তু অনেকেই একথা বলেছেন যে, তিনি জানতেন—তাঁর চিঠিপত্র সাধারণ্যে প্রকাশিত হবেই। সেইজন্য ব্যক্তিগত

আস্বাদের উপরেও তিনি পত্রে একটি হয় সর্বজনীন চিন্তার নয় নৈর্ব্যক্তিক লিরিক রসের আরোপ করতেন। রবীন্দ্রনাথ এত বড় কবি ছিলেন—এবং তাঁর প্রাণমন এমনই কবিত্বে ভরা ছিল যে, তিনি দৈনন্দিন জীবনের অতি সাধারণ কথাবার্তাকেও কাব্যমণ্ডিত করেছিলেন—ইচ্ছে করে নয়, স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তা কবিতা হয়ে যেত। তাঁর লেখা চিঠিতেই তাই প্রাত্যহিক সংবাদ এবং ব্যক্তিগত জীবনকথা সাহিত্যিয় ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে—এতে আর বিস্ময়ের কি আছে? আমরা প্রত্যহ যে প্রবৃত্তির দাসত্ব করি, সে সম্পর্কে তাঁর একখানা চিঠি আছে 'ছিন্নপত্রে'। তেরো নম্বরের চিঠিখানির কথা বলছি। তিনি বলছেন—"যাকে আমরা প্রবৃত্তি বলি এবং যার প্রতি আমরা সর্বদাই কটুভাষা প্রয়োগ করি, সে-ই তো আমাদের গতিশক্তি—সে-ই আমাদের নানা সুখদুঃখ পাপপুণ্যের মধ্যে দিয়ে অনন্তের দিকে বিকশিত করে তুলছে। নদী যদি প্রতিপদে বলে, 'কই সমুদ্র কোথায়, এ যে মরুভূমি, ঐ যে অরণ্য, ঐ যে বালির চড়া, আমাকে যে শক্তি ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে সে বুঝি আমাকে ভুলিয়ে অন্য জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে', তা হলে তার যে রকম ভ্রম হয়—প্রবৃত্তির উপরে একান্ত অবিশ্বাস করলে আমাদেরও কতকটা সেই রকম ভ্রম হয়। আমরাও প্রতিদিন বিচিত্র সংশয়ের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছি, আমাদের শেষ আমরা দেখতে পাচ্ছি নে।" এই জাতীয় পত্র প্রকাশিত হবে না কেন? সকলের জন্যে লেখা না হলেও এ জিনিস যে সাধারণের সম্পদ—একথা অস্বীকার করবে কে?

কিন্তু প্রকাশিত হবার অপেক্ষা রেখে বা সাধারণ্যে পত্রগুলি প্রকাশ করার ইচ্ছাতেই যে তিনি চিঠিপত্র লিখতেন—এ ধারণা করা শুধু ভুল বা অন্যায় নয়, রবীন্দ্র-রস-পিপাসুর পক্ষে পাপবিশেষ। কবিগুরুর যদি এই জাতীয় কোন দুর্বলতা থাকতো, তা হলে তাঁর যে সব ইতস্ততবিক্ষিপ্ত পত্র প্রাপকের সহৃদয়তার গুণে প্রকাশিত হচ্ছে—সেগুলির একটি সঙ্কলন নিশ্চয়ই আগে বের হত। আজও যে তাঁর কত পত্র কত জায়গায় ছড়ানো আছে—কে তার খোঁজ দেবে?

তাছাড়া 'ছিন্নপত্র' গ্রন্থ সম্পর্কে তো এ রকম কোন কথা উঠতেই পারে না। তিনি যখন 'ছিন্নপত্রে'র চিঠিগুলি লিখেছিলেন—তখন তিনি সর্বজনবরেণ্য বিশ্বকবি বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেন নি এবং তাঁর চিঠিরও যে এ রকম অনিবার্য প্রয়োজন ঘটবে—তাঁর সাহিত্য বিচারের পটভূমি হিসেবে, তা তখনও ধারণার বাইরে। অমর খ্যাতির অধিকারী হবেন তিনি এবং তাঁর ঘরোয়া কথাগুলি পর্যন্ত সর্বজনীন প্রয়োজনে আসবে—তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে তিনি সে

স্বপ্ন তখনও দেখেন নি। তাই এ কথাই স্বাভাবিক যে, কবি নিজের মানসকে যেমন করে উপলব্ধি করেছেন, প্রকৃতি, পৃথিবী, জনসাধারণ, নারী-পুরুষের সম্পর্ক, এবং নিজের জীবন যেমন করে তাঁর কাছে ধরা দিয়েছে—'ছিন্নপত্রে' তিনি তাই সহজ আন্তরিকতার সঙ্গেই প্রকাশ করেছেন।

'ছিন্নপত্রে'র প্রথম চৌদ্দটা চিঠি ১৮৮৫ থেকে ১৮৯০ সালের মধ্যে লেখা। এগুলি কেমন যেন বিক্ষিপ্ত, কবির দার্শনিক চেতনার উপলব্ধিগত কোনও ধারাবাহিক পরিচয় এখানে নেই বললেই হয়। প্রথম চিঠি থেকেই দেখতে পাওয়া যায় কবি সাধারণ বর্ণনাকে অসাধারণ রোমান্টিকতার লেবেল এঁটে দিয়েছেন। বন্দোরা সমুদ্র তীরে দাঁড়িয়ে ঝড়ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ অনাবৃত সাগরের বর্ণনা দিয়ে ছিন্নপত্রের চিঠিগুলি শুরু। ঝড়ে অসহায় সমুদ্র ফুলে উঠেছে, আর কবি লিখছেন—'আমরা যেন সিংহের কেশর ধরে টানছি অথচ অসহায় সিংহ কিছুই বলতে পারছে না। একবার যদি সমস্ত সমুদ্র ছাড়া পায় তাহলে আমাদের আর চিহ্নমাত্র থাকে না। খাঁচার মধ্যে বাঘ তার লেজ আছড়াচ্ছে, আমরা কেবল দু'হাত তফাতে দাঁড়িয়ে হাসছি।' এই স্বাভাবিক বর্ণনার মধ্যে কাব্যের একটু বর্ণগন্ধ মিশেছে বলেই এ সর্বজনগ্রাহ্য হয়েছে। দ্বিতীয় পত্রেও এ জাতীয় কাব্যিক সুষমার প্রলেপন আছে—বহুদিনের অনুপস্থিতিতে কলকাতায় তাঁর ঘরটি কি রকম বিরহদশা যাপন করছে—তার রূপকথা পাঠক-মাত্রকেই মুগ্ধ করে।

'... আমার সেই হৃষ্টপুষ্ট বিরহিনী তাকিয়া—সে কি আমাদের বিরহে রোগা হয়ে গেছে, আমি তাই ভাবছি। আমার বইগুলো কাঁচের অন্তঃপুর থেকে চেয়ে আছে—কিন্তু কার দিকে চেয়ে আছে? আমার শূন্যহৃদয়া চৌকি দিন রাত্রি তার দুই বাহু বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে।' চার পাঁচ এবং দু' নম্বরের চিঠিতেও বেশ খানিকটা ব্যক্তিরস রয়েছে। সাত থেকে এগারো পর্যন্ত চিঠিতে কখনও ভ্রমণের কথা, প্রকৃতির সৌন্দর্য বর্ণনা, না হয় শ্রীশবাবুর বিরহে ঈষৎ ঠাট্টা মস্করা।

ছিন্নপত্রের প্রতিটি চিঠির বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও বিশ্লেষণ করার অবকাশ আছে—কিন্তু স্থানাভাববশত সে চেষ্টার মধ্যে আমি বর্তমানে প্রবিষ্ট হচ্ছি না। তবে সামগ্রিকভাবে ছিন্নপত্রের মধ্যে আমরা কি কি জিনিস পাই—মোটামুটি তার একটা আলোচনা এখানে নিতান্ত বাজে কথা বা প্রসঙ্গহীন হবে না।

ছিন্নপত্র গ্রন্থের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের অন্তঃপ্রকৃতির কথা যেন বিধৃত আছে—সংক্ষেপে বা এক কথায় এ গ্রন্থের এই পরিচয়। রবীন্দ্রনাথের মনে প্রকৃতি কি করে

মর্ত্যপ্রীতিমূলক সনেটকল্প কবিতা (সোনার তরী)		৩৬ „
সমুদ্রের প্রতি	(„)	৫৮, ৬৪, ৬৭ „
বসুন্ধরা	(„)	৫৭ „
শৈশবসন্ধ্যা	(„)	১০৮ „
গান ভঙ্গ	(„)	৬১ „
পোস্ট মাস্টার	(গল্প)	২১, ৬০ „
ছুটি	(„)	২৮ „
সমাপ্তি	(„)	৩০ „
ক্ষুধিত পাষাণ	(„)	১১৯ „
মেঘ ও রৌদ্র	(„)	১০৬ „

এ ছাড়া চৈতালি-চিত্রার আরও কয়েকটি কবিতার ভাবের অঙ্কুর ছিন্নপত্রে দেখতে পাই।

৯২ নম্বর পত্রটিতে কবি তাঁর সাহিত্য জীবনের ও কবিকৃতির নেপথ্যচারিতার এক সুদীর্ঘ ইতিহাস হাজির করেছেন। তিনি সাহিত্যের সমস্ত বিভাগে হাত দিয়েছেন—অথচ সর্বত্র সমান কৃতিত্ব দেখাতে কেন পারছেন না—তাঁর বিশ্লেষণ তিনি নিজেই করেছেন। 'মদগর্বিতা যুবতী যেমন তার অনেকগুলি প্রণয়ীকে নিয়ে কোনটিকেই হাতছাড়া করতে চায় না, আমার কতকটা যেন সেই দশা হয়েছে। মিউজদের মধ্যে আমি কোনটিকেই নিরাশ করতে চাই নে—কিন্তু তাতে কাজ অত্যন্ত বেড়ে যায় এবং হয়তো 'দীর্ঘ দৌড়ে' কোনোটিকেই পরিপূর্ণভাবে আমার আয়ত্ত হয় না। সাহিত্য বিভাগেও কর্তব্যবুদ্ধির অধিকার আছে, কিন্তু অন্য বিভাগের কর্তব্যবুদ্ধির সঙ্গে তার একটু প্রভেদ আছে। কোন্‌টাতে পৃথিবীর সবচেয়ে উপকার হবে সাহিত্য-কর্তব্যজ্ঞানে সে কথা ভাববার দরকার নেই, কিন্তু কোন্‌টা আমি সবচেয়ে ভালো করতে পারি সেইটেই হচ্ছে বিচার্য।'

এই সময়ের লেখা 'মানসী', 'চিত্রাঙ্গদা', 'সোনার তরী', 'চিত্রা', 'রাজর্ষি', 'বিসর্জন', 'মায়ার খেলা', 'রাজা ও রাণী', 'পঞ্চভূতের ডায়েরী', 'ইংরাজ ও ভারতবাসী', 'শিক্ষার হেরফের', 'ইওরোপ প্রবাসীর ডায়েরী' এবং 'গল্পগুচ্ছে'র কিছু গল্প। এগুলির বিচারেও ছিন্নপত্র অবশ্য স্মরণীয়।

দৈনন্দিন খবরের বদলে কবির প্রকৃতিপ্রীতির পরিচয়ের সঙ্গে কবির একটা দার্শনিক সত্তার উন্মেষও যেন দেখতে পাওয়া যায়। দৈনিক ঝঞ্ঝাট-ঝামেলার বাইরে দাঁড়িয়ে নাগরিক সমস্যার কথা বিস্মৃত হয়ে তিনি সৌন্দর্যলক্ষ্মীর সাহচর্য লাভে ব্যস্ত। সোনার তরীর নেয়েকে অনুসন্ধানই যেন তাঁর কাজ। তাই

পদ্মার জল, নদীর ঘাট, বালুর চর, ছোট ছোট গ্রাম, গ্রাম্য সরল মানুষের মিছিল —সব যেন কবির কাছে এখন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে, এরা আর কেউ বিচ্ছিন্ন নয়।

এক হিসেবে ছিন্নপত্রকে রবীন্দ্রনাথের আত্মজীবনীর একটি অধ্যায় বলা যেতে পারে—কেননা অন্তর্জীবনের একটি সুর এখানে স্পষ্টভাবে ধ্বনিত হয়েছে। তিনি লিখছেন—'আমরা দৈবক্রমে প্রকাশিত হই ; ইচ্ছা করলে, চেষ্টা করলে, প্রকাশিত হতে পারি নে। চব্বিশ ঘণ্টা যাদের কাছে থাকি তাদের কাছেও আপনাকে ব্যক্ত করা আমাদের সাধ্যের অতীত' (১২৬নং পত্র)। অন্যত্র তিনি বলছেন—'আমি দেখেছি, থেকে থেকে টুকরো টুকরো কথাবার্তা কওয়ার চেয়ে মানসিক শক্তির অপব্যয় আর কিছুতে হতে পারে না। দিনের পর দিন যখন একটি কথা না কয়ে কাটে তখন টের পাওয়া যায়, আমাদের চতুর্দিকই কথা। ···আমি জানি, আজ সন্ধ্যার সময় যখন কেদারা টেনে বোটের ছাতের উপর একলাটি বসব, তখন আমার আকাশে আমার সেই সন্ধ্যা তারাটি ঘরের লোকের মত দেখা দেবে। আমি শীতের সময় যখন এই পদ্মাতীরে আসতুম, কাছারি থেকে ফিরতে অনেক দেরি হত। বোট ওপারে বালির চরের কাছে বাঁধা থাকত ; ছোট জেলেডিঙি চড়ে নিস্তব্ধ নদীটি পার হতুম, তখন এই সন্ধ্যাটি সুগম্ভীর অথচ সুপ্রসন্নমুখে আমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকত। এখানকার প্রকৃতির সঙ্গে সেই আমার একটি মানসিক ঘরকন্নার সম্পর্ক' (১১২নং পত্র)।

এই ধরনের ভাবানুভূতি, কবির অন্তর্জীবনের একটি সুর, প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর অনুরক্তির ইতিহাস—ছিন্নপত্রে বিধৃত হয়েছে বলেই এই গ্রন্থকে কবির আত্মজীবনীর একটি অধ্যায় বলা হয়েছে। কবি এখানে আত্মতন্ময়তায় মশগুল। যা কিছু দেখছেন, তা তিনি দেখছেন তাঁর মনশ্চক্ষে, অন্তরের উপলব্ধি-রাজ্যে তার যাচাই-বাছাই হচ্ছে,—সুতরাং বিষয়বস্তু অপেক্ষা কবির সাবজেক্‌টিভ মুড্‌টাই এখানে প্রধান হয়ে উঠেছে। শরৎকালের সৌন্দর্যে তাই তিনি মুখর হয়ে সৌন্দর্য বর্ণনা করেন নি, বলেছেন—'এই শরতের অপর্যাপ্ত শান্তির মধ্যে আমার আত্মাকে স্তরে স্তরে সিক্ত করে নেওয়া আমার পক্ষে কম ব্যাপার নয়। এ জীবনে আমার যা-কিছু গভীরতম তৃপ্তি ও প্রীতি সে কেবল এই রকম নির্জন সুন্দর মুহূর্তে পুঞ্জীভূতভাবে আমার কাছে ধরা দেয়।' আর কবি তখন বিষয় ছেড়ে আত্মতন্ময় হয়ে লিরিক রচনায় নিজেকে ব্যয় করেন।

প্রকৃতি-চেতনার একটা ক্রম-পরিণতি যেমন লক্ষ্য করা যায় ছিন্নপত্রের গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত, তেমনি তার লিরিক মানসের একটা সুষ্ঠু প্রকাশও চোখে পড়ে।

প্রকৃতি গোড়াতে কবির কাছে বস্তু-সত্যের মতো দেখা দিয়েছে, তারপর সে হয়ে উঠেছে সুন্দর, কিন্তু সর্বশেষে আমরা দেখি প্রকৃতির মধ্যে কবির অন্তরের এক নিবিড় অবগাহন এবং কবি প্রকৃতির জগৎ থেকে একটি মহান সত্যের সন্ধান করে ফিরছেন। অবশেষে এই প্রকৃতির প্রভাবেই কবি যেন নিজের মনোলোকে এক মহান শিল্পীর পদসঞ্চার শুনতে পাচ্ছেন, তাঁকে তিনি আত্মীয় করে নিতে পারছেন। ছিন্নপত্রের এক থেকে একশো বাহান্নখানা পত্রে এই খবরই আমরা পাই।

ছিন্নপত্রে লিরিক রসটি কবি প্রকাশ করেছেন গদ্যের ঢঙে, কিন্তু কাব্যের সুষমা তাতে কোথাও ক্ষুণ্ন হয় নি। কোথাও উপমার চমৎকারিত্ব, কোথাও সমাসোক্তি মধুর ব্যঞ্জনা; কোথাও ভাবানুভূতির আশ্চর্য প্রকাশ, কোথাও কাব্যময় উচ্ছ্বাসের অপূর্ব উন্মাদনা। 'সূর্য আস্তে আস্তে ভোরের বেলা পূর্বদিক থেকে কী এক প্রকাণ্ড গ্রন্থের পাতা খুলে দিচ্ছে এবং সন্ধ্যায় পশ্চিম থেকে ধীরে ধীরে আকাশের উপরে যে এক প্রকাণ্ড পাতা উলটে দিচ্ছে সেই বা কী আশ্চর্য লিখন —আর, এই ক্ষীণ পরিসর নদী আর এই দিগন্তবিস্তৃত চর, আর ওই ছবির মতন পরপার, ধরণীর এই উপেক্ষিত একটি প্রান্তভাগ, এই বা কী বৃহৎ নিস্তব্ধ পাঠশালা।' ··· 'মাথাটা জানলার উপর রেখে দিই, বাতাস প্রকৃতির স্নেহ হস্তের মতো আস্তে আস্তে আমার চুলের মধ্যে আঙুল বুলিয়ে দেয়, জল ছল্‌ছল্‌ শব্দ করে বয়ে যায়, জ্যোৎস্না ঝিক্‌ঝিক্‌ করতে থাকে এবং অনেক সময় 'জলে নয়ন আপনি ভেসে যায়!' ··· 'রুগণ ছেলের দিকে মা যেমন করে তাকায় প্রকৃতি সেই রকম সুগভীর স্তব্ধ এবং স্নিগ্ধ বিষাদের সঙ্গে আমার মুখের দিকে চেয়েছিল, নদীর জল আকাশের মতো স্থির এবং আমাদের দুটি বাঁধা নৌকো জলচর পাখির মতো মুখের উপর পাখা ঝেঁপে স্থিরভাবে ঘুমিয়ে আছে।' ··· 'আমার সমস্ত মনটাকে কে যেন তুলিতে করে তুলে নিয়ে এই রঙিন শরৎপ্রকৃতির উপর আর-এক পোঁচ রঙের মতো মাখিয়ে দিচ্ছে—তাতে করে এই সমস্ত নীল সবুজ এবং সোনার উপর আর-একটা যেন নেশার রঙ লেগে গেছে।' ··· 'সূর্যালোকে আজকের প্রকৃতিকে ভারি একটি শুভ্রবসনা মহিমময়ী মহেশ্বরীর মতো দেখাচ্ছে ··· এই রকম সকাল- বেলায় মনে হয়,

—নাই মোর পূর্বাপর,
যেন আমি একদিনে উঠেছি ফুটিয়া
অরণ্যের পিতৃমাতৃহীন ফুল!—

যেন আমি এই আকাশের, এই নদীর, এই পুরাতন শ্যামল পৃথিবীর।' এরকম হাজারটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে—এবং প্রত্যেকটিই সৌন্দর্য বিশ্লেষণের অপেক্ষা না রেখেই উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করবে যে, তারা কাব্যরাজ্যের বাসিন্দা, যদিও পোশাকটা গদ্যের, তবু মেজাজটা একান্তই লিরিকের। কল্পনার ঐশ্বর্যে এবং শব্দশিল্পের চারুত্বে এগুলি একেবারেই যেন কবিতা।

ব্যক্তিগত জীবনের টুকিটাকি খবরও যা আছে—তাও তিনি অভাবিতপূর্ব কল্পনা ও আলঙ্কারিক ব্যঞ্জনার সাহায্যে প্রকাশ করে Personal-কে Impersonal করেছেন, Physical জগৎকে তিনি Metaphysical চেতনার আলোকে উন্নীত করেছেন। প্রকৃতির সৌন্দর্য থেকে তাঁর চিত্ত তাই সহজে বিশ্বৈক্যানুভূতির স্পন্দন লাভ করেছে।

সিরিয়াস বিষয় নিয়েও কবি যে সব চিঠি লিখেছেন, সেগুলির মধ্যে লিরিকের একটা চাল এসেছে। মেয়েদের হিউমার করা সম্পর্কে তাঁর মন্তব্যের মধ্যে সত্য অবশ্যই আছে, কিন্তু যে লঘুচালে তিনি সে কথা বলেছেন—সেই ধরনটির মনোহারিত্বই পাঠককে মুগ্ধ করবে বেশী।

ছিন্নপত্রে রবীন্দ্রনাথের লিরিক রসের পাশাপাশি হাস্যরসের একটা প্রচ্ছন্ন ধারা কোথাও কোথাও ফল্গু নদীর মতো বয়ে গেছে দেখা যাবে। রবীন্দ্রনাথ হাস্যরসিক ব্যক্তি। যাঁরা তাঁর ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে পরিচিত—তাঁরা সকলেই রবীন্দ্রনাথকে হাস্যরসের পরম ভক্ত বলেই জানেন। ছিন্নপত্রে এই ব্যক্তিক দিকটা চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। সহজ সরল নির্মেঘ নীলাকাশে শরৎকালীন রৌদ্রের উজ্জ্বল দীপ্তির মতোই এই হাস্যরসের বিচ্ছুরণ ঘটেছে ছিন্নপত্রে। সমস্ত চিঠিগুলির বলার যে চাল—তা লঘু এবং সরস, কিন্তু সস্তা নয়। দু নম্বর চিঠিতে তিনি বলেছেন—'পাপোষ-শয্যায় শয়ান সেই পুরাতন জুতোযুগল! আমার সেই হৃষ্টপুষ্ট বিরহিণী তাকিয়া—সে কি আমাদের বিরহে রোগা হয়ে গেছে, আমি তাই ভাবছি।' চার নম্বর চিঠিতে পাচ্ছি—'পাণিনি ব্যাকরণটি এমন একটি ঘোড়ার ডিম যা কোনো ঘোড়ায় পাড়ে নি। অনেক ভাষা আছে যার ব্যাকরণ এখনো তৈরী হয় নি, কিন্তু কে জানত এমন ব্যাকরণ আছে যারা ভাষা তৈরী হয় নি।' সাত নম্বরের উল্লেখ এবং তা থেকে কিছু অংশ আমি আগেই উদ্ধৃত করেছি ব্যক্তিকপ্রসঙ্গে—সেখানে কোমরে বাত নিয়ে কবির রসিকতা অত্যন্ত উপভোগ্য হয়েছে। আট নম্বর পত্রের কবিতাংশটির কথা কেউ কখনও বোধ হয় বিস্মৃত হবেন না।

বন্ধু হে,

পরিপূর্ণ বরষায়
আছি তব ভরসায়
কাজকর্ম করো সায়—
এসো চট্‌পট্‌।
শাম্‌লা আঁটিয়া নিত্য
তুমি কর ডেপুটিত্ব,
একা প'ড়ে মোর চিত্ত
করে ছট্‌ফট্‌।

এই থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত এর সমস্তটাই হাস্যরসে পরিপূর্ণ। প্রায় তিন পাতাব্যাপী ১২০ লাইনের কবিতাটি হাস্যরসের ভিয়েনে অপূর্ব। শেষটা—

অতএব ত্বরা ক'রে
উত্তর করিবা মোরে,
সর্বদা নিকটে ঘোরে
কাল সে করাল ;
(সুধা তুমি ত্যজি নীর
গ্রহণ করিয়ো ক্ষীর)
এই তত্ত্ব এ চিঠির
জানিয়ো Moral.

ন' নম্বর পত্রে তিনি বলছেন যে তিনি যে গাড়িতে ছিলেন—সেখানে আরও দুটি-বাঙালি ছিল, তার মধ্যে একজন কবিকে জিজ্ঞাসা করলেন—'আপনার পিতা দার্জিলিঙে ছিল? কবি বলছেন—লক্ষ্মী থাকলে এর যথোচিত উত্তর দিতে পারত। সে হয়তো বলত—'তিনি দার্জিলিঙে ছিল কিন্তু তখন দার্জিলিঙ বড়ো ঠাণ্ডা ছিলেন বলে তিনি বাড়ি ফিরে গেছে।' আমার উপস্থিত মতো এ রকম বাঙলা জোগাল না।'

সতেরো নম্বর চিঠিখানির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের হিউমারবোধের একটা স্পষ্ট পরিচয় রয়েছে। তাঁর কাছারিতে গুটি পাঁচ ছয় ছেলে স্কুলের বেঞ্চ চাইতে এসে বিশুদ্ধ বঙ্গ ভাষায় যে বক্তৃতা করেছিল, সে সম্পর্কে কবিগুরুর যে টীকা—তা বোধহয় চিরস্মরণীয় সূক্ষ্ম হাস্যরসের নিদর্শন!

পোস্টমাস্টারের গল্প শুনতে কবির বেশ ভালো লাগে। সে সম্পর্কে তিনি বলছেন—'পোস্টমাস্টার কাল বলছিলেন,—এদেশের লোকের গঙ্গার উপর এমনি

ভক্তি যে এদের কোন আত্মীয় মরে গেলে তার হাড় গুঁড়ো করে রেখে দেয়, কোনো কালে গঙ্গার জল খেয়েছে এমন লোকের যদি সাক্ষাৎ পায় তা হলে তাকে পানের সঙ্গে সেই হাড়গুঁড়ো খাইয়ে দেয় আর মনে করে তার আত্মীয়ের একটা অংশের গঙ্গালাভ হল। আমি হাসতে হাসতে বললুম—এটা বোধ হয় গল্প। তিনি খুব গম্ভীর ভাবে চিন্তা করে স্বীকার করলেন—তা হতে পারে।' ৩৭নং চিঠিটা সম্পূর্ণ হাস্যরসের।

এছাড়া ২৯নং পত্রে কবির স্বপ্ন দেখা এবং দর্শনাভিলাষী স্কুল মাস্টারদের কথা হাস্যরসের সঙ্গেই ব্যক্ত করা হয়েছে। আর একটি মাত্র পত্রের কিয়দংশ উদ্ধৃত করে হাস্যরসের ব্যাপারে ক্ষান্ত হবার চেষ্টা করছি। কটকাভিমুখে জলপথে যাবার সময় কাপড়ের ব্যাগটা তাঁর সঙ্গে ছিল না—সেজন্যে তাঁর আক্ষেপ,—এক কাপড় পরেই রাত্রে শয়ন করছেন এবং প্রাতঃকালে প্রকাশিত হচ্ছেন। স্টিমারে কি সুখে ছিলেন—তার পরে সেকথা লিখছেন। 'স্টিমারে কত রকমের যে সঙ্গী জুটেছে তার আর সংখ্যা নেই। অঘোরবাবু বলে একটি কে এসেছে, পৃথিবীর সমস্ত জড় এবং চেতন পদার্থকে মামাশ্বশুরের ভাগ্নে বলে উল্লেখ করছে। আর একটি সঙ্গীতকুশল লোক অর্ধেক রাত্রে ভৈরোঁ আলাপ করতে লাগল। একটা সুঁড়ি খালের মধ্যে জাহাজ আটকে কাল বিকেল থেকে আজ ন'টা পর্যন্ত যাপন করা গেছে। সমস্ত যাত্রীর ভিড়ের মধ্যে ডেকের এক ধারে নির্জীব এবং বিমর্ষভাবে শুয়েছিলুম। খান্‌সামাজিকে বলেছিলুম রাতে লুচি করতে; সে কতকগুলি আকারপ্রকারহীন ভাজা ময়দা তৈরি করে এনেছিল, তার সঙ্গে ছোকা কিংবা ভাজাভুজির উপলক্ষমাত্র ছিল না। দেখে আমি কিঞ্চিৎ বিস্ময় এবং আক্ষেপ প্রকাশ করলুম। সে ব্যক্তি তটস্থ হয়ে বললে, হম্ আবি বনা দেতা। রাত্রের আধিক্য দেখে আমি তাতে অসম্মত হয়ে যথাসাধ্য শুষ্ক লুচি খেয়ে আলো এবং লোকজনের মধ্যে শুয়ে পড়লুম—শূন্যে মশা এবং চতুষ্পার্শ্বে আরসোলা সঞ্চরণ করছে; ঠিক পায়ের কাছেই আর এক ব্যক্তি শয়ন করেছে; তার গায়ে মাঝে মাঝে পা ঠেকছে; চারটে-পাঁচটা নাক অবিশ্রাম ডাকছে; মশকদষ্ট বীতনিদ্র হতভাগ্যগণ তামাক টানছে—এবং এরই মধ্যে ভৈরোঁ রাগিণী। রাত যখন সাড়ে তিনটে তখন কতকগুলি ব্যস্তবাগীশ লোক পরস্পরকে জাগ্রত হতে উৎসাহিত করতে লাগল। আমি নিতান্ত কাতরভাবে শয্যাত্যাগ করে আমার চৌকিটাতে ঠেস দিয়ে প্রভাতের প্রতীক্ষায় বসে রইলুম।'

ছিন্নপত্রে রবীন্দ্রনাথের মানবিক সত্তার অদ্ভুত প্রকাশ আছে। জমিদারি দেখাশুনো করার জন্যে শহুরে আবহাওয়া এবং উৎকট নাগরিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন

হয়ে তাঁকে শিলাইদহ, পতিসর, কালিগ্রাম, সাজাদপুর প্রভৃতি জায়গায় আসতে হয়, পদ্মার উপর বোটে করে তাঁকে ঘুরতে হয়, বোটে বোটেই দিন কাটাতে হয়, ফলে গ্রামের সঙ্গে, মানুষের সঙ্গে—নিকেলকরা নয় এমন বাস্তব জগতের সঙ্গে তাঁর কল্পনাশ্রয়ী মনের মেলবন্ধন ঘটলো, নিবিড় চাক্ষুষ পরিচয় ঘটলো।

পুজোর সময় বিদেশ থেকে বাড়ি ফিরে আসা একটি বাবুর চিত্র দিয়ে তিনি গ্রাম্য মানুষের পরিচয় উদ্ঘাটিত করেছেন। তিনি বুঝেছেন, পৃথিবী যে সৃষ্টিকর্তার একটা ফাঁকি এবং শয়তানের একটা ফাঁদ—তা না মনে করে একে বিশ্বাস করে, ভালবেসে, ভালবাসা পেয়ে, মানুষের মতো বেঁচে এবং মানুষের মতো মরে গেলেই যথেষ্ট—দেবতার মতো হাওয়া হয়ে যাবার চেষ্টা করা তাঁর কাজ নয়।

রবীন্দ্রনাথ সেই বয়সেই যে কতবড় মানবপ্রেমিক ছিলেন—তা তাঁর এই চিঠিগুলি পড়লেই বুঝা যায়। ১৮নং পত্রে তিনি লিখছেন—'পৃথিবীর কাছ থেকে আমরা যে সব পৃথিবীর ধন পেয়েছি এমন কি কোন স্বর্গ থেকে পেতুম। স্বর্গ আর কী দিত জানি নে, কিন্তু এমন কোমলতা-দুর্বলতাময় এমন সকরুণ আশঙ্কাভরা অপরিণত এই মানুষগুলির মতো এমন আপনার ধন কোথা থেকে দিত। আমাদের এই মাটির মা, আমাদের এই আপনাদের পৃথিবী, এর সোনার শস্যক্ষেত্রে, এর স্নেহশালিনী নদীগুলির ধারে, এর সুখদুঃখময় ভালবাসার লোকালয়ের মধ্যে এই সমস্ত দরিদ্র মর্ত-হৃদয়ের অশ্রুর ধনগুলিকে কোলে করে এনে দিয়েছে। আমরা হতভাগ্যরা তাদের রাখতে পারি নে, বাঁচাতে পারি নে, নানা অদৃশ্য প্রবল শক্তি এসে বুকের কাছ থেকে তাদের ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিয়ে যায়, কিন্তু বেচারা পৃথিবীর যতদূর সাধ্য তা সে করেছে। আমি এই পৃথিবীকে ভারি ভালবাসি।'

৯৬নং পত্রে কবি কালিগ্রামের সরল চাষী প্রজাদের সম্পর্কে লিখছেন—'আমার কাছে এই সমস্ত দুঃখপীড়িত অটল বিশ্বাসপরায়ণ অনুরক্ত প্রজাদের মুখে বড়ো একটি কোমল মাধুর্য আছে, বাস্তবিক এরা যেন আমার একটি দেশজোড়া বৃহৎ পরিবারের লোক। এই সমস্ত নিঃসহায় নিরুপায় নিতান্ত নির্ভরপর সরল চাষা-ভুষাদের আপনার লোক মনে করতে একটা সুখ আছে! ··· এদের উপর যে আমার কতখানি শ্রদ্ধা হয়, আপনার চেয়ে যে এদের কতখানি ভালো মনে হয় তা এরা জানে না।'

১৩৫১ সালের 'বিশ্বভারতী' পত্রিকায় একখানি চিঠি পড়েছিলাম—সেটিও ছিন্নপত্রের চিঠি বলে উল্লিখিত ছিল এবং রবীন্দ্র-জীবনীকার শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মশাইও রবীন্দ্র-জীবনীর প্রথম খণ্ডে তার কথা উল্লেখ করেন। সেই

পত্রটিতে সাধারণ মানুষ হিসেবে রবীন্দ্রনাথকে দেখা যায়, শুধু যে সাধারণ মানুষের জন্যে সংবেদনশীলতায় তাঁর চিত্ত ভরে উঠেছে—তা নয়, তিনি সাধারণ মানুষের স্তরে নেমে এসে নিজের সম্পর্কে বিচার করেছেন। প্রভাতবাবু ঠিকই বলেছেন—ওইখানি মানুষ রবীন্দ্রনাথের লেখা, জমিদার রবীন্দ্রনাথের নয়, এমন কি কবি রবীন্দ্রনাথেরও নয়। সেখানে নিজের জমিদারির কাজকর্ম সম্পর্কে কবি বলছেন—'আমার মনে মনে হাসি পায়—আমার নিজের অপার গাম্ভীর্য এবং অতলস্পর্শ বুদ্ধিমানের চেহারা কল্পনা করে সমস্তটা প্রহসন বলে মনে হয়। প্রজারা যখন সসম্ভ্রম কাতর ভাবে দরবার করে, এবং আমলারা বিনীত করজোড়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তখন আমার মনে হয় এদের চেয়ে এমনি আমি কি মস্ত লোক যে আমি একটু ইঙ্গিত করলেই এদের জীবন রক্ষা এবং আমি একটু বিমুখ হলেই এদের সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে। আমি যে এই চৌকিটার উপরে বসে বসে ভাণ করছি যেন এই সমস্ত মানুষের থেকে আমি একটা স্বতন্ত্র সৃষ্টি, আমি এদের হর্তাকর্তা বিধাতা, এর চেয়ে অদ্ভুত আর কি হতে পারে! অন্তরের মধ্যে আমিও যে এদেরই মতো দরিদ্র দুঃখকাতর মানুষ, পৃথিবীতে আমারও কত ছোট ছোট বিষয়ে দরবার, কত সামান্য কারণে মর্মান্তিক কান্না, কতলোকের প্রসন্নতার উপরে জীবনের নির্ভর! এই সমস্ত ছেলেপিলে-গরুলাঙ্গল ঘরকন্না-ওয়ালা সরলহৃদয় চাষাভুষোরা আমাকে কি ভুলই জানে! আমাকে এদের সমাজপতি মানুষ বলেই জানে না। সেই ভুলটিই রক্ষে করবার জন্যে কত সরঞ্জাম রাখতে এবং কত আড়ম্বর করতে হয়। ··· কে জানে যদি ঐ ভুলে আঘাত লাগে! প্রেসটিজ মানে হচ্ছে মানুষ সম্বন্ধে মানুষের ভুল বিশ্বাস! আমাকে এখনকার প্রজারা যদি ঠিক জানত, তা হলে আপনাদের একজন বলে চিনতে পারত, সেই ভয়ে সর্বদা মুখোশ পরে থাকতে হয়।'

এমনি ধারা মানুষ রবীন্দ্রনাথের হাজার পরিচয় ছড়িয়ে আছে ছিন্নপত্রের চিঠিতে।

এক কথায় ছিন্নপত্র না পড়লে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিচেতনা, মানবচেতনা নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করা যাবে না। প্রকৃতিলোকের অপার সৌন্দর্য আর মানবজীবনে দুঃখ-সুখের উপলব্ধি—আনন্দ—বেদনার বিচিত্র সংবেদনশীলতা—ছিন্নপত্রের প্রায় প্রতিটি চিঠিতেই স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছে। তাই ছিন্নপত্র রবীন্দ্র-সাহিত্য পাঠের পটভূমিকা হিসাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ—সন্দেহ নেই।

'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-দৃষ্টি

রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের জীবনের উদ্যোগপর্বের একটি বিরাট অংশ 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থের মাধ্যমে পাঠকদের সামনে বেশ সুচারুভাবেই বিশ্লেষণ করেছেন। জীবন-স্মৃতি পড়লে রবীন্দ্রনাথের কবি-মানসের উন্মেষ সম্বন্ধে পাঠকের একটা পরিষ্কার ধারণা হবেই। কিন্তু আমরা আপাতত সে আলোচনা থেকে বিরত থাকছি। বর্তমানে আমাদের আলোচ্য বিষয় হল যে রবীন্দ্রনাথের কবি-জীবনে তাঁর বাল্যকালে দেখা প্রকৃতি কতদূর প্রভাব বিস্তার করেছে, তাঁর কাব্য-মানস প্রকৃতি থেকে কি ভাবে প্রাণরস আহরণ করতে শিখেছে, আমরা বর্তমানে সেটুকুর আলোচনা করবো।

বালক বয়স থেকেই রবীন্দ্রনাথ যে সব কবিতা লিখতে শুরু করেন, সেগুলোর মধ্যেও প্রকৃতির প্রভাব খুব বেশী দেখা যায়। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ যে কবি হবার আগেই প্রকৃতির সঙ্গে সখ্য পাতিয়েছিলেন তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। জীবনস্মৃতিতে প্রকৃতির প্রতি বালক কবির যে মনোভাব গড়ে উঠেছে তারই দু'চারটে ধূসর স্মৃতিচিত্র অঙ্কিত আছে, শুধু তাই নয় পরবর্তী কালে প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ নিজের কাব্য-মানসে প্রকৃতিকে যে ভাবে উপলব্ধি করেছেন—তারও মৌলিক সূত্রের সন্ধান মিলতে পারে, এমন দু-একটি চিত্র ও ঘটনার স্মৃতি-কথার উল্লেখও কবি করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে বিশ্বপ্রকৃতি যত বেশী প্রভাব বিস্তার করেছে—তত বেশী প্রভাব আর কারও কাব্যে পড়ে নি। রবীন্দ্রনাথও একথা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছেন যে, প্রকৃতিই তাঁর জীবনে সবচেয়ে বড় সত্য।

জীবনস্মৃতির 'ঘর বাহির' শীর্ষক নিবন্ধে আমরা দেখি যে শিশুবয়সে রবীন্দ্রনাথ শ্যাম নামক একটি চাকরের জিম্মায় বিকাল বেলার সময়টুকু কাটাতেন। সেই শ্যাম চাকরটি শিশু রবীন্দ্রনাথকে একটি নির্দিষ্ট স্থানে বসিয়ে রেখে চারিদিকে খড়ি দিয়ে গণ্ডি কেটে দিত। সেখান থেকে জানালা দিয়ে একটা প্রকাণ্ড চীনে বটগাছ দেখা যেত এক পুকুরের পারে। এই পুকুরে নানালোকের স্নানপর্ব তিনি সেখান থেকে দেখতেন, সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে বসেও তিনি বৃহত্তর জগতের একটা কাল্পনিক স্বাদ গ্রহণ করতেন। সেই ঝুরিনামা বটগাছ; পৃথিবীর সেই ছোট্ট কোণটি—বালক কবির মনে একটা কুহক-জাল সৃষ্টি করেছিল। এই বটগাছকে উদ্দেশ্য করেই তিনি লিখেছিলেন—

নিশি দিসি দাঁড়িয়ে আছে মাথায় লয়ে জট,
ছোট ছেলেটি মনে কি পড়ে, ওগো প্রাচীন বট।

এই বট এবং তার পরিপার্শ্ব কবির জীবনে একটা বড় রকমের প্রভাব রেখে গেছে। তিনি বলছেন—'সে বট এখন কোথায়? যে পুকুরটি এই বনস্পতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার দর্পণ ছিল তাহাও এখন নাই;—আর সেই বালক আজ বাড়িয়া উঠিয়া নিজের চারদিক হইতে নানাপ্রকারের ঝুরি নামাইয়া বিপুল জটিলতার মধ্যে সুদিন দুর্দিনের ছায়ারৌদ্রপাত গণনা করিতেছে।'

বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথের বাড়ির বাইরে যাওয়ার নিষেধ ছিল। সেই জন্যে বিশ্বপ্রকৃতিকে আড়াল আবডাল থেকেই তিনি দেখতেন। 'বাহির বলিয়া একটি অনন্তপ্রসারিত পদার্থ ছিল যাহা আমার অতীত, অথচ যার রূপ, শব্দ, গন্ধ দ্বার-জানালার ফাঁক-ফুকর দিয়া এদিক-ওদিক হইতে আমাকে চকিতে ছুঁইয়া যাইত। সে যেন গরাদের ব্যবধান দিয়া নানা ইসারায় আমার সঙ্গে খেলা করিবার নানা চেষ্টা করিত। সে ছিল মুক্ত, আমি ছিলাম বদ্ধ—মিলনের উপায় ছিল না, সেই জন্য প্রাণের আকর্ষণ ছিল প্রবল। আজ সেই খড়ির গণ্ডি মুছিয়া গেছে, কিন্তু গণ্ডী তবু ঘোচে নাই, দূর এখনও দূরে বাহির এখনও বাহিরেই।'

অর্থাৎ বহির্জগৎকে তিনি যেন গণ্ডির মধ্যে থেকেই দেখতে চেষ্টা করেছেন, তাই বস্তুময় জগতের সবটা তাঁর কাব্যে কখনও পরিষ্কার হয়ে প্রতিফলিত হয় নি। ছোট্ট একটি ছেলে—বড় বাড়ির বড় শাসনের ফাঁক থেকে মুক্ত প্রকৃতির ঔদার্য কি করে উপভোগ করবে? বালক-কবির মনে প্রকৃতির সমগ্র রূপের খবর তখন ধরা পড়ে নি—এমন কি একটা পরিষ্কার ধারণাও তাঁর মনকে স্পর্শ করে নি। পদ্মাতীরে আসবার আগে পর্যন্ত প্রকৃতির উন্মুক্ত সৌন্দর্যের ছোঁয়া তিনি পান নি; ফলে সোনার তরী-যুগের আগে অবধি কবির মনে একটা অধীরতা বা প্রকৃতিকে স্পষ্ট করে জানার আকাঙ্ক্ষা রয়েছে—দেখতে পাই। এই সম্পূর্ণ না-দেখার জন্যেই তাঁর মনে প্রকৃতি সম্পর্কে একটা সজাগ কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে—এবং এই সতত সজাগ কৌতূহল তাঁকে 'প্রকৃতির কবি' বলে খ্যাত করেছে।

প্রকৃতির বুকে মানুষ হলে হয়তো তিনি 'মানুষের কবি' হতেন—শহর বা লোকালয়ের প্রতি তাঁর টান থাকত বেশী। প্রকৃতির সমগ্র সৌন্দর্যের জন্যে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে আকুলতা দেখতে পাই, সৌন্দর্যানুসন্ধানের প্রবল টান যে তাঁর মধ্যে এত তীব্রভাবে দেখতে পাই,—তা এর জন্যেই। তিনি সত্যিই বলেছেন যে, তিনি বুঝতে পারেন না তাঁর মনে সুখ-দুঃখ-বিরহ-মিলনপূর্ণ ভালবাসা প্রবল, না সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা প্রবল। 'সোনার তরী', 'নিরুদ্দেশ যাত্রা', 'মানস সুন্দরী' (সোনার তরী), 'জ্যোৎস্না রাতে', 'উর্বশী' (চিত্রা)—প্রভৃতি কবিতায়

এই আকাঙ্ক্ষার খবর আছে। মানসীর 'মেঘদূতে'ও এই সুর ধ্বনিত হতে দেখা যায়।

বালক-কবি যখন প্রথম পেনেটিতে ছাতুবাবুদের বাগানে বেড়াতে যান—তখন প্রকৃতির উন্মুক্ত প্রসারতার মধ্যে তাঁর প্রথমেই মনে হয়েছিল যে গঙ্গার তীরভূমি যেন কোন পূর্বজন্মের পরিচয়ে তাঁকে কোলে করে নিলে। এই প্রথম তিনি বাঙলার পল্লীতে বেড়াবার সুযোগ পেলেন, গ্রামের গলিতে ঘন বনের ছায়ায় শেওড়ার বেড়া-ঘেরা-দেওয়া পানা পুকুরের ধার দিয়ে চলতে বড় আনন্দে এই ছবি মনের মধ্যে এঁকে নিচ্ছিলেন।

প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর এই জন্মান্তরীণ আত্মীয়তা—এর প্রকাশ তাঁর বহু কবিতায় ঘটেছে। বিশেষ করে 'সোনার তরী'র 'সমুদ্রের প্রতি' এবং 'বসুন্ধরা' কবিতায়। 'চৈতালি'র একটি কবিতায় তিনি লিখেছেন—

ফিরিয়া এসেছি যেন আদি-জন্মস্থলে
বহুকাল পরে,—ধরণীর বক্ষতলে
পশু পাখি পতঙ্গম সকলের সাথে
ফিরে গেছি যেন কোন নবীন প্রভাতে
পূর্বজন্মে—জীবনের প্রথম উল্লাসে
আঁকড়িয়া ছিনু যবে আকাশে বাতাসে
জলে স্থলে—মাতৃস্তনে শিশুর মতন—
আদিম আনন্দরস করিয়া শোষণ।

'জীবনস্মৃতির বাহিরে যাত্রা' নিবন্ধে তিনি লিখছেন—'প্রত্যহ প্রভাতে ঘুম হইতে উঠিবামাত্রই আমার কেমন মনে হইত, যেন দিনটাকে একখানি সোনালি-পাড়-দেওয়া নূতন চিঠির মতো পাইলাম।' কবি প্রকৃতিকে নিজের মনের উপলব্ধির সঙ্গে একীভূত করে দিতে পেরেছিলেন বলেই এইভাবে বলতে পেরেছেন।

'হিমালয় ভ্রমণ' নিবন্ধে তিনি লিখছেন—'আমাদের বাসার নিম্নবর্তী এক অধিত্যকায় বিস্তীর্ণ কেলুবন ছিল। সেই বনে আমি একলা আমার লৌহফলক-বিশিষ্ট লাঠি লইয়া প্রায়ই বেড়াইতে যাইতাম। বনস্পতিগুলা প্রকাণ্ড দৈত্যের মতো মস্ত মস্ত ছায়া লইয়া দাঁড়াইয়া আছে; তাহাদের কত শত বৎসরের বিপুল প্রাণ। কিন্তু এই সেদিনকার অতি ক্ষুদ্র একটি মানুষের শিশু অসংকোচে তাহাদের গা ঘেঁষিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহারা একটি কথা কখনও বলিতে পারে না। বনের ছায়ার মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্রই যেন তাহার একটা বিশেষ

স্পর্শ পাইতাম। যেন সরীসৃপের গাত্রের মতো একটি ঘন শীতলতা এবং বনতলের শুষ্ক পত্ররাশির উপরে ছায়া-আলোকের পর্যায় যেন প্রকাণ্ড একটা আদিম সরীসৃপের গাত্রের বিচিত্র রেখাবলী।'

কবি যখন অনেক পরে স্মৃতির ভাণ্ডার উজাড় করে এই সব অনুভূতিগুলিকে সুচারু-ভাষায় প্রকাশ করছেন—তখন তিনি তখনকার কাব্য-মানসকেই ব্যক্ত করছেন। অবশ্য হিমালয় যাত্রা কবির মনকে প্রকৃতির রাজ্যে গভীরভাবে টেনে নিয়ে গিয়েছিল—এবং সেই আকর্ষণের খবর আছে তাঁর প্রথম যুগকার কাব্য—'কবি-কাহিনী', 'বনফুল' প্রভৃতি গ্রন্থে। প্রকৃতি থেকে যখনই কবি নিজের মনের আনন্দরস আহরণ করার দীক্ষা নিয়েছিলেন, প্রকৃতি তখনই তাঁর আত্মীয়রূপে গণ্য হয়েছিল। গঙ্গাতীরের নিবন্ধে তিনি লিখছেন—'আমার পক্ষে বাংলা দেশের এই আকাশভরা আলো, এই দক্ষিণের বাতাস, এই গংগার প্রবাহ, এই রাজকীয় আলস্য, ই আকাশের নীল ও পৃথিবীর সবুজের মাঝখানকার দিগন্ত প্রসারিত উদার বকাশের মধ্যে সমস্ত শরীর মন ছাড়িয়া দিয়া আত্ম-সমর্পণ—তৃষ্ণার জল ও ক্ষুধার াদ্যের মতই অত্যাবশ্যক ছিল।'

'সন্ধ্যাসঙ্গীত', 'প্রভাতসঙ্গীত' ও 'ভগ্নহৃদয়'-এর কবিতায় এই ক্ষুধার বিশেষ পরিচয় আছে। 'প্রভাতসঙ্গীতে'র কবিতাগুলিকে তাই নিমন্ত্রণ বলা হয়—কারণ হৃদয়ারণ্য থেকে বাইরের বিশ্বে প্রথম আসাব খবর এখানে রয়েছে। এই সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথের মানস উপলব্ধি কাব্যে রূপলাভ করতে থাকে। তিনি 'প্রভাত-সঙ্গীত' নিবন্ধে বলেছেন—'এতদিন জগৎকে কেবল বাইরের দৃষ্টিতে দেখিয়া আসিযাছি, এজন্য তাহাব একটা সমগ্র আনন্দরূপ দেখিতে পাই নাই। একদিন হঠাৎ আমার অন্তরের যেন একটা গভীর কেন্দ্রস্থল হইতে একটা আলোকরশ্মি মুক্ত হইয়া সমস্ত বিশ্বের উপর যখন ছড়াইয়া পড়িল তখন সেই জগৎকে আর কেবল ঘটনাপুঞ্জ ও বস্তুপুঞ্জ করিয়া দেখা গেল না, তাহাকে আগাগোড়া পরিপূর্ণ করিয়া দেখিলাম। ইহা হইতেই একটা অনুভূতি আমার মনের মধ্যে আসিয়াছিল যে, অন্তরের কোন্ একটি গভীরতম গুহা হইতে সুরের ধারা আসিয়া দেশে কালে ছড়াইয়া পড়িতেছে—এবং প্রতিধ্বনিরূপে সমস্ত দেশকাল হইতে প্রত্যাহত হইয়া সেই খানেই আনন্দস্রোতে ফিরিয়া যাইতেছে। সেই অসীমের দিকে ফেরার মুখের প্রতিধ্বনিই আমাদের মনকে সৌন্দর্যে ব্যাকুল করে। গুণী যখন পূর্ণ হৃদয়ের উৎস হইতে গান ছাড়িয়া দেন তখন সেই এক আনন্দ; আবার যখন সেই গানের ধারা তাঁহারই হৃদয়ে ফিরিয়া যায় তখন সে এক দ্বিগুণতর আনন্দ। বিশ্বকবির কাব্যগান যখন আনন্দময় হইয়া তাঁহারই চিত্তে ফিরিয়া যাইতেছে তখন সেইটেকে

আমাদের চেতনার উপর দিয়া বহিয়া যাইতে দিলে, আমরা জগতের পরিণামটিকে যেন অনির্বচনীয়রূপে জানিতে পারি। যেখানে আমাদের সেই উপলব্ধি সেইখানে আমাদের প্রীতি; সেখানে আমাদেরও মন সেই অসীমের অভিমুখীন আনন্দস্রোতের টানে উতলা হইয়া সেইদিকে আপনাকে ছাড়িয়া দিতে চায়। সৌন্দর্যের ব্যাকুলতার ইহাই তাৎপর্য।'

এরপর তিনি স্পষ্ট ঘোষণা করলেন যে—তাঁর শিশুকালের বিশ্বকে 'প্রভাত-সঙ্গীতে'র মধ্যে তিনি বিশেষ করে ধরে রেখেছেন—এবং সেখানেই যেন তিনি বিশ্বকে অনেক বেশী করে পেতেন। এমনি করেই রবীন্দ্রনাথের 'প্রভাতসঙ্গীতে'র কবিতায় প্রকৃতির সঙ্গে সহজ মিলন-বিচ্ছেদে ও পুনর্মিলনে জীবনের প্রথম অধ্যায়ের একটা পালা শেষ হয়ে গেল। তিনি বলছেন—'শেষ হইয়া গেল বলিলে মিথ্যা বলা হয়। এই পালাটাই আবার আরও একটু বিচিত্র হইয়া শুরু হইয়া আবার আরও একটা দুরূহতর সমস্যার ভিতর দিয়া বৃহত্তর পরিণামে পৌছিতে চলিল।'

এরপর 'সোনার-তরী'র-যুগে প্রকৃতির সঙ্গে কবির যে আত্মিক যোগ—তার হদিস পাই তাঁর শিশুকালের চেতনা থেকে। শৈশব থেকেই বিশ্ব-প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর সহজ অথচ নিবিড় যোগ ছিল—তাই তখন বাড়ির ভেতরের নারকেল গাছগুলিও তাঁর কাছে অত্যন্ত সত্য হয়ে দেখা দিত। এই ভাবে প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর মিলন শুরু হয়—সে খবর বিস্তৃত করে তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন "প্রভাত-সঙ্গীত" নিবন্ধে। শিলাইদহপর্বে 'ছিন্নপত্রের' পাতায় পাতায় প্রকৃতির সঙ্গে এই একাত্মতা জড়িয়ে রয়েছে।

তোমার প্রিয় গ্রন্থ

বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী'

বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী'র কৌলীন্য আজ সর্বজনস্বীকৃত। একদা এই গ্রন্থের বোদ্ধা ছিলেন মুষ্টিমেয় রসিক কয়েকজন মাত্র—যাঁরা এই গ্রন্থের উচ্চপ্রশংসা করতেন, আন্তরিক সমাদর করতেন। তাঁদেরকে 'সর্বজন' বলা যায় না। তাই বিভূতিভূষণের জীবনকালে এই গ্রন্থের ভাগ্যে জনসাধারণের অন্তর থেকে উৎসারিত কোনও আদর জোটে নি। কিন্তু ইতিমধ্যে দুটি ঘটনা 'পথের পাঁচালী'কে অসাধারণ জনপ্রিয় করে তুলেছে।